শরৎচন্দ্র

(১ম খণ্ড-জীবনী)

গোপালচন্দ্র রায়

সাহিত্য সদন
এ ১২৫ কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট
কলিকাতা-১২

প্রকাশিকা—
শ্রীমীনাক্ষী রায়, এম-এ
সাহিত্য সদন
এ ১২৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ—
৩রা চৈত্র (দোল-পূর্ণিমা), ১৩৭১
১৭ই মার্চ, ১৯৬৫

দাম—ষোল টাকা

মুদ্রাকর—
শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার
সেঞ্চুরী প্রেস
২১ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

কয়েকটি টুকরো ঘটনা—

গ্রন্থকারের নিবেদন

শরৎচন্দ্রের জীবন বড় বৈচিত্র্যময়। তাঁর প্রথম জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে বেপরোয়া, উচ্ছৃঙ্খল, ছন্নছাড়া ও ভবঘুরে হিসাবে।

তিনি গামছা কাঁধে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন। তাঁর নিজের কথায়— "এমন দিন গেছে, যখন দু-তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায় থেকেছি। কাঁধে গামছা ফেলে এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছি। কত বাড়ীতে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে—তারা ভদ্রলোক! কত হাড়ী-বাগ্দীর বাড়ীতে আহার করেছি।… তারপর খুব ভাল করে দেখে নিয়েছি পল্লীগ্রাম ও পল্লী-সমাজ।"

শরৎচন্দ্র সন্ন্যাসী হয়ে সন্ন্যাসীর দলে ভিড়ে ভারতের নানাস্থানে বেড়িয়েছেন। চাকরির জন্য বর্মায় গিয়ে সেখানেও তিনি গ্রামে গ্রামে এবং শহরে শহরে ঘুরেছেন।

শরৎচন্দ্র একাধিক নারীর প্রণয়-প্রার্থী হয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। বিয়েও করেছেন একাধিক। 'নারীর ইতিহাস' লিখতে গিয়ে তিনি বহুদিন পতিতালয়ে পতিতালয়ে ঘুরেছেন এবং এজন্য তিনি প্রচুর দুর্নামও কুড়িয়েছেন। তিনি সমাজচ্যুত হয়েছেন, 'একঘরে' হয়েছেন এবং মিথ্যা মামলায় আসামীও হয়েছেন।

শরৎচন্দ্র কংগ্রেসে যোগ দিয়ে দেশের কাজে মেতেছেন। কংগ্রেসের অহিংস সংগ্রামী হয়ে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছেন।

শরৎচন্দ্র বন্ধুদের অনুরোধে মাসিকপত্রে লেখা দিয়েছেন। এবং কাগজে আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তিনি সাহিত্য রচনায় কুঁড়েমির চূড়ান্ত করেছেন। যা লিখেছেন, তার জন্য প্রশংসা পেয়েছেন প্রচুর, আবার গালাগালিও খেয়েছেন যথেষ্ট। দেশের একদল লোক তাঁকে মাথায় তুলে নিয়েছেন, আবার একদল তাঁকে অপাংক্তেয় করেছেন।

শরৎচন্দ্র 'নারী দরদী' বলে বহু নারী তাঁর স্তুতি করেছেন, আবার অনেক নারী তাঁর নিন্দাও করেছেন। এইরূপ নারীরই স্তুতি ও নিন্দায়, শরৎচন্দ্রের জীবনের একটা ঘটনা এখানে বলছি—

কলকাতার বীণা দেবী সরস্বতী একজন উচ্চশিক্ষিতা ভদ্রমহিলা। তিনি

নিজে লেখিকা বলে শরৎচন্দ্রের উপর তাঁর একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। শরৎচন্দ্র শেষ বয়সে বালীগঞ্জে বাড়ী করে যখন বাস করতে আরম্ভ করলেন, তখন বীণা দেবী তাঁদের বাড়ী থেকে মাঝে মাঝে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। বীণা দেবী শরৎচন্দ্রকে দাদা বলতেন, আর শরৎচন্দ্রও তাঁকে ছোট বোনের মত খুব স্নেহ করতেন।

বীণা দেবী প্রায় আসেন। একবার এসে তিনি শরৎচন্দ্রকে তাঁদের বাড়ীতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন।

নিমন্ত্রণ শুনে শরৎচন্দ্র বললেন—তোমার বাড়ীতে গিয়ে খেতে পারি, কিন্তু আমি যা খাই, তুমি তাই খাওয়াবে তো? আমি সিঙ্গী মাছের ঝোল আর ভাত খাই। তাই যদি খাওয়াতে পারো তো যাই।

বীণা দেবী তাই খাওয়াবেন বলায়, শরৎচন্দ্র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

বীণা দেবী শরৎচন্দ্রকে যেদিন খাওয়াবেন, সেদিন সকালে তিনি তাঁদের বাড়ীর পুরুষদের বাজার থেকে ভাল দেখে সিঙ্গী মাছ কিনে আনতে বললেন।

সিঙ্গী মাছ এল। রান্নাও হ'ল। সেদিনটা রবিবার কি ছুটির দিন ছিল না। তাই যথাসময়ে বাড়ীর পুরুষরা যে যার অফিসে চলে গেলেন।

বাড়ীর পুরুষরা অফিস গেলে, বীণা দেবীর এক অল্পশিক্ষিতা ননদ তাঁর মা'র কাছে গিয়ে বলল—ওগো মা, বৌদি কাকে নিমন্ত্রণ করে এনে অত যত্ন করে খাওয়াবে শুনেছ! সেই লেখক শরৎ চাটুজ্যেকে, শুনেছি লোকটা যেমন মাতাল, তেমনি চরিত্রহীন। পতিতাদের মধ্যেই নাকি থাকে।

মা ছিলেন সেকেলে মহিলা, তেমন লেখাপড়া জানতেন না। তিনি এই কথা শুনে খুব রেগে গেলেন। চীৎকার করে বৌমার কাছে গিয়ে বললেন—বৌমা! তুমি গেরস্থ ঘরের বৌ হয়ে একি করছ! আমি আগে যদি ঘুণাক্ষরেও এর কিছু জানতে পারতাম, তাহলে ছেলেদের ঐ মাছ কিনে আনতেই নিষেধ করতাম। কিন্তু বলে দিচ্ছি বৌমা, তুমি তাকে কিছুতেই এ বাড়ীতে আনতে পারবে না।

বীণা দেবী তো তাঁর শাশুড়ীর কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি তাঁর শাশুড়ীকে অনেক অনুরোধ করে বললেন—মা, আজকের দিনটার মত আপনি অনুমতি দিন। আর কোন দিন আমি তাঁকে আনব না। আজ নিমন্ত্রণ করে তাঁকে না খাওয়ালে, তাঁর যে অপমান করা হবে মা!

বীণা দেবীর শাশুড়ী কিছুতেই অনুমতি দিলেন না। অবশেষে তিনি

বৌকে একটা মতলব বলে দিলেন। বললেন—তুমি এখনি তাঁর বাড়ী গিয়ে বলগে, আমার শাশুড়ীর ভারী অসুখ, তাই আজ আর আপনাকে খাওয়াতে পারলাম না।

নিমন্ত্রিত শরৎচন্দ্রকে শুধু সেই দিনটার জন্য একবার বাড়ীতে আনতে দেবার জন্য তিনি শাশুড়ীর কাছে কত অনুনয়-বিনয় করলেন, কিন্তু তাঁর শাশুড়ী কিছুতেই মত দিলেন না।

বীণা দেবী তখন বাধ্য হয়েই শরৎচন্দ্রকে নিষেধ করতে গেলেন। তিনি কিন্তু গিয়ে শাশুড়ীর শেখানো তাঁর ভারী অসুখের কথা বললেন না। তিনি শরৎচন্দ্রের কাছে কেঁদেকেটে অকপটে সমস্ত কথাই খুলে বললেন। তিনি আরও বললেন যে, তাঁর স্বামী বা ভাসুর, পুরুষদের কেউ যদি বাড়ীতে থাকতেন, তাহলে এমনটা হতে পারত না। তাঁরা থাকলে তাঁদের মাকে বোঝাতে পারতেন।

সমস্ত শুনে শরৎচন্দ্র গম্ভীর হয়ে বীণা দেবীকে শুধু এই কথাই বললেন—এ নিয়ে তুমি মনে কোন দুঃখ করো না। এর জন্য আমি কিছু মনে করি নি। আমাকে লোকে ঐ রকম ভুলই বুঝে থাকে। আমাকে নিয়ে তারা যে কত জল্পনা-কল্পনা করে তার ইয়ত্তা নেই। এই দেখ না, তোমার বৌদিকে আমি ধর্ম-মতেই বিয়ে করেছি, তবুও লোকে বলে আমি নাকি তাঁকে রক্ষিতা রেখেছি।

সত্যই শরৎচন্দ্রের বিবাহটা একটা বড় ধোঁয়াটে ব্যাপার। কেউ কেউ বলেন, তিনি বিয়ে করেছিলেন ; আবার অনেকে বলেন, তিনি বিয়ে করেন নি, কেবল জীবন-সঙ্গিনী জুটিয়েছিলেন। তাই শরৎচন্দ্রের এই বিয়ের ব্যাপারটি নিয়েও এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কথা হল, তিনি ছিলেন অত্যন্ত দরদী। তাঁর চরিত্রের এই দিকটা তো বটেই, তাছাড়া তাঁর চরিত্রের খেয়ালী, আত্মভোলা, বন্ধু-বৎসল, অতিথি-পরায়ণ, মজলিসী, ধর্ম-নিষ্ঠ প্রভৃতি দিকগুলি নিয়েও এই গ্রন্থে আলোচনা করেছি। আর শরৎচন্দ্র যে জন্য আজ 'শরৎচন্দ্র', তাঁর সেই সাহিত্য-সৃষ্টির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্তরই বিস্তৃত ইতিহাস ও বিবরণ দিয়েছি।

একটা কথা। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ বা সৌভাগ্য

আমার হয় নি। তাঁকে ক'বার দেখেছি মাত্র। শেষবার দেখি তাঁর মৃত্যুর বৎসর ১৩৪৪ সালের ৩১শে ভাদ্র তারিখে। আমি তখন কলকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজে বি-এ ক্লাসে পড়ি। তিনি সেবার আমাদের কলেজে তাঁর জন্মোৎসব সভায় এসেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ না হলেও, তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীর কাছে বহুদিন গিয়ে তাঁদের জীবনের অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি। তাছাড়া শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীদের বাড়ী থেকে, শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরের কয়েকজন মাতুল ও বাল্যবন্ধুর কাছ থেকে, তাঁর হাওড়ার শিবপুর, সামতাবেড় ও কলকাতার অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে, তাঁর গ্রন্থের প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির কাছ থেকেও তাঁর সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি এবং এ বিষয়ে সাহায্য পেয়েছি।

অবশ্য শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশলেই যে তাঁর সম্বন্ধে সমস্ত প্রকৃত ঘটনা লেখা যায়, তাও মোটেই সত্য নয়। কেননা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও আত্মীয় যাঁরা তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু লিখেছেন, তাঁদের কারও লেখায় প্রচুর, আবার কারো কারো লেখায় কিছু কিছু ভুলও রয়েছে।

এখানে তাঁদের কারো কারো লেখায় সেইরূপ দু-একটা ছোটখাট ভুলের উল্লেখ করছি। যেমন—শরৎচন্দ্রের মাতুল ও বাল্যবন্ধু সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎ-পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন—"যখন 'পথের দাবী'র পরিকল্পনা তাঁর মনে গড়ে উঠেছে, তখন তিনি জানতেন যে ঐ বইখানি লেখায় তাঁর জেল হবে নিশ্চয়। জেলে যেতে তাঁর ভয় ছিল না। তবে সেখানে মদ পাওয়া যাবে না, এটা নিশ্চয় কোরে জানতেন। তাই মদ খাওয়া বন্ধ কোরে দিলেন। আফিং খাওয়ার করুণ ইতিহাস যে, জেলে মদ পাওয়া অসম্ভব। আফিং তবুও পাওয়া গেলেও যেতে পারে।"

সুরেনবাবুর লেখায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, জেলে মদ পাওয়া যাবে না, বরং আফিং পাওয়া যেতে পারে—এই ভেবে শরৎচন্দ্র মদ ছেড়ে আফিং ধরেছিলেন।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যে—শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী' লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, রেঙ্গুন ছেড়ে চলে আসার অনেক বছর পরে হাওড়ায় থাকার সময়। অথচ শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুন থেকে লেখা চিঠিপত্রে দেখা যায়, তিনি রেঙ্গুনে থাকার সময়েই ভাল রকম আফিং ধরেছিলেন। হাওড়ায় এসে ২-২-১৭

তারিখেও তিনি হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন—"দেখছি ১২৫ এর কমে মাস চলে না।...আফিংই ত লাগে ১৪।১৫ টাকা।"

শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট বন্ধু ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"সে (শরৎচন্দ্র) স্বদেশকে বড় ভালবাসিত। যে কেহ স্বদেশের জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়াছে, সে তাহার পরমাত্মীয় হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ কত লোককে যে সে সাহায্য করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। রাসবিহারী বসু যখন পলাইয়া যাইবেন, তখন একজন আসিয়া শরৎকে বলিল—সাত হাজার টাকা না দিলে, রাসবিহারী সীমান্ত পার হইয়া পলাতক হইতে পারে না। রাত্রি তখন এগারটা ; শরৎ চিন্তিত হইল। তাহার হাতে অত টাকা নাই। সে অবশেষে মাড়োয়ারীর কাছে গিয়া হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া টাকা লইয়া রাসবিহারীবাবুকে উদ্ধার করিল।" (প্রবাসী—কার্তিক, ১৩৪৫)

চারুবাবুর এ লেখাটি সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফিরেই এসেছিলেন (এপ্রিল ১৯১৬) রাসবিহারী বসু পলাতক হওয়ার (জুলাই ১৯১৫) প্রায় এক বছর পরে। আর শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে চলে আসার পর বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত তাঁর আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। তাই তিনি তখন অত টাকা কারও কাছে ধার চাইলে, কেউই ধার দিত না।

রাসবিহারী বসু কবে কিভাবে পলাতক হয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে দেশের মুক্তিকার্যে তাঁর সহকর্মী ও তাঁর জীবনী লেখক নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে এখানে কিছুটা উদ্ধৃত করছি—

"১৯১৫ সালের ১৫ই জুলাই খিদিরপুর ডক হইতে 'সানুকিমারু' নামক একটি জাপানী জাহাজ জাপান যাওয়ার কথা ছিল। অতএব সেই জাহাজেই রাসবিহারী জাপানাভিমুখে যাত্রা করিবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।...

গিরিজাবাবু (নগেন্দ্রনাথ দত্ত) তখনও ধরা পড়েন নাই। কাজেই রাসবিহারীর জাপান যাত্রার সমুদয় ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় অর্থাদি সংগ্রহ ইত্যাদি কার্য তিনিই সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। গিরিজাবাবুই খিদিরপুর ডকে গিয়া রাসবিহারীকে সম্বর্ধনা জানাইয়া আসেন।" (বিপ্লবীবীর রাসবিহারী বসু)

এইরূপ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি শরৎচন্দ্রের আত্মীয় এবং বন্ধুদের শরৎচন্দ্র সম্বন্ধীয় লেখাতেও কিছু কিছু ভুল থেকে গেছে।

এঁদের কেউ কেউ পুরাতন স্মৃতি থেকে লিখতে গিয়ে ভুল করেছেন। আবার কেউ কেউ তাঁদের অজানা কথা লিখতে গিয়েও ভুল করেছেন।

শরৎচন্দ্র দিলীপকুমার রায়কে একবার এক পত্রে লিখেছিলেন—"…সজ্জন সমাজে আমি অপাংক্তেয়। কতই না জনশ্রুতি লোকের মুখে মুখে।"

শরৎচন্দ্র তাঁর শেষ বয়সে লেখা 'বাল্য-স্মৃতি' প্রবন্ধেও লিখেছিলেন—

"আমার বিগত জীবনের ইতিবৃত্ত…লইয়া বহুবিধ জল্পনা-কল্পনা ও নানাবিধ জনশ্রুতি সাধারণ্যে প্রচারিত আছে।"

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এই জনশ্রুতি আজ আর কিন্তু মুখে মুখে নেই। তাঁর মৃত্যুর পর অনেকে সেই জনশ্রুতিকে গ্রন্থ মধ্যে লিখে প্রচার করেছেন ও করছেন। যেমন—একব্যক্তি তাঁর 'শরৎচন্দ্র' নামক একটি গ্রন্থে অনেক আজগুবি কাহিনী প্রকাশ করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেনের একটি অভিমতসহ বইটি প্রকাশিত হয়েছে। এই অভিমতটি থাকায় বইটির একটু কদরও বেড়েছে এবং কয়েকটা সংস্করণও নাকি শেষ হয়ে গেছে। অতএব বইটি একেবারে উপেক্ষার নয়। এখন সেই বই থেকে একটু নমুনা দিচ্ছি। গ্রন্থকার লিখেছেন—

"…সেবার ঠিক হ'ল শিবপুরে রবীন্দ্রনাথের একটা জয়ন্তী উৎসব করা হবে। উদ্যোগী হলেন অনুরূপবাবু, নীলরতনবাবু, আরও পাড়ার উৎসাহী যুবকবৃন্দ। তাদের পাণ্ডা হলেন শরৎচন্দ্র। তিনি নিজে চিঠি দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আনানোর ব্যবস্থা করালেন।

লক্ষ্ণৌ থেকে আনা হ'ল বাইজী, তার সঙ্গে এলো পরিচিত আট দশ বছরের একটি বাঙ্গালী মেয়ে।

ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ। কিন্তু বিঘ্ন ঘটালো তবল্চী। কথা ছিল আসার, কোন কারণবশতঃ তা আর সম্ভব হয়ে উঠলো না। কলকাতার নামজাদা বাজিয়েদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হ'ল।

নাচ সুরু হ'ল। রবীন্দ্রনাথ সামনে বসে আছেন তাকিয়াটি হেলান দিয়ে। মেয়েটি নাচতে নাচতে মাঝে মাঝে থেমে যেতে লাগলো—মুখে ফুটে উঠতে লাগলো বিরক্তির ছায়া।

সবাই বুঝলেন তাল কেটে যাচ্ছে। অথচ সে আসরে তাঁর সামনে তবলা ধরতেও সাহসী হচ্ছে না কেউ।

দুবার মেয়েটি নাচতে নাচতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। রবীন্দ্রনাথের অসম্মান করা হচ্ছে ভেবে শরৎচন্দ্র আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলেন না। একটি হাই তুলে ডাক দিলেন, অনুরূপ!

অনুরূপবাবু ছুটে এলেন। শরৎচন্দ্র বললেন—একটু আফিং নিয়ে এসো। নীলরতন গেল কোথায়? তাকে মাঝে মাঝে বরং একটু চা যোগাতে বলো।

নাচ সুরু হ'ল। তাল আর কাটে না। সভা নিস্তব্ধ হয়ে পড়লো। শুধু শোনা যেতে লাগলো—তবলার বোল আর ঘুঙুরের ঝুম্ ঝুম্ শব্দ।

এলো পেশাদার বাইজী। শরৎচন্দ্র অটল অচল। নাচ যখন থামল, তখন ভোর হয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হলেন তাঁর এই অসাধারণ শক্তির পরিচয় পেয়ে। জিজ্ঞাসা করলেন—এমন সুন্দর বাজাতে কোথায় শিখলে শরৎ?

শরৎচন্দ্র উত্তরে মৃদু হাসলেন। বললেন—আমার যা কিছু সঞ্চয় সবই বর্মামুলুকে, ভারতী।

অনুরূপবাবু ও নীলরতনবাবু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন—কার কাছে শিখেছিলেন?

শরৎচন্দ্র সহাস্যে উত্তর দিলেন—শিখেছিলাম লক্ষ্ণৌর এক তবল্‌চীর কাছে। তিনি বলতেন—এটা হ'ল হয় আমীর, না হয় ফকিরের কাজ। আমি তো সেখানে ফকিরই ছিলাম নীলু!...

বৈকালে রবীন্দ্রনাথ সকলকে এসরাজ বাজিয়ে শোনালেন। শেষে এসরাজটি পাশে নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন—বোধ করি এ রসে তুমি বঞ্চিত, শরৎ?

শরৎচন্দ্র মিষ্টি মধুর হেসে বললেন—এ অভাগার কোন কিছুতে বঞ্চনা নেই, ভারতী! একটু যদি অপেক্ষা করেন—আমি আপনাকে সেতার শোনাতে পারি। অনুরূপ এক নম্বর এক্‌স একটু এনে দাও তো।

অনুরূপবাবু কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন। তিনি সেটুকু গলাধঃকরণ করে সেতারখানা কোলে তুলে নিলেন। ঘরটা মূর্চ্ছনায় ভরে উঠলো।

বহুক্ষণ পরে শরৎচন্দ্র সেতারখানা নামিয়ে রাখলেন। কিন্তু শ্রোতৃবর্গের কারও তখনও চমক ভাঙেনি।

ভারতীর তন্ময়তা কাটলো বহুক্ষণ পরে। তিনি শরৎচন্দ্রের হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন—তুমি যে এত গুণের অধিকারী, তা আমার জানা ছিল না শরৎ! সত্যই তুমি সরস্বতীর বরপুত্রই বটে!"

এই গল্পের খুঁটিনাটি কথাগুলো বাদ দিয়েও মূল কথা থাকে এই—রবীন্দ্রনাথ শিবপুরে তাঁর জন্মতিথি উৎসবে গিয়ে সারারাত্রি ধরে বাইজীর নাচ দেখলেন। পরদিন বিকালে আবার নিজে তো এসরাজ বাজালেনই, এমন কি শরৎচন্দ্রের সেতার বাজনাও শুনলেন। আর শরৎচন্দ্র সেতার ধরবার আগে রবীন্দ্রনাথের সামনে বসেই এক নম্বর এক্স অর্থাৎ মদ খেলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে যাঁরা সামান্য মাত্রও চিনেছেন বা দেখেছেন, তাঁরাই জানেন—নিজের জন্মতিথি উৎসবে দুদিন ধরে যোগ দেওয়া এবং সারারাত্রি ধরে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বাইজীর নাচ দেখার লোক রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না। আর যে-শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলে শ্রদ্ধাভক্তি করতেন, তাঁর সামনে বসে তিনি কখনই মদ খেতে পারেন না। গ্রন্থকার জানেন না যে, মদ তো দূরের কথা, শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে এত বেশী শ্রদ্ধা করতেন যে, তাঁর সামনে ধূমপানও করতেন না। এ সম্পর্কে তবে একটি ঘটনা বলি। এই ঘটনাটি শরৎচন্দ্র নিজেই তাঁর স্নেহভাজন শ্রীহীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে একদিন বলেছিলেন। হীরেনবাবু এই কাহিনীটি অধুনালুপ্ত 'মাসিকপত্র' কাগজের ১৩৫৬ সালের মাঘ সংখ্যায় লিখেছিলেন। কাহিনীটি এই—

রবীন্দ্রনাথ এক সময় যখন চন্দননগরে গঙ্গার উপর বোটে বাস করতেন, সেই সময় শরৎচন্দ্র একবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যান। কবির সঙ্গে সেবার শরৎচন্দ্রের অনেক বছর পরে দেখা। বহুদিন পরে দেখা বলে, কবি শরৎচন্দ্রকে তখনি ছাড়তে চাইলেন না। শরৎচন্দ্র ঘণ্টা দুই কবির কাছে ছিলেন। কবি তো শরৎচন্দ্রের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের বিপদ হ'ল এই যে, তিনি ঘন ঘন ধূমপায়ী হয়েও কবির সামনে আদৌ ধূমপান করতে পারলেন না। শরৎচন্দ্র যে অত্যন্ত ধূমপায়ী, কবি এ কথা জানতেন। তাই শরৎচন্দ্র ধূমপায়ী হয়েও তাঁর সামনে ধূমপান করছেন না দেখে, কবি ঠিক আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর চা, খাবার, এটা-ওটার নাম করে শরৎচন্দ্রকে সামনে থেকে সরিয়ে তাঁর সেক্রেটারী অনিল চন্দর কাছে চালান করে দিতে লাগলেন। আর ঐ অবকাশে শরৎচন্দ্র বাইরে গিয়ে ধূমপান করে এলেন।

ঘন ঘন ধূমপায়ী হয়েও শরৎচন্দ্র যে রবীন্দ্রনাথের সামনে আদৌ ধূমপান করতেন না, একথা আরও অনেকে—যাঁরা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র উভয়কে অনেকক্ষণ ধরে একত্র থাকতে দেখেছেন, তাঁরাও বলে থাকেন। যে-শরৎচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথের কাছে একটা সিগারেট পর্যন্ত খেতেন না, তিনিই তাঁর সামনে বসে মদ খাচ্ছেন, একি কখনো সম্ভব ?

তাছাড়া গ্রন্থকারের গল্পের অমুরূপবাবু ও নীলরতনবাবু এঁরা দুজনেই আজও এই প্রবন্ধ লেখার সময়, বেঁচে আছেন। তাঁরা বলেন যে, এই কাহিনী সত্য নয়। শিবপুরে কখনো ঐ ধরণের কোন রবীন্দ্র-জন্মোৎসব হয়নি।

শিবপুরে শরৎচন্দ্রের আর যেসব বন্ধু জীবিত আছেন, তাঁরাও বলেন— শিবপুরে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে রবীন্দ্রনাথ নিজে কখনো আসেন নি। এমন কি তাঁর কোন জন্মোৎসবে তাঁকে নিয়ে আসারও কখনো চেষ্টা হয়নি।

অতএব পূর্বোক্ত 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের এই গল্পটি যে একেবারেই অসত্য, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যে সব জনশ্রুতি, প্রবাদ ও অপপ্রচার আছে, সেগুলির এখনি একটা সুষ্ঠু আলোচনা হওয়া দরকার। তা না হলে, পূর্বোক্ত 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থটির ন্যায়, আরও অনেক গ্রন্থেই শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে, নানা বিকৃত ও মনগড়া আজগুবি গল্প ক্রমশঃ প্রচারিত হতে থাকবে। তখন সে সব রোধ করা কষ্টকর হয়ে পড়বে।

এক সময় আমি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে একটানা বহু প্রবন্ধ লিখেছিলাম। ভারতবর্ষ ছাড়া ঐ সময় আমি 'আনন্দবাজার', 'যুগান্তর' প্রভৃতি পত্রিকায়ও শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে প্রচুর প্রবন্ধ লিখি। ঐ সময়েই 'শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র', 'শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প', 'শরৎচন্দ্রের হাস্য-পরিহাস' নামে আমার কয়েকটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমার সমস্ত লেখা শেষ করতে ও সেগুলিকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করতে এখন মনস্থ করেছি। সেই হিসাবে ঠিক করেছি—৪ খণ্ডে সমগ্রভাবে 'শরৎচন্দ্র' প্রকাশ করব। ১ম খণ্ডে শরৎচন্দ্রের জীবনী, ২য় খণ্ডে শরৎচন্দ্রের মৌখিক আলাপ-আলোচনা, বৈঠকী গল্প, হাস্য-পরিহাস ও মৌখিক অভিভাষণ, ৩য় খণ্ডে শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র এবং ৪র্থ খণ্ডে শরৎ-সাহিত্যের আলোচনা থাকবে।

শরৎচন্দ্রের জীবনী নিয়ে প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হ'ল।

এই গ্রন্থ রচনায় যে সকল লেখকের রচনা থেকে উপাদান নিয়েছি এবং যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আমাকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সকলের কাছেই আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।
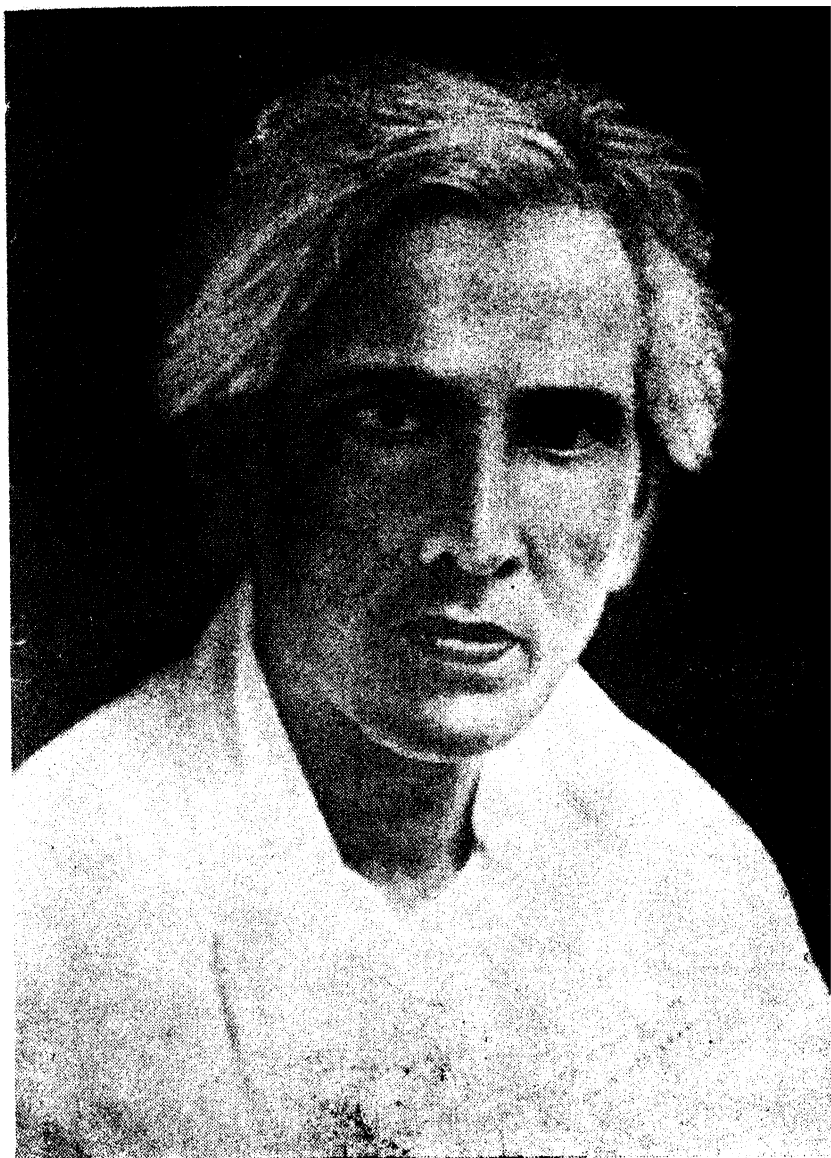
শরৎচন্দ্র (৫৭ বৎসর বয়সে)

জন্ম ও বংশ পরিচয়

হুগলী জেলায় দেবানন্দপুর একটি ছোট গ্রাম। গ্রামটি ইস্টার্ণ রেলওয়ের ব্যাণ্ডেল স্টেশন থেকে মাইল দুই উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

দেবানন্দপুরের পাশেই একটি ছোট নদী। নদীটির নাম সরস্বতী।

দেবানন্দপুর ছোট গ্রাম হলেও, এই গ্রামের একটি ঐতিহাসিক মর্যাদা আছে। প্রাচীন বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ রাজধানী সপ্তগ্রামের সাতটি মৌজার মধ্যে এই দেবানন্দপুর ছিল একটি। তখন এই গ্রাম খুব সমৃদ্ধশালী ছিল।

এছাড়া কবিবর রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের স্মৃতির সহিতও এই গ্রাম বিজড়িত। ভারতচন্দ্র তাঁর কৈশোর কালে কিছুদিন এই গ্রামে বাস করেছিলেন। তখন তিনি এখানে স্থানীয় রামচন্দ্র দত্তমুন্সীর বাড়ীতে থেকে পারসী শিক্ষা করতেন।

দেবানন্দপুরে অবস্থান কালে ভারতচন্দ্র এই গ্রামের হীরারাম রায় ও পূর্বোক্ত রামচন্দ্র দত্তমুন্সীর বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পুঁথি পড়বার জন্য আদিষ্ট হয়ে দুবারে দুটি পৃথক সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করে পড়েছিলেন।

এই দুটি সত্যনারায়ণের পাঁচালীতেই ভারতচন্দ্র দেবানন্দপুর গ্রামের উল্লেখ করে গেছেন। যেমন, প্রথমটিতে—

এ তিন জনার কথা   পাঁচালী প্রবন্ধে গাঁথা
বুদ্ধিরূপ কৈল নানা জনা।
দেবানন্দপুর গ্রাম   দেবের আনন্দধাম
হীরারাম রায়ের বাসনা॥

দ্বিতীয়টিতে—

দেবের আনন্দধাম   দেবানন্দপুর নাম,
তাতে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুন্সী।
ভারতে নরেন্দ্র রায়   দেশে যার যশ গায়
হোয়ে মোরে কৃপাদায় পড়াইল পারসী॥

এই দেবানন্দপুর গ্রামের এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখ (বাঙ্গলা ১২৮৩ সালের ৩১শে ভাদ্র) শরৎচন্দ্রের

জন্ম হয়। শরৎচন্দ্রের পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভুবনমোহিনী দেবী।

মতিলালের পাঁচ পুত্রের মধ্যে শরৎচন্দ্রই ছিলেন জ্যেষ্ঠ। অপর পুত্রদের মধ্যে দুজন জন্মের পরই মারা যান। তারপর চতুর্থ পুত্র প্রভাসচন্দ্র এবং পঞ্চম পুত্র প্রকাশচন্দ্রের জন্ম হয়। মতিলালের এই পুত্ররা ছাড়া দুই কন্যাও ছিলেন। কন্যাদের মধ্যে অনিলা দেবী তাঁর সর্বপ্রথম সন্তান, আর কনিষ্ঠা সুশীলা দেবী তাঁর সবশেষ সন্তান।

শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুরে জন্মালেও এই গ্রামটি কিন্তু তাঁর পিতা বা মাতা কারও পূর্বপুরুষের বাসভূমি ছিল না। শরৎচন্দ্রের পৈতৃক বাসভূমি ছিল ২৪ পরগণা জেলায় কাঁচড়াপাড়ার কাছে মামুদপুর গ্রামে। দেবানন্দপুর ছিল শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলালের মাতুলালয়।

মতিলালের পিতা ছিলেন খুব নির্ভীক ও অত্যন্ত স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ। তিনি এক সময় স্থানীয় প্রবল-প্রতাপান্বিত জমিদারের বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন। ফলে জমিদারের অত্যাচারে তিনি গৃহত্যাগী হতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারপর একদিন তাঁদেরই স্নানের ঘাটে তাঁর ক্ষত বিক্ষত দেহ মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

এই সময় মতিলালের বয়স ছিল খুবই অল্প। মতিলালের মাতা নিরুপায় হয়ে পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে পিত্রালয়ে চলে আসেন। মতিলাল ছেলেবেলায় মামাদের বাড়ীতেই মানুষ হয়েছিলেন। পরে বড় হয়ে মামুদপুরে আর ফিরে না গিয়ে দেবানন্দপুরেই বাড়ী করেছিলেন। মতিলালের মামারা তাঁদের বাড়ীর সংলগ্ন চারকাঠা আন্দাজ বাগান জমি মতিলালকে বাস করার জন্য দিলে, মতিলাল সেই জমিতে দক্ষিণদ্বারী একতালা দুকুঠরী পাকা ঘর করেছিলেন।

মতিলালের যখন অল্প বয়স, সেই সময়েই হালিশহরের কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা ভুবনমোহিনী দেবীর সহিত তাঁর বিবাহ হয়। কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তখন তাঁর অপর চার ছোট ভাই—দীননাথ, মহেন্দ্রনাথ, অমরনাথ ও অঘোরনাথকে নিয়ে ভাগলপুরে একত্রে বসবাস করতেন।

কেদারনাথের পিতা রামধন গঙ্গোপাধ্যায়ই প্রথম হালিসহর ত্যাগ করে ভাগলপুরে যান। তিনি সেখানে উচ্চপদে সরকারী চাকরি করতেন। ভাগলপুরের প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে শিক্ষায় ও অর্থে এই গঙ্গোপাধ্যায়দের তখন খুব নামডাক ছিল।

কেদারনাথ জামাতা মতিলালের পড়াশুনার জন্য তাঁকে দেবানন্দপুর থেকে নিয়ে গিয়ে ভাগলপুরে নিজেদের বাড়ীতে রেখেছিলেন। তাই মতিলাল শ্বশুরবাড়ীতে থেকেই পড়াশুনা করতেন। ভাগলপুর থেকে তিনি এন্‌ট্রান্স পাস করেছিলেন। এন্‌ট্রান্স পাস করার পর পাটনা কলেজে তিনি কিছুদিন পড়েও ছিলেন। কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘোরনাথ ছিলেন মতিলালের সতীর্থ। তিনিও পাটনা কলেজে পড়েছিলেন। পাটনায় কলেজে পড়ার সময় এঁরা দুজনে এক সঙ্গে একটি মেসে থাকতেন।

মতিলাল লেখাপড়া শিখলেও চাকরি বড় একটা করতেন না। বিহারের ডিহিরিতে কিছুদিন যা চাকরি করেছিলেন। চাকরির যে বন্ধন, সে তাঁর আদৌ সহ্য হ'ত না। তিনি কাজকর্মে উদাসীন ও চঞ্চল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। দিনের বেশীর ভাগ সময়ই তিনি বই পড়ে কাটাতেন। মতিলাল আসলে ছিলেন, একজন শিল্পী ও সাহিত্যিক মানুষ। তিনি ছবি আঁকতেন, কবিতা ও গল্প লিখতেন এবং উপন্যাস, নাটকও রচনা করতেন। তবে কিন্তু তাঁর চঞ্চল স্বভাবের জন্যই তিনি অনেক উপন্যাস ও নাটক রচনায় হাত দিলেও কোনটাই শেষ করতে পারেন নি। সবই অসমাপ্ত অবস্থায় থেকে যায়।

অর্থ উপার্জন না করার জন্য মতিলালকে প্রথম প্রথম কিন্তু শ্বশুরবাড়ীর লোকজনদের কাছ থেকে নানা কথা শুনতে হ'ত। শ্বশুরবাড়ীর লোকদের এই কথা শোনার হাত থেকে দূরে থাকার জন্যই মতিলাল কখন কখন ভাগলপুর ছেড়ে সস্ত্রীক দেবানন্দপুরে চলে আসতেন।

শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল যেমন বে-হিসাবী, আত্মভোলা, স্বপ্নবিলাসী ও চঞ্চল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, শরৎচন্দ্রের মাতা ভুবনমোহিনী দেবী তেমনি ছিলেন শান্তস্বভাবা, ধৈর্যশীলা, গৃহকর্মেনিরতা ও সেবাপরায়ণা। ভুবনমোহিনী তাঁর পিতার একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারে নির্বিবাদে অজস্র খেটে যেতেন। মতিলাল স্বপ্নবিলাসী এবং উপার্জনে অমনযোগী হলেও, ভুবনমোহিনী স্বামীর সঙ্গে এই নিয়ে ঝগড়া করা পছন্দ করতেন না। আর তিনি তাঁর স্বামীর কাছে নানা রকমের দাবী নিয়েও নিজেদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করতেন না। ধনীর কন্যা হলেও দারিদ্র্য ও অভাবকে তিনি নীরবে সহ্য করতে জানতেন।

বিদ্যারম্ভ

শরৎচন্দ্রের বয়স যখন পাঁচ বৎসর, সেই সময় তাঁর পিতা তাঁকে গ্রামের (দেবানন্দপুরের) প্যারী পণ্ডিতের (বন্দ্যোপাধ্যায়ের) পাঠশালায় ভর্তি করে দেন। খড়ের ছাউনি দেওয়া একটি প্রশস্ত চণ্ডীমণ্ডপে এই পাঠশালাটি বসত। পাঠশালায় অনেকগুলি ছাত্র-ছাত্রী ছিল। এদের মধ্যে শরৎচন্দ্র ছিলেন যেমন মেধাবী, তেমনি দুরন্ত।

গুরুমশায়ের পুত্র কাশীনাথও এই পাঠশালায় পড়ত। কাশীনাথ ছিল শরৎচন্দ্রের সহপাঠী ও বন্ধু। প্রথমতঃ শরৎচন্দ্র, পাঠশালার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী, দ্বিতীয়তঃ পুত্রের বন্ধু, এই দুই কারণে গুরুমশায় শিশু শরৎচন্দ্রকে মাঝে মাঝে ঠেঙ্গানি দিলেও সকল দুরন্তপনাই নির্বিচারে সহ্য করতেন।

গুরুমশায় শরৎচন্দ্রের দৌরাত্ম্যে বিরক্ত হয়ে কখনো কখনো শরৎচন্দ্রের পিতামহীর নিকটে গিয়েও শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতেন। পিতামহী গুরুমশায়কে সান্ত্বনা দিয়ে স্নেহের নাতি সম্বন্ধে বলতেন—ন্যাড়া এখন একটু দুরন্ত আছে বটে, কিন্তু বড় হলেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

ছেলেবেলায় শরৎচন্দ্রের মাথায় একবার কয়েকটা ফোঁড়া ও ঘা হয়। তার ফলে তখন তাঁর মাথার অনেক চুল উঠে যায়। এইজন্যই শরৎচন্দ্রের পিতামহী তাঁকে আদর করে 'ন্যাড়া' বলে ডাকতেন। শরৎচন্দ্রের কোন কোন বন্ধুও তাঁকে ন্যাড়া বলতো।

পাঠশালায় শরৎচন্দ্রের দুরন্তপনার একটি কাহিনী এইরূপ :—

গুরুমশায় একদিন ধূমপানের আগে কল্‌কেয় তামাক ও টিকে সাজিয়ে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যান। শরৎচন্দ্র সেই অবসরে কল্‌কের তামাক ফেলে দিয়ে তামাকের বদলে কতকগুলো ছোট ছোট ইটের টুকরো রেখে তার উপর টিকে সাজিয়ে রেখেঁ দেন।

গুরুমশায় ফিরে এসে কল্‌কে থেকে এক টুকরো টিকে নিয়ে দেশলাই জ্বেলে টিকে ধরালেন। তারপর ফুঁ দিয়ে টিকে ধরিয়ে হুঁকোর মাথায় কল্‌কে রেখে তামাক টানতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই আর ধোঁয়া বার করতে পারলেন

না। তখন ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য তিনি কল্‌কে উল্টে ঢেলে দেখলেন। তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, কে তামাকের বদলে কয়েকটা ইটের টুকরো দিয়ে রেখেছে।

গুরুমশায় বুঝলেন, এ নিশ্চয় তাঁর ছাত্রদেরই কারও কাজ। তাই তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে চীৎকার করে ছাত্রদের বললেন—এ কার কাণ্ড বল্ বল্‌ছি ?

গুরুমশায়ের অগ্নিমূর্তি দেখে পাঠশালার একটি ছেলে ভয়ে দাঁড়িয়ে উঠে শরৎচন্দ্রের নাম বলে দিল। তখন গুরুমশায় বেত নিয়ে শরৎচন্দ্রকে মারতে উদ্যত হলেন। গুরুমশায় বেত হাতে আসছেন দেখেই শরৎচন্দ্র টেনে এক দৌড় দিলেন। আর ছুটে যাবার সময় যে ছেলেটি দাঁড়িয়ে তাঁর নাম বলছিল, তাকে এক ধাক্কায় ফেলে দিয়ে পালালেন। ছেলেটি ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলে, গুরুমশায় তাকে তুলতে গেলেন। শরৎচন্দ্র ততক্ষণে ছুটে অনেক দূরে চলে যান।

শরৎচন্দ্র একেবারে সরস্বতী নদীর খেয়াঘাটে চলে গেলেন। তারপর সেখান থেকে খেয়া ডোঙা বেয়ে ৩।৪ মাইল দূরে কৃষ্ণপুর গ্রামের রঘুনাথ বাবাজীর আখড়া বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলেন। সেদিন আর সেখান থেকে ফিরলেন না। পরে শরৎচন্দ্রের বাড়ীর লোকজন সমস্ত জানতে পেরে তাঁকে আখড়া বাড়ী থেকে নিয়ে আসেন।

পাঠশালার ছাত্র কাশীনাথ যেমন শরৎচন্দ্রের বন্ধু ছিল, তেমনি পাঠশালার একটি ছাত্রীর সঙ্গেও শরৎচন্দ্রের খুব ভাব ছিল। পাঠশালার ছুটির পর অনেক সময়ই মেয়েটি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। মেয়েটি শরৎচন্দ্র অপেক্ষা বয়সে দু-এক বছরের ছোট ছিল। সে শরৎচন্দ্রের ছিপ সংগ্রহ করা, মাছ ধরা, ঘুড়ির সুতোয় মান্‌জা দেওয়া প্রভৃতি কাজে শরৎচন্দ্রকে সাহায্য করতো। মেয়েটির একটি খেয়াল ছিল, যখন বৈঁচি ফল পাকত, বৈঁচি ফল তুলে মালা গেঁথে শরৎচন্দ্রকে প্রায়ই উপহার দিত।

স্কুল-জীবন

শরৎচন্দ্র যখন প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়ছিলেন, সেই সময়ে স্থানীয় সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য দেবানন্দপুরে একটি বাঙ্গলা স্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুল স্থাপিত হলে শরৎচন্দ্রের পিতা শরৎচন্দ্রকে প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালা থেকে এনে সিদ্ধেশ্বর মাষ্টারের স্কুলে ভর্তি করে দেন। শরৎচন্দ্র এই স্কুলে এক বৎসর পড়েন।

এই সময়েই শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল বিহারের ডিহিরিতে একটা চাকরি পান। চাকরি পেয়েই মতিলাল সপরিবারে ডিহিরিতে চলে যান। ঐ সময় শরৎচন্দ্রের বয়স ছিল সাত-আট বৎসর।

মতিলাল ডিহিরিতে মাত্র দু-তিন বৎসর চাকরি করেছিলেন। শরৎচন্দ্র ঐ সময়টা তাঁর পিতামাতার সহিত ডিহিরিতেই ছিলেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর ছেলেবেলার এই ডিহিরি বাসের কথা উল্লেখ করে পরে ১৪-৮-১৯ তারিখে তাঁর সাহিত্য-শিষ্যা লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন :—

"ডিহিরি যাচ্ছো? যখন তোমাদের জন্মও হয় নি, তখন আমি ওই ডিহিরির ক্যানেলের পাড়ে পাড়ে পাকা খিরণী কুড়িয়ে কুড়িয়ে বেড়াতাম, আর ফাঁস করে গিরগিটি ধরতাম। উঃ সে কত কালের কথা। তখন রেল হয় নি, ছোট স্টিমারে চড়ে আরা থেকে যেতে হোতো। তোমাদের বাঙলোটাও আমি যেন চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছি। আচ্ছা তোমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে ভানহাতি সূর্য উঠে না? তখনকার কালে ওদেশে একটা ঘাট ছিল, সতীচওড়া না এমনি কি একটা নাম! বোধ করি তোমাদের ওখান থেকে মাইল দুই হবে। কিছুকাল ঐখানে বসেচি, কি জানি সে ঘাটের অস্তিত্ব আজও আছে কি না!"

মতিলালের ডিহিরির চাকরি শেষ হলে, তিনি আবার সপরিবারে ভাগলপুরে শ্বশুরালয়ে ফিরে এলেন। শরৎচন্দ্র তখন 'বোধোদয়' পর্যন্ত পড়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে এলে এবার তাঁর অভিভাবকরা তাঁকে স্থানীয় দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে ভর্তি করে দিলেন। শরৎচন্দ্রের বয়স তখন বছর দশেক।

শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘোরনাথের পুত্র মণীন্দ্রনাথও ঐ সময় দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে পড়তেন। কেদারনাথ ভ্রাতুষ্পুত্র মণীন্দ্রনাথকে এবং দৌহিত্র শরৎচন্দ্রকে বাড়ীতে পড়াবার জন্য দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়ের অক্ষয় পণ্ডিত মশায়কে নিযুক্ত করেছিলেন। পণ্ডিত মশায়ের পড়ানোর গুণে এঁরা সেবার দুজনেই ছাত্রবৃত্তি পাস করেছিলেন। সেটা ছিল ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ। সে বছর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলি ছিল।

আজকাল ছাত্রবৃত্তি বলতে, উত্তম ছাত্রকে প্রদত্ত বৃত্তি বা জলপানি—এই আমরা বুঝে থাকি। কিন্তু আগেকার দিনে ছাত্রবৃত্তি স্কুলই ছিল। ছাত্রবৃত্তি স্কুলের শেষ ক্লাস ছিল, বর্তমানের ষষ্ঠ শ্রেণীর সমান। ছাত্ররা ছাত্রবৃত্তি পাস করে, তারপরেই নর্মাল ত্রৈ-বার্ষিক পড়ত। আজ সে ছাত্রবৃত্তি স্কুলও নেই, আর নর্মাল স্কুলও নেই।

ছাত্রবৃত্তিতে ইংরাজি পড়ানো হ'ত না। তবে বাঙ্গলা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় একটু বেশী করেই পড়ানো হ'ত। তাই ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাস করতে হলে, ছাত্রদের এই সব বিষয় খুব ভালভাবে আয়ত্ত করতে হ'ত।

ছাত্রবৃত্তি পাস করে ইংরাজি শিখবার জন্য শরৎচন্দ্রকে ইংরাজি স্কুলের নীচের ক্লাসে ভর্তি হতে হয়েছিল। শরৎচন্দ্র ছাত্রবৃত্তি পাস করার ফলে, ইংরাজি স্কুলে তাঁর ক্লাসের বাঙ্গলা, অঙ্ক ইত্যাদি পড়া তাঁর কাছে অতি তুচ্ছ বলেই মনে হ'ত। তাঁকে কেবল ইংরাজিই যা পড়তে হ'ত। এই জন্যই পড়ার চাপ না থাকায় শরৎচন্দ্র ঐ সময় তাঁর পিতার সংগৃহীত 'হরিদাসের গুপ্তকথা' প্রভৃতি বই লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তেন।

ইংরাজি স্কুলে কেবল ইংরাজিটাই পড়তে হয়েছিল বলে, শরৎচন্দ্র সে বছর পরীক্ষায় অন্যান্য বিষয়ে ত বটেই, এমন কি ইংরাজিতেও এত বেশী নম্বর পেয়েছিলেন যে, শিক্ষক মশায়রা তাঁকে সেবার ডবল প্রমোশন দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুরে প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়বার সময় পাঠশালায়

যেমন দুরন্তপনা করতেন, ভাগলপুরে দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়ে পড়বার সময়ও স্কুলে কখনো কখনো মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলাতেন। যেমন, স্কুলের ছুটির আগেই কি করে বাড়ী পালানো যায়, এই ভেবে শরৎচন্দ্র মাস্টার মশায়দের অলক্ষ্যে সহপাঠীদের দিয়ে স্কুলের দেয়াল ঘড়ির কাঁটা আগিয়ে দেওয়াতেন।

ছাত্রবৃত্তি পাস করার পর শরৎচন্দ্র আরও বছর দুই ভাগলপুরে পড়েছিলেন। তারপর তাঁর পিতা আবার সপরিবারে দেবানন্দপুরে চলে এলে, তিনিও তাঁর পিতামাতার সহিত দেবানন্দপুরে চলে আসেন।

শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুরে এসে হুগলী শহরে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি হন। হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে তিনি কয়েক বৎসর পড়েন। শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল উপার্জনহীনতার জন্য দেবানন্দপুরে এসে কিছুদিনের মধ্যেই ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে পড়লেন। তখন তিনি শরৎচন্দ্রের স্কুলের বেতন যোগাতেও অক্ষম হলেন। তাই শরৎচন্দ্রকে কিছুদিন পড়াও বন্ধ রাখতে হয়েছিল।

ক্রমে মতিলালের অভাব বাড়তে থাকলে, শেষে তিনি বাধ্য হয়েই সপরিবারে আবার ভাগলপুরে চলে গেলেন। শরৎচন্দ্র তখন সবে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের ১ম শ্রেণীতে (বর্তমানের দশম শ্রেণী) উঠেছেন।

শরৎচন্দ্র এবার ভাগলপুরে গিয়ে ভাগলপুরের তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে ১ম শ্রেণীতেই ভর্তি হলেন। সেই সময় সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তিনি তখন ভাগলপুরেই থাকতেন। পাঁচকড়িবাবুর পিতা বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের মাতামহের বন্ধু ছিলেন। তাই শরৎচন্দ্র পাঁচকড়িবাবুকে মামা বলতেন। শরৎচন্দ্র তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় পাঁচকড়িবাবু শরৎচন্দ্রকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। শরৎচন্দ্র যথাসময়ে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন। সেটা তখন ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ। ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল ১৮ বছর।

এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার সময় শরৎচন্দ্রের মামাদেরও আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। কেননা শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ইতিপূর্বে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ভাটপাড়ায় গুরুগৃহে মারা যান। কেদারনাথের মৃত্যুর পরই তাঁদের একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে যায়।

কেদারনাথের দুই পুত্র—ঠাকুরদাস ও বিপ্রদাস। ঠাকুরদাস, তাঁর পিতা যেখানে কাজ করতেন, ভাগলপুরে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সেরেস্তায়, সেখানেই কাজ পান। বিপ্রদাসও এই সময় অল্প বেতনে একটা চাকরিতে ঢোকেন।

ঠাকুরদাস কিছুদিন কাজ করার পর অফিসের সামান্য ক'টা টাকার গোলমাল নিয়ে আদালতে অভিযুক্ত হন। ভাগলপুরে গঙ্গোপাধ্যায়দের তখন খুব নামডাক ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। তাই ঠাকুরদাসের মামলায় বড় বড় উকিল ব্যারিস্টার নিযুক্ত করতে হ'ল। অনেকদিন ধরে মামলা চলল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠাকুরদাস দায়মুক্ত হলেন না। ঠাকুরদাসের কাকারা ইতিপূর্বেই ভিন্ন হয়ে ছিলেন। তাই এই মামলা চালাতে গিয়ে ঠাকুরদাস ও বিপ্রদাসকে একেবারে নিঃস্ব হতে হয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের প্রবেশিকা পরীক্ষার কিছুদিন পূর্বেই এই মামলার হাঙ্গামা হয়েছিল। সেই কারণে শরৎচন্দ্রের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফি এবং ঐ সঙ্গে দেয় ক'মাসের মাহিনার টাকার জন্য বিপ্রদাসকে স্থানীয় মহাজন গুলজারিলালের কাছে হ্যাণ্ডনোট লিখে দিয়ে টাকা ধার করতে হয়েছিল।

অল্প উপার্জনকারী বিপ্রদাসকে এই সময় তাঁর নিজের, তাঁর দাদা ঠাকুরদাসের এবং ভগ্নীপতি মতিলালের সংসার চালাতে হ'ত। তাই অভাবের জন্যই শরৎচন্দ্রের প্রবেশিকা পরীক্ষার সামান্য ক'টা টাকার জন্যও তাঁকে গুলজারিলালের কাছে হ্যাণ্ডনোট লিখে দিতে হয়েছিল।

ছেলেবেলার খেলাধুলা প্রভৃতি

স্কুলে পড়ার সময় শরৎচন্দ্র যেমন সহপাঠীদের মধ্যে দলের নেতা ছিলেন, তেমনি বাড়ীতে এবং পাড়ায়ও সমবয়সীদের দলে তিনিই ছিলেন দলপতি। একবয়সীদের মধ্যে মার্বেল খেলা, লাটু ঘোরানো, ঘুড়ি ওড়ানো প্রভৃতিতে শরৎচন্দ্র ছিলেন, সবচেয়ে দক্ষ। গুরুজনদের নিষেধ সত্ত্বেও তাঁদের লুকিয়ে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশে শরৎচন্দ্র এই সব খেলাতেন। এই খেলাধুলা ছাড়া বন থেকে ফড়িং ধরে এনে পোষা, নানা রকমের পোকা ও পাখী পোষা, কুকুর পোষা এবং ফুলের বাগান করা প্রভৃতি কতকগুলি খেয়ালও শরৎচন্দ্রের ছিল।

ভাগলপুরে থাকার সময় শরৎচন্দ্র তাঁর সেখানকার সমবয়সীদের নিয়ে বাড়ীতে একটা ছোটখাট যাদুঘর ও চিড়িয়াখানা করেছিলেন। নানারকমের ফড়িং ও পোকা এবং কোকিল ওংগাওশালিখ প্রভৃতি পাখী, বিড়াল, বেজি, সাপ, লাল-নীল মাছ ইত্যাদি এই যাদুঘর ও চিড়িয়াখানায় ছিল।

শরৎচন্দ্রের মামার বাড়ীতে 'সংসার কোষ' নামে একটা বই ছিল। সেই বই থেকে শরৎচন্দ্র জানতে পারেন যে, বেলের শিকড় গোখরো সাপের ফণার কাছে ধরলে, সেই সাপ মাথা নীচু করে হীনবল হয়ে যায়।

এই জেনেই বালক শরৎচন্দ্র বেলের শিকড় এবং হাঁড়ি ও সরা জোগাড় করে সাপ ধরবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। এজন্য তিনি সদলে বাড়ীর আনাচে-কানাচে সাপের গর্ত খোঁজাও স্থরু করে দিলেন। একদিন একটা সাপও দেখতে পেলেন। তখন সাপটার সামনে বেলের শিকড় নিয়ে গেলে, সে মাথা নীচু করার বদলে দিব্যি ফণা তুলে দাঁড়াল। সেই সময় শরৎচন্দ্রের মাতুল মণীন্দ্রনাথ লাঠি হাতে নিয়ে পাশেই ছিলেন। তিনি সজোরে লাঠির আঘাতে সাপটাকে মারলে, শরৎচন্দ্র সে যাত্রা সাপের হাত থেকে রক্ষা পান।

শরৎচন্দ্র ছেলেবেলায় সাঁতার কাটতে, কুস্তি করতে ও গাছে উঠতে খুব ভালবাসতেন। ভাগলপুরের পাশেই গঙ্গার যে ছাড়, যমুনিয়া নদী, তাতে

বর্ষাকালে শরৎচন্দ্র অভিভাবকদের লুকিয়ে তাঁর মাতুল মণীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে খুব সাঁতার কাটতেন এবং উঁচু পাড় থেকে জলে ঝাঁপ খেতেন। শরৎচন্দ্র তার ঐ মণিমামার সঙ্গে পাড়ায় ঘোষেদের পোড়ো বাড়ীতে একটা কুস্তির আখড়া করেছিলেন এবং সেখানে সদলে কুস্তি করতেন। শরৎচন্দ্র গাছে চড়তেও খুব দক্ষ ছিলেন। এমন কি পরা-কাপড়ের কোঁচার দিকটা দিয়ে নিজের শরীরটাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে গাছে বসে ঘুমানোও তিনি অভ্যাস করেছিলেন। এই গাছে চড়া ও গাছে বসে ঘুমানো সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র তাঁর সঙ্গীদের বলতেন—মনে কর একটা বনের মধ্যে গিয়ে রাত হয়ে গেল। বনে বাঘ-ভাল্লুক রয়েছে। তখন গাছে চড়া ছাড়া উপায় নেই! আর সারারাত তো জেগে কাটানোও যায় না। তাই গাছে বসে ঘুমানোটাও অভ্যাস করে রাখা ভাল।

দেবানন্দপুরে এসে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়ার সময়ও শরৎচন্দ্র সমবয়সীদের দলে নেতৃত্ব করতেন। দেবানন্দপুর থেকে হুগলী প্রায় তিন মাইল পথ। এই তিন মাইল কাঁচা পথ, তখন গ্রীষ্মকালে ধূলায় এবং বর্ষাকালে কাদায় পরিপূর্ণ থাকত। শরৎচন্দ্র এবং গ্রামের আরও কয়েকটি ছেলে সকলে একত্রে দল বেঁধে হুগলীতে পড়তে যেতেন। স্কুলে পড়তে যাবার সময় শরৎচন্দ্র পথে সঙ্গীদের অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শোনাতেন এবং পথের ধারে কারও বাগানে কোন সুস্বাদু ফল দেখলে, সদলে তার সদ্ব্যবহার করতেন।

গ্রামের ভিতরে মুন্সীদের একটা বড় পুকুরের পাশে গড়ের জঙ্গলে একটা গভীর খাদের মধ্যে শরৎচন্দ্রের একটা আস্তানা ছিল। শরৎচন্দ্র সঙ্গীসাথীদের নিয়ে লুকিয়ে এর ওর বাগান থেকে যে সব আম-কাঁটাল প্রভৃতি সংগ্রহ করতেন, এইখানেই সে সব রেখে দিতেন এবং সময়মত সদলে সেগুলি আহার করতেন। এইখানেই শরৎচন্দ্রের হুঁকা, কলকে প্রভৃতি ধূমপানের সরঞ্জাম লুকানো থাকতো এবং এখানে এসেই তিনি ধূমপান করতেন।

দেবানন্দপুরের পাশেই সরস্বতী নদী। এই নদীর ফেরিঘাটে পারাপারের যে ডোঙা থাকতো, সেই ডোঙা খুলে নিয়ে অথবা স্থানীয় জেলেদের নৌকা তাদের অজ্ঞাতসারে খুলে নিয়ে শরৎচন্দ্র কখনো একা, কখনো বা বন্ধুদের নিয়ে নদীবক্ষে দু-তিন মাইল পর্যন্ত চলে যেতেন। এইভাবে কৃষ্ণপুর গ্রামে

রঘুনাথ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত আখড়া বাটী পর্যন্ত অথবা সপ্তগ্রামের পুল অবধি বেড়িয়ে আসতেন। কৃষ্ণপুরের এই বৈষ্ণবদের আখড়া বাটীটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি কখনো একা, কখনো বন্ধুদের নিয়ে পায়ে হেঁটেও এই আখড়ায় যেতেন।

বাল্যকালে শরৎচন্দ্র যেমন সাহসী ছিলেন, তেমনি তিনি কোমল স্বভাবেরও ছিলেন। এই বয়সেই তিনি লোকের রোগে শোকে সেবা করতে ও সান্ত্বনা দিতে ছুটে যেতেন। হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে যখন তিনি পড়তেন, তখন প্রয়োজন হ'লে গভীর রাত্রিতে তিনি একাই লণ্ঠন ও একটি লাঠি হাতে নিয়ে তিন মাইল নির্জন পথ হেঁটে হুগলী শহর থেকে রোগীর ঔষধ অথবা ডাক্তার এনে দিতেন। বালকসুলভ চপলতার জন্য শরৎচন্দ্র যেমন কিছু লোকের অপ্রিয় ছিলেন, তেমনি তাঁর এই সকল সৎকাজের জন্য তাঁকে আবার অনেকে আদরও করতেন।

শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুরে থাকার সময় একবার এক যাত্রার দলে ঢুকেছিলেন। এই দলে থেকে তিনি কিছুদিন বাইরে বাইরে ঘুরেছিলেন। ছেলেবেলায় তিনি মাঝে মাঝে বাড়ীর কাকেও কিছু না বলে নিরুদ্দেশ যাত্রাও করতেন। শরৎচন্দ্র একবার তাঁর ১৩৷১৪ বছর বয়সের সময় ব্যাণ্ডেল স্টেশনে এসে কলকাতাগামী একটি ট্রেনের ১ম শ্রেণীর কামরায় উঠে বসেন। ঐ কামরায় তখন কলকাতার বৌবাজার-নিবাসী অ্যাটর্ণি গণেশচন্দ্র চন্দ্র ছিলেন। ময়লা কাপড়-জামা পরা একটি ছেলেকে ১ম শ্রেণীর কামরায় উঠতে দেখে, তিনি কৌতূহলবশে ছেলেটিকে কাছে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি জানতে পারলেন, ছেলেটি তাঁরই এক বন্ধুর নাতি।

গণেশবাবুর ঐ বন্ধুটি ছিলেন হালিশহরের অক্ষয়নাথ গাঙ্গুলী (বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর পিতা)। অক্ষয়বাবু শরৎচন্দ্রের মাতামহের খুড়তুতো ভাই।

গণেশবাবু শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে অক্ষয়বাবুর বাড়ীতে দিয়ে এলেন। অক্ষয়বাবু তখন গণেশবাবুর বাড়ীর অদূরে দুর্গা পিথুরি লেনে থাকতেন।

অক্ষয়বাবু আবার পরদিন লোক দিয়ে শরৎচন্দ্রকে দেবানন্দপুরে পাঠিয়ে দেন।

শরৎচন্দ্র একবার কাকেও কিছু না বলে পায়ে হেঁটে পুরীও পালিয়েছিলেন। তাঁর এই পায়ে হেঁটে পুরী যাওয়ার গল্প পরে তিনি অনেকের কাছে বলতেন। পুরীতে গিয়ে সেবার তিনি বিখ্যাত গণিতজ্ঞ কে. পি. বসুর বাড়ীতে ছিলেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর ছেলেবেলার কথায় নিজেই বলেছেন :—

"ছেলেবেলার কথা মনে আছে। পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরে, ডোঙা ঠেলে, নৌকা বেয়ে দিন কাটে। বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাগরেদি করি, তার আনন্দ ও আরাম যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন গামছা কাঁধে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বা'র হই। ঠিক বিশ্বকবির কাব্যের নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়, একটু আলাদা। সেটা শেষ হলে আবার একদিন ক্ষতবিক্ষত পায়ে নির্জীব দেহে ঘরে ফিরে আসি। আদর অভ্যর্থনার পালা শেষ হলে, অভিভাবকেরা পুনরায় বিদ্যালয়ে চালান করে দেন।"

কলেজে অধ্যয়ন

কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘোরনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র মণীন্দ্রনাথ তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে শরৎচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় মণীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র দু'জনেই দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে মণীন্দ্রনাথ তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে ভর্তি হলেন। কিন্তু টাকার অভাবে শরৎচন্দ্রের আর কলেজে ভর্তি হওয়া হল না। অভাবের জন্যই বিপ্রদাস শরৎচন্দ্রকে কলেজে ভর্তি করাতে পারলেন না।

শরৎচন্দ্রের পড়া হবে না দেখে, মণীন্দ্রনাথের মা কুসুমকামিনী দেবীর বড় মায়া হল। এই সময় তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁদের ছোট ছেলেদের পড়াবার বিনিময়ে শরৎচন্দ্রের কলেজের মাহিনা দেবার ব্যবস্থা করে দিলেন। ফলে শরৎচন্দ্র কলেজে ভর্তি হলেন। শরৎচন্দ্র রাত্রে মণীন্দ্রনাথের দুই ছোট ভাই সুরেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথকে পড়াতেন। এঁরা তখন স্কুলে নীচের ক্লাশে পড়তেন। এঁরা ছাড়া বাড়ীর অন্য ছোট ছেলেরাও তাঁর কাছে অমনি পড়ত।

শরৎচন্দ্র এইভাবে অপরকে পড়িয়ে তার বিনিময়ে তবে তিনি নিজে পড়তে সক্ষম হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র রাত্রে অপরকে পড়িয়ে, তারপরে নিজের পড়া করতেন। এই সময় অধিক রাত পর্যন্ত জেগে তিনি গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়াশুনা করতেন।

পড়াশুনায় শরৎচন্দ্রের এই একাগ্রতা সম্বন্ধে তাঁর মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন—"কলেজে ফার্ষ্ট ইয়ারে বিজ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষার পূর্বদিন সন্ধ্যায় শরৎচন্দ্র তাঁর ছাত্রদের বলে গেলেন—কাল আমার পরীক্ষা, আমি পড়তে যাচ্ছি, আজ রাত্রে আর আমাকে তোমরা কেউ বিরক্ত করো না। যার যা পড়া জানবার আছে, কাল সকালে আমার কাছে গিয়ে জেনে এসো।

ঘরে আলো জেলে মোটা মোটা বিজ্ঞানের বইগুলো নিয়ে দোর জানালা বন্ধ করে পড়তে বসে গেলেন। তার পরদিন সকালে ছাত্রের দল দোর ঠেলে সে ঘরে গিয়ে দেখে তখনও ঘরে আলো জ্বলছে, দরজা জানালা বন্ধ এবং

শরৎচন্দ্র নিবিষ্টমনে পড়ছেন। ছেলের দল ঘরে ঢুকতে তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন—এইমাত্র বারণ করে এলুম না, আজ রাত্রে তোমরা কেউ আমায় বিরক্ত করো না ; আমি পড়াতে পারব না ; তবু সব এলে কেন ? ছাত্রের দল বিস্মিত হয়ে বললে—সে তো কাল রাত্রে কথা ছিল। আজ যে এখন সকাল হয়ে গেছে। শরৎচন্দ্র আসন ছেড়ে উঠে জানালা খুলে দিতেই ঘরের মধ্যে সকালের রৌদ্র এসে ছড়িয়ে পড়ল, তিনি ছেলেদের কাছে মনে মনে অপ্রতিভ হলেন।

সে বার কলেজে বিজ্ঞানের পরীক্ষাপত্রে শরৎচন্দ্রের উত্তর দেখে পরীক্ষক বিস্মিত হয়ে সন্দেহ করেছিলেন যে, এ ছেলেটি নিশ্চয়ই গোপনে বই দেখে লিখেছে। তিনি পুনরায় শরৎচন্দ্রকে সম্মুখে বসিয়ে নূতন প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা করলেন। এবার শরৎচন্দ্র মুখেই তার উত্তরগুলি বলে দিয়ে পরীক্ষককে অধিকতর বিস্মিত করে দিলেন। তাঁর স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ।”

শরৎচন্দ্র যখন কলেজে পড়ছিলেন, সেই সময় ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তাঁর মাতার মৃত্যু হয়। শরৎচন্দ্রের পিতা ঘরজামাই হয়ে গাঙ্গুলী-বাড়ীতেই বাস করতেন। তিনি ঐ সময় কিছুই উপার্জন করতেন না। শরৎচন্দ্রের মাতার মৃত্যুর পর মতিলাল ভাবলেন, এখানে থাকা আর ভাল দেখায় না। তাই তিনি তাঁর পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে নিয়ে ভাগলপুরের খঞ্জরপুর পল্লীতে একটা খোলার বাড়ী ভাড়া করে বাস করতে লাগলেন। ইতিপূর্বে মতিলালের জ্যেষ্ঠা কন্যা অনিলা দেবীর বিবাহ হওয়ায়, অনিলা দেবী তাঁর শ্বশুর বাড়ীতেই থাকতেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর পিতার সঙ্গে খঞ্জরপুরে গিয়ে সেখানে থেকেই লেখাপড়া করতে লাগলেন। কিন্তু এফ, এ, পরীক্ষার ফি জমা দিতে না পারায় শেষে আর পরীক্ষা দিতে পারলেন না।

শরৎচন্দ্রের মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ইনি শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদারনাথের তৃতীয় ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র) ১৩৫৭ সালের ‘শরৎ-স্মরণিকা’য় ‘শরৎচন্দ্রের ছোটমামা ও মামার বাড়ী’ প্রবন্ধে লিখেছেন—

“তৎকালীন এফ, এ, পরীক্ষার প্রবেশমূল্য মাত্র পনেরটি টাকা জোগাড় না হতে পারার দরুণ শরৎচন্দ্র ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষা দিতে পারেন নি, এই মর্মে যে

কাহিনী প্রচলিত আছে, তা আদৌ সত্য নয়। এমন কি, সেই কাহিনীর সৃষ্টি যত বড় লোকের দ্বারাই হয়ে থাকুক না কেন, তথাপি সত্য নয়।"

উপেনবাবুর এ কথার উত্তরে আমার বক্তব্য—এই কাহিনীর স্রষ্টা যে শরৎচন্দ্র নিজেই। তিনি বহুবার বহু জায়গায় তাঁর এই অর্থাভাবে পরীক্ষা দিতে না পারার বেদনার কথা বলেছেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগস্ট তারিখে শরৎচন্দ্র লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে যে চিঠিখানি লেখেন, তার এক জায়গায় লিখেছিলেন—"বড় দরিদ্র ছিলাম, ২০টি টাকার জন্যে একজামিন দিতে পাইনি।"

শরৎচন্দ্র তাঁর 'আত্মচরিত' নামক প্রবন্ধের মধ্যেও নিজে লিখেছেন—"আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটেনি।"

ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারকেও শরৎচন্দ্র একবার একথা বলেছিলেন। রমেশবাবু তাঁর 'শরৎ-স্মৃতি' প্রবন্ধে সে কথার উল্লেখ করে লিখেছেন—"অর্থাভাবে পরীক্ষার ফি জোগাড় করিতে না পারায় তিনি এফ, এ, পরীক্ষা দিতে পারেন নাই।" (শরৎ-স্মরণিকা—১ম বর্ষ, পৃষ্ঠা ২৬)

শরৎচন্দ্র যে অত্যন্ত দরিদ্রের সন্তান ছিলেন এবং অর্থাভাবেই যে তাঁকে পড়া ত্যাগ করতে হয়েছিল, একথা শরৎচন্দ্র চন্দননগরের শ্রীহরিহর শেঠের কাছেও একদিন বলেছিলেন।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড মিশন হোস্টেলে এক ছাত্রসভায় শরৎচন্দ্র একবার গিয়েছিলেন। তাতে শরৎচন্দ্র ছিলেন সভাপতি, আর ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রধান অতিথি। সেদিন সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র ছাত্রদের বলেছিলেন—"তোমরা সকলেই কলেজের ছাত্র। তোমরা উচ্চ-শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছ। তোমাদের মত বয়সে অর্থের অভাবেই আমাকে কিন্তু একদিন পড়া ছাড়তে বাধ্য হতে হয়েছিল।"

এ ছাড়া আরও অনেক জায়গায় অনেকের কাছেই তিনি অর্থাভাবে পরীক্ষা দিতে না পারায়, তাঁর এই বেদনার কথা বলে গেছেন।

টাকার অভাবে যদি না হয়, তবে কিসের জন্য শরৎচন্দ্র এফ, এ, পরীক্ষা দিতে পারেন নি, এ সম্বন্ধে আমি একদিন উপেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

তার উত্তরে উপেনবাবু আমাকে বলেছিলেন—টেষ্ট পরীক্ষার সময় হলে শরৎচন্দ্র যখন লুকিয়ে বই দেখে নকল করছিলেন, তখন গার্ডের হাতে ধরা পড়ে যান। ফলে তাঁকে এফ, এ পরীক্ষার অনুমতি দেওয়া হয় নি।

উপেনবাবু আমাকে যে কথাটি বলেছিলেন, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও ঐ কথাই বলেছিলেন। তাই ব্রজেনবাবু তাঁর 'শরৎ-পরিচয়' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে লিখেছিলেন—"টেষ্ট পরীক্ষাদান কালে এমন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিল, যাহার ফলে কলেজের কর্তৃপক্ষ শরৎচন্দ্রকে এফ, এ, পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেন নাই।"

শরৎচন্দ্র অর্থাভাবে পরীক্ষা দিতে পারেন নি, না টেষ্ট পরীক্ষার সময় নকল করতে গিয়ে ধরা পড়ার ফলে পরীক্ষা দেবার অনুমতি পান নি, এর কোনটা সত্য?—এ সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে আমি একদিন প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তরে তিনি বলেছিলেন—অর্থাভাবের কথাটাই সত্য। তবে টেষ্ট পরীক্ষার সময় একটা গণ্ডগোলও অবশ্য হয়েছিল।—এই বলে তিনি যে কাহিনীটি বলেছিলেন, তা এই :—

তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজে আগে টেষ্ট পরীক্ষা বলে কিছু ছিল না। সেকেণ্ড ইয়ারে যারা পড়ত, তাদের সকলকেই অমনি এফ, এ, পরীক্ষা দিতে পাঠানো হ'ত। শরৎচন্দ্রদের সময় থেকেই এই কলেজে টেষ্ট পরীক্ষার প্রবর্তন হ'ল। ছাত্ররা পরীক্ষা দিতে চায়না, কলেজ-কর্তৃপক্ষও পরীক্ষা না করে ছাড়বেন না—এই নিয়ে টেষ্ট পরীক্ষার আগেও একটু গণ্ডগোল হয়েছিল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ছাত্রদের টেষ্ট পরীক্ষা দিতেই হ'ল।

বিজ্ঞানের পরীক্ষার দিন শরৎচন্দ্র একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে বসলেন। শরৎচন্দ্র বিজ্ঞানে খুব ভাল ছাত্র ছিলেন। বিজ্ঞানের পরীক্ষার দিন তিনি প্রায় অর্ধেক সময়ের মধ্যেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লিখে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

পরীক্ষার হলে শরৎচন্দ্র দেখেছিলেন যে, তাঁর ক'টি বন্ধু ভাল লিখতে পারছে না। বন্ধুরা লিখতে না পারলে, তখন কিভাবে তাদের সাহায্য করবেন, এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র এবং তাঁর বন্ধুরা কলেজের দারোয়ানকে হাত করে আগেই একটা মতলব ঠিক করে রেখেছিলেন। সেই মতলব অনুযায়ীই শরৎচন্দ্র বেরিয়ে এসে কলেজ-কম্পাউণ্ডেরই সংলগ্ন হোস্টেলে গেলেন। সেখানে গিয়ে শ্লিপ করে তাতে উত্তর লিখে লিখে দারোয়ানের হাত দিয়ে পরীক্ষার হলে

পাঠিয়ে দিতে লাগলেন। দারোয়ান জল, কাগজ, ব্লটিং পেপার, কালি ইত্যাদি দেবার নাম করে গার্ডের চোখ এড়িয়েই, শরৎচন্দ্র যাকে যাকে দিতে বলেছিলেন, তাদের কাছেই শ্লিপ পৌঁছে দিতে লাগল। কিন্তু সে ঘন ঘন যাতায়াত করতেই গার্ডের সন্দেহ হ'ল।

বিজ্ঞানের অধ্যাপক সারদা ভট্টাচার্য নিজেই গার্ড দিচ্ছিলেন। দারোয়ানের উপর তাঁর সন্দেহ হওয়ায়, দারোয়ান যখন বেরিয়ে যায়, তার অনুসরণ করে তিনি হোস্টেলে গিয়ে দেখেন—শরৎচন্দ্র দিব্যি বসে বসে শ্লিপে উত্তর লিখছেন।

সারদাবাবু শরৎচন্দ্রকে হোস্টেল থেকে কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে ধরে নিয়ে এলেন। কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন তখন, শান্তিপুর-নিবাসী হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। তিনি অত্যন্ত নীতিবাগীশ লোক ছিলেন। শরৎ-চন্দ্রের এই অন্যায় কাজের জন্য তিনি শরৎচন্দ্রকে টেষ্ট পরীক্ষায় 'উত্তীর্ণ' বলে ঘোষণা করবেন না, স্থির করলেন।

টেষ্ট পরীক্ষার ফল বেরুল। সব ছেলেই পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেল। পেলেন না কেবল শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র আর কি করেন, নিরুপায় হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন।

এদিকে হরিপ্রসন্নবাবু শরৎচন্দ্রকে এফ-এ পরীক্ষা দিতে দিলেন না বটে, কিন্তু তিনি অত্যন্ত নীতিবাগীশ লোক ছিলেন বলে, সর্বদাই বিবেকের দংশন অনুভব করতে লাগলেন। তিনি কেবলই ভাবতে লাগলেন—তাই ত, একটা ছেলের জীবন নষ্ট করে দেব!

এই সময় সারদাবাবুও আবার নিজেকে শরৎচন্দ্রের পরীক্ষা দিতে অনুমতি না পাওয়ার মূল ভেবে, শরৎচন্দ্র যাতে পরীক্ষা দিতে পারেন, তার জন্য হরিপ্রসন্নবাবুকে অনুরোধ করতে লাগলেন।

হরিপ্রসন্নবাবু জানতেন, শরৎচন্দ্র পড়াশুনায় ভাল ছেলে; পরীক্ষা দিলে পাস করবেই। তাই তিনি কলেজের সম্মানের কথাটাও ভাবছিলেন।

এইভাবে অনেক চিন্তা করে পরীক্ষার ফি জমা দেবার আগের দিন, কি সেই দিন, হরিপ্রসন্নবাবু শরৎচন্দ্রকে ডাকালেন। শরৎচন্দ্র এলে হরিপ্রসন্নবাবু তাঁকে ফি'র টাকা এনে জমা দিয়ে যেতে বললেন।

শরৎচন্দ্র বাড়ীতে গিয়ে তাঁর পিতাকে টাকার কথা বললেন। শরৎচন্দ্রের পিতা অমনিই ত বেকার ও ঘোরতর অভাবী। হঠাৎ একসঙ্গে পরীক্ষার ফি এবং ঐ সঙ্গে দেয় ক'মাসের কলেজের মাইনের টাকা পান কোথায়? তিনি

সমস্ত টাকা যোগাড় করতে পারলেন না। শ্বশুরবাড়ী থেকে চলে আসায় তিনি সেখানেও আর কারো কাছে টাকা চাইতে গেলেন না। তা ছাড়া শরৎচন্দ্রের নিজের মামাদের অবস্থাও তখন খুবই খারাপ, ফলে শেষ পর্যন্ত টাকা জোগাড় না হওয়ায়, শরৎচন্দ্র পরীক্ষার ফি আর জমা দিতে পারলেন না।

শরৎচন্দ্রের এফ, এ, পরীক্ষা দিতে না পারার সম্বন্ধে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় যা বলেছেন, সে সম্বন্ধে উপেনবাবুর সহপাঠী বন্ধু সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎচন্দ্রের জীবন-রহস্য' নামক গ্রন্থে লিখেছেন :—

"পরীক্ষার ফি দিতে পারেন নি বলে তিনি ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষা দিতে পারেন নি। এ সম্বন্ধে মতভেদ দেখছি, এবং এ মতভেদের কারণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নয়। বাপে-খেদানো, মা-মরা ভাগনে, তাও সহোদরা ভগ্নীর পুত্র নয়, তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন হবেন এমন মামা জগতে বিরল। ধনী মধ্যবিত্ত কোন সংসারে এমন মাতুল দেখা যায় না। মাতুলালয়ে শরৎচন্দ্র যে আদরের পাত্র ছিলেন ১৯০০ সালে অন্তত তার কোন লক্ষণ আমি দেখিনি। তাঁর দিন কাটতো বিভূতি ভট্টের গৃহে, সতীশচন্দ্রের বৈঠকখানায় এবং শরৎচন্দ্রের মনের প্রাণের সাথীদের সঙ্গে।"

সতীশদের বাড়ীতে

ভাগলপুরে বাঙ্গালীটোলায় শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বাস করতেন।

বাঙ্গালীটোলার গায়েই আদমপুর পল্লী। আদমপুরেও অনেক বাঙ্গালীর বাস। তখনকার দিনে এই আদমপুরের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিবচন্দ্র অত্যন্ত গরীবের ছেলে ছিলেন। কিন্তু তিনি ছাত্রজীবনে একজন কৃতি ছাত্র ছিলেন। শিবচন্দ্র আইন পাস করে ভাগলপুরে ওকালতি আরম্ভ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ওকালতিতে পসার করে বহু অর্থ উপার্জন করেছিলেন। নানা দেশহিতকর কাজের মধ্যেও তিনি লিপ্ত ছিলেন। তিনি ভাগলপুরে তাঁর পিতার নামে দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয় এবং তাঁর মাতা মোক্ষদা দেবীর নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট শিবচন্দ্রকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

রাজা শিবচন্দ্র স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য একবার বিলাত যান। বিলাত থেকে ফিরে এলে ভাগলপুরের বাঙ্গালী সমাজ তাঁকে 'একঘরে' করেছিল।

বাঙ্গলা দেশের বাইরে হলেও ভাগলপুরের বাঙ্গালীরা তখন সেখানে সমাজ-বদ্ধ হয়েই বসবাস করতেন।

স্থানীয় বাঙ্গালী সমাজ রাজা শিবচন্দ্রকে একঘরে করলে, তিনি তা আদৌ গ্রাহ্য করেন নি। বরং তিনি ধনী ও মানী ব্যক্তি ছিলেন ব'লে, অনেক বাঙ্গালীই তাঁর দলভুক্ত হয়েছিলেন। আর উদার মতাবলম্বীরা তো তাঁর পক্ষ নিয়েছিলেনই। এই নিয়ে তখন ভাগলপুরের বাঙ্গালী সমাজ রক্ষণশীল ও উদার মতাবলম্বী, এই দুই দলে বিভক্ত হয়েছিল। রক্ষণশীল দলের অন্যতম নেতা ছিলেন, শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আর অপর দলের সর্বেসর্বা ছিলেন রাজা শিবচন্দ্র নিজে।

রাজা শিবচন্দ্রের পুত্রের নাম ছিল সতীশচন্দ্র। সতীশচন্দ্র 'আদমপুর ক্লাব' নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঐ ক্লাবে গান-বাজনা, অভিনয়, খেলাধূলা সবেরই ব্যবস্থা ছিল।

সতীশচন্দ্রের ক্লাবের সকল কাজেই তাঁর পিতার পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। এমন কি রাজা শিবচন্দ্র তাঁর পুত্রের বন্ধুদের স্নেহযত্নও করতেন। এই সতীশ চন্দ্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল।

শরৎচন্দ্রের মাতামহ এবং মাতামহের অন্যান্য ভাইরা সকলেই রক্ষণশীল দলের লোক ছিলেন ব'লে, শরৎচন্দ্রকে রাজা শিবচন্দ্রের বাড়ীতে যেতে ও সতীশচন্দ্রের সঙ্গে মিশতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র মাতামহদের নিষেধ সত্ত্বেও লুকিয়ে রাজা শিবচন্দ্রের বাড়ীতে যেতেন এবং সতীশচন্দ্রের ক্লাবেও যোগ দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর মাতার মৃত্যুর পর, যখন মামার বাড়ী ছেড়ে খঞ্জরপুর পল্লীতে আসেন, তখন মাতামহদের নিষেধ থাকলেও, তিনি সতীশচন্দ্রের সঙ্গে আরও বেশী মিশতেন। তারপর কলেজের পড়া ছেড়ে দিয়ে কিছুদিন তিনি অধিকাংশ সময়ই রাজা শিবচন্দ্রের বাড়ীতে কাটাতেন। এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের তখনকার খঞ্জরপুরের প্রতিবেশী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

"ভাগলপুরের খঞ্জরপুর মহল্লায় যখন শরৎচন্দ্রের পিতা তাঁহার তিন পুত্র ও এক কন্যা লইয়া বাস করিতেন, তখন আমরা ছিলাম তাঁহাদের প্রতিবেশী। আমার অগ্রজ ৺রাজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন শরৎচন্দ্রের সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি বলিতেছি ১৮৯৭ সালের কথা—শরৎচন্দ্র তখন সম্পূর্ণভাবে বেকার এবং সাংসারিক ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকিল রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতেই শরৎচন্দ্র অধিকাংশ সময় কাটাইতেন। যেহেতু রাজা শিবচন্দ্রের পুত্র কুমার সতীশচন্দ্র ছিলেন তাঁহার বন্ধু। সতীশচন্দ্র সঙ্গীত, বিলিয়ার্ড এবং ক্রিকেট খেলায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন এবং তিনি 'আদমপুর ক্লাব' নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। এই আদমপুর ক্লাবের একটি ড্রামাটিক সেকশন ছিল এবং সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে বাঙ্গলা নাটক অভিনয় করা ছিল এই ক্লাবের বৈশিষ্ট্য। মৃণালিনী, জনা, বিল্বমঙ্গল নাটকের অভিনয়ে শরৎচন্দ্র যথাক্রমে মৃণালিনী, জনা এবং চিন্তামণির ভূমিকায় অভিনয় করিয়া আদমপুর ক্লাবের অভিনয়ের সুনাম বর্ধিত করেন।"

উদার মতাবলম্বী রাজা শিবচন্দ্রের বাড়ীর আড্ডাটি তখন যেরূপ ছিল, সে সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একটি পরিষ্কার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

"সে বাড়ীতে যাইতে আমাদের কঠিন মানা। এ-নিষেধ মানিয়া চলা সময়ে সময়ে আমাদের সম্পূর্ণ অসম্ভব হইত।...

ও-বাড়ীতে শাসন বলিতে কিছুই ছিল না। কর্তারা কঠোর ছিলেন না। লুকাইয়া ও-বাড়ীতে যাইলে আমাদের অবহেলা না করিয়া তাঁহারা আদর করিতেন। বাড়ীর কর্তারা ছিলেন বেশ দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ; ছেলেদের ঘুড়ি উড়াইবার সখ মিটাইতেন বাজার হইতে একরাশ ঘুড়ি লাটাই সুতা কিনিয়া আনিয়া দিয়া। ছেলেদের তামাক-চুরুট খাইতে ইচ্ছা হইলে লাউ-কুমড়ার ডাঁটা লইয়া শিক্ষানবিশী করিতে হইত না এবং চুরুট খাওয়া ধরা পড়িলে হাসির রোলে সে অপরাধ উড়িয়া যাইত।"

সুরেনবাবু আরও লিখেছেন—"সেখানে কাঠপুতুলের নাচ নিত্যই চলিয়াছে। সাপুড়ে আনিয়া সাপ খেলাইয়া প্রচুর পুরস্কার লাভ করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইত। সন্ধ্যাবেলায় সখের যাত্রাদলের খোলের চাঁটিতে আমাদের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিত। শাসনের লৌহ পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া আমরা সেই আনন্দবাজারের প্রতি যে কি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতাম, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।...

এই সখের যাত্রাদলের অধিনায়ক যৌবনে সূর্যসিদ্ধ হইবার মানসে প্রদীপ্ত সূর্যের উপর নিজের দুইচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া কঠোর তপশ্চর্যা করিয়াছিলেন। ফলে দুই চক্ষুই তাঁহার নষ্ট হইয়া যায়। তাই তাঁহার অবসর ছিল অখণ্ড। তিনি আদর করিয়া সতীশচন্দ্রের এই বন্ধুদলের নাম দিয়াছিলেন 'নব হুল্লোড়'। হুল্লোড় শব্দের প্রকৃতিগত অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া বহুবার তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি—হুং হোথা লোড় যস্তি ইতি হুল্লোড়! ইহার অর্থ এখনো জানি না। এই নব হুল্লোড়ে দিবারাত্র মাতামাতি চলিত। কেহ বেহালা শিখিতেছে, কেহ ডুগি-তবলায় বেদম চাঁটি দিয়া মুখে 'কৎ তে তাধিন তাধিন তা' আওড়াইতেছে, আবার কেহ বা নেশা করিয়া আগাগোড়া মুড়ি দিয়া একপাশে আড় হইয়া পড়িয়া আছে। আবার অন্যদিকে লম্বা নল গুড়গুড়ি লইয়া তাম্রকূট-সেবনশিক্ষণী মুখ হইতে অবিরাম ধূমোদ্গীরণ করিয়া কাসিতেছে। অধিনায়ক সেই সঙ্গে শ্লোক আওড়াইতেছেন—

তাম্রকূটং মহাদ্রব্যং সমস্তায় পিয়তে যদি
টানে টানে মহাফলং মা তা দিয়া মহৎসুখম।"

ভট্ট বাড়ীতে

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস নাগাদ ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের সহিত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পরিচয় হয়। সৌরীনবাবু তখন ভাগলপুরে তাঁর মেসোমশায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে থেকে ওখানকার তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে এফ, এ, পড়তেন।

কলেজে বিভূতিভূষণ ভট্ট ছিলেন সৌরীনবাবুর সতীর্থ-বন্ধু। বিভূতি বাবুর ডাক নাম ছিল পুঁটু। এই পুঁটু বা বিভূতিভূষণই তাঁদের বাড়ীতে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সৌরীনবাবুর পরিচয় করিয়ে দেন। শরৎচন্দ্র তখন বিভূতিবাবুদের বাড়ীতেই অধিকাংশ সময় থাকতেন।

এ সম্বন্ধে সৌরীনবাবু তাঁর 'শরৎচন্দ্রের জীবন রহস্য' গ্রন্থে লিখেছেন—

"পুঁটুদের বাড়ী আমাদের যাতায়াত ছিল হামেশা। যখনই যেতুম শরৎচন্দ্রকে দেখতুম সেই চেয়ারখানিতে বসে আছেন—কখনো বই পড়চেন, কখনো লিখচেন। আমাদের সঙ্গে নানা আলোচনাতেও যোগ দিতেন।···

এ সময়টায় শরৎচন্দ্র থাকতেন পুঁটুদের বাড়ী। মামার বাড়ী ভাগলপুরেই পুঁটুদের বাড়ী থেকে কিছু দূরে। সেখানকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আমাদের দুর্জ্ঞেয় ছিল। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় যে-সময়েই পুঁটুদের বাড়ী গিয়েছি, দেখেছি, শরৎচন্দ্র বসে আছেন সেই চেয়ারখা নিতে। ঐ চেয়ারখানি ছিল তাঁর রিজার্ভ করা। বই পড়তেন মোটা মোটা ইংরেজি বই।···

গল্প লিখতেন অনর্গল। এ যাবৎ পুঁটু আর তাঁর ভগ্নী নিরুপমা এঁরাই ছিলেন পাঠক-পাঠিকা। সে দলে আমিও ইনিসিয়েটেড হলুম।"

সৌরীনবাবু আরও লিখেছেন—"বড়দিদির সুরেন্দ্রনাথ চরিত্রের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের মিল আমি প্রথমেই লক্ষ্য করেছিলুম।"

সৌরীনবাবু এফ, এ, পরীক্ষা দিয়ে কলকাতায় ভবানীপুরে তাঁদের বাড়ীতে ফিরে আসেন। ঐ সময় শরৎচন্দ্রের মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতায় সৌরীনবাবুর প্রতিবেশী ছিলেন। উপেনবাবুর সঙ্গে সৌরীনবাবুর বন্ধুত্ব ছিল। সৌরীনবাবু একদিন উপেনবাবুর কাছে শরৎচন্দ্রের

লেখার প্রসঙ্গ তুলে বলেছিলেন—সম্পর্কে তোমাদের ভাগ্‌নে হন, শুনেছি! তুমি তাঁর লেখার কথা কখনো বলোনি তো!

সৌরীনবাবুর কথার উত্তরে উপেনবাবু বলেছিলেন—"আমি লেখা পড়িনি। তাছাড়া শরৎ বয়ে' গিয়েছে—আমাদের বাড়ীর সঙ্গে তেমন যোগাযোগ আর নেই তার। সতীশদের ওখানে আর পুঁটুদের ওখানেই প্রায় থাকে।" (শরৎচন্দ্রের জীবন রহস্য)

পুঁটু বা বিভূতিভূষণের মেজদা ইন্দুভূষণ কলেজে শরৎচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। ইন্দুভূষণের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের খুব বন্ধুত্ব ছিল। ইন্দুভূষণ দাবা খেলতে ভালবাসতেন। দাবা খেলা তাঁর নেশার মত ছিল। শরৎচন্দ্রও দাবা খেলতে পছন্দ করতেন। শরৎচন্দ্র ইন্দুভূষণের সঙ্গে তাঁদের বাড়ীতে দাবা খেলতে আসতেন। তারই ফলে ক্রমে বিভূতিভূষণদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা হয়। এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছেন :—

"...কি করিয়া এই পরিবারের (ভট্ট পরিবারের) সঙ্গে জানাশুনা ও ঘনিষ্ঠতা হয়, সে সব কথা আমার ভাল মনে নাই। বোধ হয় এই জন্য যে, ধনী হইলেও ইঁহাদের ধনের উগ্রতা বা দাম্ভিকতা কিছুমাত্র ছিল না এবং আমি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম বোধ হয় এই জন্য বেশী যে, ইঁহাদের গৃহে দাবা খেলার অতি পরিপাটি আয়োজন ছিল। আয়োজন অর্থে বুঝিতে হইবে—খেলোয়াড়, চা, পান ও মুহুর্মুহু তামাক।"

শরৎচন্দ্র এই ভট্ট পরিবারের সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন যে, এঁদের 'পূর্ণমাত্রায় অবরোধপ্রথা বিশিষ্ট গৃহান্তঃপুরের মধ্যে আত্মজনের মত প্রবিষ্ট' হয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে নিরুপমা দেবী তাঁর 'আমাদের শরৎদাদা' নামক প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

"আজ...একটা শ্রাদ্ধাতথির কথা মনে পড়িতেছে। যাতে তিনি আমাদের পূর্ণমাত্রায় অবরোধ প্রথাবিশিষ্ট গৃহান্তঃপুরের মধ্যে আত্মজনের মত প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেদিন আমার ৺স্বামীর সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধ দিন। ...'যমানিয়া' নামে অভিহিত গঙ্গার ছাড়ের উপরে আমাদের বাসার অনতিদূরে একটি ঠাকুরবাড়ী ছিল; তাহাতেই উক্ত অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়।

আমার এক মাতৃতুল্যা বয়স্কা বিধবা ভ্রাতৃজায়া (জ্যেষ্ঠতাতের পুত্রবধূ)

আমাকে সেইখানে লইয়া গিয়া আসনে বসাইলে দেখিলাম—দাদারা বা ভগ্নীপতি কেহই সেখানে উপস্থিত হন নাই (বোধ হয় দুঃখে), মাত্র ছোটদা আর একজন কাহাকে সঙ্গে লইয়া সেখানে স্বেচ্ছাসেবকের কার্য করিতেছেন। পরে বুঝিয়াছিলাম তিনিই শরৎদাদা। উক্ত কার্যের দানাদির মধ্যে তাঁহাদের একটা ভুল হওয়ায় কিছুক্ষণ পরে সসঙ্কোচে আমি পুরোহিতকে তাহা নিবেদন করিলে, তাঁহারা সেটি সংশোধনার্থে কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন এবং অসঙ্কোচে বড় ভাইয়ের অধিকারে আমাকে উদ্দেশ করিয়া শরৎদাদা বলিলেন—'দেখ দেখি, কতটা হাঙ্গামে পড়তে হ'ল—ভুলটা এতক্ষণ পরে ধরিয়ে না দিয়ে তখনই দিলে না কেন?' আমি খুবই অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম। সেদিন ঘৃত মধু ইত্যাদির গন্ধে একটা ভীমরুল (যাহা পশ্চিমে বড্ড বেশী) উক্ত শ্রাদ্ধ কার্যের মধ্যেই আমাকে মক্ষম ভাবে কামড়াইয়া ধরিয়াছিল; কিন্তু সেটা এমন সময়—যাহার মধ্যে চঞ্চল হওয়া বা আসন ত্যাগ করা উচিত মনে হয় নাই; যখন সেটা রক্ত বহাইয়া দিয়াছে, তখন তাঁহারা জানিতে পারিয়া বিষম ব্যস্তভাবে তাহার প্রতিষেধার্থে ছুটাছুটি বাধাইয়া দিলেন। ছোটদার সঙ্গে শরৎচন্দ্র ব্যাকুলভাবে একবার দধি, একবার মধু লইয়া বিদ্ধ স্থানে দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন—অথচ তখন আমাদের সঙ্গে পরিচয় সামান্যই। প্রতিবাসী এবং দাদাদের বন্ধু ভাবেই সাহায্যার্থে আসিয়াছিলেন মাত্র। শ্রাদ্ধান্তে যখন উক্ত ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে বাড়ী ফিরিতেছি—দেখি তখন শরৎদাদা আমাদের বাড়ীর দিক হইতে পুঁটুলীর মত কি লইয়া ছুটিয়া আসিয়া ছোটদার হাতে দিলেন। ছোটদা তাহা ভ্রাতৃজায়ার হাতে দিলে দেখি একখানা পাড়ওয়ালা কাপড় ও হাতের গহনা—৺শ্রাদ্ধের পূর্বে যাহা বাড়ীতে খুলিয়া রাখা হইয়াছে। মনের উত্তেজনায় বোধ হয় সে সময় আবার সেগুলা লইতে অনিচ্ছা প্রকাশই হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সে জিদ সেদিন জয়ী হইতে পারে নাই। মাতৃসমা ভ্রাতৃজায়া তো কাঁদিতেই ছিলেন—ছোটদা মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতেছে এবং একজন বাহিরের লোক—তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে কাঁদিতেছেন—এ দৃশ্য সেদিন শোকে মূঢ় ব্যক্তিকেও নিজ কার্যে লজ্জা আনিয়া দিয়াছিল।"

ভট্টবাড়ীতে সতীর্থ ইন্দুভূষণের সহিত দাবা খেলা নিয়েই বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হলেও, বিভূতিভূষণ ও নিরুপমা দেবীর সহিত শরৎচন্দ্রের কিন্তু চেনাশোনা হয়, প্রধানতঃ সাহিত্য-চর্চার মধ্য দিয়েই। নিরুপমা দেবী লিখেছেন :—

"আমি সে সময়ে অজস্র কবিতা লিখিতাম। ছোটদা তাঁহার নিজের কবিতার সঙ্গে আমার লেখাও তাঁহার সম্মানিত বন্ধুকে দেখিতে দিতেন এবং আমাদের খাতায় তাঁহার হস্তাক্ষরে ঐ সব কবিতা সম্বন্ধে মতামত আসিয়া আমাদের উৎফুল্ল করিয়া তুলিত। একদিন দেখি—ছোটদা আমার একটি নূতন কবিতার মাথায় লিখিয়া দিয়াছেন—'আরো যাও—আরো যাও—দূরে—থামিও না আপনার সুরে।' পরে শুনিলাম শরৎদাদা নাকি তাঁহাকে বলিয়াছেন—'ঐ একটি ভাব আর একটি কথা ছাড়া বুড়ি যদি আর পাঁচ রকম ভেবে লেখে তো লেখার আরও উন্নতি হবে।' এই কথাই ছোটদার হাতে উক্ত কবিতাকারে আমার লেখার মন্তব্যরূপে বর্ষিত হইয়াছিল।...

সেই ক্রম-বর্ধিতাকার খাতাখানার কথা আজও মনে আছে—যাহার প্রায় প্রতি কবিতার মাথায় বা আশেপাশে তাঁহার তরুণ জীবনের সাহিত্যরুচির প্রচুর প্রমাণ ছিল। তিনি নাকি ছোটদাকে বলিয়াছিলেন যে, 'বুড়ি যদি চেষ্টা করে তো গদ্যও লিখিতে পারিবে।...' "

নিরুপমা দেবীর বাড়ীতে ডাকনাম ছিল বুড়ি।

প্রথম চাকরি

শরৎচন্দ্রের মাতার মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্রের পিতা শ্বশুরালয় থেকে পুত্র-কন্যাদের নিয়ে ভাগলপুরের খঞ্জরপুর পল্লীতে চলে যান।

ইতিপূর্বে, হাওড়া জেলার বাগনান থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রাম নিবাসী পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের সহিত মতিলালের জ্যেষ্ঠা কন্যা অনিলা দেবীর বিয়ে হয়েছিল। অনিলা দেবী তখন তাঁর শ্বশুরবাড়ীতেই থাকতেন।

মতিলাল এখন তিন পুত্র—শরৎচন্দ্র, প্রভাসচন্দ্র ও প্রকাশচন্দ্র এবং এক কন্যা সুশীলা দেবীকে নিয়ে খঞ্জরপুরে বাস করতে লাগলেন।

মতিলাল একে ত আত্মভোলা, অলস প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং কিছুই কাজকর্ম করতেন না, এর উপর আবার ভুবনমোহিনী দেবীর মৃত্যু হওয়ায় তিনি প্রায় পাগলের মত হয়ে যান।

শরৎচন্দ্র নিজে বলেছেন, তাঁর মাতার মৃত্যুর পর তাঁর পিতা পাগলের মত হয়ে যা কিছু ছিল, সমস্ত বিলিয়ে নষ্ট করে দেন।

এই সব কারণে মতিলালের সংসার তখন একেবারেই অচল হয়ে পড়ে। এর উপর আবার মতিলালের পাওনাদারদের তাগাদা ও নালিশ ছিল।

মতিলাল এক সময় দেবানন্দপুরের রাজকুমারী দেবী নামে এক ব্রাহ্মণ মহিলার কাছে কিছু টাকা ঋণ করেছিলেন। মতিলাল ঐ টাকা শোধ দিতে না পারায়, মহিলাটি এই সময় পাওনা টাকা আদায়ের জন্য মতিলালের বিরুদ্ধে হুগলীর প্রথম মুন্সেফী আদালতে নালিশ করেন। মহিলাটি মামলায় ডিক্রি পেয়ে মতিলালের বসতবাটী ক্রোক করেছিলেন। মতিলাল তখন আর কোন উপায় না দেখে, ঐ ডিক্রির টাকা মেটাবার জন্য দেবানন্দপুরের নিজের বসত-বাটীটি তাঁর কনিষ্ঠ মাতুল অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ২২৫ টাকায় ১৩০৩ সালের ২৫শে কার্তিক তারিখে সাফ্ কোবলায় বিক্রি করে দেন। এর ফলে দেবানন্দপুরে মতিলালের নিজস্ব জায়গা বলতে আর কিছুই রইল না।

শরৎচন্দ্র তাঁদের এই সময়কার দারুণ অভাবের কথা উল্লেখ করে পরে লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে এক পত্রে লিখেছিলেন :—

"বড় দরিদ্র ছিলাম, ২০টি টাকার জন্য একজামিন দিতে পাই নি। এমন দিন গেছে, যখন ভগবানকে জানাতাম, হে ভগবান, আমার কিছুদিনের জন্য জ্বর করে দাও, তাহলে দুবেলা খাবার ভাবনা ভাবতে হবে না। উপোষ করেই দিন কাটাব।"

শরৎচন্দ্র পড়া ছেড়ে দিয়ে এত অভাব অনটনের মধ্যেও প্রথমদিকে বাড়ী সম্বন্ধে একেবারে সম্পূর্ণই নির্বিকার ছিলেন। পরে তিনি বনেলী এস্টেটে সামান্য মাইনের একটা চাকরি করেছিলেন। কিন্তু তাও অতি অল্প দিনের জন্যই।

বনেলী এস্টেটে এই কাজের কথা উল্লেখ করে পরে শরৎচন্দ্র নিজেই হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নকে বলেছিলেন—

"আমি কিছুদিন বনেলী এস্টেটে কাজ করি। সাঁওতাল পরগণায় তখন সেটেলমেন্টের কাজ চলচে। এস্টেটের তরফ থেকে একজন বড় কর্মচারী সেই কাজে এস্টেটের স্বার্থ দেখবার জন্য নিযুক্ত হন। তাঁর সহকারীদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। ডাঙ্গার মাঝে তাঁবুতে থাকতে হ'ত। কখন কখন রাজকুমার সেখানে আসতেন। সেটেল্‌মেন্টের বড় বড় অফিসারদের তাঁবুতে নেমন্তন্ন করে নাচ-গানের মজলিস্ দিতেন।"—ভারতবর্ষ, চৈত্র, ১৩৪৪

চাকরিতে শরৎচন্দ্রের বেশীদিন মন টিকল না। তাই একদিন তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ভাগলপুরে ফিরে এলেন। ভাগলপুরে ফিরে এসে আবার তিনি কলেজে পড়াশুনা করবেন স্থির করলেন। কিন্তু অভাবের জন্য তা আর হয়ে উঠল না। তখন বাড়ীতেই পুনরায় পড়াশুনা ও সাহিত্য-চর্চার সহিত গান-বাজনা অভিনয় প্রভৃতি করে কাটাতে লাগলেন।

অভিনয় ও গান-বাজনা

শরৎচন্দ্র তাঁর ছেলেবেলাকার কথা-প্রসঙ্গে নিজে বলেছেন—'ছেলেবেলার কথা মনে আছে, পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরে, ডোঙা ঠেলে, নৌকা বেয়ে দিন কাটে, বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাগরেদি করি।'

এই যাত্রা-থিয়েটারের উপর শরৎচন্দ্রের একটা সহজাত ঝোঁকই ছিল। এই ঝোঁকের জন্যই তিনি তাঁর যৌবন প্রারম্ভে সাকরেদ থেকে একেবারে গুরুর পদে উন্নীত হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র ভাগলপুরের খঞ্জরপুর পল্লীতে যখন ছিলেন, সেই সময় তাঁদের পাড়ার কয়েকটি ছেলেকে নিয়ে তিনি একটা ছোট থিয়েটারের দল গঠন করেছিলেন। আর শুধু দল গঠনই নয়, এই দলটি কয়েকবার অভিনয়ও করেছিল। শরৎচন্দ্র ছিলেন এই দলের প্রাণস্বরূপ। তিনি একাধারে প্রযোজক, শিক্ষক, অভিনেতা সব কিছুই ছিলেন।

কোন নাটক অভিনয় করতে গেলে রীতিমত রিহার্সালের দরকার। তার উপর দলের সকলেই ছিলেন ছেলেমানুষ। তাই নাটক অভিনয়ের পূর্বে তাঁদের দস্তুর মত রিহার্সাল দিতে হ'ত। অভিভাবকদের লুকিয়ে, যখনই সকলে একত্র জুটতে পারতেন, তখনই রিহার্সাল চালাতেন। আর রিহার্সালও হ'ত গুরুজনদের অজ্ঞাতে—কখন নির্জন যমুনিয়ার তীরে, কখন ভাঙা ও পরিত্যক্ত দেবালয়ে, আবার কখনও বা মুসলমানদের কবরস্থানে।

এই থিয়েটারের দলটি সম্বন্ধে দলের অন্যতম সদস্য বিভূতিভূষণ ভট্ট লিখেছেন :—

"আমরা যে পাড়ায় থাকিতাম, তাহার নাম খঞ্জরপুর। সেই পাড়ার প্রতিবেশী বালক ও যুবকগণ শরৎচন্দ্রের নায়কত্বে আমাদের লইয়া একটা ছোট থিয়েটার পার্টি গঠন করিয়াছিল। তাহাতে যে অভিনয় হইত শরৎচন্দ্র ছিলেন তাহার প্রযোজক ও শিক্ষক।...এই থিয়েটারের রিহার্সাল অনেক সময় অদ্ভুত অদ্ভুত স্থানে হইত—নদীর ধার (তখনকার যমুনিয়া এখন নাই) হইতে মুসলমানদের কবরস্থান, দেবস্থান, কোনস্থানই বাদ যাইত না।"

এই সময় ভাগলপুরের আদমপুর পল্লীতে 'আদমপুর ক্লাব' নামে যে ক্লাব ছিল, শরৎচন্দ্র সেই আদমপুর ক্লাবেও যোগ দিয়েছিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই

তিনি ক্লাবের একজন বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী সদস্য হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন। আদমপুর ক্লাব বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করে সর্বপ্রথম অভিনয় করেছিল। এই নাটকে শরৎচন্দ্র মৃণালিনীর ভূমিকায় সাফল্যের সহিত অভিনয় করেছিলেন। এ ছাড়া ক্লাব যখন 'জনা' ও 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের অভিনয় করে, শরৎচন্দ্র তখন এই দুই নাটকে যথাক্রমে জনা ও চিন্তামণির ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র একজন ভাল অভিনেতা হলেও অভিনয় অপেক্ষা সংগীতের উপরই কিন্তু তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অতি মিষ্ট। তিনি একবার যে গান শুনতেন, পরমুহূর্তেই সেই গানটি অবিকল সেই সুরে গাইতে পারতেন।

শরৎচন্দ্র যখন মামার বাড়ীতে থাকতেন, সেই সময় প্রসিদ্ধ গায়ক ও লেখক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের মামার বাড়ীর নিকটেই বাস করতেন। এই সুরেনবাবুর বাড়ীতে প্রায়ই গানের ও সাহিত্যের আসর বসত। শরৎচন্দ্র সংগীত ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণের বশে সুরেনবাবুর বাড়ীতে প্রায়ই যেতেন। যেদিন গানের কি সাহিত্যের মজলিস্ হ'ত, সেদিন শরৎচন্দ্র সেখানে থেকে স্বেচ্ছায় নানা ফাইফরমাস্ খাটতেন এবং অতিথিদের মধ্যে চা, পান ও তামাক সুরেনবাবুর বাড়ীর ভিতর থেকে এনে সরবরাহ করতেন।

সুরেনবাবুর ছোট ভাই রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। রাজেন্দ্রনাথের ডাক নাম ছিল রাজু। এই রাজুই শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথ। রাজুও আদমপুর ক্লাবেব একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিল। ক্লাবের মৃণালিনী ও বিল্বমঙ্গলের অভিনয়ে রাজু যথাক্রমে গিরিজায়া ও পাগলিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিল।

রাজু শরৎচন্দ্রের চেয়ে বয়সে অল্প কিছু বড় ছিল। শরৎচন্দ্র তাঁর এই বন্ধুটিকে যেমন শ্রদ্ধা করতেন, তেমনি তার আদেশ এবং নির্দেশও একজন অনুরাগী শিষ্যের মতই মেনে চলতেন। রাজু সুন্দর বাঁশী বাজাতে পারত। আর হারমোনিয়াম, তবলা, বেহালা প্রভৃতিতেও তার ভাল হাত ছিল। শরৎ-চন্দ্র এই রাজুর কাছ থেকে সমস্ত যন্ত্রই অল্প-বিস্তর বাজাতে শিখেছিলেন।

রাজু যে শুধু যন্ত্র-সংগীতেই বিশেষ পারদর্শী ছিল তা নয়, নানারকম দুঃসাহসিক কাজেও সে ওস্তাদ ছিল। রাজুর এই সব দুঃসাহসিক কাজে শরৎচন্দ্র ছিলেন তার একমাত্র সঙ্গী ও সহায়ক।

ভাগলপুরের আদমপুর ক্লাবের সদস্যবৃন্দ। নীচে বামদিকে কোণে উপবিষ্ট শরৎচন্দ্র। ক্লাবের অন্যতম সদস্য রাজু অর্থাৎ 'শ্রীকান্তে'র ইন্দ্রনাথ নিরুদ্দেশ হওয়ার পরে এই আলোকচিত্র গৃহীত। তাই এখানে রাজু অনুপস্থিত।

রাজুর সংস্পর্শে আসার ফলে শরৎচন্দ্র যেমন যন্ত্র-সংগীতে শিক্ষালাভ করতে পেরেছিলেন, তেমনি শরৎচন্দ্রের সাহসও খুব বেড়ে গিয়েছিল। ভূতের বা সাপের ভয় তিনি আদৌ করতেন না। গভীর রাত্রে একাই তিনি গান গেয়ে ও বাঁশী বাজিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন।

পাড়ায় ঘোষেদের একটি পোড়ো বাড়ী ছিল। সে বাড়ীতে কেউ থাকত না। শরৎচন্দ্র রাত্রে সেই বাড়ীর ছাদে বসে বাঁশী বাজানো অভ্যাস করতেন। পাড়ার লোকে ভাবত, পোড়ো-বাড়ীতে এত রাত্রে বাঁশী বাজায় কে? ভূতে নাকি? কিন্তু সে-ভূত যে শরৎচন্দ্র তা কেউ কোনদিন জানতে পারে নি।

শরৎচন্দ্রের সেই সময়কার সাহস ও গান বাজনার কথা উল্লেখ করে বিভূতিভূষণ ভট্ট লিখেছেন—

"আমাদের খঞ্জরপুরের বাড়ীর পাশেই একটা মসজিদ ছিল এবং হয়ত এখনো আছে। আমরা হিন্দুর ঘরের ভীরু ছেলে, কিন্তু এই পরম সাহসিকটির সদ্‌গুণে 'মামদো' ভূতই বল—আর ব্রহ্মদৈত্যই বল—সকল ভয়কেই তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছিলাম। কত গভীর অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি এই কবর স্থানের মধ্যেই কাটিয়া গিয়াছে। শরৎদার বাঁশি চলিতেছে—না হয় হারমোনিয়াম সহ গান চলিতেছে এবং আমরা ২।৪ জন বসিয়া তন্ময় হইয়া শুনিতেছি। কখনো বা গভীর অন্ধকার রাত্রে গুরুজনদের রক্তনয়ন এবং দাদাদের চপেটাঘাত উপেক্ষা করিয়া গঙ্গার চড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি কিম্বা থিয়েটারের রিহার্সাল-কক্ষে বাঁশ মাথায় দিয়া সতরঞ্চিতে পড়িয়া রাত্রি কাটাইয়াছি।"

শরৎচন্দ্রের বাঁশী বাজানো ও গান গাওয়া সম্বন্ধে নিরুপমা দেবীও লিখেছেন—

"সেই উদাসী কবি-স্বভাববিশিষ্ট লেখকটিকে আমাদের বাসার পশ্চিমদিকে যে প্রকাণ্ড মস্‌জেদ ছিল (শুনা যাইত তাহা নাকি শাজাহানের আমলের) তাহার বৃক্ষছায়াময় পথে কখনো কখনো দেখা যাইত। কোন গভীর রাত্রে সেই মস্‌জেদের সুউচ্চ প্রাঙ্গণ চত্বর হইতে গানের শব্দ, কখনো 'যমানিয়া' নদীর (গঙ্গার ছাড়) তীর হইতে বাঁশীর আওয়াজ ভাসিয়া আসিলে মেজদা মেজ-বৌদিকে শুনাইয়া বলিতেন—'এ ন্যাড়াচন্দ্রের কাণ্ড।'…ইহার পরে দাদাদের বৈঠকখানায় তাঁহার কণ্ঠের আরও গান আমরা ভিতর হইতে শুনিয়াছি।"

রাজুর সঙ্গী

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শ্রীকান্তের সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনের কোন কোন ঘটনার—বিশেষ করে প্রথম দিককার ঘটনার কিছু কিছু মিল আছে। তবে সর্বত্রই বাস্তব ঘটনাগুলির উপর অল্পবিস্তর কল্পনার রং চড়ানো হয়েছে।

এই 'শ্রীকান্ত' গ্রন্থের ইন্দ্রনাথ একটি বাস্তব চরিত্র। ইন্দ্রনাথের আসল নাম রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার। ডাক নাম রাজু। রাজুর পিতার নাম রামরতন মজুমদার। রামরতন মজুমদারের বাড়ী ছিল পাবনা জেলায়; তিনি ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন।

রাজুরা ছিল সাত ভাই। ভাইদের মধ্যে রাজু ছিল ৫ম। রাজুর তিন দাদা কৃতবিদ্য হয়েছিলেন। তার বড়দা রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং তিনি সাহিত্য ও সংগীতে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

রাজু বেশীদূর লেখাপড়া করেনি বটে, তবে অন্যদিকে তার অশেষ গুণ ছিল। রাজু যেমন ছিল সাহসী, তেমনি ছিল পরোপকারী। রাজু স্কুলের পড়া ছেড়ে লোকের বিপদে আপদে তাদের সেবা করে বেড়াত।

'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বে আছে, ফুটবল মাঠে ইন্দ্রনাথের (রাজুর) সঙ্গে শ্রীকান্তের (শরৎচন্দ্রের) প্রথম পরিচয় হয়। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন যে, এর আগে থেকেই এঁদের মধ্যে পরিচয় ছিল। এই ফুটবল মাঠের ঘটনার কথা প্রসঙ্গে সুরেনবাবু তাঁর 'শরৎ পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন :—

"শ্রীকান্তের প্রথম পর্বের আরম্ভেই দেখি যে, একটি ফুটবল ম্যাচের পরিসমাপ্তির পর মারামারি; এবং বিপন্ন শ্রীকান্তকে ইন্দ্রনাথ আততায়ীর হাত থেকে উদ্ধার করছে।

এই মারামারির সময় সেখানে বর্তমান লেখকের উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য ঘটেছিল। ভাগলপুর 'টয়েন বি স্পোর্টে'র একটি খেলার শেষে এ ব্যাপারটি ঘটে এবং ইন্দ্রনাথের (রাজু) দল লাঠির জোরে বিপক্ষ পক্ষকে তাড়িয়ে দেয়।

শ্রীকান্তের (শরতের) সঙ্গে ইন্দ্রনাথের (রাজুর) এটি প্রথম দেখা নয়।

কারণ এই ঘটনা ১৮৯৩-৯৪ সালে ঘটে। এই সময়ে শরতের বয়স সতের বৎসর, রাজুর আঠার উনিশ হবে।

এখানে রাজুর বর্ণনাটি একটু কাল্পনিক কি অতিরঞ্জিত নয়।"

রাজুদের বাড়ীর কাছ দিয়েই গিয়েছিল যমুনিয়া নদী। এই যমুনিয়ার তীরে এক জায়গায় একটা বিরাট বটগাছ ছিল। সে জায়গাটি ছিল ভীষণ নির্জন।

ঐ বটগাছের একটা মোটা ডাল নদীর দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। সেই ডালে বাঁশের একটা মাচা করে, ক্যানেস্তারার টিন দিয়ে ঘিরে, রাজু ছোট্ট একটা ঘরের মত করেছিল। রোজ ভোরে উঠেই রাজুর কাজ ছিল, সেই ঘরে গিয়ে ভগবানের ধ্যান করা। সকলেই ঐ ঘরটিকে রাজুর ধ্যানঘর বলে জানত। কিন্তু কারও সাধ্য ছিল না, সেই ঘরে যায়। একমাত্র শরৎচন্দ্রই রাজুর সেই ধ্যানঘরে যেতে পারতেন। নদীর উপরে ঝুঁকে-পড়া ঐ ডাল বেয়ে সেই ধ্যানঘরে যাওয়া, সে ছিল এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

রাজুর নিজের একটি ডিঙ্গি ছিল। সেই ডিঙ্গি নিয়ে রাজু নদীতে নদীতে ঘুরে বেড়াত। রাজুর এই ডিঙ্গি-অভিযানে শরৎচন্দ্র ছিলেন তার সঙ্গী। এ সম্বন্ধে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :—

"কলেজ থেকে বাড়ী ফিরে শরৎচন্দ্র বৈকালটা বাড়ীতে কাটাতেন না। বই-খাতা রেখে কিছু জলখাবার খেয়ে তিনি বেরুতেন। রাজুর সঙ্গে ছোট ডিঙ্গিতে চড়ে বেরুনো।...ডিঙ্গি করে রোজ বেরুনো চাই। কোন কোন দিন ফিরতে রাত হ'ত।"

গভীর রাত্রে জেলেদের ফাঁকি দিয়ে নদীতে মাছ ধরতে যাওয়া, আবার সেই রাত্রেই লুকিয়ে মাছ বিক্রি করে টাকা নিয়ে দুঃস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য করা, রাজুর একটা বড় কাজ ছিল। এ ছাড়া রোগীর সেবা করা ও মৃতদেহের সৎকার করা প্রভৃতি কাজেও রাজুর জোড়া ছিল না। রাজুর এই সমস্ত কাজেই একমাত্র সঙ্গী ও সহায়ক ছিলেন শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র যদিও তখন ছাত্র, তবুও অভিভাবকদের লুকিয়ে তিনি রাজুর এই সমস্ত কাজে সাহায্য করতে যেতেন।

রাজুর একটি পরোপকার-মূলক দুঃসাহসিক কাজে শরৎচন্দ্র একবার কিরূপে তার সহকারী হয়েছিলেন, এখানে তারই একটি কাহিনী বলছি :—

সেদিন সন্ধ্যার পর রাজু বেড়াতে বেরিয়েছে। এমন সময় স্থানীয় এক হাই স্কুলের হেডপণ্ডিত মশায় রাজুকে দেখতে পেয়েই এসে কেঁদে বললেন—বাবা রাজু, আমি এই তোমাকেই খুঁজতে যাচ্ছিলাম।

পণ্ডিত মশায়ের কান্না দেখে রাজু ব্যস্ত হয়ে বললে—কি হয়েছে পণ্ডিত মশায়? আপনি কাঁদছেন কেন?

তখন পণ্ডিত মশায় তাঁর পিঠ দেখিয়ে বললেন—এই দেখ বাবা, পুলিশ সাহেব অকারণে আমাকে কি রকম মেরেছে। জমিদার বাড়ী টিউশনিতে যাচ্ছিলাম। পথে টমটমে চড়ে পুলিশ সাহেব আসছে দেখেই আমি তাড়াতাড়ি পথ ছেড়ে দাঁড়াই। কিন্তু তবুও সাহেব আমার নিকটে এসে মেজাজ গরম করে আমাকে গালাগালি দিয়ে বললে—রাস্তা ছেড়ে দাঁড়াতে পার না—বলেই হঠাৎ তার ঘোড়ার চাবুক দিয়ে সপাং সপাং করে আমার পিঠে মারল। তারপরেই সাহেব ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

রাজু সব শুনে বললে—আচ্ছা, দেখাচ্ছি মজা। সাহেব ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলতে গেছে। ফেরার সময় টের পাবে। আপনি এখন বাড়ী যান। কাল শুনতে পাবেন, সাহেবকে কি করেছি।

এই বলেই রাজু পণ্ডিত মশায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিধা শরৎচন্দ্রের কাছে এল। এসেই শরৎচন্দ্রকে সব ঘটনাটা বললে। তারপর শরৎচন্দ্রকে বললে—তুই শিগগির আয় আমার সঙ্গে।

শরৎচন্দ্র রাজুর সঙ্গী হলেন। প্রথমে দুজনেই গেলেন আদমপুর ঘাটে। সেখানে তখন রাত্রে অনেক বড় বড় নৌকা ঘাটে বাঁধা থাকত।

শরৎচন্দ্রকে ঘাটে দাঁড় করিয়ে রেখে, রাজু অন্ধকারে চুপে চুপে একটা বড় নৌকায় গিয়ে উঠল। তারপর মাঝিদের অলক্ষ্যে মোটা একটা কাছির বাণ্ডিল মাথায় করে নিয়ে এল। কাছির বাণ্ডিল এনে রাজু শরৎচন্দ্রকে বললে—চল্ এবার।

পুলিশ সাহেবের বাংলো থেকে তার বিলিয়ার্ড খেলার ক্লাব ছিল প্রায় মাইল খানেক দূরে। এই পথটা সাহেব গাড়ী হাঁকিয়েই যাতায়াত করত। আর সাহেবের একটা ব্যারাম ছিল, কিছুতেই সে আস্তে ঘোড়া চালাতে পারত না। সব সময়েই জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে যেত।

রাজু ও শরৎচন্দ্র সাহেবের বাংলো আর ক্লাবের মাঝামাঝি একটা জায়গায় অন্ধকারে লুকিয়ে রইলেন। তারপর অনেকটা রাত হ'লে যখন সাহেবের ক্লাব

থেকে ফিরবার সময় হ'ল, সেই সময় দুজনে মিলে কাছিটাকে হাত দুই উঁচু করে রাস্তার দুধারে দুটা গাছের সঙ্গে বেশ টান করে বাঁধলেন।

অনেকটা রাত হওয়ায় রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দড়ি টাঙিয়ে রাজু ও শরৎচন্দ্র নিঃশব্দে দুজনে একটা গাছের আড়ালে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে সাহেবের ঘোড়ার খুরের খটাখট্ শব্দ শুনতে পেলেন। তখন বুঝলেন, সাহেব বিলিয়ার্ড খেলে এবার ক্লাব থেকে ফিরছে।

সাহেব তার অভ্যাস মত খুব জোরেই ঘোড়া ছুটিয়ে আসছিল। যেমনি কাছির কাছে আসা, অমনি ঘোড়া হোঁচট খেলে গাড়ী একেবারে সওয়ার সুদ্ধ উল্টে পড়ল। সাহেব বেদম নেশা করেছিল। আচমকা আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে মুখ থুবড়ে গোঙাতে লাগল।

রাজু তখন হিংস্র বাঘের মত সাহেবের ওপর লাফিয়ে পড়ল। তারপর সাহেবকে আচ্ছা রকম কিল ঘুসি মেরে মেরে তার নেশা ছুটিয়ে দেবার যোগাড় করল। তারপর সাহেবের কোমর থেকে রিভলভারটা খুলে নিয়ে উঠে পড়ল।

এরপর কাছিটা খুলে নিয়ে দুজনে সেখান থেকে সরে পড়লেন। আদমপুর ঘাটে এসে রাজু কাছিটা যথাস্থানে রেখে এল এবং সাহেবের রিভলবারটা নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

পরোপকারমূলক কাজে রাজুর সঙ্গী হিসাবে শরৎচন্দ্রের আরও একটি কাহিনীর এখানে উল্লেখ করছি :—

শরৎচন্দ্রের মামাদের বাড়ীতে তখন প্রতি বৎসর খুব ধুমধামের সহিত জগদ্ধাত্রী পূজা হ'ত এবং এই পূজা উপলক্ষে দু-তিন রাত্রি যাত্রাও হ'ত।

সেবার জগদ্ধাত্রী পূজার ঠিক পরের দিন রাত্রে যাত্রা হচ্ছে। কলকাতা থেকে নামকরা একটা যাত্রার দল এসে গাইছে। পাড়ার ও আশপাশের সব লোক ঝেঁটিয়ে এসেছে যাত্রা শুনতে। শরৎচন্দ্রও আসরের এক কোণে বসে তন্ময় হয়ে যাত্রা শুনছেন। এমন সময় রাজু কোথা থেকে এসে শরৎচন্দ্রের কানে কানে বললে—একবার বাইরে আয়।

শরৎচন্দ্র বাইরে এলে রাজু বললে—ও-পাড়ায় একটা ছেলে এইমাত্র কলেরায় মারা গেল। ছোট ছেলে, বয়স বছর তিনেক। অনেক চেষ্টা করলাম, বাঁচানো গেল না।

বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে। তাই তার বাপ-মা পাগলের মত খুব

কান্নাকাটি করছে। কণেরার মড়া ঐভাবে ওদের কাছে ফেলে রাখা ঠিক হবে না। ভাবছি, এখনি মড়া নিয়ে শ্মশানে যাব। ও-পাড়া একেবারে খালি, সব লোক যাত্রা শুনতে এসেছে। তুই আয়।

শরৎচন্দ্র কোন কথা না বলে রাজুর সঙ্গে গেলেন।

মৃত শিশুটিকে নিয়ে রাজু ও শরৎচন্দ্র যখন শ্মশানে গেলেন, তখন বোধ হয় রাত্রি একটা।

গভীর রাত্রে গঙ্গার তীরে শ্মশানে গিয়ে রাজু ও শরৎচন্দ্র দেখলেন—নির্জন শ্মশানে অন্ধকারের মধ্যে এক গঙ্গাযাত্রী বুড়ো একা পড়ে রয়েছে।

বুড়ো ক'দিন এসেছে, তার সঙ্গে কে কে এসেছে এবং তারা কোথায়?—রাজু বুড়োকে এই সব প্রশ্ন করলে।

বুড়ো বললে—এসেছি বাবা আজ তিন দিন। মরণ আর হচ্ছে না। আমার দু নাতি আর পাড়ার একটি লোক আমাকে নিয়ে এসেছে। তারাও এই ক'দিন এখানেই আছে। কাছে কোথায় নাকি যাত্রা হচ্ছে, তাই তারা আমাকে ফেলে যাত্রা শুনতে গেছে। আমার মরতে দেরী হচ্ছে বলে, তারা আমার উপর খুব রেগে গেছে। বলছে, মরবে ভেবে বুড়োকে নিয়ে এলাম, এখন দেখছি, গঙ্গার হাওয়া খেয়ে বুড়ো দিব্যি সেরে উঠছে। মরবার নামটি নেই। একবার গঙ্গাযাত্রী হয়ে এলে, আর কি ঘরে ফিরে যেতে নেই বাবা?

রাজু শুনে বললে—কে বললে ফিরতে নেই? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি এখন আর মরবে না; এ যাত্রা বেঁচে গেলে। তোমার বাড়ী কোথায়? তুমি আমাদের সঙ্গে বাড়ী চল। না গেলে, ঐ বাড়ী ফিরতে নেই বলে, তোমাকে যারা নিয়ে এসেছে, তারাই তোমার গলা টিপে মেরে ফেলবে।

বুড়ো বললে—ঠিকই বলেছ বাবা! তারা ক'দিন ধরে ঐ কথাই বলছে।

রাজু বললে—তোমার ভয় নেই। আমরা আমাদের কাজটা আগে শেষ করি। তারপর তোমাকে নিয়ে যাব। আজ রাত্রে তুমি আমাদের বাড়ীতে থাকবে। কাল সকালে তোমাকে তোমার বাড়ীতে রেখে আসব।

রাজু মৃত শিশুটিকে মাটি চাপা দিয়ে, গঙ্গায় ডুব দিয়ে এল। এসে রাজু বুড়োকে কাঁধে তুলে নিয়ে শরৎচন্দ্রকে বললে—তুই ওর কাঁথা-বালিশগুলো নে।

রাজু বুড়োকে কাঁধে নিয়ে আর শরৎচন্দ্র বুড়োর ময়লা বিছানাপত্র বগল-দাবা করে নিয়ে, সেই রাত্রে শ্মশান থেকে ফিরলেন।

এই রাজুর সম্বন্ধে হীরালাল দাশগুপ্ত নামে একব্যক্তি তাঁর 'শ্রীকান্তের দেশে' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন :—

"সুরেনবাবু (শরৎচন্দ্রের মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) বললেন—ইন্দ্রনাথ এই ভাগলপুরেরই মজুমদারদের ছেলে। ওর নাম হ'ল রাজু

রাজু কোথায় ?—জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

উনি বললেন—রাজু? সে কোথায় কেউ জানে না। ঐ ডানপিটে—দুরন্ত ছেলে জলে জঙ্গলে গাছের ডালে ডালে দাপাদাপি করে একদিন ডুব দিলে। কোথায় গেল কেউ তার সন্ধান জানে না। হয়ত বেঁচে আছে। হয়ত নেই। বোধ হয় ঘর ছেড়ে সন্ন্যেসী হয়ে পালিয়েছে।

ওঁর কোন উদাসীর ভাব লক্ষ্য করেছেন কখনো ?—প্রশ্ন আমার।

সুরেনবাবু বললেন—না তেমন কিছু নয়। তবে হাঁ, মাঝে মাঝে ও অদৃশ্য হয়ে যেত। অনেক খুঁজে হয়ত পাওয়া যেত গাছের ডালে ঘন পাতার আড়ালে। যেখানে গঙ্গা প্রলয় ডাক ডেকে ছুটে চলেছে—ক্ষয়িত-মূল বড় বড় গাছ খানিকটা জমি আঁকড়ে ধরে কায়ক্লেশে দাঁড়িয়ে আছে—ওখানে গাছের মগডালে চড়ে এই দস্যি ছেলে চুপ করে বসে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। জিজ্ঞেস করলে আনমনা ভাবে জবাব দিত—ওখানে ও আলো দেখতে পায়।...

এই পাহাড়ের মত উঁচু পাড়ের উপর থেকে গাছের শিকড় ধরে ও লাফিয়ে পড়ত নীচে বাঁধা ওর লুকোনো নৌকায়। তারপর সেই মোচার খোলার মত নৌকো নিয়ে কখনো অনুকূল, কখনো প্রতিকূল প্রবাহে সে কি প্রাণান্তকর পরিশ্রম! লাফ, ঝাঁপ, সাঁতার তো লেগেই ছিল, যেন জলের মাছ—আবার ডাঙাতেও দুরন্তপনার শেষ ছিল না। তারপর কি হ'ল, ছেলের দলের এত বাঁধন কাটিয়ে কখন যে এল ওর বৈরাগ্য! কোন্ আকর্ষণে ও ছেড়ে গেল আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, গঙ্গাতীর আর ভাগীরথীর জলপ্রবাহ!"

হীরালালবাবু রাজুর সম্বন্ধে আরো লিখেছেন—

"পাটনাতে একদিন রাজুর প্রসঙ্গ উঠেছিল, শ্রীসুরেন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। উনি তখন সেসনের জজিয়তি থেকে অবসর নিয়েছেন। রাজুর প্রসঙ্গ উঠেছিল ভাওয়াল সন্ন্যেসীর মামলা নিয়ে।

সুরেনবাবুর আদিম বাসস্থান ভাগলপুর। কথায় কথায় বললেন—শ্রীকান্ত পড়েছেন তো? ইন্দ্রনাথ কে জানেন? ও আমাদের রাজু। কি দুর্দান্ত

ছিল এই ছেলে! ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কিন্তু ও খুব ভালবাসত। তাদের নিয়েও ওর দস্যিপনার শেষ ছিল না। একবার আমাদের পরিবারের একটি ছোট মেয়েকে কোলে করে ও কোথায় চলে গেল। খুঁজতে খুঁজতে ওকে যে অবস্থায় পাওয়া গেল, সে এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার। দুটো বড় বড় গাছ। মাঝে অনেকটা ব্যবধান। ঐ দু'গাছে একটি দড়ি বেঁধে ঐ দস্যি ছেলে খুকিকে নিয়ে বসে ছিল দড়ির মাঝখানে। না আছে কোন কাঠ, না কোন অবলম্বন। আমরা ভয়ে অস্থির। লক্ষ্মীসোনা ধন নেমে এস, বলে কাতরে ওকে মিনতি জানাচ্ছি। শেষটায় এল। কিন্তু হঠাৎ পা ফস্‌কে গেলে কি বিপদই না হ'ত!

ওই রাজু কোথায় অদৃশ্য হ'ল। কেউ বলে জলে ডুবে মরেছে। কেউ বলে সন্ন্যেসী হয়েছে। সন্ন্যেসী হয়েছে সেইটেই ঠিক। ওকে একবার আমরা দেখতে পেয়েছি। সেবারে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা। আমার মা, আরও কেউ কেউ ছিলেন আমাদের সাথে। হঠাৎ একটি সাধুকে দেখে মনে হ'ল ও রাজু।

রাজুর কথা আমরা কখনো ভাবি নি। আমরা ওকে ভাল করেই জানতাম। আমাদের সংশয় ছিল না। তবু একটা পরামর্শ সাব্যস্ত করে হঠাৎ একটা ডাক দিলাম ওর নাম ধরে। মুহূর্তে সাধু মাথা উঁচু করে তাকালে। এ যে রাজু না হয়ে যায় না, তাতে আমাদের কোন সন্দেহ রইল না। তারপর ওর মা-কে ভাগলপুরে টেলিগ্রাম দিলাম। যথাসময়ে মা-ও এলেন। কিন্তু ওকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। অনুসন্ধান করতে কেউ কেউ বললে ও কাশী গিয়েছে। সেখানে পৌঁছেও সন্ধান করা গেল। বৃথা সন্ধান। পাখী পালিয়েছে।" (শারদীয়া দৈনিক বসুমতী—১৩৬০)

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় হীরালালবাবুর কাছে রাজুর সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলেন, রাজুর প্রসঙ্গে ঐ কথাই তিনি একাধিকবার আমার কাছেও বলেছিলেন। তিনি আমাকে এ কথাও বলেছিলেন যে, ইন্দ্রনাথের চরিত্র চিত্রিত করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র মোটেই কল্পনার আশ্রয় নেন নি। রাজুর চরিত্রই হুবহু ইন্দ্রনাথের চরিত্র।

শরৎচন্দ্র তাঁর পরবর্তী জীবনে বন্ধুমহলে রাজুর প্রসঙ্গ উঠলে বলতেন—রাজুর কথা আমি কোনদিনই ভুলতে পারব না। সে আমাকে অনেক কিছু দিয়ে গেছে। তার সে দানের ঋণ শোধ হবার নয়।

দুঃসাহসী

রাজুর সঙ্গী হিসাবে শরৎচন্দ্রের যেমন সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি অন্যান্য ঘটনা থেকেও তাঁর কিছু কিছু দুঃসাহসের কথা জানা যায়। শরৎচন্দ্রের এইরূপ একটি দুঃসাহসের কাহিনী এখানে বলছি :—

শরৎচন্দ্র তখন কলেজের পড়া ছেড়ে দিয়েছেন। সেই সময় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ তারিখে তিনি তাঁর দুই মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং এই মাতুলদের বন্ধু যোগেশচন্দ্র মজুমদার ও সতীশচন্দ্র মিত্রকে (ইনি বৈজ্ঞানিক ডাঃ শিশিরকুমার মিত্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা) সঙ্গে নিয়ে ভাগলপুর শহর থেকে ৪।৫ মাইল দূরে গঙ্গাতীরে অবস্থিত 'গুম্ফা' (ভূগর্ভস্থ গুহা) দেখতে গিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের এই সঙ্গীরা সকলেই সেই সময় কয়েকদিন আগে মাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন।

যোগেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর সেই সময় রক্ষিত দিনলিপি অবলম্বনে পরে ঐদিনকার তাঁদের ভ্রমণ কাহিনীটি লিখেছিলেন। যোগেশবাবুর ঐ লেখাটি কোথাও ছাপা হয়েছে কি না জানি না। তবে তাঁর লেখাটি পাণ্ডুলিপি অবস্থায় আমি দেখেছি। যোগেশবাবু তাঁদের সেদিনকার ভ্রমণ কাহিনীটি সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা হচ্ছে এই :—

শরৎচন্দ্র সারাটা পথ নানা ধরণের হাসির গল্প বলতে বলতে গেলেন। এতে তাঁর সঙ্গীরা কেউই পথশ্রম তো অনুভব করলেনই না, এমন কি কখন যে পথ শেষ হয়ে গেল, তাও বুঝতে পারলেন না।

গুহার সামনে এসে সকলে মোমবাতি জ্বেলে নিলেন। শরৎচন্দ্র দলের অগ্রবর্তী হয়ে গুহার মুখ দিয়ে ভিতর নামবার সময় তাঁর সঙ্গীদের বললেন—সকলেই খুব সাবধানে নামবে। খাড়া সিঁড়ি। একটু এদিক ওদিক হলেই একেবারে ১০।১২ ফুট নীচে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়বে।

সকলেই খুব সতর্কতার সহিত সিঁড়ি বেয়ে গুহার অভ্যন্তরে সমতল ভূমিতে গিয়ে নামলেন। শরৎচন্দ্রের সঙ্গীরা নেমে মোমবাতির আলোয় দেখলেন—গুহার মধ্যে কিছুই চিনবার উপায় নেই এবং বেশ হেঁট হয়েই চলতে হয়।

শরৎচন্দ্রের নির্দেশে সকলেই একটি সুড়ঙ্গ ধরে তার ভিতরে চলতে

লাগলেন। সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে তাঁরা একটি চক্রাকার কক্ষে গেলেন। মোম বাতির ক্ষীণ আলোয় দেখলেন, কক্ষটির তিনচার দিক থেকে রথচক্রের পাখীর মত আরও সুড়ঙ্গ এসে মিশেছে। অনেকটা গোলক ধাঁধাঁর মত। কোন্‌টা ধরে গেলে গুহার শেষ প্রান্তে যাওয়া যাবে, তা বোঝা কঠিন।

শরৎচন্দ্র একটি সুড়ঙ্গ ধরে এগিয়ে যেতে লাগলেন এবং সঙ্গীদের তাঁর অনুগমন করতে বললেন। সঙ্গীরা শরৎচন্দ্রকে অনুসরণ করে চলতে সুরু করলেন। তাঁরা যেতে যেতে আরও কয়েকটা চক্রাকার কক্ষ দেখলেন। সুড়ঙ্গের উচ্চতা ক্রমে কমে আসতে লাগল, শেষে এমন হ'ল যে, বুকে হাঁটা ছাড়া আর উপায় রইল না। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম হ'ল। গুহার গা ও তলদেশ বেশ ভিজা ভিজা মনে হতে লাগল। শরৎচন্দ্রের সঙ্গীরা আর যেতে না পেরে এক জায়গায় বসে পড়লেন। এই সময় তাঁরা লক্ষ্য করলেন, শরৎচন্দ্র তাঁদের মধ্যে নেই। একটি সুড়ঙ্গের সুদূর প্রান্ত থেকে শুধু তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তিনি তাঁর সঙ্গীদের ডাকছেন—চলে এস, কোন ভয় নেই।

সঙ্গীদের তখন মনের অবস্থা এমন যে, কোন প্রকারে গুহার এই গোলক ধাঁধাঁ থেকে একবার বেরুতে পারলে বাঁচেন। ভয়ে তাঁরা আর এগোতে পারলেন না। সেইখানেই বসে রইলেন এবং শরৎচন্দ্রকে ফিরে আসবার জন্য ডাকতে লাগলেন।

এঁদের ডাকাডাকির বেশ কিছুক্ষণ পরে, শরৎচন্দ্র গা-ময় কাদা মেখে ফিরে এলেন। শরৎচন্দ্রকে দেখেই তাঁর সঙ্গীরা বুঝলেন, গুহাটি যেখানে গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে, তিনি সেই পর্যন্তই গিয়েছিলেন এবং সেখানে যেতে তাঁকে শুয়ে শুয়েই যেতে হয়েছিল।

এবার ফেরার পথে শরৎচন্দ্র সঙ্গীদের বললেন—খুনী আসামীরা অনেক সময়ই এই গুহার মধ্যে এসে লুকিয়ে থাকে এবং দর্শকরা গুহা দেখতে এলে তাদের তাড়া করে।—এই বলে তিনি কয়েকটা ঘটনাও বললেন। তিনি আরও বললেন—সাপ তো থাকেই, একবার একটা বাঘও এই গুহায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের মুখে এই সব কথা শুনে তাঁর সঙ্গীরা খুবই ভীত হলেন এবং বলতে লাগলেন যে, তাঁরা যদি আগে একথা শুনতেন তো কখনই গুহার ভিতরে আসতেন না।

শরৎচন্দ্র তাঁর সঙ্গীদের গুহার বাইরে নিয়ে এলে, তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

এরপর গুহার ইতিহাস সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র বললেন—এই গুহাগুলো সম্ভবত বৌদ্ধ যুগের তৈরী। ভাগলপুরের উপকণ্ঠে চম্পানগর স্থানটি এক সময় বৌদ্ধ রাজধানী বলে বিখ্যাত ছিল। খুব সম্ভব বৌদ্ধ শ্রমণরা এই গুহাগুলো তাঁদের সাধন-ভজনের স্থলরূপে ব্যবহার করতেন। চক্রাকার কক্ষগুলিতে বোধ হয় তাঁদের আলোচনা সভা বসত। পরবর্তীকালে ডাকাত ও বোম্বেটেরা এই গুহায় লুকিয়ে থাকত এবং অতর্কিতে পণ্যবাহী ও তীর্থযাত্রীদের নৌকাগুলি আক্রমণ করত।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গীরা এবার বাড়ী ফিরবার জন্য বড় রাস্তা ধরবার উপক্রম করলে, শরৎচন্দ্র বললেন—কাছেই আরও কয়েকটা গুহা আছে, সেগুলো দেখে তবে যাব।

সঙ্গীদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র তাঁদের নিয়ে চললেন। গঙ্গার পাড় ধরে খানিকটা এগিয়ে বড় একটা ঝোপের কাছে এসে শরৎচন্দ্র বললেন—এরই মধ্যে একটা গুহা আছে। সেটা বেশী বড় নয়, এখনি ফিরে আসা যাবে। চল যাই।

সঙ্গীরা কেউই আর গুহার মধ্যে যেতে রাজী হলেন না। তাঁরা শরৎ-চন্দ্রকেও ঐ ঘন জঙ্গলের মধ্যে গুহার ভিতরে যেতে নিষেধ করলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র কারও কথা না শুনে, একাই সেই জঙ্গলে ঢুকে গুহার ভিতরে গেলেন।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গীরা জঙ্গলের বাইরে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন চিত্তে তাঁর প্রত্যাগমনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে শরৎচন্দ্র যখন ফিরে এলেন, তখন তাঁর সারা শরীর মাকড়সার জাল আর শুকনো পাতায় আচ্ছন্ন।

এই সময় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে দেখে, শরৎচন্দ্রের সঙ্গীরা সকলেই বাড়ী ফিরবার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। শরৎচন্দ্রের কিন্তু বাড়ী ফিরবার আদৌ মন নেই। তিনি বললেন—আরও একটা জায়গা তোমাদের দেখাব।—এই বলে তিনি একরূপ জোর করেই তাঁদের গঙ্গাগর্ভে একটি চড়ার মধ্যে নিয়ে গেলেন। সেখানে নিয়ে গিয়ে বললেন—খুব সাবধানে এস, কারণ চড়াটি চোরাবালিতে ভর্তি। একবার পা বসে গেলে আর উঠবার উপায় নেই।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গীরা এই কথা শুনে তো খুবই ভীত হলেন।

চড়ার পাশেই একটা খাল। শরৎচন্দ্র এরপর সকলকে নিয়ে সেই চড়া ও খাল পার হয়ে, যে স্থানটিতে গিয়ে হাজির হলেন, সেটি একটি মহাশ্মশান। সেই শ্মশানের চারিদিকে নর-কপাল, অর্ধদগ্ধ হাড় ও কাঠ ছড়ান।

তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। আকাশে নক্ষত্র দেখা দিয়েছে। সঙ্গীরা সেই সুবিশাল শ্মশানক্ষেত্রে এসে অত্যন্ত ভীত হয়ে উঠলেন এবং সেখান থেকে তাঁদের অন্যত্র নিয়ে যাবার জন্য শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করতে লাগলেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—বেশ, আর একটা জায়গা আছে, সেইটা দেখেই এবার বাড়ী ফিরব।

এর পরেও যে আরও কিছু দেখবার থাকতে পারে, তাঁর সঙ্গীরা তো ভেবেই পেলেন না। তাঁরা বাড়ী ফিরবার জন্য অনুনয় করতে লাগলেন। শরৎচন্দ্র কিন্তু কোন কথা না বলে, শ্মশান ছেড়ে সামনের দিকে এগোতে লাগলেন।

গঙ্গার তীর ধরে এবার তিনি যে স্থানটিতে তাঁদের নিয়ে গেলেন, সেটি যমুনিয়া ও গঙ্গার সঙ্গমস্থল। সেই ঘন অন্ধকারে যমুনিয়ার পাড় ধরে আরও খানিকটা তাঁদের নিয়ে গিয়ে যে জায়গায় দাঁড়ালেন, তার সামনেই শঙ্করপুর দিয়ারার (চর) সুবিস্তৃত ও সুউচ্চ বালির পাড়। সেই পাড়টি ইতঃস্তত উৎপন্ন ঝাউবনে আচ্ছন্ন হয়েছিল। নক্ষত্রের আলোকে সে সব অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

শরৎচন্দ্র বললেন—বর্ষাকালে আদমপুর ঘাট থেকে নৌকায় করে এখানে প্রায়ই বেড়াতে আসি। সেই সময় নদীর জলে সমস্ত ভরে গেলে সেই উদ্দাম জলস্রোতে নৌকা ভ্রমণের যে কী আনন্দ, তা বলে বোঝানো যায় না!

ক্রমে অনেকটা রাত হয়ে গেল। এবার শরৎচন্দ্রের সঙ্গীরা বাড়ী ফিরবার জন্য খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তখন শরৎচন্দ্র দূরত্ব সংক্ষেপ করবার জন্য নদীর তীর ধরেই তাঁদের নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হলেন। পথে আসবার সময়ও তিনি মজার মজার গল্প বলে সঙ্গীদের পথশ্রম লাঘব করতে লাগলেন।

শীঘ্রই তাঁরা খঞ্জরপুর ও কয়লাঘাট অতিক্রম করে আদমপুর ঘাটের কাছে এসে পৌছালেন। ঐখান থেকে যোগেশবাবু ও সতীশবাবুর বাড়ী নিকটে হওয়ায় তাঁরা নদীতীর ত্যাগ করে উপরে উঠে বড় রাস্তা ধরলেন। শরৎচন্দ্র এবং তাঁর মাতুলরা নদীর তীর ধরে বাঙ্গালীটোলা ঘাটের দিকে এগোতে লাগলেন। তখন বেশ রাত হয়ে গেছে।

এখানে যোগেশবাবুর বর্ণিত ঐ ভূগর্ভস্থ গুহা আজও রয়েছে। তবে ঐ গোলক ধাঁধার মত গুহায় ঢুকে দর্শকরা বিপদে পড়ত বলে এবং গুহাটি খুনী ও চোর ডাকাতের আড্ডায় পরিণত হয়েছিল বলে, পরে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইট দিয়ে গেঁথে ঐ গুহার প্রবেশ মুখ বন্ধ করে দেয়।

প্রথম সাহিত্য সাধনা

শরৎচন্দ্র উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর পিতার কাছ থেকে সাহিত্যানুরাগ লাভ করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র যখন স্কুলের নীচের ক্লাসে পড়তেন, তখনই তিনি স্কুলের বই ছাড়া তাঁর পিতার দেরাজ থেকে গল্পের বই বা'র করে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তেন। এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছেন—

"এবার আর বোধোদয় নয়, বাবার ভাঙ্গা দেরাজ থেকে খুঁজে বের করলাম 'হরিদাসের গুপ্তকথা' আর বেরলো 'ভবানী পাঠক'। গুরুজনদের দোষ দিতে পারিনে, স্কুলের পাঠ্য ত নয়, ওগুলো বদ্‌ছেলের অপাঠ্য পুস্তক। তাই পড়বার ঠাঁই করে নিতে হলো আমাকে বাড়ীর গোয়াল ঘরে।"

এ ছাড়া শরৎচন্দ্র তাঁর পিতার লেখা অসমাপ্ত উপন্যাস, নাটক এবং গল্প ও কবিতাগুলি প্রায়ই নিয়ে পড়তেন। এই সব অসমাপ্ত লেখাগুলির শেষাংশে কি হতে পারত, এই নিয়ে শরৎচন্দ্র ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বসে নিজের মনে কল্পনার জাল বুনতেন। এমন কি এই ভেবে ভেবে তিনি কোন কোন দিন বিনিদ্র অবস্থাতে রাত্রি কাটিয়ে দিতেন। অসমাপ্ত গল্পের বা উপন্যাসের শেষ ভাগে কি হতে পারত, কল্পনার এই সূত্র ধরেই শরৎচন্দ্র সেই ছেলেবেলাতেই গল্প লিখতে সুরু করেছিলেন। শরৎচন্দ্র নিজে বলেছেন—

"পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকার সূত্রে আর কিছুই পাই নি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল—আমি অল্প বয়সে সারা ভারত ঘুরে এলাম। আর পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভ'রে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম। আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনটাই তিনি শেষ করতে পারেন নি। তাঁর লেখাগুলি আজ আমার কাছে নেই—কবে কেমন করে হারিয়ে গেছে, সে কথা আজ মনে পড়ে না। কিন্তু এখন স্পষ্ট মনে আছে, ছোটবেলায় কতবার তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। এগুলি শেষ করে যান নি বলে কত দুঃখই না

করেছি। অসমাপ্ত অংশগুলি কি হতে পারে ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। এই কারণেই বোধ হয়, সতের বৎসর বয়সের সময় আমি গল্প লিখতে সুরু করি।"

শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে গিয়ে টি, এন, জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে এন্‌ট্রান্স ক্লাসে ভর্তি হওয়ার আগে, যখন দেবানন্দপুরে ছিলেন, তখনই তিনি গল্প লেখা সুরু করেছিলেন। তিনি তাঁর পাঠশালার সহপাঠী কাশীনাথের নামানুসারে তখন 'কাশীনাথ' গল্পটি লেখেন। পরে আবার ভাগলপুরে গিয়ে এই গল্পটিকেই মার্জিত আকারে লিখেছিলেন।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—" 'কাশীনাথ' সম্বন্ধে আমি শুনেছি শরৎচন্দ্রের মুখে—এ গল্পটি খুব ক্ষুদ্র আকারে তিনি লেখেন প্রথম দেবানন্দপুরে থাকবার সময়। তারপর ভাগলপুরে এটি পল্লবিত করে লেখা হয়।"

শরৎচন্দ্রের দেবানন্দপুরের বাল্যবন্ধুদের মতে, শরৎচন্দ্র তাঁর 'কাশীনাথ' গল্পটির ন্যায় 'কাকবাসা' গল্পটিও দেবানন্দপুরে থাকার সময়েই রচনা করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে গিয়ে সাহিত্যচর্চা সুরু করলে, তাঁকে দেখে তাঁর মামারা সুরেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ এঁরাও সাহিত্যচর্চা করতে আরম্ভ করেন।

ভাগলপুরে খঞ্জরপুর পল্লীতে প্রায় ঐ সময়েই বিভূতিভূষণ ভট্ট ও তাঁর ছোট বোন বিধবা নিরুপমা দেবীও কবিতা লিখতেন।

বিভূতিভূষণের মেজদা ইন্দুভূষণ ভট্ট তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে শরৎ-চন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। ইন্দুভূষণের দাবা খেলার খুব ঝোঁক ছিল। শরৎ-চন্দ্রও দাবা খেলতে খুবই ভালবাসতেন। তাই শরৎচন্দ্র সতীর্থ ইন্দুভূষণদের বাড়ীতে প্রায়ই দাবা খেলতে যেতেন। এই সময়েই শরৎচন্দ্রের সহিত বিভূতি ভূষণ ভট্টের পরিচয় হয়েছিল।

কিভাবে শরৎচন্দ্রের সহিত বিভূতিবাবুর পরিচয় হয়েছিল এবং কিভাবে ভাগলপুরের তৎকালীন ঐ সব 'কুঁড়ি সাহিত্যিকদের' সাহিত্য সভা ও সাহিত্য সভার মুখপত্র 'ছায়া'র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে বিভূতিবাবু লিখেছেন—

"শরৎচন্দ্রকে প্রথম যখন দেখি তখন তিনি ভাগলপুরে তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে পড়েন।…আমি তখন স্কুলের ছাত্র।…স্কুলের ছাত্র হইলে কি হয়, কবিতা দেবীর সুড়সুড়ি বা কাতুকুতু…আমি এবং আমার ভগ্নী নিরুপমা

উভয়েই তাহা অনুভব করিয়াছিলাম…। গোপনে গোপনে আমাদের কবিতার খাতা পুরিয়া উঠিয়াছিল।…সেই সব লেখা বিশেষতঃ নিরুপমার খাতাখানা শরৎচন্দ্রের হাতে গিয়া পড়িয়াছিল। দাদাদের মধ্যে কেহ হয়ত তাহা শরৎদার হাতে দিয়াছিলেন।…আমরা ছোটরা তখন ঐ অদ্ভুত মানুষটিকে দূর হইতে সসম্ভ্রমে দাদাদের পড়িবার ঘরে আসা যাওয়া করিতে বা দাবা পাশা খেলিতে দেখিতাম মাত্র।

এ হেন শরৎচন্দ্র…একদিন হঠাৎ আমার ছোট কুঠরীর মধ্যস্থিত অতি ক্ষুদ্র টেবিলটির পার্শ্বে আসিয়া হাজির। আমি ভয়ে ভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলাম…।

তারপর কখন যে আমাদের আলাপ জমিয়া উঠিল এবং কবে যে তাঁহার খোলার ঘরের বই খাতাপত্রে ভরা টেবিলের পাশে বসিবার অধিকার পাইলাম, তাহা আজ স্মরণ হয় না। কেবল এইটুকু মনে আছে যে, তাঁহার সেই প্রথম জীবনের সাহিত্য সাধনার কুটিরের মধ্যে অতি সহজেই আমার স্থান হইয়াছিল।…

তারপর মনে পড়ে…সুরেন, গিরীন, উপেনের কথা। ইহাদের দেখিবার পূর্বেই শরৎচন্দ্রের কৃপায় ইঁহারা আমার আপনজন হইয়া গিয়াছিলেন। উপেন, গিরীনের কবিতার প্রশংসা…সবই শরৎদার মুখে শুনিতাম।…

শরৎদা একদিন হঠাৎ প্রস্তাব করিলেন যে, যখন আমরা এতগুলি কুঁড়ি সাহিত্যিক ফুটি ফুটি করিতেছি, তখন একটা কাজ করা যাক। একটা হাতের লেখা কাগজ বাহির করা যাক। যে মুহূর্তে বলা, সেই মুহূর্তে কার্যারম্ভ।…

এই মাসিকপত্রখানা আমাদের কুঁড়ি-সাহিত্যিকদের সভার মুখপত্র হইল। ইহার প্রথম সম্পাদক যোগেশচন্দ্র এবং মুদ্রাকর গিরীন্দ্রনাথ, লেখক অনেকগুলি এবং লেখিকা মাত্র একটি। তিনি আর কেহ নন, আমারই অন্তঃপুরচারিণী বিধবা ভগ্নী শ্রীমতী নিরুপমা!…

সাহিত্য-সভা—হাঁ সত্য সত্যই একটা সাহিত্য-সভা এই তরুণদের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল। মাসিক পত্রখানির নামকরণ হইয়াছিল 'ছায়া'। এই সাহিত্য-সভার অধিবেশন যে কোথায় কোন্‌দিন হইত, তাহার ঠিকানাই ছিল না।…ইহার মধ্যে চেঁচামেচিও ছিল, তর্কাতর্কিও ছিল—সবই ছিল।"

বিভূতিবাবু আরও লিখেছেন—"মনে পড়ে একদিন আমাদের সেই খেলাঘরের সাহিত্য-সভায় যুবক শরৎচন্দ্রের একটা রচনা লইয়া তর্ক করিতে করিতে প্রায় হাতাহাতির জোগাড় হইয়া উঠিয়াছিল।"

শরৎচন্দ্রদের এই সাহিত্য-সভা ও 'ছায়া' পত্রিকা সম্বন্ধে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

"ছায়া এবং সাহিত্য সভার সৃষ্টি ১৯০১ সালে। ১৯০০ সালে ভাগলপুরে আমি যখন এফ, এ, পড়ি, তখন শরৎচন্দ্র বেশ কায়েমিভাবে বিভূতি ভট্টদের গৃহে নিজেকে জমিয়ে তুলেছেন।...

১৯০১ সালের মার্চ মাসে বিভূতির গৃহেই পরামর্শান্তে স্থির করলেন, হাতে লেখা মাসিক পত্র বা'র করবেন। ১৩০৯ সালের বৈশাখ মাস থেকে, পত্রের নাম হবে 'ছায়া', গল্প কবিতাদি লিখবেন প্রতি মাসে গিরীন্দ্রনাথ, ছায়ায় সম্পাদক হিসাবে নাম থাকবে যোগেশচন্দ্র মজুমদারের। যোগেশচন্দ্র আমাদের সহপাঠী ছিলেন টি, এন, জুবিলি কলেজে।"

সপ্তাহে একদিন করে এই সাহিত্য-সভার অধিবেশন হ'ত। সাধারণতঃ ভাগলপুরের সরকারী স্কুলের বাঁধানো নালির মধ্যে অথবা কোন গাছতলায় সভা বসত। অভিভাবকদের লুকিয়েই এই সভা হ'ত। কেননা সেকালে যুবকদের সাহিত্য-চর্চাকে অভিভাবকরা একটা গুরুতর অপরাধ বলেই গণ্য করতেন। সভায় সভ্যদের স্বরচিত গল্প, কবিতা প্রভৃতি পড়া হ'ত।

সাহিত্য-সভার একমাত্র সভ্যা নিরুপমা দেবী তখন বালবিধবা। আর তিনি ছিলেন রক্ষণশীল পরিবারের কন্যা। তাই তিনি কোন দিনই সাহিত্য-সভার অধিবেশনে প্রকাশ্যভাবে যোগদান করতেন না। তিনি তাঁর দাদা বিভূতিভূষণ ভট্টর হাত দিয়ে তাঁর লেখা সাহিত্য-সভায় পড়বার জন্য পাঠিয়ে দিতেন।

সাহিত্য সভায় যে সব গল্প, কবিতা পড়া হ'ত, সেগুলির মধ্যে যেগুলি ভাল বিবেচিত হ'ত, সেগুলি সাহিত্য-সভার মুখপত্র ছায়ায় প্রকাশ করা হ'ত।

সাহিত্য সভার মুখপত্র এই 'ছায়া' পত্রিকায় একটি সমালোচনা বিভাগও ছিল। এতে সাধারণতঃ 'তরণী' নামক আর একটি হাতে লেখা পত্রিকার লেখার সমালোচনা থাকত। এই তরণী পত্রিকাটি কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চল থেকে বেরুত।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এফ, এ, পরীক্ষা দিয়ে ভাগলপুর থেকে তাঁদের

কলকাতায় ভবানীপুরের বাড়ীতে ফিরে আসেন। ফিরে এসে তিনি তাঁর পাড়ার বন্ধুদের কাছে ভাগলপুরের সাহিত্য সভা ও 'ছায়া' পত্রিকার গল্প করেছিলেন এবং এই বন্ধুদের নিয়ে ঐ 'তরণী' পত্রিকাটি বা'র করেছিলেন। সৌরীনবাবুর এই বন্ধু দলের অন্যতম ছিলেন শরৎচন্দ্রের মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। উপেনবাবু তখন ভবানীপুরে তাঁর দাদা কলকাতা হাইকোর্টের উকিল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে থেকে কলকাতায় পড়তেন।

'তরণী' ও 'ছায়া' পত্রিকা দুটি পরস্পর বিনিময় হ'ত এবং এই উভয় পত্রিকারই লেখকরা পরস্পরের কাগজ পড়ে আবার কাগজ ফেরৎ দিতেন। ছায়ার ন্যায় তরণীতেও একটি সমালোচনা বিভাগ ছিল এবং এই বিভাগে ছায়ার লেখার সমালোচনা থাকত।

শরৎচন্দ্র নিজেও ছায়ায় কিছু কিছু লিখতেন। যেমন, ছায়ায় প্রকাশিত তাঁর একটি প্রবন্ধ 'ক্ষুদ্রের গৌরব'।

এছাড়া এই সময় তিনি পৃথকভাবে কয়েকটি গল্প উপন্যাসও লিখেছিলেন। শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলাকার গল্প উপন্যাসগুলি হ'ল :—

(১) অভিমান (২) বাসা বা কাকবাসা (৩) বাগান—তিন খণ্ডে সমাপ্ত :—১ম খণ্ডে—বোঝা, কাশীনাথ ও অনুপমার প্রেম; ২য় খণ্ডে—কোরেলগ্রাম (পরে পরিবর্তিত আকারে ছবি), শিশু (পরে বড়দিদি), চন্দ্রনাথ; ৩য় খণ্ডে—হরিচরণ, দেবদাস, বাল্যস্মৃতি (৪) পাষাণ (উপন্যাস) (৫) শুভদা (উপন্যাস) (৬) ব্রহ্মদৈত্য (উপন্যাস)।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন— ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে একদিন কলেজের ছুটির পর তিনি সতীর্থ বিভূতিভূষণ ভট্টর সহিত তাঁদের বাড়ীতে যান। বাড়ীতে গেলে বিভূতিবাবু সৌরীনবাবুকে "লাইন টানা বাঁধানো একখানি মোটা খাতা দেন। সে খাতার প্রথম পাতায় ছোট ছোট মুক্তার মত অক্ষরে লেখা ছিল 'বাগান'। এবং সেই বাগান খাতার পৃষ্ঠায় বোঝা, কাশীনাথ, অনুপমার প্রেম, সুকুমারের বাল্যকথা প্রভৃতি শরৎচন্দ্রের লেখা ক'টি গল্প।"

এখানে সৌরীনবাবুর লেখা থেকে দেখা যাচ্ছে, 'সুকুমারের বাল্যকথা' নামে আরও একটি গল্প বাগানে ছিল।

'ব্রহ্মদৈত্য' শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনের লেখা হলেও, এ বইটি তিনি শেষে লিখেছিলেন।

শরৎচন্দ্র এই সময়েই তাঁর 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটিও লিখতে সুরু করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর এই প্রথম জীবনের সাহিত্য সাধনার সময় প্রধানতঃ গল্প এবং উপন্যাস লিখলেও তিনি কয়েকটি কবিতাও লিখেছিলেন। শরৎচন্দ্রের এই কবিতা লেখা সম্বন্ধে নিরুপমা দেবী লিখেছেন—

"শরৎদাদা কবিতা লিখিতে পারিতেন শুনিয়া ছিলাম। কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছোট একটি গাথা ছাড়া আর কিছু কখনো দেখি নাই। সেটির নাম মনে নাই কিন্তু ছাড়া ছাড়া ভাবে কয়েকটি লাইন মাত্র তাহার মনে আছে। প্রথম লাইনটি—'ফুলবনে লেগেছে আগুন'। সুপ্রভা আর ইন্দিরা নামে দুইটি নায়িকার (নায়কের নাম মনে নাই) মনোভাব বিশ্লেষণ, পরে যথারীতি এক জনের (সুপ্রভার) বিষপানে মৃত্যু এবং সেই পরাজয়েই তাহার জয়ের পতাকা উড্ডীন হওয়া ইত্যাদি—ইহাই গাথার বিষয় হইলেও বর্ণনায় অনেকখানি ক্ষমতারই প্রকাশ ছিল।"—ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪৪।

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎ-পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন—"তাঁর (শরৎচন্দ্রের) প্রিয় কুকুর 'কানা' মারা গেলে, শরৎচন্দ্র একটি ইংরাজীতে কবিতা লিখেছিলেন।··

তিনি তখন বাঙ্গলাতেও পদ্য লিখিতেন। অবশ্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে—

'ফুলবনে লেগেছে আগুন' ইত্যাদি।"

শরৎচন্দ্রের এই বাল্য রচনাগুলির মধ্যে 'অভিমান', 'পাষাণ' ও 'ব্রহ্মদৈত্য' তিনটি উপন্যাসের এবং সৌরীনবাবু বর্ণিত 'সুকুমারের বাল্যকথা' গল্পের পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায়। তার 'ফুলবনে লেগেছে আগুন' কবিতাটিও হারিয়ে যায়। সেগুলি আর পাওয়া যায় না।

শরৎচন্দ্র তাঁর এই সাহিত্য সাধনার সময় কয়েকজন ইংরাজ লেখক-লেখিকার বই খুব পড়তেন। এ সম্বন্ধে বিভূতিভূষণ ভট্ট লিখেছেন—

"শরৎচন্দ্র সে সময়ে ইংরাজ ঔপন্যাসিকের উপন্যাস পড়িতেন, তাহা এখনো আমার মনে আছে। মিসেস হেন্‌রি উড্ এবং মারি কোরেলির উপন্যাসের তিনি একজন ভক্ত পাঠক ছিলেন।···

বাল্য জীবনে শরৎদাদা যে সমস্ত ঔপন্যাসিকের লেখা বেশি করিয়া পড়িতেন, তাহার মধ্যে চার্লস ডিকেন্স বোধ হয় তাঁহার কাছে বেশী আদর পাইয়াছিল। অনেকদিন ডিকেন্সের ডেভিড কপারফিল্ড হাতে করিয়া এখানে সেখানে—এবাড়ী ওবাড়ী করিতে দেখিয়াছি। মিসেস্ হেন্‌রি উডের ইস্টলিন খানিও প্রায় তদ্রূপ আদরই পাইয়াছিল।”—ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪৪

শরৎচন্দ্র যখন কলেজে পড়তেন, সেই সময় লোকে হেন্‌রি উড্ ও মারি কোরেলির লেখা খুব আগ্রহ করে পড়ত। শরৎচন্দ্রও তখন এঁদের লেখা বই খুবই পড়তেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর ‘অভিমান’ গ্রন্থটি হেন্‌রি উডের ‘ইস্টলিনে’র ছায়া অবলম্বনে লিখেছিলেন। আর ‘পাষাণ’ লিখেছিলেন, মারি কোরেলির ‘মাইটি অ্যাটম’ উপন্যাসের ছায়া নিয়ে। তবে ছায়া অবলম্বন শুধু নামেই, আসলে এই দুটি উপন্যাসেও শরৎচন্দ্রের মৌলিক প্রতিভার ছাপ যথেষ্টই ছিল।

শরৎচন্দ্র চন্দননগরের হরিহর শেঠের কাছে একবার বলেছিলেন যে, তিনি প্রথম জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের লেখা চুরি করে লিখতেন।

এই কারণেই হয়ত শরৎচন্দ্রের বাল্যকালের কয়েকটি রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব দেখা যায়। যেমন—শরৎচন্দ্রের দেবদাস উপন্যাসে দেবদাস ও পার্বতীর বাল্যপ্রণয় বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর উপন্যাসের শৈবলিনী ও প্রতাপের বাল্যপ্রণয়ের কথা স্মরণ করায়। শরৎচন্দ্রের ক্ষুদ্রের গৌরব প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তরের ছাপ বর্তমান। শরৎচন্দ্রের চন্দ্রনাথ ও চরিত্রহীনে যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের ‘ত্যাগ’ গল্পের ও ‘চোখের বালি’ উপন্যাসের প্রভাব দেখা যায়।

শরৎচন্দ্রের এই বাল্য রচনা ছাড়া তাঁর পরবর্তীকালের কয়েকটি রচনায়ও বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সুস্পষ্টরূপে বর্তমান।

প্রথম জীবনে সাহিত্য সাধনার সময় শরৎচন্দ্র একটি ইংরাজি ছদ্মনামও নিয়েছিলেন। তাঁর সেই নামটি ছিল, St. C. Lara. অর্থাৎ St. = শরৎ, C. = চট্টোপাধ্যায় এবং Lara = ন্যাড়া (তাঁর ডাক নাম)।

শরৎচন্দ্র তাঁর গল্পের খাতায় মলাটের উপরে লেখকের নাম হিসাবে এই নামটি আর্টিস্টিক ছাঁদে ইংরাজি অক্ষরে লিখে রাখতেন।

নিরুদ্দেশ

শরৎচন্দ্র পড়াশুনা ও সাহিত্যচর্চা, গান-বাজনা ও অভিনয় এবং রাজুর সঙ্গে মিশে বেশ দিন কাটাচ্ছিলেন। এই সময়েই হঠাৎ একদিন তিনি কাকেও কিছু না বলে বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ হলেন। এর আগে এমনিভাবেই রাজুও একদিন নিরুদ্দেশ হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র খুব সম্ভব ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে নিরুদ্দেশ হন। কেননা ১৩০৮ সালের শ্রাবণ (ইং ১৯০১ জুলাই) তারিখযুক্ত শরৎচন্দ্রের একটি রচনা 'ক্ষুদ্রের গৌরব' তাঁদের সাহিত্য সভার হাতে লেখা পত্রিকা 'ছায়া'য় স্থান পেয়েছিল। এই দেখে মনে হয়, শরৎচন্দ্র খুব সম্ভব ঐ তারিখের আগে নিরুদ্দেশ হন নি।

শরৎচন্দ্রের এই নিরুদ্দেশ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

"বিভূতি যখন তাঁর ভাগলপুর থেকে নিরুদ্দেশ হবার কথা বলেন, তখন বন্ধুবান্ধবদের কাছে তার কারণ যা শুনেছিলুম—কেউ বলেছিলেন, বাপের উপর অভিমানবশে, কেউ বলতেন, মায়ের পরলোক গমনের পর মাতুলালয়ে বাস করা তাঁর মোটে পোষায় নি।"

মায়ের পরলোক গমনের পর শরৎচন্দ্র আর মাতুলালয়ে বাস করতেন না। তিনি তাঁর পিতার সহিত ভাগলপুরের খঞ্জরপুর পল্লীতে থাকতেন। অতএব সৌরীনবাবু যে শুনেছিলেন, মাতুলালয়ে বাস করা তাঁর মোটেই পোষায় নি, এ কথা তখন আর উঠতেই পারে না।

বাপের উপর অভিমান করে নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা নরেন্দ্র দেবও তাঁর 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে বলেছেন। তিনি লিখেছেন—

"কোন কোন লোকের যেমন রকম রকম ঝোঁক থাকে, শরৎচন্দ্রের পিতা মতিবাবুর তেমনি ঝোঁক ছিল রকমারি প্রস্তর সংগ্রহ করা। তাঁর এই সংগ্রহের মধ্যে কতকগুলি রঙিন ও উজ্জ্বল প্রস্তর ছিল। এগুলিকে মতিবাবু অতি মূল্যবান ও দুর্লভ প্রস্তর জ্ঞানে একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে সর্বদা চাবি

দিয়ে রাখতেন। শরৎচন্দ্র এগুলির সন্ধান জানতেন। দেখতে খুব সুন্দর বটে, কিন্তু সেগুলির যে যথার্থই কোন মূল্য থাকতে পারে, এ ধারণা তাঁর ছিল না। মতিবাবুর অজ্ঞাতসারে তিনি এক সময় সেগুলি বার করে নিয়ে গিয়ে তাঁর এক ধনী বন্ধুকে উপহার দিয়েছিলেন।

মতিবাবু তাঁর বড় সখের পাথরগুলি বিলিয়ে দেওয়ার জন্য শরৎচন্দ্রকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন। যে-পিতার কাছে শরৎচন্দ্র এতদিন শুধু অপরিমিত স্নেহ লাভেই অভ্যস্ত ছিলেন, যে-পিতা বহুবার বহুদোষ হাসিমুখে ক্ষমা করেছেন, কখনও কোন কটুকথা বলেন নি, তাঁর এই রূঢ় তিরস্কারে অভিমানী শরৎচন্দ্র মনের দুঃখে সেইদিনই গৃহত্যাগ করে পুনরায় নিরুদ্দিষ্ট হলেন।"

নরেনবাবু এই 'পুনরায় নিরুদ্দিষ্ট হলেন' বলে বলেছেন যে, শরৎচন্দ্র এর আগে আরও দুবার নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। সে সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—শরৎচন্দ্র বিলাত ফেরৎ উদার-মতাবলম্বী রাজা শিবচন্দ্রের বাড়ীতে যেতেন বলে এবং তাঁর পুত্রের ক্লাবে অভিনয় করতেন বলে ভাগলপুরের রক্ষণশীল দলের নেতারা শরৎচন্দ্রকে সমাজচ্যুত করেছিলেন। সেবার শরৎচন্দ্রের মামার বাড়ীর জগদ্ধাত্রী পূজায় নিমন্ত্রিতদের খাওয়ানোর সময় শরৎচন্দ্র পরিবেশন করতে গেলে নিমন্ত্রিতরা বললেন—শরৎচন্দ্র যদি পরিবেশন করে, তাহলে আমরা কেউ জলস্পর্শ করব না।

'এই ঘটনায় শরৎচন্দ্র মর্মান্তিক আহত হন এবং ভাগলপুর পরিত্যাগ করে দীর্ঘকালের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যান। পাঁচ ছ' মাস পরে এফ, এ, পরীক্ষা দেবার জন্য ফিরে আসেন, কিন্তু মাতুল গোষ্ঠীর বিরোধীতার জন্য পরীক্ষার ফি সংগ্রহ করতে না পেরে, রাগে দুঃখে ও অভিমানে আবার দেশত্যাগী হন। এইভাবে তাঁর ছাত্র জীবনের এইখানেই পরিসমাপ্তি হয়।'

জগদ্ধাত্রী পূজায় নিমন্ত্রিতদের পরিবেশন করতে গেলে নিমন্ত্রিতদের পক্ষ থেকে আপত্তি আসায়, মনের দুঃখে শরৎচন্দ্রের নিরুদ্দেশ হওয়া, খুব একটা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কিন্তু তবুও প্রশ্ন ওঠে, তিনি তো তখন আর তাঁর মামার বাড়ীতে থাকতেন না, তাই সেখানে তাঁর পরিবেশনে কেউ না খেলেই বা, তাতে তাঁর এমন কি ক্ষতি হ'ত!

দ্বিতীয়তঃ, নরেনবাবু যে বলেছেন, পাঁচ ছ' মাস নিরুদ্দেশ থেকে এফ, এ,

পরীক্ষা দেবার জন্য ফিরে এসেছিলেন, এও কি ঠিক? এত দীর্ঘদিন কলেজ কামাই করা কি সম্ভব হয়েছিল?

তৃতীয়তঃ, এফ, এ, পরীক্ষার ফি জমা দিতে না পারার দুঃখে শরৎচন্দ্র হয়তঃ নিরুদ্দেশ হতে পারেন। কিন্তু পরীক্ষার ফি সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁর মাতুল-গোষ্ঠী বিরোধিতা করেছিলেন, এও কি ঠিক?

শুধু বিরোধীদলে মিশেছিলেন বলেই শরৎচন্দ্রের মাতুলগোষ্ঠী কি তাঁর এত বড় সর্বনাশের চেষ্টা করেছিলেন! শরৎচন্দ্র কেন যে এফ, এ, পরীক্ষা দিতে পারেন নি, এ সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি।

যাই হোক্, শরৎচন্দ্র এবার নিরুদ্দেশ হয়ে সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তিনি নাগা সন্ন্যাসীদের দলেও মিশে ঘুরলেন। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে শরৎচন্দ্র এক সময় মজঃফরপুরে এসে উপস্থিত হলেন। মজঃফরপুরে এসে তিনি এক ধর্মশালায় উঠলেন। মজঃফরপুরে এই ধর্মশালায় থাকার সময়েই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের পরিচয় হয়।

প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের বাড়ী বর্ধমান জেলায়। প্রমথবাবু ছেলেবেলায় মজঃফরপুরে তাঁর কাকার কাছে থেকে লেখাপড়া করতেন। মজঃফরপুরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর এই পরিচয় পরে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল।

কিভাবে এঁদের মধ্যে প্রথম পরিচয় হয়েছিল, সে কথা প্রমথবাবু নরেন্দ্র দেবের কাছে একদিন বলেছিলেন। নরেনবাবু এ সম্বন্ধে লিখেছেন—

"তাঁর মজঃফরপুর আগমন সম্বন্ধে ৺প্রমথনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছিলেন—একদিন সন্ধ্যায় তাঁরা ক্লাবে জমায়েত হয়ে খেলা ও গল্পগুজব করছিলেন, এমন সময় একটি তরুণ সন্ন্যাসী সেখানে এসে পরিষ্কার হিন্দী ভাষায় সবিনয়ে লেখবার সরঞ্জাম প্রার্থনা করলেন। ক্লাবের একটি ছেলে দোয়াত কলম এনে দিল। সন্ন্যাসী ঝুলির ভিতর থেকে একখানি পোস্টকার্ড বার করে ঘরের এককোণে বসে নিবিষ্টমনে পত্র লিখতে সুরু করলেন।

ছেলেরা স্বভাবতঃই কৌতূহলী। ওরই মধ্যে একজন উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে নিলে সন্ন্যাসী চমৎকার বাঙ্গলা হরফে পত্র লিখছেন। ক্লাবের মধ্যে একটা কানাঘুষো সুরু হয়ে গেল, সবাই একটু চঞ্চল হয়ে উঠল এই তরুণ সন্ন্যাসীর পরিচয় নেবার জন্য। প্রমথনাথ ছিলেন এসব বিষয়ে অগ্রণী; তিনি পুরোবর্তী হয়ে সন্ন্যাসীঠাকুরের সঙ্গে আলাপ পরিচয় সুরু করলেন একেবারে খাঁটি বাঙ্গলা

ভাষায়। সন্ন্যাসী কিন্তু প্রত্যেক কথার উত্তর হিন্দীতেই দিচ্ছে দেখে প্রমথবাবু অধৈর্য হয়ে বলে উঠলেন—'ছাতুখোরের ভাষা ছাড় না বাবাজী, নিজের জাত-ভাষা ধর না, আমরা অনেকক্ষণ জানতে পেরেছি, তুমি বাঙ্গালী।'

শরৎচন্দ্র এবার হেসে ফেললেন এবং মধুর বাঙলা ভাষায় গল্প সুরু করলেন। প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে এইভাবে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়।"

নরেন্দ্র দেবের বর্ণিত এই কাহিনীটিকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সত্য বলে স্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন—"এই গল্প আমি দুইটি কারণে সত্য বলিয়া মনে করি না। প্রথমতঃ, ইহা যে সময়ের ঘটনা, প্রমথনাথ তখন কলিকাতায় অবস্থান করিতেন—মজঃফরপুরে ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ, তর্কের খাতিরে যদিও বা ধরিয়া লওয়া যায়, তিনি কোন কারণে তখন মজঃফরপুরে ছিলেন, তাহা হইলেও এই ব্যাপারেই শরৎচন্দ্রের সহিত তাঁহার 'প্রথম পরিচয়' এই সিদ্ধান্তে কিছুতেই পৌছানো যাইতে পারে না। এই ঘটনার বহু পূর্ব হইতে ১৩০০ সাল (ইং ১৮৯৩-৯৪) হইতে তিনি যে শরৎচন্দ্রের সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ, শরৎচন্দ্রের একখানি পত্রই তাহার প্রমাণ।" (শরৎ-স্মরণিকা—৫ম বর্ষ, পৃঃ ১০৩)

এই বলে ব্রজেনবাবু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা শরৎচন্দ্রের একটি চিঠি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন—

"তুমি ফণির উপর রাগ কোরো না।...সে কি করে জানবে তুমি আমি কি এবং ২০ বছরের কি ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ।...তোমার আমার কথা তুমি আমি ছাড়া আর কেউ জানে না প্রমথ।" (জ্যৈষ্ঠ ১৩২০)

ব্রজেনবাবুর কথাটিও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। কেননা, প্রথমতঃ,—নরেনবাবু যখন বলেছেন, প্রমথবাবু নিজে তাঁকে বলেছিলেন, তখন এ কথাকে অস্বীকার করার কারণ দেখি না। এটি এমন কিছু একটি ঘটনা নয়, যা বানিয়ে মিথ্যা করে বলে, প্রমথবাবু বা নরেনবাবু কারও কোন লাভ আছে।

দ্বিতীয়তঃ,—ব্রজেনবাবু বলেছেন, যে সময়ের ঘটনা প্রমথবাবু তখন কলকাতায় ছিলেন, মজঃফরপুরে ছিলেন না। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যে, প্রমথবাবু বাল্যকালে মজঃফরপুরেই তাঁর কাকার কাছে থেকে প্রবেশিকা

পরীক্ষায় পাস করেন। এই সময় তিনি কলকাতায় কলেজে পড়লেও মাঝে মাঝে ছুটিতে মজঃফরপুর যাওয়া এবং ঐভাবে একবার গিয়ে সেখানে অবস্থান কালে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হওয়াটা এমন কিছুই আশ্চর্য ব্যাপার নয়। ব্রজেনবাবু অবশ্য এ কথাকে 'তর্কের খাতিরে' বলে স্বীকার করেছেন।

তৃতীয়তঃ,—শরৎচন্দ্র চিঠিতে বিশ বছর আগের বন্ধুত্ব বললেও, তাঁর এই কথাটিকে আক্ষরিক সত্য হিসাবে গ্রহণ করাও ঠিক হবে বলে মনে হয় না। যেমন, তিনি লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে একবার একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—"১৪ বছর ১৪ ঘণ্টা ধরে পড়ি। সেই যে একজামিন দিতে পারি নি, কেবল সেই রাগে।"

শরৎচন্দ্র বর্মায় কেরাণী জীবনে প্রতিদিন ১৪ ঘণ্টা করে পড়তেন, এ কথা কি আক্ষরিক সত্য? কেননা তিনি নিজেই তো রেঙ্গুন থেকে ফণীন্দ্রনাথ পালকে লিখেছিলেন—"সকালে ছাড়া রাত্রে আমি লিখতে পারিনে। রাত্রে আমি শুয়ে শুয়ে পড়ি।"

সকালে লেখা ও দুপুরে অফিস করে, রাত্রে পড়লে ১৪ ঘণ্টা পড়া হয় না। অতএব ১৪ বছর ১৪ ঘণ্টা করে পড়ার কথা যেমন, ২০ বছরের বন্ধুত্বের কথাও তেমনি ধরাই ঠিক।

মজঃফরপুরে শরৎচন্দ্র সন্ন্যাসীর বেশে ধর্মশালায় থাকতেন। রাত্রি হ'লে ধর্মশালার ছাদে বসে আপন মনে গান করতেন। শরৎচন্দ্রের মিষ্টকণ্ঠের গান শুনে পথের লোক মুগ্ধ হয়ে যেত। এইভাবেই একদিন গান শুনে নিশানাথ নামে একটি যুবক মুগ্ধ হয়েছিলেন। পরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয়ও হয়েছিল।

এই নিশানাথ ছিলেন লেখিকা অনুরূপা দেবীর স্বামী শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কীয় এক ভাই। মজঃফরপুরে এই নিশানাথের মাধ্যমেই শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত শরৎচন্দ্রের পরিচয় হয়েছিল। কিভাবে এঁদের মধ্যে পরিচয় হয়েছিল এবং শরৎচন্দ্র কিভাবে শিখরনাথের বাড়ীতে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে অনুরূপা দেবী লিখেছেন—

"মজঃফরপুরে আমার সম্পর্কিত একটি দেবর ছিলেন। গান-বাজনায় তাঁর খুব সখ ছিল। তিনি একদিন আসিয়া বলেন, 'একটি বাঙালী ছেলে অনেক

রাত্রে ধর্মশালার ছাদে বসিয়া গান গায়, বেশ গায়, অবশ্য পরিচয় নিতে যাওয়ায় নিজেকে বেহারী বলেই পরিচয় দিলেন; কিন্তু তা নয়, লোকটা বাঙালীই। একদিন নিয়ে আসব তাকে? গান শুনবে? তার খাওয়া-দাওয়ার বড় কষ্ট হচ্ছে—তোমার এখানে রাখতে পারলে ভাল হয়।'

বাড়ীতে সন্ধ্যাবেলা এক একদিন ভাল কোন গায়ক পাওয়া গেলে গান-বাজনার আসর বসিত। নিশানাথ শরৎবাবুকে লইয়া আসেন। ইহার পর মাস দুই শরৎবাবু আমাদের বাড়ীর অতিথিরূপে এইখানেই ছিলেন। কিজন্য তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু তখন তাঁর অবস্থা একেবারে নিঃস্বের মতই ছিল।...শ্রীযুক্ত শিখরনাথবাবু এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহার সহিত কথাবার্তায় বিশেষ তৃপ্তিবোধ করিতেন।

শরৎবাবুর মধ্যে কতকগুলি বিশেষ গুণ ছিল।—অসহায় রোগীর পরিচর্যা, মৃতের সৎকার এমনি সব কঠিন কার্যের মধ্যে তিনি একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন। এই সব কারণে মজঃফরপুরে শরৎবাবু শীঘ্রই একটা স্থান করিতে পারিয়াছিলেন।"

মজফরপুরে থাকার সময়ে অল্পদিনের মধ্যেই একজন ভাল গায়ক হিসাবে শরৎচন্দ্রের নাম ছড়িয়ে পড়ে। এই সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মজঃফরপুরের জমিদার মহাদেব সাহুর পরিচয় হয়। উভয়ের মধ্যে পরিচয় হ'লে মহাদেব সাহু শরৎচন্দ্রকে তাঁর বাড়ীতে এসে থাকবার জন্য অনুরোধ করেন। তখন শরৎচন্দ্র শিখরনাথের বাড়ী ছেড়ে মহাদেব সাহুর বাড়ীতে থাকেন। মহাদেব সাহু অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় লোক ছিলেন। এই সঙ্গীতের জন্যই তিনি বিশেষভাবে শরৎচন্দ্রকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র মহাদেব সাহুর বাড়ীতে সঙ্গীত ছাড়া কিছু কিছু সাহিত্য সাধনাও করতেন। এখানে থাকাকালে তিনি 'ব্রহ্মদৈত্য' নামে একখানা উপন্যাস রচনা করেছিলেন। এটা তখন ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়। এই সময় শরৎচন্দ্র একদিন হঠাৎ তাঁর পিতার মৃত্যু সংবাদ পেলেন।

পিতার মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্রই শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে চলে গেলেন। ভাগলপুরে যাওয়ার সময় শরৎচন্দ্র তাঁর 'ব্রহ্মদৈত্য' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি মহাদেব সাহুর নিকটে রেখে যান। কিছুদিনের মধ্যে শরৎচন্দ্র মজঃফরপুরে

আর ফিরে না আসায় মহাদেব সাহু এদিকে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের সেই পাণ্ডুলিপিটা হারিয়ে ফেলেছিলেন।

ভাগলপুরের খঞ্জরপুর পল্লীতে যেখানে শরৎচন্দ্ররা থাকতেন, সেখানে তিনি গিয়ে এবার যেন চারিদিকে কেবল অন্ধকার দেখতে লাগলেন। তিনি নিজেও নিঃস্ব। বড় বোন অনিলা দেবীর ইতিপূর্বে বিয়ে হওয়ায় তিনিই যা শ্বশুর বাড়ীতে। বড়দিদি ছাড়া এখন এই বাকি নাবালক তিনটি ভাই-বোনকে নিয়ে কোথায় দাঁড়ান, কি করেন, কিছুই যেন ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। কোন রকমে পিতার শ্রাদ্ধ করলেন।

শরৎচন্দ্ররা খঞ্জরপুরে যে ভাড়া বাড়ীতে থাকতেন, সেই বাড়ীর মালিকের স্ত্রী শরৎচন্দ্রের ছোট বোন সুশীলা দেবীকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি স্বেচ্ছায় এই মা-বাপহারা মেয়েটির সমস্ত ভার নিতে চাইলেন। শরৎচন্দ্র নিরুপায় হয়ে ছোট বোনটির ভার তাঁর উপরেই দিলেন।

শরৎচন্দ্রের মেজভাই প্রভাসচন্দ্রের বয়স তখন বছর পনর, আর ছোটভাই প্রকাশচন্দ্রের বয়স সাত কি আট ছিল। এই সময় আসানসোলে শরৎচন্দ্রের এক আত্মীয় থাকতেন। তিনি সেখানে রেলে কাজ করতেন। শরৎচন্দ্র তাঁকে অনুরোধ করলে তিনি প্রভাসচন্দ্রের ভার নিতে রাজী হলেন এবং তিনি প্রভাসচন্দ্রকে নিজের কাছে রেখে টেলিগ্রাফের কাজ শেখাবেন এ কথাও জানালেন।

ছোটবোন এবং একটি ভাইয়ের কোনরূপ ব্যবস্থা হ'ল। আর একটি ভাইকে নিয়ে তিনি কোথায় যাবেন চিন্তা করতে লাগলেন। এই সময় সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতা জলপাইগুড়িতে চাকরি করতেন। সুরেন্দ্রনাথের পিতাকে বলে শরৎচন্দ্র প্রকাশচন্দ্রকে জলপাইগুড়িতে রেখে এলেন।

ভাইবোনদের একটা ব্যবস্থা করে শরৎচন্দ্র এবার নিজের সম্বন্ধে ভাবতে থাকেন। মন দিয়ে চাকরি এবার তাঁকে করতেই হবে। অন্ততঃ ছোট ভাইবোনগুলোর মুখের দিকে চেয়েও। শরৎচন্দ্র ঠিক করলেন চাকরির জন্য তিনি কলকাতায় যাবেন।

অর্থের সন্ধানে কলকাতায়

শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের তৃতীয় ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করতেন। তিনি তখন ভবানীপুরে ৮৫ নং কাঁসারিপাড়া রোডে থাকতেন।

শরৎচন্দ্র কলকাতায় এসে তাঁর এই সম্পর্কীয় মাতুল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ীতেই উঠলেন এবং এই মাতুলের কাছেই একটা চাকরি পেলেন।

ঐ সময় বিহার বাঙ্গলা দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে ভাগলপুর কোর্টের বিচারের পর সমস্ত 'আপীল কেস' কলকাতা হাইকোর্টে হ'ত। লালমোহন বাবু ভাগলপুর থেকে কলকাতা হাইকোর্টে যে সব আপীল কেস পেতেন, সেই সব কেসের 'পেপার বুকের' হিন্দী থেকে ইংরাজিতে তর্জমা করা ছিল, শরৎচন্দ্রের কাজ। এ জন্য তিনি লালমোহনবাবুর কাছ থেকে মাসে তিরিশ টাকা করে পেতেন।

শরৎচন্দ্র ভবানীপুরে লালমোহনবাবুর বাড়ীতে এলে ঐ পল্লীর তাঁর পূর্ব-পরিচিত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের সহিত আবার সাক্ষাৎ হ'ল। সৌরীনবাবু তখন কলকাতায় থেকে কলেজে বি, এ, পড়েন। সৌরীনবাবুর মারফৎ শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ক্রমে ঐ পাড়ার সৌরীনবাবুর বন্ধুদেরও পরিচয় হ'ল।

সৌরীনবাবু ও তাঁর বন্ধুরা প্রতিদিন সন্ধ্যার দিকে একত্র মিলিত হয়ে ভবানীপুর থেকে গড়ের মাঠের দিকে বেড়াতে যেতেন। শরৎচন্দ্রও সেই সময় এঁদের সঙ্গে বেড়াতে যেতেন।

এ সম্বন্ধে সৌরীনবাবু লিখেছেন :—

"আমাদের অভ্যাস ছিল, সন্ধ্যার পূর্বে মাঠের দিকে বেড়াতে যাওয়া। শরৎচন্দ্রও আমাদের সঙ্গে বেরুতেন। লালমোহনবাবুর বাড়ীর বাহিরের ঘরে ছিল তাঁর আস্তানা—আমাদের এলাকার মধ্যে। আমার আজো মনে আছে, তাঁর সে রিক্ত সর্বহারার মতো বেশভূষা।"

শরৎচন্দ্র সৌরীনবাবুদের সঙ্গে সন্ধ্যার সময় গড়ের মাঠে বেড়াতে গেলে,

সৌরীনবাবুরা মাঠে বসে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাহিত্য, অভিনয় প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। সৌরীনবাবু তাঁদের একদিনের একটি আলোচনার প্রসঙ্গে বলেন—

সেই সময় স্টার থিয়েটারে ক্ষিরোদপ্রসাদের 'সাবিত্রী' নাটকের অভিনয় দেখে এসে, আমি একদিন ঐ নাটক অভিনয়ের প্রশংসা করেছিলাম।

আমার মুখে প্রশংসা শুনে শরৎচন্দ্র একদিন সাবিত্রী অভিনয় দেখতে যান। দেখে এসে তিনি বলেছিলেন—বাপ্‌রে, কি ব'লে তোমার ভাল লাগল। সত্যবান মারা যাবার আগে পর্যন্ত এক রকম মন্দ লাগছিল না। সত্যবান যে সেজেছে, তাকে দেখাচ্ছিল সাবিত্রীর ছোট ভাই যেন। তারপর টেক্কা পড়লো, যখন সত্যবান বেচারা মারা গেল। সাবিত্রী তার মৃতদেহ কোলে তুলে গান ধরলো। এমন অবস্থাতেও মানুষকে গানে পায়! বুঝলাম, শোকের আবেগকে নাট্যকার গানের ছন্দে সুরে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাই বলে দু-দুটো গান!

লালমোহনবাবুর বাড়ীতে শরৎচন্দ্রের সেই সময়কার থাকার কথা-প্রসঙ্গে সৌরীনবাবু লিখেছেন—

"লালমোহনবাবুর বাড়ীতে শরৎচন্দ্র থাকতেন যেন অত্যন্ত সংকোচে, অত্যন্ত কুণ্ঠাভরে। বাহিরের ঐ ঘরটুকুর মধ্যেই নড়াচড়া। যেন অনাত্মীয় আশ্রিতের মত বাস। সদরের ঐ ঘরেই তাঁর বাস—অন্দরে যাওয়ার সময় গলা-খাঁকারি দিয়ে তবে ঢুকতে হতো—মেয়েরা সরে যাবেন। এ কথার উল্লেখ করে মাঝে মাঝে বলতেন, বওয়াটে বলে আমার এমন কুখ্যাতি হে! একদিন বাড়ীর কর্তার ব্রাশ নিয়ে মাথার চুলে চালিয়েছিলেন। এমন সময় বাহিরের ঘরে কর্তার প্রবেশ। শরৎচন্দ্র ব্রাশ রেখে দিলেন ভয়ে ভয়ে। কর্তা তখনি সে-ব্রাশ নিয়ে জানালা গলিয়ে পথে নর্দমায় ফেলে দিয়েছিলেন। এ কাহিনীর উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন—'পরঘরী হয়ে থাকার চেয়ে, পথে থাকাও ঢের আরামের। তাছাড়া বলতেন—কি জঘন্য কাজ করি। তার জন্যে পাই মাসে ত্রিশটি করে টাকা! এতে ভদ্রতা থাকে না। ভালো একটা চাকরি পাই যদি তো সাঁওতাল পরগণার জঙ্গলে কেন, সাহারা মরুভূমিতে পর্যন্ত যেতে পারি।' "

লালমোহনবাবুর বাড়ীতে শরৎচন্দ্রের থাকার প্রসঙ্গে সৌরীনবাবুর যে

লেখাটি এখানে উদ্ধৃত করলাম, সৌরীনবাবু ঠিক এই কথাগুলিই বহুবার আমার কাছেও বলেছেন।

শরৎচন্দ্র যখন লালমোহনবাবুর বাড়ীতে থাকতেন, সেই সময়েই ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের ছুটিতে লালমোহনবাবুর এক ভগ্নীপতি (অন্নপূর্ণা দেবীর স্বামী) অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় লালমোহনবাবুর বাড়ীতে বেড়াতে আসেন। অঘোরবাবু রেঙ্গুনের একজন নামকরা এ্যাডভোকেট ছিলেন। তিনি খুব অমায়িক ও আলাপী মানুষ ছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁর এই সম্পর্কীয় মেসোমশায়ের কাছে বর্মাদেশের অনেক গল্প শুনতেন। সেই সব গল্প শুনে শরৎচন্দ্র মনে মনে ঠিক করলেন যে, তিনিও বর্মায় যাবেন।

অঘোরবাবু কলকাতা থেকে রেঙ্গুন ফিরে যাবার মাসখানেকের মধ্যেই শরৎচন্দ্রও ব্রহ্মদেশ রওনা হয়েছিলেন।

কুন্তলীন পুরস্কার লাভ

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন যাওয়ার দু-একদিন আগে তাঁর মাতুল গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুরোধে সঙ্গে সঙ্গে একটা গল্প লিখে এক প্রতিযোগিতায় পাঠিয়েছিলেন। পরে বিচারে সেই গল্পটি প্রথম স্থান অধিকার করে পুরস্কার লাভ করেছিল। শরৎচন্দ্র কিন্তু তখন রেঙ্গুনে।

প্রতিযোগিতায় শরৎচন্দ্রের সেই গল্প পাঠানোর ইতিহাসটি এই :—

কলকাতায় তখন এইচ্, বসু নামে একজন পারফিউমার বা গন্ধ তৈলাদির ব্যবসায়ী ছিলেন! তাঁর দোকান ছিল বহুবাজারে, বর্তমান বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট ও চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এর সংযোগস্থলের নিকটে।

এই এইচ, বসু 'কুন্তলীন তৈল' নামে একটি কেশ তৈল তৈরি করে বিক্রি করতেন। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি বৎসর ছোট গল্পের এক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে 'কুন্তলীন পুরস্কার' নামে এক পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ঐ গল্প-প্রতিযোগিতার মূল বিষয়টি ছিল এই যে, গল্পের ভিতর দিয়ে কৌশলে কুন্তলীন তেলের প্রচার করতে হবে, অথচ প্রত্যক্ষভাবে সেটা যেন না কুন্তলীন তেলের বিজ্ঞাপন হয়ে দাঁড়ায়।

এই প্রতিযোগিতায় যে সব গল্প আসত, সেগুলির মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হত, সেই গল্পের লেখককে কুন্তলীন পুরস্কার হিসাবে পঁচিশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হ'ত। সাধারণতঃ কোন একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের উপরই ঐ গল্পগুলি পড়ে বিচার করবার ভার থাকত। কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় যে সব গল্প আসত, সেগুলিকে নিয়ে এইচ্ বসু প্রতি বৎসর একটি করে কুন্তলীন পুস্তকও বার করতেন।

শরৎচন্দ্র যখন কলকাতায় তাঁর মাতুল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ীতে বাস করছিলেন, সেই সময় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে (রেঙ্গুন যাওয়ার দু-একদিন আগে) 'মন্দির' নামে একটি গল্প লিখে কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় পাঠিয়েছিলেন। ঐ গল্পটি তিনি নিজের নামে না লিখে, তাঁর মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র কিরূপ অবস্থায়

কবে এই গল্পটি লিখেছিলেন, সে সম্বন্ধে তাঁর ভাগলপুরের বন্ধু 'ছায়া'র সম্পাদক যোগেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন—

"কি পরিবেশের ভিতর এই গল্পটি রচিত হয়, তাহা গিরীন্দ্রনাথের নিকট সেই সময় শুনিয়াছিলাম।

সুরেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ তখন বহুবাজারের একটি বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। শরৎচন্দ্র প্রায়ই তাঁহার মাতুলদের বাসায় আসিতেন। এক ছুটির দ্বিপ্রহরে আহারের পর শরৎচন্দ্র সেই বাসায় আসিলেন। গিরীন্দ্রনাথ বাসায় ছিলেন। দুইজনের ভিতর সাহিত্যালোচনা চলিতে লাগিল। কথাবার্তার মধ্যে স্মরণ হইল যে, কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য গল্প পাঠাইবার সেই দিনটিই শেষ দিন। গিরীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে প্রতিযোগিতায় গল্প লিখিবার জন্য ধরিয়া বসিলেন। গল্প তৈয়ারি হইলে সন্ধ্যার সময় উহা এইচ, বসু মহাশয়কে দিয়া আসিলেই চলিবে। এই অদ্ভুত আবেদনের উত্তরে শরৎচন্দ্র কি বলিয়াছিলেন জানি না। তবে তিনি সম্মত হইয়া বাজার হইতে কাগজ আনাইলেন এবং গল্প-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। গল্পটির নাম 'মন্দির'। উহা শেষ করিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। সন্ধ্যার সময় শরৎচন্দ্র ও গিরীন্দ্রনাথ কুন্তলীন আফিসে গল্পটি লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সব দোকানেই আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এইচ, বসু মহাশয়কে গল্পটি দেওয়া হইলে তিনি মন্তব্য করেন যে, শেষ দিনের শেষ মুহূর্তে গল্পটি তাঁহাকে দেওয়া হইল। এই মন্তব্য শুনিয়া শরৎচন্দ্র, আপত্তি থাকিলে উহা ফেরৎ দিবার কথা বলেন। যাহা হউক, বসু মহাশয় গল্পটি গ্রহণ করেন। এই গল্পটি শরৎচন্দ্র নিজ নামে প্রকাশ করিতে দেন নাই। তাঁহার মাতুল সুরেন্দ্রনাথের নামে উহা প্রকাশ করিতে দেওয়া হয়। এই ঘটনার পরেই তিনি বর্মায় চলিয়া যান।"

এ সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎ-পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন—

"রেঙ্গুন যাওয়ার আগের দিন তিনি আমাদের বাসায় যান।...পরে আমাকে সঙ্গে নিয়ে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরদের বাড়ী যাচ্ছি বলে পথে গিয়ে বলেন যে, 'কুন্তলীন পুরস্কারের' জন্য আমার নামে একটি গল্প দিয়ে গেছেন 'মন্দির' নাম দিয়ে। গল্পের প্লট বলেন এবং বলেন, প্রাইজ পেলে মোহিত সেন প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কাব্য গ্রন্থাবলী যেন তাঁকে দেওয়া হয়। এ সমস্ত কথা আমি সৌরীন মুখোপাধ্যায়কে বলি।"

সৌরীনবাবু ও সুরেনবাবু উভয়েই তখন জেনারেল এসেম্বলিজ্ ইন্‌ষ্টি-টিউশনে (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) বি, এ, পড়তেন।

সুরেনবাবু এখানে শরৎচন্দ্রের পাথুরেঘাটার ঠাকুরদের বাড়ী যাওয়ার যে কথা বলেছেন, সে সম্বন্ধে আমার মনে হয়, শরৎচন্দ্র তখন তাঁর মজঃফরপুরের বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কেননা, প্রমথবাবু তখন পাথুরেঘাটার রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ করছিলেন।

শরৎচন্দ্র এইভাবে নিজের গল্পটি মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে পাঠিয়ে প্রতিযোগিতার ফলাফল বেরুবার পূর্বেই কলকাতা ছেড়ে রেঙ্গুনে চলে যান।

ঐ বৎসর কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন, তৎকালীন বসুমতী-সম্পাদক সাহিত্যিক জলধর সেন। প্রায় দেড়শ গল্পের মধ্যে শরৎচন্দ্রের 'মন্দির' গল্পটিকেই জলধরবাবু শ্রেষ্ঠ গল্প বলে স্থির করেছিলেন। এই মন্দির গল্পের প্রসঙ্গে জলধরবাবু পরে একবার লিখেছিলেন—প্রায় দেড় শত গল্প এসেছিল, তার মধ্যে মন্দির গল্পটি আমার সব চাইতে ভাল লেগেছিল। মনে আছে, এই গল্পটির উপর ছোট একটু মন্তব্য লিখেছিলাম—'এই লেখক যদি চর্চা রাখেন, তাহলে ভবিষ্যতে যশস্বী হবেন।' "

'মন্দির' গল্প প্রথম স্থান অধিকার করায়, মন্দিরের লেখক হিসাবে সুরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামেই এইচ্ বসু মশায় পুরস্কারের পঁচিশ টাকা পাঠিয়ে দেন। সুরেনবাবু পরে সেই টাকায় শরৎচন্দ্রের ইচ্ছানুযায়ী রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী কিনে শরৎচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

১৩১০ সালের ভাদ্র মাসে 'কুন্তলীন পুরস্কার ১৩০৯ সন' নামে যে পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাতে এই মন্দির গল্পটি ছাপা হয়েছিল। গল্পটি সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে ছাপা হলেও, এইটিই কিন্তু শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত রচনা।

ব্রহ্মদেশ যাত্রা

শরৎচন্দ্র আত্মীয়-স্বজনদের না জানিয়ে, একরূপ গোপনেই ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ব্রহ্মদেশ যাত্রা করেন।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন যে, তিনিই এক রাত্রে শরৎচন্দ্রকে রেঙ্গুনের জাহাজে তুলে দিয়ে এসেছিলেন এবং ঐ সময় তিনি ছাড়া আর কেউই শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুন যাওয়ার কথা জানতেন না।

উপেনবাবু আরও লিখেছেন শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে যাওয়ার আগে তাঁর কাছে চল্লিশ টাকা ধার চাইলে, তিনি শরৎচন্দ্রকে চল্লিশ টাকা ধার দিয়েছিলেন।

এ সম্বন্ধে কিন্তু শরৎচন্দ্রের অন্য মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর শরৎ-পরিচয় গ্রন্থে লিখেছেন—"তিনি রেঙ্গুনে গিয়ে অনেকদিন পরে যে চিঠি দেন তাতে লেখেন যে, তোমরা পালানোয় বাধা দেওয়ার ভয়ে তোমাদের বলিনি। শুধু দেবীনকে সঙ্গে নিয়ে রাত ৪টের সময় ভবানীপুরের বাড়ী থেকে স্টীমার ঘাটে যাই। কেবল দেবীন জানতেন আমি রেঙ্গুনে গেলাম।"

সুরেনবাবু আরও লিখেছেন—"উপেন্দ্রনাথ নাকি শরৎচন্দ্রকে রেঙ্গুন যাবার সময় চল্লিশ টাকা ধার দেন, শরৎচন্দ্র এ কথা পত্রে কোনদিন স্বীকার করেন নি। তিনি বলেন, রেঙ্গুন যাবার সময় মাত্র দেবেন্দ্রনাথ সঙ্গে গিয়ে জাহাজে উঠিয়ে দেন। যেহেতু তিনি বোকা টাইপের লোক ছিলন, তাঁকে প্রশ্ন করে উত্তর পাওয়া যেত না। উপেন্দ্রনাথের কথা বিশ্বাস করতে পারিনে, কেন না—তাঁর পক্ষে এ কথা প্রকাশ করার বাধা সেদিন আমাদের কাছে ছিল না।"

দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের চতুর্থ ভ্রাতা অমরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র।

তখনকার দিনে বিলাতের মেল নিয়ে যে জাহাজ কলকাতা থেকে ছাড়ত, সেই জাহাজ তিনদিনে রেঙ্গুন গিয়ে পৌঁছাত। আর কেবল মাত্র ভারতের মেল নিয়ে যে জাহাজ কলকাতা থেকে ছাড়ত, সেই জাহাজের রেঙ্গুন যেতে লাগত চারদিন।

শরৎচন্দ্র এইরূপ একটি কেবলমাত্র ভারতের মেল নেওয়া জাহাজে চড়ে

ব্রহ্মদেশ যাত্রা করেন এবং চারদিনের দিন ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুন সহরের উপকণ্ঠে গিয়ে পৌছান।

শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে যান, তখন রেঙ্গুনে প্লেগ দেখা দিয়েছিল। ঐ প্লেগের বীজ নাকি বোম্বাই শহর থেকে রেঙ্গুনে যায়। রেঙ্গুনের তখনকার ডাক্তার ও সাহেবদের ধারণা হয়েছিল, কুলীদের মধ্যেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। এবং তারাই এই রোগ এক দেশ থেকে অন্য দেশে নিয়ে যায়। আর জাহাজের যারা ডেকের যাত্রী সাহেবদের মতে তারাই ছিল কুলীশ্রেণীভুক্ত।

শরৎচন্দ্র যে জাহাজে ছিলেন, সেই জাহাজ রেঙ্গুন শহরের কাছাকাছি গেলে, জাহাজের অফিসারদের আদেশে খালাসীরা ডেকের যাত্রীদের শুনিয়ে চীৎকার করে বলতে লাগল—রঙ্গম শহর, রঙ্গম শহর, সব বিছানা গুটিয়ে উঠে পড়। করন্‌টিনে যেতে হবে, করন্‌টিন না করে কেউ শহরে ঢুকতে পাবে না।

করন্‌টিন শব্দটা এসেছে ইংরাজি 'ক্যোয়রাণ্টিন' শব্দ থেকে। কোন বন্দরে সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে, সেই বন্দর থেকে জাহাজ অন্য বন্দরে গেলে, বন্দরে ভিড়বার আগে জাহাজকে বন্দর থেকে কিছু দূরে একটা জায়গায় কয়েক দিনের জন্য আটক থাকতে হয়। সতর্কতামূলক ঐ আটক থাকার সময়টাকেই বলে 'ক্যোয়রাণ্টিন'।

বঙ্গোপসাগর থেকে যে নদী দিয়ে জাহাজ রেঙ্গুন শহরে গিয়ে পৌছায়, সেই নদীর নাম ইরাবতী। সমুদ্রবক্ষ থেকে ইরাবতী ধরে ২৮ মাইল গেলে দেখা যায়, তিন দিক থেকে এ নদীর উৎপত্তি। নদীর এই চতুষ্কোণ জায়গার একদিকে রেঙ্গুন শহর, অন্যদিকে চৌটাঙ্‌, আবার এক পারে সিরিয়াম ও টঞ্জিন, অন্যপারে ডালা।

জাহাজের ডেকের যাত্রীদের অর্থাৎ করন্‌টিন যাত্রীদের ঐ ডালার সীমান্তে একটা জঙ্গলঘেরা জায়গায় নামিয়ে রাখা হ'ল। এই করন্‌টিন যাত্রীদের সেখানে সাতদিন থাকতে হ'ল। শরৎচন্দ্র ডেকের যাত্রী ছিলেন, তাই তিনিও করন্‌টিন যাত্রী হিসাবে ঐখানে সাতদিন আটকে রইলেন। সাতদিন করন্‌টিনে থেকে একরূপ শূন্যহস্ত হয়ে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন শহরে গেলেন।

শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে যান, তখন রেঙ্গুনে কোন বাঙ্গালীর হোটেল ছিল

না। তিনি 'দাঠাকুরের হোটেল' নামে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণের হোটেলে উঠে, সেইখানে থেকেই তাঁর মেসোমশায় অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের খোঁজ করেন।

অঘোরবাবু রেঙ্গুন শহরের একজন বিখ্যাত অ্যাড্‌ভোকেট ছিলেন, তাই তাঁর বাড়ী খুঁজে বার করতে শরৎচন্দ্রের বেশী দেরি হ'ল না। শরৎচন্দ্র এই ভাবে অঘোরবাবুর বাড়ী খুঁজে নিয়ে সেইখানে গিয়েই উঠলেন।

শরৎচন্দ্র যে অবস্থায় প্রথম অঘোরবাবুর বাড়ীতে গিয়ে ওঠেন, তাঁর সেই অবস্থার বর্ণনা করে অঘোরবাবুর এক পুত্র (ইনি ব্রহ্মদেশের ইন্‌সিন্ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন) পরে লিখেছেন—

"আমার বয়স তখন বারো কি তের বছর। আমার খুব মনে আছে, তখন আমরা ছিলুম লুইস স্ট্রীটে আমাদের নিজ বাড়ীতে। আমি বাইরের ঘরে বসিয়া পড়িতেছি, সকাল বেলা আটটা কি নয়টা বাজিয়াছে, এমন সময় বছর পঁচিশ বয়স্ক এক ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করিয়াই বাবাকে দেখিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বাবা আমার অনতিদূরেই বসিয়াছিলেন। সামনে আরো দু একজন লোক ছিল। কে কে ছিল আমার স্মরণ নাই। আমি বই হইতে মুখ তুলিয়া দেখিতে না দেখিতেই দেখি বাবাকে প্রণাম করিতেছেন, বাবাও আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কিরে শরৎ, তুই কোথা থেকে এলি ?

তিনি চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন—আমাকে করন্‌টিনে আটকে রেখেছিল।

বাবা আরো অবাক্ হইয়া বলিলেন—তুই আমার নাম করতে পারলি না ? আমার নাম করে কত লোক পার হয়ে যায়, আর তুই পড়ে রয়েছিস করন্‌টিনে ?

উস্কো চুল, ময়লা কাপড়, গায়ে একটা ছেঁড়া সার্ট, একজোড়া ঠন্‌ঠনের চটিজুতো পায়ে, গামছা কাঁধে, এই হলো বেশভূষা।

আবার ভদ্রলোকটি বলিলেন—সাতদিন হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হয়েছে।

বাবা আবার বলিলেন—তোর বোকামি, আমার নাম করলেই কোন কষ্ট পেতে হতো না—এমন কি আমার নাম করে রাস্তার কাকেও বললে, তোকে এনে ঘরে পৌঁছিয়েই দিয়ে যেত।"

অঘোরবাবু শরৎচন্দ্রকে সাদরেই গ্রহণ করে বাড়ীতে আশ্রয় দিলেন।

অঘোরবাবুর স্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবীও তাঁর জ্যাঠতুতো ভগ্নীর পুত্রকে আদর যত্ন করতে লাগলেন।

অঘোরবাবু শরৎচন্দ্রকে আইন পড়বার জন্য উপদেশ দিলেন। বর্মা দেশে আইন পড়তে হলে বর্মী ভাষাও পড়তে হয়, না হলে আইন পাস করা যায় না। শরৎচন্দ্র অঘোরবাবুর উপদেশ মত আইন পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্মী ভাষাও শিখতে লাগলেন। শরৎচন্দ্রকে বর্মীভাষা শেখাবার জন্য অঘোরবাবু একজন গৃহ-শিক্ষকও রেখেছিলেন। অঘোরবাবুর ইচ্ছা ছিল, তিনি নিজে যখন একজন নামকরা আইন-ব্যবসায়ী, তখন শরৎচন্দ্র আইন পাস করলে, তাঁকে আইন-ব্যবসায়ে দাঁড় করিয়ে দিতে পারবেন।

ঐ সময় ব্রহ্মদেশে উকিল হওয়ার বিশেষ সুযোগ ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স বা প্রবেশিকা পাস যে কেউ বর্মীভাষা শিখে অ্যাড্‌ভোকেটসিপ পরীক্ষা দিতে পারত। এই সুবিধার জন্য তখন অনেক এন্ট্রান্স পাস বাঙ্গালী ব্রহ্মদেশে উকিল হয়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন।

ব্রহ্মদেশে চাকরি

শরৎচন্দ্র তাঁর মেসোমশায় অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে থেকে বর্মী ভাষা শিখতে ও আইন পড়তে সুরু করলেন। এই সময় তাঁর মেসোমশায়, অডিটর বর্মা রেলওয়ে অফিসের একাউণ্টেণ্ট্ কৃষ্ণকুমার বসুকে ধরে তাঁর অধীনে শরৎচন্দ্রের একটা চাকরিও করে দিলেন। এই চাকরি পেয়ে এতদিন পরে শরৎচন্দ্র একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

চাকরি পেয়ে বেশ সুখেই শরৎচন্দ্রের দিন কেটে যেতে লাগল। কিন্তু এ সুখ তাঁর বেশীদিন স্থায়ী হ'ল না। কেননা, ঐ সময় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে নিউমোনিয়ায় ভুগে শরৎচন্দ্রের মেসোমশায় অঘোরবাবুর হঠাৎ মৃত্যু হয়। অঘোরবাবুর মৃত্যুর সময় শরৎচন্দ্রের মাসীমা অন্নপূর্ণা দেবী রেঙ্গুনে ছিলেন না। তিনি তাঁর কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করবার জন্য তখন কলকাতায় এসেছিলেন। অন্নপূর্ণা দেবী তাঁর স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পেয়েই রেঙ্গুনে চলে যান; কিন্তু রেঙ্গুনে থাকা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব না হওয়ায়, অল্পদিন পরেই তিনি কলকাতায় চলে আসেন।

রেঙ্গুনে মাসীমার বাসা উঠে গেলে, শরৎচন্দ্র এবার তাঁর বিশেষ পরিচিত রেঙ্গুন গভর্ণমেণ্ট হাউসের ওভারসীয়ার অন্নদাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন।

শরৎচন্দ্র বর্মা রেলওয়ের অডিট্ অফিসে দেড় বছর চাকরি করেছিলেন। শরৎচন্দ্র ঐ সময় আইন ব্যবসায়ী হবার জন্য একবার পরীক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বর্মী ভাষায় পাস করতে না পারায়, এ আশা পরিত্যাগ করেন।

বর্মা রেলওয়ের চাকরি ছেড়ে দিয়ে শরৎচন্দ্র নাজ্‌লেবিনে গিয়ে পি, কে, মিত্র নামক এক ধান্য ব্যবসায়ীর সহকারী হিসাবে কাজ করতে থাকেন। নাজ্‌লেবিনে থাকার সময় তিনি একবার খুব অসুখে পড়েছিলেন। ধানের ব্যবসায়ে মন না লাগায় শরৎচন্দ্র কিছুদিন পরে এ কাজও ছেড়ে দিলেন। এই সময় পেগুর অ্যাড্‌ভোকেট এন্, কে, মিত্রের (নৃপেন্দ্রকুমার মিত্র) সঙ্গে শরৎ-চন্দ্রের পরিচয় থাকায় শরৎচন্দ্র নাজ লেবিন থেকে পেগুতে চলে আসেন।

শরৎচন্দ্র অত্যন্ত হাস্য-পরিহাসপ্রিয় মজলিসী মানুষ ছিলেন এবং ভাল গান-বাজনাও জানতেন। শরৎচন্দ্রের এইসব গুণের জন্য এন, কে, মিত্রের বাড়ীতে সকলেই তাঁকে খুব ভালবাসত এবং এই গানের জন্যই এন, কে, মিত্রের খুড়তুতো ভাই এম, কে, মিত্রের (মণীন্দ্রকুমার মিত্র) সঙ্গে শরৎচন্দ্রের একদিন পরিচয় হ'ল।

এম, কে, মিত্র বর্মার একজামিনার পাবলিক ওয়ার্কস্ একাউন্টস্ অফিসের ডেপুটি একজামিনার ছিলেন। এন, কে, মিত্র এই সময় একদিন শরৎচন্দ্রের জন্য একটি চাকরি করে দেবার কথা এম, কে, মিত্রকে বলেন। তার ফলে এম, কে, মিত্র ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বর্মার একজামিনার পাবলিক ওয়ার্কস্ একাউন্টস্ অফিসে শরৎচন্দ্রকে মাসিক তিরিশ টাকা বেতনে একটি অস্থায়ী কেরাণীর চাকরি করে দেন। শরৎচন্দ্র এই চাকরি পেয়ে রেঙ্গুনে চলে আসেন এবং রেঙ্গুনে এসে টম্‌সন স্ট্রীটের একটি বাড়ীতে এম, কে, মিত্রের সহিতই বাস করতে থাকেন। চাকরি পেয়ে শরৎচন্দ্র 'ফোর্থ গ্রেড পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট একাউন্টসিপ' পরীক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি পাস করতে পারেন নি।

এক মাস পরে আগস্ট মাসে শরৎচন্দ্র তাঁর অফিসের একজামিনারের সাহায্যে পেগুতে পেগু-ডিভিসানের এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে একটি অস্থায়ী চাকরি জোগাড় করতে সক্ষম হন। শরৎচন্দ্র এই চাকরিটি পেয়ে একজামিনার অফিসের চাকরি ছেড়ে পেগুতে চলে যান। কিন্তু এই চাকরিও তিনি আড়াই মাসের বেশী করতে পারেন নি।

এরপর ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত শরৎচন্দ্র একেবারে বেকার ছিলেন। এই ক'মাস তাঁর কোন চাকরি-বাকরি ছিল না। পরে এপ্রিল মাসে এম, কে, মিত্রের চেষ্টায় তিনি আবার একজামিনার পাবলিক ওয়ার্কস্ একাউন্টস্ অফিসে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে অস্থায়ী কেরাণীর চাকরি পান। শরৎ-চন্দ্র এবার মন দিয়ে কাজকর্ম করতে লাগলেন। শরৎচন্দ্রের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে কর্তৃপক্ষ জুলাই মাসে তাঁর আরও পনের টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলেন এবং এক বছর পরে শরৎচন্দ্রের মাইনে দাঁড়াল আশি টাকা। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে শরৎচন্দ্রের মাইনে স্থির হয়ে যায়, নব্বই টাকা। শরৎচন্দ্র ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর চাকরি ছাড়ার সময় পর্যন্ত ঐ মাইনেই পেতেন।

শরৎচন্দ্র বরাবরই অস্থায়ী কেরাণী হিসাবে চাকরি করেছিলেন। ১৯১০

খ্রীষ্টাব্দে তিনি চাকরিতে স্থায়ী হবার জন্য একবার দরখাস্ত করেছিলেন। কিন্তু ঐ সময় তাঁর বয়স তিরিশ পার হয়ে যাওয়ায়, তাঁকে চাকরিতে স্থায়ী করা সম্ভব হয় নি। অবশ্য শরৎচন্দ্রও চাকরিতে স্থায়ী হবার জন্য আর তেমন কোন চেষ্টাও করেন নি।

১৯১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে বর্মার একজামিনার পাবলিক ওয়ার্কস্ একাউন্টসের অফিস বর্মার একাউন্টেণ্ট জেনারেল অফিসের সঙ্গে একত্র মিলিত হয়। তার ফলে শরৎচন্দ্র ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে বর্মার একাউন্টেণ্ট জেনারেল অফিসেই কাজ করতে থাকেন।

শরৎচন্দ্র ২২-৩-১২ তারিখে তাঁর ঐ সময়কার চাকরির কথা-প্রসঙ্গে বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখেছিলেন—

"চাকরি করি, নব্বই টাকা মাহিনা পাই এবং দশ টাকা এলাউয়েন্স পাই। একটা ছোট দোকানও আছে। দিন গত পাপক্ষয় কোনমতে কুলাইয়া যায়, এই মাত্র। সম্বল কিছুই নাই।"

শরৎচন্দ্র যে লিখেছিলেন—'একটা ছোট দোকানও আছে।' তাঁর এই দোকানটার সম্বন্ধে তাঁর রেঙ্গুনের বন্ধু সতীশচন্দ্র দাস তাঁর 'শরৎ প্রতিভা' গ্রন্থে লিখেছেন—

"একবার তিনি একটা চায়ের দোকান করিয়া অফিসে আসিয়া খবর দিলেন, আমি একটা চায়ের দোকান খুলেছি। দেখ্‌বে তো চল! প্রথমতঃ বন্ধুদের মধ্যে কেহই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু অফিস ছুটির পর, জোর করিয়া দু-চারজন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার চায়ের দোকান দেখাইতে লইয়া গেলেন। তাঁহার বাড়ীর অনতিদূরেই একটা কাঠের বাড়ীতে, বন্ধুরা সকলেই দেখিতে পাইলেন নূতন একটা চায়ের দোকান খোলা হইয়াছে। বন্ধুদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহলে তো শরৎবাবুর চাকরি ছেড়ে দিতে হবে? চায়ের দোকানে নিজে না বসলে দুদিনেই সাবাড় হয়ে যাবে।

—না হে না, বসতে হবে না। জান, আমি কি বন্দোবস্ত করেছি? এক টিন দুধে কত চিনি মেশাতে হবে, তাতে কত পেয়ালা চা হবে, আমি সব ঠিক করে নিয়েছি। সকালবেলা দুধের টিন কিনে দোব, সারাদিন কত টিন দুধ খরচ হবে, সন্ধ্যাবেলা হিসেব করলেই পয়সা ধরা পড়বে।

রেঙ্গুনে তখন গরুর দুধে চা হইত না। পয়সা খরচ করিয়াও খাঁটি দুধ পাওয়া যাইত না।”

রেঙ্গুনে চায়ের দোকান একটি লাভজনক ব্যবসা ছিল। এই ব্যবসার কথা-প্রসঙ্গে সতীশবাবু বলেছেন—“এখানে একটা চায়ের দোকান দু-তিন হাজার টাকা দামে বিক্রি হয়। এর দ্বারা স্পষ্ট অনুমান করিতে পারেন, এদেশে চায়ের প্রচলন কিরূপ। সকাল পাঁচটা হইতে রাত বারটা পর্যন্ত এক একটা দোকানে বিক্রি দু-তিন শ’ টাকার উর্ধ্বে ছাড়া নীচে নয়।”

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এই সতীশবাবুর পরিচয় ও বন্ধুত্বের প্রসঙ্গে সতীশবাবু লিখেছেন—“শরৎদা রেঙ্গুনে প্রবাসকালে আমার সঙ্গে অন্ততঃ ছয় সাত বছরের বন্ধুত্বভাব ছিল। এমন কি কিছুদিন এক বাড়ীতেও বাস করিয়াছি।”

একজামিনার পাবলিক ওয়ার্কস্ একাউণ্টস্ অফিসে দ্বিতীয়বার চাকরি পেয়ে শরৎচন্দ্র প্রথমদিকে মেসে থাকতেন। তারপর বোটাটং ল্যান্সডাউন স্ট্রীটে একটা দুতলা কাঠের বাড়ীর দুতলাটা ভাড়া নিয়ে সেখানে থাকতেন। ঐ বাড়ীটা রেঙ্গুন শহরের বাইরে একটা মাঠের ধারে এবং ইরাবতী নদীর নিকটে ছিল। শরৎচন্দ্র এই পল্লীতে অনেকদিন ছিলেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর ব্রহ্ম-প্রবাসকালে, চাকরির সূত্রে ব্রহ্মদেশের কয়েক জায়গায় থাকলেও, তিনি কিন্তু ব্রহ্মদেশের প্রায় সর্বত্রই ঘুরে বেড়িয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র, পরবর্তীকালে লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে এ কথার উল্লেখ করে বলেছিলেন—“বর্মার অত কথা জানলে কি করে? ম্যাজিস্ট্রেট (ডেপুটি) যে ওখানে ‘মিউক’ এ খবর কে দিলে? ম্যাণ্ডেলে থেকে যে লঞ্চে যাতায়াতের পথ আছে, সেই বা কে বললে? যদি যথার্থই বর্মায় থেকে থাকো, সে কোন্ জায়গায়? ও-দেশটার হেন স্থান তো নেই, যেখানে এ-দুটি পা একদিন না একদিন ঘুরে বেড়িয়েছে!”

উচ্ছৃঙ্খল জীবন

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুন তারিখে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে এক চিঠিতে তাঁর 'দেবদাস' উপন্যাস সম্বন্ধে লিখেছিলেন—

"শুধু যে ওটা আমার মাতাল হয়ে লেখা তাই নয়, ওটার জন্যে আমি নিজেও লজ্জিত।..."

১৭-৭-১৩ তারিখে তিনি আবার প্রমথবাবুকে আর এক চিঠিতে 'দেবদাস' সম্বন্ধেই লিখেছিলেন—"ঐ বইটা একেবারে মাতাল হইয়া বোতল বোতল খাইয়া লেখা।"

শরৎচন্দ্র দেবদাস লিখেছিলেন, প্রথম জীবনে ভাগলপুরে থাকার সময়। অতএব দেখা যাচ্ছে, তাঁর চিঠির কথা সত্য হ'লে, তিনি অল্প বয়সেই মদ খাওয়া ধরেছিলেন। কিন্তু একটা কথা, তখনকার বেকার ও একেবারে নিঃস্ব শরৎচন্দ্র অত মদ খাওয়ার পয়সা পেতেন কোথায়!

শরৎচন্দ্র ভাগলপুর থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যখন মজঃফরপুরে শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে কিছুদিন ছিলেন, তখন সেখানে অবস্থানকালেও নাকি তিনি লুকিয়ে মদ খেতেন।

শিখরবাবু ছিলেন, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের মাসতুতো বোন অনুরূপা দেবীর স্বামী। সৌরীনবাবু তাঁর 'শরৎচন্দ্রের জীবন-রহস্য' গ্রন্থে লিখেছেন—

"শরৎচন্দ্রকে শিখরবাবু কাছে রেখেছিলেন কিছুকাল। কিন্তু তিনি তখন নেশায় বেশ পোক্ত হয়েছেন—সুযোগ এবং তেমন দল পেলে নেশা চলতো—যাকে বলে 'রম্‌রম্‌'। এবং নেশায় বিভোর হয়ে অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরতেন। একদিন গভীর রাত্রে নেশা করে এসে একটু বেএক্তিয়ার হন—শিখরবাবুর অভিভাবিকা পিসিমার মুখে সে-কথা শুনে পিতা অনুযোগ তোলেন—তখন শিখরবাবু সতর্ক করে দেন শরৎচন্দ্রকে। ব্যস্—পরের দিন তাঁকে আর দেখা গেল না। লজ্জায় তিনি উধাও।"

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে গিয়েও মদ খেতেন। নরেন্দ্র দেব তাঁর 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে

লিখেছেন—"রেঙ্গুনে কিছুদিন তিনি অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেন। এই উচ্ছৃঙ্খল জীবনের প্রধান সঙ্গী ছিলেন, তাঁর বন্ধু বঙ্গচন্দ্র দে নামে একজন পূর্ববঙ্গ নিবাসী উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক।...বঙ্গচন্দ্র নিজে ছিলেন পানাসক্ত এবং শরৎচন্দ্রকেও নিয়েছিলেন তাঁর দলভুক্ত করে।"

শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনে মদ খাওয়ার সম্বন্ধে তাঁর নিজের লেখা চিঠি থেকেও জানা যায়। যেমন—২২-২-১৯০৮ তারিখে রেঙ্গুন থেকে তিনি তাঁর স্নেহভাজন বন্ধু বিভূতিভূষণ ভট্টকে লিখেছিলেন—

"মাস দুয়েক মদ খাই নাই—শরীরটা যেন একটু সুস্থবোধ করি—আর যদি না খাই তো বোধ হয় বেশ সারিয়া যাইব।"

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন ত্যাগ করে চলে এসে হাওড়ায় বাজে শিবপুরে যখন বাস করছিলেন, সেই সময় তাঁর এক স্নেহভাজন বন্ধু হরিদাস শাস্ত্রীর কাছে, তিনি নিজে একদিন রেঙ্গুনে তাঁর মদ খাওয়া ও ছাড়ার একটি গল্প বলেছিলেন। হরিদাসবাবু শরৎচন্দ্রের সেই গল্পটি লিখেও গেছেন। হরিদাসবাবুর সেই লেখাটি এই :—

"একদিন অত্যন্ত দুর্যোগের মধ্যে সকাল বেলায় দাদার বাজে শিবপুরের বাসা বাড়ীতে হাজির হইয়াছি।...

চা খাইতে খাইতে দাদা বলিলেন—শ্রীরামপুর থেকে সেদিন একটি মেয়ে এসেছিল, নাম...। অদ্ভুত মেয়ে—চেন কি?

—না, কি রকম অদ্ভুত মেয়ে?

—এসেই আমায় বললে কি না, 'অনেক দিন থেকে ইচ্ছা করছি আপনার সঙ্গে দেখা করব। আত্মীয় বন্ধু যাকেই বলি, সেই বলে—তুমি ভদ্রঘরের মেয়ে, তুমি যাবে শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা করতে—তোমার সাহস তো কম নয়, তা আপনি কি এমন যে কোন যুবতী মেয়ে আপনার কাছে আসতে পারে না?'—শুনে বেশ কৌতুক বোধ হ'ল—বলিয়া দাদা হাসিতে লাগিলেন।

আমিও হাসিলাম। বলিলাম—আপনি কি জবাব দিলেন?

—হাঁ জবাব একটা দিলাম বৈকি। বললাম—তাঁরা যদি দশ বছর আগেকার শরৎবাবু সম্বন্ধে এ কথা বলে থাকেন তো আমি কিছু বলতে চাইনে। কারণ তখন আমি দিন রাতের মধ্যে কখনই প্রকৃতিস্থ থাকতাম না; সর্বদাই মদের নেশায় চুর। তবুও বলতে পারি অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় কখনও কোন

নারীর অমর্যাদা আমি করি নি—আর এখন তো আমি তোমাদের বড়দা—নির্ভয়ে আসবে।

—খুব বুঝি মদ খেতেন দাদা ?

—হাঁ ভাই। কিন্তু এক দিনে ছেড়ে দিলাম, অর্থাৎ মাতাল আর হই নি।

—কি করে ছাড়লেন ?

—আচ্ছা বলছি শোন। আর এক চাটুজ্জে ও আমি আর আমাদের একটি বর্মী বন্ধু একসঙ্গে মদ খেতাম। বর্মী বন্ধুটির হঠাৎ হ'ল হার্টের অসুখ, ডাক্তার একেবারে মদ খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। অফিসে ছুটি নিয়ে বাড়ী বসে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। একদিন—রাত্রি তখন ১১টা হবে, চাটুজ্জে এসে আমার দরজা ভাঙ্গতে লাগলো—'ও শরৎবাবু! শরৎবাবু!' বুঝলাম, দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, পিপাসা বেড়েছে, কিছু মদ চাই। আমার ঘরে যা ছিল তাতে পিপাসার শান্তি হ'ল না। আরও চাই—চাটুজ্জে বললে, চল বর্মী বন্ধুর বাড়ী। প্রথমটা আমি রাজি হইনি, শেষে যেতেই হ'ল তার সঙ্গে।

রাত্রি তখন ১টা হবে। অনেক ডাকাডাকির পর বন্ধু-গৃহিণী জানালা দিয়ে জানালেন—তাঁর স্বামী অসুস্থ, আমরা যেন দয়া করে চলে যাই। ডাকহাঁকে বন্ধুটিও জেগেছিল, এসে তার স্ত্রীকে অনুরোধ করতে লাগলো—'দাও না খুলে, ঘরে তো একটা বোতল রয়েছে। ওরা খাক না, আমি তো আর খাচ্ছি না।'

আমার কতকটা জ্ঞান ছিল, ফিরে আসতে চাইলাম, কিন্তু চাটুজ্জে রাজী হ'ল না। একটা ছোট বেতের টেবিলের পাশে তিনজন পাশাপাশি বেতের চেয়ারে বসেছি, সামনে মেটিঙের উপর বন্ধু-পত্নী বসে স্বামীকে পাহারা দিচ্ছে, আমরা মদ খাচ্ছি।

বন্ধু-পত্নীটি দিনের শ্রমে বোধ হয় ক্লান্ত ছিল, ঝিমুতে লাগলো দেখে চাটুজ্জে বর্মী বন্ধুটিকে ইসারায় এক পেগ নেবার অনুরোধ জানাল। আমি মানা করলাম, বর্মী বন্ধুটিও পত্নীকে দেখিয়ে অস্বীকার করলো। আরও দু-এক বার মদ খাবার পরে দেখা গেল বন্ধুপত্নী মেটিঙের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে। চাটুজ্জে আবার অনুরোধ জানাল—এবার সে আর অস্বীকার না করে টেনে নিলে। দু-বারের পর তৃতীয় বারে নিজ হাতে পাত্র টেনে নিয়ে এক চুমুকে যখন নিঃশেষ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে আঁা—আঁা—একটা বিকট শব্দ করে ঢলে পড়ল। ঐ শব্দে স্ত্রী ছেলেপিলে সকলের ঘুম ভেঙে গেছে, সকলেই তার বুকের উপর লুটোপুটি করে এমনই কলরব তুললো, কোথায় গেল নেশা ছুটে। সেই রাত্রে

থানা পুলিস করে পরদিন তার শেষ গতি করে বাড়ী এসে প্রতিজ্ঞা করলাম, আর মাতাল হব না। চাটুজ্জেও প্রতিজ্ঞা করেছিল, কিন্তু রক্ষা করতে পারে নি।—বল তো হারদাস, একটি ভদ্রলোক স্ত্রীপুত্র নিয়ে সুখে ঘুমোচ্ছিল। রাত একটায় দুটো মাতাল তাকে টেনে তুলে একেবারে মেরে এল! এর পরও যদি মাতালের বিবেক না আসে, তবে আর কিসে আসবে?—বলিয়া দাদা চুপ করিলেন।” (সাহানা, ১৩৪৬)

হরিদাসবাবুর লেখায় শরৎচন্দ্রের নিজের কথা থেকেই দেখা যাচ্ছে যে, রেঙ্গুনে তিনি মদের নেশার জন্য দিনরাতের মধ্যে কখনই প্রকৃতিস্থ থাকতেন না। কিন্তু কথা হচ্ছে, সর্বক্ষণই যদি অপ্রকৃতিস্থ থাকতেন, তাহলে চাকরি করতেন কি করে? তাই মনে হয়, এ কথাটা নিশ্চয়ই তাঁর অতিরঞ্জিত করে বলা।

শরৎচন্দ্রের নেশা সম্বন্ধে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

“তামাকের নেশা আগেই ধরেছিলেন। ১৯১৩ সালে বর্মা থেকে যখন ফিরে আসেন, তখন একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন—মানুষ যেটাকে ভয় করে, ভয়ে যা করতে যায় না, অনেক সময় গোঁয়ার্তুমি করে আমি তা করেছি। এটা পারলুম না, এমন গ্লানি না মনে জাগে এবং নেশা মানুষ যত রকম করে থাকে, তার কোনটা বাদ দিইনি।” (শরৎচন্দ্রের জীবন রহস্য)

এখানে সৌরীনবাবুর বর্ণিত, শরৎচন্দ্রের ১৯১৩ সালে বর্মা থেকে ফিরে আসার কথাটিতে একটু সময়ের গোলমাল হয়েছে। কেননা শরৎচন্দ্র ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে কোনদিন বর্মা থেকে আসেন নি। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ১ মাসের ছুটি নিয়ে তিনি এসেছিলেন।

২২-২-১৯০৮ তারিখে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে বিভূতিভূষণ ভট্টকে লিখেছিলেন—মাস দুই মদ খাই নি। আর যদি না খাই তো শরীর বেশ সেরে যাবে।

শরৎচন্দ্র এক সময় রেঙ্গুনে মদ ছেড়ে আফিং ধরেছিলেন। তারপর আফিংও ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি আবার আফিং ধরেছিলেন এবং বেশী মাত্রাতেই ধরেছিলেন। আর তাঁর এই আফিং ধরা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্তই ছিল।

শরৎচন্দ্রের আফিং খাওয়া সম্পর্কে একটি চিঠি এখানে উদ্ধৃত করছি। এই চিঠিটি তিনি ৫-১০-১৫ তারিখে রেঙ্গুন থেকে বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন। চিঠিটি এই :—

"......হাতটা কিছুতেই ভাল হইতেছে না। মধ্যে ডান পা'টাও আগাগোড়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া জয়ঢাক হইয়া উঠিয়াছিল, সেটা এখন কমিয়াছে, এই যা।......

আফিং ছাড়িবার চেষ্টা করিয়াই এত দুঃখ বোধ করি পাইলাম। আর ছাড়িবার নামটিও কখনো মুখে আনিব না, বেশ করিয়া পুনরায় ধরিয়া তবে পা ভাল হইল। এইবার আর একটু বেশ করিয়া ধরিলে হাতটাও ভাল হইবে আশা হয়।

আফিং কম করিয়া মাথাটা একেবারে খালি হইবার মত হইয়াছিল; আবার ধীরে ধীরে বেশ ভরিয়া আসিতেছে। কি জিনিস! আপনাদেরও ধরা বোধ করি ভাল। আমি তো মনে করি সমস্ত ভদ্রলোকেরই এটা সেবন করা কর্তব্য।"

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ৬ মাসের ছুটি নিয়ে শরৎচন্দ্র তৃতীয়বার যখন দেশে আসেন, সেই সময়েই 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়েছিল।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র বরাবরের জন্য ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করে চলে আসেন। সেই থেকে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত, তাঁর প্রায় সমস্ত পুস্তকেরই প্রকাশক হিসাবে তো বটেই, তাছাড়া 'ভারতবর্ষে' নিয়মিত রচনা প্রকাশের জন্যও, শরৎচন্দ্রের সহিত হরিদাসবাবুর যথেষ্ট বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ছিল। এই হরিদাসবাবু একদিন আমায় বলেছিলেন—"১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে অর্থাৎ যখন থেকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে শরৎদাকে দেখেছি, সেই থেকে কোনও দিনই কিন্তু শরৎদাকে মদ খেতে দেখিনি।"

এই তো গেল শরৎচন্দ্রের মদ খাওয়ার কথা। এ ছাড়া গিরীন্দ্রনাথ সরকারের লেখা থেকে, শরৎচন্দ্রের নিজের লেখা একটি চিঠি থেকে এবং তাঁর মুখে বলা একটি কাহিনী থেকে, মোট তিনটি তাঁর রেঙ্গুনের প্রণয় কাহিনীর বিবরণ পাওয়া যায়। সে কাহিনীগুলি এখানে পর পর বলছি :—

গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—

"শরৎচন্দ্রের সহিত বিদেশে সুদীর্ঘ ১৪ বৎসর কাল বিশেষ বন্ধুত্ব ও প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ থাকায় তাঁহার জীবনের অনেক ছোট বড় ঘটনা ও চিত্তাকর্ষক বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।"

গিরীনবাবু তাঁর বইয়ে শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মদেশে অবস্থানের সময়কার অনেক চিত্তাকর্ষক কাহিনীই বর্ণনা করেছেন। গিরীনবাবু তাঁর বইয়ে 'ব্যর্থ প্রণয়ী শরৎচন্দ্র' নামে ৪ পৃষ্ঠাব্যাপী এক অধ্যায়ে শরৎচন্দ্রের একটি ব্যর্থ প্রণয়ের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সেই কাহিনীটির সংক্ষেপিত আকার হচ্ছে এই :—

কলকাতার ভবানীপুরের নন্দদুলাল নামে একটি যুবক, তাদের পাড়ার গায়ত্রী নামে একটি যুবতী বিধবাকে তার মেসোমশায়ের বাড়ীতে লক্ষ্ণৌয়ে পৌঁছে দেবার নাম করে, একেবারে রেঙ্গুনে নিয়ে গিয়ে হাজির হয়।

পথে জাহাজে পাঁচকড়ি নামে একটি যুবকের সঙ্গে নন্দদুলালের আলাপ হয় এবং নন্দদুলাল পাঁচকড়ির কাছে গায়ত্রীকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দেয়।

এরা তিনজনেই রেঙ্গুনে গিয়ে প্রথমে রেঙ্গুনের বিখ্যাত অ্যাডভোকেট কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ওঠে। সেখানে গিয়েই কিন্তু গায়ত্রী কুঞ্জবাবুর স্ত্রীর কাছে নন্দদুলালের কু-মতলবের সমস্ত কথা বলে দেয়।

কুঞ্জবাবুর বাড়ীতে গিরীন্দ্রনাথ সরকারের খুব যাতায়াত ছিল। তিনি কুঞ্জবাবুর স্ত্রীকে দিদি বলে ডাকতেন।

কুঞ্জবাবুর স্ত্রী, গায়ত্রীর সমস্ত কথা শুনে গিরীনবাবুকে ডাকিয়ে গায়ত্রীর কাহিনী বলেন।

তখন গিরীনবাবু শরৎচন্দ্র প্রভৃতি তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে নন্দদুলালকে অপমান করে জাহাজে তুলে দেশে পাঠিয়ে দেন।

এদিকে কুঞ্জবাবুর স্ত্রী তাঁদের বাড়ীতে আর গায়ত্রীকে রাখতে রাজী না হওয়ায়, গিরীনবাবু শরৎচন্দ্রের পাড়ায় গায়ত্রীর জন্য একটা বাড়ী দেখে দেন।

পাঁচকড়ি ছেলেটি ভাল ছিল। সে-ই এখন গায়ত্রীর সহায় ও রক্ষক হ'ল।

গায়ত্রী যে বাড়ীতে থাকত, সেই বাড়ীর একটা ঘরে সে শুত, আর একটা ঘরে পাঁচকড়ি শুত। শরৎচন্দ্র রাত্রে এসে পাঁচকড়ির ঘরে শুতেন।

গিরীনবাবু ইতিমধ্যে কলকাতায় গায়ত্রীর বাবার কাছে চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু গায়ত্রীর বাবা মেয়েকে কুলটা আখ্যা দিয়ে আর গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। তখন গিরীনবাবু আবার লক্ষ্ণৌয়ে গায়ত্রীর মেসোমশায়ের কাছে চিঠি দেন।

এদিকে গায়ত্রীদের বাসায় কয়েকদিন যাতায়াতের ফলে শরৎচন্দ্র গায়ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়ে উঠলেন। একদিন তিনি গায়ত্রীকে বললেন—"আমার জীবনের মাঝখানে যে আপনার আসন পাতা হয়ে গিয়েছে, গায়ত্রী দেবী।"

এই সময় গায়ত্রী-ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিল। সে হ'ল, পাঁচকড়ি যার কাঠের গোলায় কাজে লেগেছিল, সেই গোলার ধনী মালিক শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায়। সে একদিন কাজের ব্যাপারে পাঁচকড়ির খোঁজে এসে, গায়ত্রীকে দেখে মুগ্ধ হয় এবং সেইদিন থেকেই গায়ত্রীকে কিভাবে হস্তগত করা যায়, তারই জন্য সে ফন্দী ও মতলব করতে থাকে। শেষে একদিন সে জোর করেই গায়ত্রীকে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ী ও লোকজন নিয়ে যায়।

শরৎচন্দ্র এই কথা জানতে পেরেই, সেদিন অফিস কামাই করে পাড়ার লোকজন নিয়ে শশাঙ্কমোহনকে বাধা দিতে যান।

এই নিয়ে সেদিন একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটবার উপক্রম হয়।

গিরীনবাবু লোকমুখে এই সব শুনে তখনি কুঞ্জবাবুর গাড়ী নিয়ে পালোয়ান সঙ্গে করে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। গিরীনবাবু গিয়ে অবস্থা যা দেখেছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—"দেখিলাম, শশাঙ্কবাবু একখানি গাড়ীতে বসিয়া আছেন ও তাঁহার পশ্চাতে আর একখানি খালি গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। কিছুদূরে শরৎচন্দ্র একটি গলি পথের আড়ালে গায়ত্রীর ঘরের দিকে চাহিয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। উভয় পক্ষের উত্তেজিত বহুলোক সমবেত হইয়া কুরুক্ষেত্রের স্থচনা করিতেছিল। এমন সময় কুঞ্জবাবুর বর্মা-পনি সংযুক্ত জুড়ি গাড়ীতে লাঠি হস্তে পালেয়োনসহ আমাদের নামিতে দেখিয়া ভয়ে সকলে একে একে সরিয়া দাঁড়াইল।"

গায়ত্রীর মেসোমশায়ের কাছ থেকে গায়ত্রীকে পাঠিয়ে দেবার জন্য, গিরীনবাবুর কাছে চিঠিও দু'এক দিনের মধ্যে এসে গেল। তখন গিরীনবাবু তাঁর এক বন্ধু সপরিবারে কলকাতায় আসছিলেন দেখে, তাঁদের সঙ্গে গায়ত্রীকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে শরৎচন্দ্র একদিন গিরীনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যান। সেদিনের কথা-প্রসঙ্গে গিরীনবাবু লিখেছেন—"বহুদিন পরে শরৎচন্দ্র একদিন আমার বাটীতে আসিয়া মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে বলিলেন—

…পৃথিবীতে এতবড় বিড়ম্বনা আমার ভাগ্যে ঘটেনি ভাই। কল্পনা কোনদিন বাস্তব হয়ে দেখা দেয় না।……অপরিণত বয়সে নিজেকে বিসর্জন দেবার আকাঙ্ক্ষা অল্প বিস্তর সকল মানুষেরই থাকে। অসংযমী মনের উপর প্রভুত্ব করা বড় শক্ত। এমন কত পুরুষের মন, কত নারীর মনকে চেয়ে এসেছে, তার সংখ্যা করা যায় না।"

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে বিভূতিভূষণ ভট্টকে একটি দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন। সেই পত্রে তিনি রেঙ্গুনে আঠার মাস ব্যাপী এক রজক কন্যার সহিত তাঁর দাম্পত্য প্রেম চর্চার একটি চমকপ্রদ কাহিনীর বর্ণনা করেন। চিঠির মধ্যেকার সেই কাহিনীটি এই—

পরম কল্যাণীয় পুঁটুভায়া,

…আমার ইতিহাস একটু শুনিবে? মধ্যে এই রেঙ্গুনে দাম্পত্য প্রেম চর্চা করিতে গিয়া হঠাৎ দেখিলাম, পুরা গৃহী হইয়া পড়িয়াছি। দেড় বৎসরের মধ্যে সেই অসীম অগাধ প্রণয়ের তলা দেখি নাই। একদিন মধুর কলহ (!) বাধিয়া গেল এবং মান ভঞ্জনের পূর্বেই দেখিলাম, গৃহিণী আমার অভিমান ভরে আর একজন সুপাত্রে বরমাল্য প্রদান করিয়াছেন। কাজেই আমি আমার পোঁটলা পুঁটুলি ঘাড়ে করিয়া এই ৩৬ নম্বর গলির চার তলায় একটি ঘর ভাড়া লইয়া বিছানা পাতিয়া চিৎ হইয়া চুরুট টানিতে লাগিলাম।

এটা যে কি হইয়া গেল, আজো তাহার মীমাংসা করিতে পারি নাই। বধূ আমার ব্রহ্মদেশীণী ছিলেন না খাঁটি স্বদেশী। যখন শুনিলাম, তিনি রজক কন্যা, তখন কান মলিয়া, এক হাত নাকখত্ দিয়া ঐরাবতীতে স্নান করিয়া আসিলাম ও পরদিনই মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিয়া প্যাসেজ বুক করিয়া বিরহ জ্বালা শান্ত করিতে হংকং চলিয়া গেলাম। ফিরতি পথে কলিকাতায় গিয়াছিলাম মাত্র। শুনিয়াছি চণ্ডীদাস নাকি ঐ রকম কি একটা করিয়া মাথুর লিখিয়াছিলেন, আমিও স্থির করিয়াছি, বহুপূর্বে 'চরিত্রহীন' বলিয়া যেটা সুরু করিয়াছিলাম, এইবার সেটা শেষ করিব।

দেশে গিয়াও সুখ পাই নাই। একবার ওলাউঠা হইল, কতদিন হাসপাতালে অপারেশন হইয়া পড়িয়া রহিলাম। আর সবচেয়ে জ্বালাতন করিয়াছিল কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দল। গায়ের চামড়া খাইয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল। আমার দুঃখের দিনে তাঁহারা যে কোথায় ছিলেন জানি না।

কিন্তু আজ নিশ্চিন্ত হইয়া বাকি দিন ক'টা কাটাইয়া দিবার যেই সময় আসিয়াছে, অমনি দয়া করিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁহারা কোন্ অজ্ঞাত স্থান হইতে যে বাহির হইতেছেন, নির্ণয় করিবার ক্ষমতা আমার তো নাই!

আমি গৃহ, গৃহিণী, প্রণয় ও বিরহ এই আঠার মাসের মধ্যে এমনি পুরাদমে ভোগ করিয়া লইয়াছি যে, তাহা হজম করিতে অন্ততঃ আঠার বৎসর লাগিবে। ইহার পরেও যদি বাঁচিয়া থাকি, ওদিকে চাহিব—এখন নয়।"

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, এই চিঠির মধ্যেকার রজক কন্যার সহিত শরৎচন্দ্রের প্রণয় চর্চার কাহিনীটা সত্য কিনা? না বন্ধুর কাছে পরিহাস করে বা মিথ্যা করে লেখা?

এ সম্পর্কে আমার মনে হয় এই:—

চিঠির কথা যে মিথ্যা, সে সম্বন্ধে জোর করে কিছু বলা যায় না। সত্য হলেও হতে পারে। কেননা আগাগোড়া সমস্ত চিঠিখানি পড়লে দেখা যায় যে, যেভাবে চিঠি লেখা তাতে হাল্কামি বা পরিহাস করেছেন বলে মনে হয় না।

শরৎচন্দ্রের এই চিঠিতে রেঙ্গুনের ৩৬ নং গলির ৪ তলার ঘর ভাড়া করার উল্লেখ আছে। শরৎচন্দ্র এক সময় রেঙ্গুনের ৩৬ নং গলিতে ছিলেন এবং এক সময় চারতলার একটি ঘরেও ছিলেন, এ কথা সত্য। রেঙ্গুন থেকে লেখা শরৎচন্দ্রের অনেক চিঠিতে ৩৬ নং গলির ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছে। তবে এই চিঠিগুলি সবই ১৯১৪ সালের পরের। শরৎচন্দ্র এই ৩৬ নং গলির ক'তলার ঘরে ছিলেন জানা যায় না, কিন্তু এক সময় যে বাড়ীর চারতলার ঘরে ছিলেন, সে বাড়ীটি ছিল বোটাটং স্ট্রীটে। এ কথার উল্লেখ করে সতীশচন্দ্র দাস তাঁর 'শরৎ-প্রতিভা' গ্রন্থে লিখেছেন—"বোটাটং স্ট্রীটে আমাদের মেস। আমরা থাকতাম তিন তলায়, শরৎদা থাকতেন চার তলায়।"

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের কিছুদিন আগে শরৎচন্দ্র একবার কলকাতায় এসেওছিলেন।

তাই এই চিঠির কাহিনীটি সত্য হলেও হতে পারে বলে মনে হয়। যদি সত্যই হয়, তাহলে শরৎচন্দ্রের চিঠিতে 'দাম্পত্য প্রেম চর্চা'র কথা যখন রয়েছে, তখন তিনি কি বিয়েই করেছিলেন! এবং পরে জানতে পেরেছিলেন, তাঁর জায়াটি ব্রাহ্মণ কন্যা নন্, রজক কন্যা!

শরৎচন্দ্র তাঁর ব্রহ্ম-প্রবাসের বেশীর ভাগ সময়টাই রেঙ্গুন শহরের উপকণ্ঠে মিস্ত্রীপল্লীর মিস্ত্রীদের মধ্যে বাস করেছেন। ঐ মিস্ত্রীপল্লীতে যুবক যুবতীদের মধ্যে একটা আপোষে বিবাহ হ'ত এবং সেই বিবাহে জাতি ও কুলের খুঁটিনাটি খোঁজ বড় একটা কেউ করত না।

গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থেও লিখেছেন—

"গলির ভিতর একটি পুরাতন কাঠের বাড়ীতে শরৎচন্দ্র বাস করিতেন। এই পল্লীর বাঙ্গালী মিস্ত্রীরা বহুকাল হইতে এখানে বাস করে। উহাদের সকলেরই বিবাহিত স্ত্রী সঙ্গে না থাকিলেও, এখানে আপোষের মধ্যে বিবাহাদির আদান প্রদান করিয়া সপরিবারে বসবাস করে। চট্টগ্রামবাসী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ এই সকল বিবাহে পৌরোহিত্য করিত।"

মিস্ত্রীপল্লীতে থেকে মিস্ত্রীদের মত শরৎচন্দ্রও কি ঐরূপ 'আপোষে' বিয়ে করে পরে জেনেছিলেন যে, তাঁর বধূটি রজক কন্যা!

শরৎচন্দ্রের এই চিঠির কাহিনীটি আবার সত্য নাও হতে পারে। এটি সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য করে বানিয়ে বলা একটি মিথ্যা কাহিনীও হতে পারে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁরা মিশেছেন, তাঁরাই জানেন যে, মিথ্যা করে বানিয়ে গল্প রচনা করতে তিনি কিরূপ ওস্তাদ ছিলেন, আর এমনিভাবে তিনি বলতেন যে, কারও সাধ্য ছিল না, তাকে অবিশ্বাস করে।

আর একটি কথা, শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের জীবন নিয়ে যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা শরৎচন্দ্রের জীবনে যে এরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল, এ কথা বলেন নি। গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে অনেক কথাই লিখেছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের জীবনে রজকিনী-প্রেমের কথা কোথাও উল্লেখ করেন নি। গিরীনবাবু তাঁর বইয়ে বলেছেন যে, শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে যাওয়ার সময় থেকে চলে আসার সময় পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১৪ বৎসর কাল তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক থাকায় তিনি শরৎচন্দ্রের জীবনের অনেক ছোট বড় ঘটনা ও চিত্তাকর্ষক কাহিনী জানতেন। শরৎচন্দ্রের জীবনে ১৮ মাস ব্যাপী দাম্পত্য প্রেম চর্চার এমন একটি ব্যাপার যদি ঘটত, তাহলে গিরীনবাবু সে কথা তাঁর বইয়ে উল্লেখ করতেন বলেই মনে হয়।

কবি চণ্ডীদাসের রজকিনী প্রেম বিশ্ববিখ্যাত। শরৎচন্দ্রের পক্ষে, নিজেকেও এইরূপ একটি রজকিনী প্রেমের সঙ্গে জড়িত করে, বানিয়ে বন্ধুর কাছে চিঠি লেখা, এমন কিছু বিচিত্র নয়।

এখন কথা উঠতে পারে, যদি মিথ্যাই হয়, তবে নিজেকে এভাবে খেলো করে এ সব বলার অর্থই বা কি?

এর উত্তরে বলা যেতে পারে—বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে মিথ্যা করে বানিয়ে পরিহাস করতে শরৎচন্দ্র খুব পছন্দ করতেন। তাছাড়া তাঁর আর একটা স্বভাব ছিল এই যে, তিনি যা নন্, অনেক সময় লোকের কাছে নিজেকে তাই বলে প্রচার করতেন। যেমন তিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু ও ভগবদ্-বিশ্বাসী হলেও লোকের কাছে মুখে এবং লিখে সর্বদাই নিজেকে ঘোরতর নাস্তিক বলে প্রচার করতেন।

শরৎচন্দ্র যখন হাওড়ায় বাজে শিবপুরে থাকতেন, তখন তাঁর বাসার অদূরবর্তী শিবতলা লেন নিবাসী প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক অক্ষয়কুমার সরকারের সহিত তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। অক্ষয়বাবু অত্যন্ত আদর্শবাদী ও নীতিবাগীশ লোক ছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁর 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে যে অধ্যাপক অক্ষয়বাবুর চিত্র এঁকেছেন, এই অক্ষয়বাবুই নাকি তার মূল। অবশ্য উপন্যাসে মূলের উপর তিনি প্রচুর কল্পনার তুলি বুলিয়েছেন।

যাই হোক্, শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুরে থাকার সময় এই অক্ষয়বাবু অনেক সময় বন্ধু শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন, আবার শরৎচন্দ্রও অনেক সময় অক্ষয়বাবুর বাড়ীতেও যেতেন। উভয়ে মিলিত হলে, তখন তাঁদের মধ্যে যে সব আলোচনা হ'ত, অক্ষয়বাবু তাঁর একটি খাতায় সে সব লিখে গেছেন।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহকালে এই অক্ষয়বাবুর সহিত আমার বিশেষ পরিচয় হয়েছিল। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে উপকরণ সংগ্রহ এবং আলোচনা করবার জন্য আমি অনেক দিন তাঁর বাড়ীতে গিয়েছি। অক্ষয়বাবু তাঁর 'শরৎস্মৃতি'র খাতাটি আমাকে দেখতে দিয়েছিলেন। আমি তা থেকে তাঁর লেখাগুলি নকল করে তাঁর খাতাটি তাঁকে ফিরিয়ে দিই।

ঐ খাতায় এক জায়গায় 'শরৎবাবুর নারী চরিত্র' শিরোনামায় একটি লেখা আছে। লেখাটিতে তারিখ দেওয়া আছে ২-২-৩০। নারী চরিত্র সম্বন্ধে

শরৎচন্দ্রের নিজের বহু অভিজ্ঞতার কথা, যা তিনি অক্ষয়বাবুর কাছে বলে-ছিলেন, সে সব কথা অক্ষয়বাবু লিখে রেখেছেন। অক্ষয়বাবু লিখেছেন :—

"শরৎবাবুর উপন্যাসগুলিতে নারী চরিত্রের যে সব মনোরম বিশ্লেষণ আছে, তাহা সাহিত্য-রসিক মাত্রেই উপভোগ করিয়াছেন এবং সমালোচনার কঠিন কষ্টিপাথরেও নিয়ত পরীক্ষিত হইতেছে। কিন্তু আমি তাঁহার নিজের মুখ হইতে নারী চরিত্রের যে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ শুনিয়াছি, তাহাও কম অপূর্ব নয়।

মোটেই অবলা নয়, একদিন তিনি বলিলেন। নারীকে লোকে এবং কাব্য-সাহিত্যে অবলা বলে কেন? তাহারা অনেক বিষয়ে যাহা করিতে পারে, তাহা অনেক দুঃসাহসিক পুরুষের পক্ষেও অসম্ভব। শাস্ত্রকারেরা তাহাদের কাম প্রবৃত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা ঠিক সত্য না হইতেও পারে, তবে ক্রোধে উত্তেজিত বা বাসনায় উন্মত্ত রমণীকে যাহা করিতে দেখিয়াছি, পুরুষকে কখনও সেরূপ করিতে দেখি নাই।"

এই ভাবে নারী চরিত্র সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের বলা অনেক কথাই অক্ষয়বাবু তাঁর খাতায় লিখেছেন। অক্ষয়বাবু, শরৎচন্দ্রের শেষ কথাটি শুনে এইরূপ লিখে রেখেছেন :—

"আবার প্রণয়াস্পদের জন্য ইহাদের অকরণীয় কিছুই নাই। বর্মার কথা। একটি বাঙ্গালী মেয়ে এক বস্তীতে একজন রুগ্ন, কৃশ, কদাকার পুরুষকে লইয়া থাকিত। সে নানাভাবে······প্রণয় নিবেদন করিল।······তাহার সঙ্গলিপ্সা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। কয়েকদিন একত্রে কাটাইবার পর সে অন্তর্ধান হইল। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া পাগলের মত ঘুরিতে লাগিলাম। বাড়ীউলি একদিন সহানুভূতিতে বলিয়া ফেলিল, কাহার জন্য এমনভাবে শরীরপাত করিতেছ? সে কেমন তোমাকে ঠকাইয়া তাহার বন্ধুর জন্য টাকা রোজগার করিতেছিল। এখন তাহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। তোমার উপর তাহার কখনো কিছুমাত্র দরদ ছিল না।

আশ্চর্য, মেয়েটি কিন্তু বাস্তবিকই অত মন্দ নয়। শুধু প্রণয়াস্পদের হিতের জন্যই সে এমন হীন প্রতারণা করিয়াছিল।"

এখানে এই উদ্ধৃতিটির মধ্যে দু' জায়গায় '······' আছে। অক্ষয়বাবু ঐ দু' জায়গায় শরৎচন্দ্রের নিজের কথা বলে ইচ্ছা করেই, যথাক্রমে 'আমার কাছে' ও 'আমার' এই কথা দুটি লেখেন নি।

যাই হোক্, অক্ষয়বাবুর এই লেখাটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে এক সময় একটি রুগ্ন, কৃশ ও কদাকার লোকের প্রণয়িনীর সহিত কিছুদিন একত্রে কাটিয়েছিলেন।

এই কাহিনীটির সত্যতা সম্বন্ধে অক্ষয়বাবুর কি মত, তা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন—

"সত্য হলেও হতে পারে। তবে কিন্তু মিথ্যা বানানো গল্প বলেই আমার মনে হয়।"

এই কাহিনীটি সম্বন্ধে আমারও বক্তব্য এই যে, ঘটনাটি সত্য হলেও হতে পারে; ঘটনাটি সত্য নয়, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। কেননা শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে শরৎচন্দ্রকে 'সমাজ-বিরোধী উচ্ছৃঙ্খল যুবক' বলে এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন।

তবে ঘটনাটি সত্য নয় বলেই আমারও মনে হয়।

শরৎচন্দ্র একবার এক পত্রে জীবন্ত সাহিত্য সৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে দিলীপ কুমার রায়কে লিখেছিলেন—

"সব চেয়ে জ্যান্ত লেখা সেই, যা পড়লে মনে হবে গ্রন্থকার নিজের অন্তর থেকে সব কিছু ফুলের মত বাইরে ফুটিয়ে তুলেছে। দেখোনি বাঙ্গলা দেশে আমার সব বইগুলোর নায়ক-নায়িকাকেই ভাবে, এই বুঝি গ্রন্থকারের জীবন, নিজের কথা। তাই সজ্জন সমাজে আমি অপাংক্তেয়। কতই না জনশ্রুতি লোকের মুখে মুখে প্রচারিত।"

শরৎচন্দ্র যেমন জ্যান্ত লেখা লিখতেন, তেমনি গল্পও বলতেন জ্যান্ত গল্প। তাঁর মুখের গল্প শুনলে, সেই গল্পকে এতটুকুও অবিশ্বাস করবার উপায় থাকত না। আর তিনি তাঁর গল্পকে জীবন্ত করে তুলবার জন্য নিজের অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে, এমন কি ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলে চালিয়ে যেতেন। এতে তিনি শ্রোতার কাছে খেলো হবেন কি, ভাল হবেন, সেদিকে খেয়ালই রাখতেন না।

আর শরৎচন্দ্রের পরিচিত সকলেই একথাও জানেন যে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে বানিয়ে গল্প বলতে কিরূপ দক্ষ ছিলেন।

তাই মনে হয়, শরৎচন্দ্র অক্ষয়বাবুর কাছে নারী চরিত্র সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে

গিয়ে, নারী প্রণয়াস্পদের জন্য কি না করতে পারে, এই গল্পটিকে জ্যান্ত গল্প করবার জন্য ঐভাবে নিজেকে জড়িয়েই হয়ত এই কাহিনীটি বিবৃত করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র ১৪-৮-১৯ তারিখে তাঁর সাহিত্য-শিষ্যা লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

"একবার ছেলেবেলায় ছয় সাত শত বাঙ্গালী কুলত্যাগিনীর ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলাম। অনেক দিন, অনেক মেহন্নত, অনেক টাকা তাতে নষ্ট হয়, কিন্তু একটা আশ্চর্য শিক্ষাও আমার হয়েছিল। দুর্নামে দেশ ভরে গেল সত্যি, কিন্তু এই কথাটা নিঃসংশয়ে জানতে পারলাম, যারা কুলত্যাগ করে আসে, তাদের শতকরা প্রায় আশি জন সধবা। বিধবা খুব কম। স্বামী বেঁচে থাকলেই বা কি, আর কড়া পাহারা দিয়ে রাখলেই বা কি! আর বিধবা হলেই বা কি! দিদি, অনেক দুঃখেই মেয়েমানুষে নিজের ধর্ম নষ্ট করতে রাজী হয়, আর যে-জন্যে হয়, সেটা পরপুরুষের রূপও নয়, একটা বিভৎস প্রবৃত্তির লোভেও নয়। তারা এতবড় জিনিসটা যখন নিজের নষ্ট করে, তখন বাইরে গিয়ে কিছু একটা আশ্চর্য বস্তু পাবার লোভে নয়, কেবল কিছু একটা থেকে আপনাকে রেহাই দেবার জন্যেই এ দুঃখ মাথায় তুলে নেয়।"

কেউ দিনের পর দিন পতিতাদের মধ্যে থাকলে, সাংসারিক লোকে বা সামাজিক লোকে তাকে কখনই ভাল চোখে দেখে না। তাকে উচ্ছৃঙ্খল, দুঃশ্চরিত্র বলেই লোকে সাধারণতঃ তার দুর্নাম করে থাকে। তাই শরৎচন্দ্র পতিতাদের জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করতে গেলে, তখন লোকে তাঁর চরিত্র সম্বন্ধেও দুর্নাম রটনা করেছিল।

বহুদিন পতিতালয়ে ঘুরে পতিতাদের সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের নানা অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গক্রমে বন্ধুমহলে প্রায়ই, এমন কি সভা সমিতিতে তাঁর অভিভাষণের মধ্যেও বলতেন—অত্যন্ত সতী নারীকে চুরি, জাল, জুয়াচুরি ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে দেখেছি। আবার ঠিক এর উল্টোটা দেখাও আমার ভাগ্যে ঘটেছে।—এই কথা বলেই শরৎচন্দ্র বন্ধুদের কাছে এর উদাহরণ হিসাবে একটা গল্প বলতেন। সে গল্পটি হচ্ছে এই :—

শরৎচন্দ্র একবার তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে এক পতিতার কাছে গিয়েছিলেন।

মেয়েটি নাচ গান জানত। নাচ গান চলতে লাগল। এদিকে দু'বন্ধুতে মিলে একটু একটু করে মদ্যপানের মাত্রাও বাড়াতে লাগলেন। শেষে এক সময় উভয়েই নেশায় বেহুঁস হয়ে পড়লেন। তখন কে কোন্ দিকে গড়াতে লাগল, তার আর হুঁশ রইল না। এমন কি তাঁদের কোমরের কাপড়ও ঠিক রইল না।

পরদিন সকালে নেশা কেটে গেলে শরৎচন্দ্রের বন্ধুটি কোমরে হাত দিয়ে হাউ-মাউ করে চেঁচিয়ে উঠল। সে বললে—আমার ট্যাঁকে তিন হাজার টাকার নোটের যে তোড়াটি ছিল, সেটা খুঁজে পাচ্ছি না। এ যে মহাজনের টাকা! তার টাকা তাকে বুঝিয়ে না দিলে আমার চাকরি তো যাবেই, এমন কি জেলও খাটতে হবে।—বলে লোকটি কাঁদতে আরম্ভ করল।

একটু পরেই সে আবার বললে—এ নিশ্চয় ঐ মেয়েটিরই কাণ্ড। কাল আমাদের বেহুঁস অবস্থায় দেখে সে-ই টাকার তোড়াটি নিয়েছে।

বন্ধুটি যখন এই কথা বলছিল, ঠিক সেই সময়ে মেয়েটি ঘরে এল। সে সব শুনে ধীর গলায় বললে—কাল নেশার ঝোঁকে গড়াগড়ি দিতে দিতে আপনারা এই ঢালা ফরাসের বাইরে চলে গেছলেন। সেখান থেকে তুলে এনে আপনাদের মাথায় বালিশ দিতে গেলাম, আপনারা আমাকে কত যে কটূক্তি করলেন, তা আর বলতে চাইনে। এ আমাদের নিত্যকার পাওনা, এসব আমাদের সয়ে গেছে। যাকগে, কোন রকমে আপনাদের শুইয়ে দিয়ে উঠতে গিয়ে দেখি, মেঝেতে লুটোচ্ছে একটা টাকার থলি। তুলে দেখি এক কাঁড়ি টাকা। সেই টাকার থলি পাহারা দিয়ে সারা রাত জেগে বসে আছি।

এ পাড়াটি বেজায় খারাপ নিশ্চয় জানেন। কত রকমের লোক আসছে যাচ্ছে, গুণ্ডারা তো সব সময়েই ছোঁকছোঁক করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার মনে হয়, আপনাদের কাছে টাকা আছে সন্দেহ করে জনকয়েক গুণ্ডা কাল আপনাদের পিছু নিয়েছিল। আমার চেনা ক'জন গুণ্ডাকে এই ঘরের পাশ দিয়ে বারে বারে যেতে আসতে দেখেছি। সাহস করে আর ঢুকতে পারেনি, হয়তো ভেবেছিল, আপনারা এখান থেকে বেরুলেই টাকাগুলো কেড়ে নেবে। গোটাকয়েক টাকার জন্যে খুন তো ওরা হামেশাই করছে।

এদিকে আমার অবস্থাটা তখন ভাবুন। আমার হাতে আপনাদের টাকা, আর বাইরে গুণ্ডাদের আনাগোনা—দেখেশুনে আমি তো খুবই ভয় পেয়ে গেছলাম। ঘরে খিল দিয়ে ঝিকে নিয়ে সারা রাত এই টাকা আগলে জেগে কাটিয়েছি। সকাল হলে এই তো সবে আমরা ঘর থেকে বেরিয়েছি।

এই বলে মেয়েটি তার পেট কাপড় থেকে টাকার থলিটা বার করে দিলে।

শরৎচন্দ্র এই গল্পটি বলেই বন্ধুদের বলতেন—একবার ভেবে দেখ দেখি, মেয়েটির মহত্ত্ব কতখানি। যে নারী সামান্য কয়েকটা টাকার জন্যে নিজেকে পণ্য করে খোরাক যোগাচ্ছে, সেই কিনা তিন-তিনটি হাজার টাকার লোভ অমন সহজে সামলে নিলে! একি কম কথা! অথচ দেখ, যদি অস্বীকার করত, কারো সাধ্য ছিল না যে আদায় করে।

তাই বলছিলাম, বাইরের রূপটাই এদের আসল পরিচয় নয়। এরাও মানুষ, এদেরও হৃদয় আছে এবং হৃদয়ের যেসব সৎ প্রবৃত্তি তাও এদের মরে যায়নি। আর কেন যে এ-পথে আসতে এরা বাধ্য হয়েছে, সেজন্য দায়ী তো এরা নয়, দায়ী আমাদের সমাজ। এই হৃদয়ের দিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের সংসারের সতী-সাধ্বীদের চাইতে এরা কোন অংশে কম নয়।

আমি আগেই বলেছি, শরৎচন্দ্র বানিয়ে গল্প বলতে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। এবং তাঁর বলা গল্পের মধ্যে কোথাও যাতে না একটুও অবিশ্বাসের ফাঁক থাকে, সেই জন্য তিনি ঘটনাটিকে নিজের জীবনের ঘটনা বলেও অবাধে চালিয়ে যেতেন। এখানের এই গল্পটিও সেই ধরণেরই গল্প কিনা কে জানে!

শরৎচন্দ্র, তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থের প্রকাশক, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে একবার রেঙ্গুনে তাঁর এক পতিতালয়ে যাওয়ার গল্প বলেছিলেন। হরিদাসবাবু শরৎচন্দ্রের বলা সেই গল্পটি শরৎচন্দ্রের কথা-প্রসঙ্গে একদিন আমাকে শুনিয়েছিলেন। সেই গল্পটি এই :—

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে একবার তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সহিত সেখানকার এক নামকরা পতিতার কাছে যান। সকলে মিলে গিয়ে দেখেন—মেয়েটির কঠিন বসন্তরোগ হয়েছে এবং সে একা তার ঘরে পড়ে রয়েছে।

এই দেখেই শরৎচন্দ্রের বন্ধুরা ভয়ে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। শরৎচন্দ্র কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে গেলেন না। তিনি একা সেখানে রয়ে গেলেন এবং মেয়েটির সেবা-যত্ন করতে লাগলেন।

শরৎচন্দ্র মেয়েটিকে সারিয়ে তুলবার জন্য নিজে টাকা খরচ করে ডাক্তার ও ওষুধ এনে কয়েকদিন ধরে খুব চেষ্টা করলেন। কিন্তু অত চেষ্টা করেও তিনি

মেয়েটিকে বাঁচাতে পারলেন না। শেষে ঐ বসন্ত রোগেই মেয়েটি একদিন মারা গেল।

মেয়েটি মারা গেলে, শরৎচন্দ্র তার যথারীতি সংকার করে, তবে বাড়ী ফিরলেন।

শরৎচন্দ্রের একবার পতিতালয়ে থাকার একটি কাহিনী তাঁর মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও আমাকে বলেছিলেন। সে কাহিনীটি এই :—

শরৎচন্দ্র ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে যখন ১ মাসের ছুটি নিয়ে রেঙ্গুন থেকে দেশে এসেছিলেন, তখন তিনি এসে হাওড়া শহরে খুরুট রোড (বর্তমানে নেতাজী সুভাষ রোড) ও গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সংযোগস্থলের কাছাকাছি ঘোলাডাঙ্গার এক পতিতালয়ে উঠেছিলেন এবং সেইখানেই থাকতেন।

উপেনবাবু শরৎচন্দ্রের ঐ ঠিকানাটি সংগ্রহ করে একদিন বিকালে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে যান। শরৎচন্দ্র যে বাড়ীতে ছিলেন উপেনবাবু নম্বর খুঁজে খুঁজে সেই বাড়ীর সামনে গিয়ে দেখেন, রাস্তার ধারে এক তলার একটি ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে চুল বাঁধছে।

উপেনবাবু আর কাকেও না দেখতে পেয়ে, সেই মেয়েটিকেই জিজ্ঞাসা করলেন—এই বাড়ীতে কি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ব'লে কেউ থাকেন? রেঙ্গুন থেকে এসেছেন?

উপেনবাবুর কথার উত্তরে মেয়েটি বললে—ও, দাদাঠাকুর! তিনি তো উপরে আছেন! আপনি পাশের ঐ সিঁড়ি দিয়ে উপরে চলে যান। গেলে সামনেই দেখতে পাবেন।

উপেনবাবু উপরে গিয়ে দেখেন, শরৎচন্দ্র তখন মেঝেয় বসে 'চরিত্রহীন' উপন্যাস লিখছেন।

শরৎচন্দ্র এক সময় পতিতাদের জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করতে গিয়ে দিনের পর দিন পতিতাদের মধ্যে থেকেছেন। তাই স্বভাবতঃই লোকের মনে কৌতূহল জাগে শরৎচন্দ্র পতিতালয়ে গিয়ে অসংযমীও হয়েছিলেন কিনা! এই কৌতূহলের বশেই শরৎচন্দ্রের এক স্নেহভাজন বন্ধু, হরিদাস শাস্ত্রী একদিন শরৎচন্দ্রকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাও করেছিলেন। শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে হাওড়ায় বাজে শিবপুরে থাকতেন।

সেদিন সে সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে যেসব কথাবার্তা হয়েছিল, হরিদাসবাবু সেসব কথা বিস্তৃতভাবে লিখেছেন। হরিদাসবাবুর সেই লেখাটি এই :—

"...অনেকক্ষণ বাদে আমি বলিলাম—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো দাদা ?

—কি বলো।

—অনেক লোকে আপনার চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বলে, সব দিকেই আপনি নাকি উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন ?

দাদা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—তোমার কি মনে হয় ?

—আমার বিশ্বাস হয় না।

—কেন ?

—কারণটা ঠিক বলতে পারবো না, মন বিশ্বাস করতে চায় না।

—আমি বলি কারণটা আমায় ভালবাসো ব'লে তোমার মনের আদর্শ থেকে আমায় খাটো ক'রে দেখতে ইচ্ছা হয় না তোমার। কিন্তু কোন্ সাহসে তুমি আমায় এ কথা জিজ্ঞাসা করলে ? এমনও তো হতে পারে যে, আমার সম্বন্ধে লোকের যা কিছু ধারণা, সব সত্যি। আমার মুখের স্বীকারোক্তি শুনলে তোমার কিছু শান্তি হবে কি ?

—না। কিন্তু আমার মন বলে সবই মিথ্যা। লোকে ঠিক কথা জানে না ব'লেই বলে।

দাদা চুপ করিয়া রহিলেন। কতকক্ষণ বাদে বলিলেন—দেখ হরিদাস, আমি সত্যিই তোমায় ভালবাসি—তার মধ্যে কোন ফাঁক নেই। অন্যে এ কথা জিজ্ঞাসা করলে কোন জবাবই পেত না, তার কারণ সাধারণ লোকের ধারণায় কি আসে যায় ! আর সে ধারণা কত দিনের জন্যেই বা। একদিন আমি থাকবো না, তারাও থাকবে না, লোকে হয়ত আমার ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয়ই জানতে চাইবে না। তখনও যদি আমার কোন লেখা বেঁচে থাকে, তা নিয়েই আমার বিচার করবে তারা, আমার চরিত্র নিয়ে নয়। তবুও তোমার যখন জানতে ইচ্ছা হয়েছে, জানাব। বাস্তবিকই তাদের ধারণা মিথ্যা। অর্থাৎ নারীজাতি সম্বন্ধে আমার চরিত্র কোনকালেই উচ্ছৃঙ্খল ছিল না, এখনও নয়। নেশার চূড়ান্ত করেছি, অনেক অস্থানে কুস্থানে গিয়েছি, কিন্তু তুমি সে সব জায়গায় খবর নিয়ে জানতে পার, তারা সকলেই আমায় শ্রদ্ধা করতো। কেউ দাদাঠাকুর, কেউ বাবাঠাকুর বলতো। কারণ অত্যন্ত মাতাল অবস্থায়ও তাদের দেহের উপর আমার কখনো লালসা হয় নি। তার

কারণ এ নয় যে আমি অত্যন্ত সংযমী, সাধু, নীতিবাগীশ,—কারণ এই যে, ওটা চিরদিনই আমার রুচিতে ঠেকেছে। যাকে ভালবাসতে পারি নে, তাকে উপভোগ করবার লালসা আমার দেহে জেগে ওঠেনি কখনও। আরও কিছু—বলিয়া দাদা চুপ করিলেন।

প্রশ্ন করিলাম—আর কিছু, কি?

—বিশ্বকবির গানটা তোমার মনে আছে কি?

কখনো কুপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ স্মরি সরমেতে হই সারা।

প্রশ্ন করিলাম—তার মানে?

—তার মানেও শুনতে চাও? আচ্ছা শোনো। প্রথম যৌবনে আমি একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলাম। ভালবাসা নিষ্ফল হ'ল, কিন্তু সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলার মধ্যে সে এসে চিরদিন দাঁড়িয়েছে আমার সামনে। সশরীরে যে নয় সে তোমায় বোঝাতে হবে না বোধ হয়।

—না। তার পর?

—তার পর—তার পরিচয় চাও ত? না, তা দেবো না। আজ শুধু আর একটি কথা তোমায় বলবো—এ সব কথা নিয়ে তুমি কখনও কারও সঙ্গে তর্ক করতে যেয়ো না—এইটিই আমার আদেশ রইলো তোমার উপর।

এমন লোক থাকা অসম্ভব নয় যিনি মনে করিবেন আমি গল্প লিখিতেছি। তাঁহাদের বলিতে চাই যে, সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ না থাকিলে, পরলোকগত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি সম্বন্ধে—তা তাঁর প্রশংসারই হউক, নিন্দারই হউক—আমি কখনই ইহা প্রকাশ করিতাম না। তত্ত্বান্বেষীগণকে একটি বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, নারীজাতি সম্বন্ধে তাঁহার কৌতূহল ছিল সর্বদা জাগ্রত। নারীর কলঙ্ক সম্বন্ধে তিনি সাধারণতঃ বিশ্বাস করিতেন না। এবং তাদের ভুলের জন্য সর্বদাই তিনি হৃদয়ে বেদনা অনুভব করিতেন।”

মিস্ত্রীপল্লীতে

ব্রহ্মদেশে অবস্থান কালে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন শহরের দু মাইল দূরে একটা বস্তীতে কলকারখানার মিস্ত্রীদের সঙ্গে একত্রে অনেক বছর বাস করেছিলেন। সেখানে এই মিস্ত্রীরাই ছিল তাঁর একমাত্র প্রতিবেশী। শরৎচন্দ্র এদের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিশে বাস করতেন। শরৎচন্দ্রের এই মিস্ত্রী প্রতিবেশীরাও তাঁকে যারপর নাই ভক্তিশ্রদ্ধা করত। তাদের কাজে কর্মে, দায়ে বিপদে শরৎচন্দ্র না হলে চলত না। অর্থাভাবে এদের অনেকেরই বাড়ীতে চিকিৎসা হয় না দেখে, শরৎচন্দ্র এদের জন্যই হোমিওপ্যাথি বই কিনে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিখেছিলেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হিসাবে শরৎচন্দ্র তাঁর প্রতিবেশীদের মধ্যে বেশ সুনামও অর্জন করেছিলেন। কয়েকটা জটিল কেসও তিনি সারিয়ে দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র কিছু না নিয়ে এদের সকলেরই দাতব্য চিকিৎসা করতেন।

মিস্ত্রীপল্লীর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য শরৎচন্দ্র ল্যান্সডাউন স্ট্রীটে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন। সতীশচন্দ্র দাস তাঁর 'শরৎ-প্রতিভা' গ্রন্থে লিখেছেন, তাঁর এক বন্ধু ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছিলেন। বন্ধুটি একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে, তিনি বন্ধুর বদলে কিছুদিন ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাজ করেছিলেন।

গিরীন্দ্রনাথ সরকার, শরৎচন্দ্র বস্তীতে মিস্ত্রীদের মধ্যে কিভাবে বাস করতেন সে কথার উল্লেখ করে তাঁর 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন—

"সহর হইতে দুই মাইল দূরে শরৎচন্দ্র যেখানে থাকিতেন সে স্থানগুলির নাম 'বোটাটং' ও 'পোজোনডং'। রেঙ্গুন শহরে যতগুলি ধানের কল, কাঠের কল, ডক ইয়ার্ড ও ঢালাইয়ের কারখানা প্রভৃতি আছে, তাহাতে ফিটার, বাইশম্যান ও ঢালাই মিস্ত্রীর সমস্ত কাজ বাঙ্গালী মিস্ত্রীদের ছিল একচেটিয়া। অনেক অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ সন্তানও এই কাজ শিখিয়া এখানে দৈনিক তিন চার টাকা রোজগার করে। ঐ সকল মিস্ত্রী একত্র দলবদ্ধ হইয়া এ অঞ্চলে সপরিবারে বাস করিত। ইহাদের জন্য এখানে সারি সারি অনেক কাঠের

ব্যারাক বাড়ী এখনও আছে। শরৎচন্দ্র স্বল্প ভাড়ায় ঐরূপ একটি ছোট বাড়ীতে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন বলিয়া আমি ঐ পল্লীর নাম 'মিস্ত্রী পল্লী'র পরিবর্তে 'শরৎ-পল্লী' রাখিয়াছিলাম। এ পল্লীতে শরৎচন্দ্রের মত শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান কেহই ছিল না। শরৎচন্দ্রের কোনরূপ আত্মাভিমান না থাকায় তিনি মিস্ত্রীদের সহিত অবাধে মেলামেশা করিতেন, তাহাদের চাকরির দরখাস্ত লিখিয়া দিতেন, বিবাদ-বিসংবাদের সালিশ হইতেন, রোগে হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিতেন, সেবা-শুশ্রূষা করিতেন, বিবাহাদি উৎসবে যোগদান করিতেন এবং বিপদে পরম আত্মীয়ের ন্যায় সাহায্য করিতেন। এই সকল সদ্‌গুণের জন্য ওখানকার স্ত্রী-পুরুষ সকলেই শরৎচন্দ্রকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিত এবং 'বামুন দাদা' বলিয়া ডাকিত। এই বামুন দাদার প্রতি তাহাদের প্রভূত বিশ্বাস ছিল, অনেকের টাকাকড়ির আদান-প্রদান এই বামুন দাদার মারফতেই হইত। ইহাদের একটা কীর্তনের দল ছিল। বামুন দাদার পরিচালনায় ছুটির দিন ইহারা খোল, করতাল সহযোগে নাম সংকীর্তন করিত।"

শরৎচন্দ্রের পরিচালনায় এই নাম সংকীর্তনের কথা-প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র দাস তাঁর 'শরৎ-প্রতিভা' গ্রন্থে লিখেছেন—

"সন্ধ্যাবেলা তুলসীগাছকে বেলফুলের মালায় সজ্জিত করিয়া তিনি পাঁচজন বন্ধু-বান্ধবকে লইয়া সংকীর্তন করিতে খুবই ভালবাসিতেন। কোন সময় সন্ধ্যাবেলা রাস্তায় দেখা হইলে, দেখা যাইত, তাঁহার হাতে বেলফুলের মালা, বাজার হইতে কিনিয়া আনিতেছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—ঠাকুরকে দেবো হে, সন্ধ্যাবেলা যেও হরিনাম হবে।"

শরৎচন্দ্রদের এই বস্তীতে সুরেন্দ্রনাথ মান্না নামে একজন লোক বাস করতো। তার বাড়ী ছিল হাওড়া জেলার আমতা থানায়। সে ছিল শরৎ-চন্দ্রের হরিনামের দলের দোহার। সে শরৎচন্দ্রের দ্বারা একবার বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের সেই উপকারের কথা স্মরণ করে সে বলে—

"আমি শরৎবাবুকে ১৯০৮ ইংরেজি হতেই জানতাম। এমন কি এক বাড়ীতেও বাস করেছি। আমি ছিলাম তাঁর দোহার, যদিও তিনি কীর্তনের পদাবলী ও সুর যোজনা করতে পারতেন, কিন্তু গাইতে চাইতেন না। যে দিনই তিনি সংকীর্তনের খবর পেতেন, এমন কি চিঠিও পেতেন, তিনি ডাকতেন—ওহে সুরেন শীঘ্রই তৈরী হও, সংকীর্তনে যেতে হবে, চিঠি এসেছে।

নিজের ঘরেও কীর্তন বাদ যেত না। আমাদের দস্তুরমত একটা সংকীর্তনের দলও ছিল। দোল, চাঁচর ইত্যাদি কৃষ্ণলীলার উৎসব শরৎবাবুর কাছে কিছুই বাদ যেত না। এই প্রকারে পাঁচ সাত বছর চলাফেরার পরে রেঙ্গুনে বর্মা অয়েল কোম্পানীর কারখানা হতে আমার চাকরি গেল। আমি পড়ে গেলুম বিপদে। আমার দু-চারজন বন্ধু তখন বর্মায় গোল্ড মাইনে চাকরি করছিল। ক্রমান্বয়ে চিঠিপত্রের চালাচালিতে, হঠাৎ এক বন্ধুর চিঠি পাওয়া গেল, নাম্‌টু গোল্ড মাইনে গেলে চাকরি হতে পারে।

দু-চারদিন পরে শরৎবাবু খবর পেলেন। তিনি বললেন—তুমি নাম্‌টুতে চলে যাও, এখানে তোমার কোন সুবিধা হবে না।

তখন আমি কপর্দকহীন। এমন কি বেণীবাবু বলে এক ভদ্রলোক আমার কাছে এক শ' টাকা পেতেন।

আবার দু-চারদিন পরে শরৎবাবু বললেন—কি হে সুরেন, তোমার নাম্‌টু যাবার কি হ'ল ?

আমি আর গোপন করতে না পেরে বললাম—দাদাঠাকুর, যাই কি করে ? একটা পয়সা নেই, দাঠাকুরের হোটেলে খোরাকির টাকা বাকি, আবার বেণীবাবু পাবেন এক শ' টাকা।

শরৎবাবু আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে আর কোন কথা বললেন না। পর দিবস আমাকে ডেকে বললেন—সুরেন, এদিকে এসো।

আমি তখন সামনে যেতে বললেন—রেঙ্গুন হতে নাম্‌টু যাবার রাস্তা জান ? প্রথমতঃ ম্যাণ্ডেলের মেল গাড়ীতে উঠে তোমাকে ম্যাণ্ডেলে নামতে হবে। উঠতে হবে লাসিওর গাড়ীতে। লাসিও যেতে পথে পাবে নামিও স্টেশন। সেই স্টেশনে নেমে রাত্রে স্টেশনে থাকতে হবে। পরদিন সকালবেলা পাবে মাইনের গাড়ী। যদিও প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাতায়াত করে না বটে, তবুও তোমার বন্ধুর চিঠি দেখালেই তোমাকে নিয়ে যাবে। খরচ পড়বে প্রায় গাড়ী ভাড়া সহ পনর টাকার মতন। টাকাটা আমি দিচ্ছি, তুমি আর দেরি না করে দু-একদিনের মধ্যেই বের হয়ে পড়।

আমি বেণীবাবুর টাকাটার কথা বলতেই তিনি বললেন—সে টাকার বিষয় তোমাকে ভাবতে হবে না। তার জবাব আমি দেবো। যাচ্ছ শীতের দিনে, সেখানে শীত খুব বেশী। জামা কাপড় দরকার হলে আমাকে চিঠি দিও। দেখি কাল ক'টায় ট্রেন ছাড়ে।...

পর দিবস সকালবেলাই শরৎবাবু বই দেখে আমায় বলে দিলেন। এমন কি যাবার খরচের টাকাটাও আমার হাতে দিলেন।

আমি আর কোন কথা না বলে সেদিনই বেলা দুটোর গাড়ীতে নাম্‌টু চলে গেলাম। আজও সেই মহাত্মার কৃপায় স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখে কাল যাপন করছি। শরৎবাবুকে আমরা শুধু বন্ধুভাবে দেখিনি। আমরা যেমন দেখেছি, একদিকে বন্ধু অপরদিকে আত্মীয়, তিনি একদিকে ছিলেন পরোপকারী, অপর দিকে ছিলেন মহৎ উদার। একদিকে ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, অপরদিকে ছিলেন দেবতা।"

শরৎচন্দ্র যে মিস্ত্রীপল্লীতে থাকতেন, সেই মিস্ত্রীপল্লীর অনেক বাড়ীতেই শনিবার সন্ধ্যা হলেই মেয়ে পুরুষে উভয়ে মিলে মদ খেয়ে পৈশাচিক কাণ্ড বাধাত। পুরুষদের এমনি নেশার জের চলত যে, কেউ কেউ সোমবার মঙ্গল বারেও কারখানায় কাজে যেতে পারত না। তাদের এই নেশা যখন কেটে যেত, তখন কিন্তু তাদের আবার সংসারের জন্য ভাবনার সীমা থাকত না। তখন তারা ভাবত—এই গরহাজিরার জন্য যদি চাকরি যায়, তাহলে কি হবে! চাকরি না গেলেও যদি মাইনে কাটা যায়, বা জরিমানা হয়, তাহলেও তো আর্থিক ক্ষতি হবে!

তাই তারা নেশা কেটে যাবার পরেই কাতরভাবে শরৎচন্দ্রের কাছে দরখাস্ত লেখাতে যেত। তাদের তখনকার ঐ অসহায় ও নিঃস্বভাব দেখে তাদের উপর শরৎচন্দ্রের মায়া হ'ত।

তারা ঐভাবে শরৎচন্দ্রের কাছে দরখাস্ত লেখাতে গেলে, শরৎচন্দ্র অনেক সময়ই তাদের বুঝিয়ে নেশা করতে নিষেধ করতেন। এইভাবে তিনি কারও কারও নেশা ছাড়িয়েও ছিলেন। যেমন—শরৎচন্দ্রের বাড়ীর পাশেই সাধু নামে একটি মিস্ত্রী বাস করত। সে বম্বে-বর্মা ট্রেডিং কোম্পানীর কারখানায় ফিটারের কাজ করত। সাধুর বাড়ী ছিল উড়িষ্যার ভদ্রক জেলায়। সে শরৎচন্দ্রকে দাদাঠাকুর বলত।

শনিবার সন্ধ্যা হলেই সাধুর ঘাড়ে ভূত চাপত। সে তখন এমনি নেশা করত যে, তার জের চলত দু-তিন দিন।

সেইজন্য সে সোমবারে তো বটেই, এমন কি মঙ্গলবারেও কারখানায় যেতে পারত না। তখন সে শরীর খারাপের নাম করে শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে

দরখাস্ত লিখিয়ে নিয়ে যেত। এইরূপ দু-একবার ছুটির দরখাস্ত লিখে দেবার পর শরৎচন্দ্র তাকে বলেন—সাধু, আর নয়। সামনের শনিবারে যদি নেশা কর তো, তোমার দরখাস্ত তো লিখে দেবই না, এমন কি তোমার সাহেবকে বলে তোমার চাকরি খতম করে দেব।

সাধু তখন শরৎচন্দ্রের কাছে নানা রকম দিব্যি করে মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল।

শরৎচন্দ্র, তাঁর পল্লীর অশিক্ষিত মিস্ত্রীরা বিপথগামী হলে, তাদের যেমন সৎপথে আনতে চেষ্টা করতেন, তেমনি তাঁর পরিচিত বিপথগামী শিক্ষিত ব্যক্তিদেরও তিনি সংশোধনের চেষ্টা করতেন। যেমন—একজামিনার পাবলিক ওয়ার্কস্ একাউণ্টস অফিসে ত্রৈলোক্যনাথ বসাক নামে তাঁর একজন সহকর্মী ছিলেন। এই বসাক দেশে তার স্ত্রীকে ফেলে রেখে, বর্মা মুলুকে এসে বর্মী মেয়ে বিয়ে করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র অনেক চেষ্টা করেও বসাককে সংশোধন করতে পারেন নি। তাই তিনি তাঁর অফিসের অন্যান্য সহকর্মী বন্ধুদের কাছে প্রায়ই আক্ষেপ করে বলতেন—কতজনেরই তো ভূত ছাড়ালাম, শেষটায় বসাকের কাছেই আমাকে হার মানতে হ'ল। এ যে লেখাপড়া জানে, একে যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝায় কার সাধ্য।

রেঙ্গুনে থাকাকালে শরৎচন্দ্র তাঁর পল্লীর দুঃস্থ বাঙ্গালীদের যেমন সাহায্য করতেন, অভাবগ্রস্ত বর্মীদেরও তেমনি সাহায্য করতেন। তিনি বলতেন—এ দেশটা এদের, আমরা এসে এখান থেকে পয়সা নিয়ে যাচ্ছি। শুধু তাই নয়, এদের ভাতও আমরা নিয়ে যাচ্ছি। তাই এদের অভাবে আমাদের দেখা উচিত।

প্রথম বিবাহ

শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন—

"শরৎচন্দ্র স্বজাতীয় কোন ব্রাহ্মণ কন্যাকে সমাজের অবিচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্ব-ইচ্ছায় বিবাহ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন।

বিবাহিত জীবনে শরৎচন্দ্র বেশীদিন সুখভোগ করিতে পারেন নাই। যৌবনে তিনি স্ত্রীর বড় অনুরক্ত ছিলেন। স্ত্রীকে ছাড়িয়া এক মুহূর্তও থাকিতে কষ্টবোধ করিতেন বলিয়া আমি তাঁহাকে মহাস্ত্রৈণ বলিয়া উপহাস করিতাম।

স্বপ্নবিলাসী শরৎচন্দ্রের প্রাণে ছিল অপূর্ব প্রেমের ভাণ্ডার, তিনি তাঁহার সমস্ত খুলিয়া দান করিয়াছিলেন স্ত্রী শান্তি দেবীকে, কিন্তু ভবিতব্যের বিধান অন্য প্রকার থাকায় ঘটনা অন্যরূপ হইল। বিধির বিপাকে বিবাহের দুই বৎসর পরেই তাঁহার প্রথম পক্ষের স্ত্রী প্লেগ রোগাক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন। এ সময়ে তিনি অসহায় অবস্থায় রেঙ্গুন সেবক ও সংকার সমিতির সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন।"

গিরীনবাবু এরপর তাঁর গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের প্রথম পক্ষের স্ত্রী শান্তি দেবীর মৃত্যু ও তাঁর শবদাহের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।

গিরীনবাবু রেঙ্গুন সেবক ও সংকার সমিতির সম্পাদক ছিলেন। শান্তি দেবীর অসুখের সময় এবং তাঁর মৃত্যুর পর শবদাহের সময়, তিনি শরৎচন্দ্রকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের এই প্রথম বিবাহ সম্বন্ধে নরেন্দ্র দেব তাঁর 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন—

"পরদুঃখকাতর কোমল হৃদয়ের অনুপ্রেরণায় এই সময় শরৎচন্দ্রকে অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থায় ব্রহ্মদেশে একটি স্বজাতীয় কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে হয়েছিল। সে কাহিনী গল্প-কথার ন্যায় রোমান্টিক।

তিনি তখন রেঙ্গুনের যে বাড়ীতে বাস করতেন, তার নীচের তলায় একজন মেকানিক বা কলকজার মিস্ত্রী ছিল। জাতিতে সে বাঙ্গালী—

চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ, বিপত্নীক। সংসারে একটিমাত্র বিবাহযোগ্যা অনূঢ়া কন্যা ছাড়া আর কেউ ছিল না। চক্রবর্তীর চরিত্রে ছিল অনেক দোষ। সন্ধ্যার পর কারখানা থেকে ফিরে এসে বাড়ীতে সে এক আড্ডা বসাতো। সেখানে জুটতো যত নেশাখোর মাতাল গেঁজেল কারিগর ও বদমাইসের দল। এরাই ছিল তার বন্ধু ও সঙ্গী। অনেক রাত্রি পর্যন্ত চলতো তাদের হুল্লোড়। মেয়েটিকে খাটতে হ'ত এই সব পাষণ্ডদের নানারকম ফাইফরমাস। চক্রবর্তীকে রেঁধে খাওয়ানো, বাসন মাজা প্রভৃতি সংসারের যা কিছু কাজ সবই করতো এই মেয়েটি। কোনো বিষয়ে একটু কিছু ত্রুটি হ'লেই চক্রবর্তী দিত মেয়েকে ধরে নির্মম প্রহার।

শরৎচন্দ্র সন্ধ্যার পর প্রায়ই বাসায় থাকতেন না। অনেক রাত্রে ফিরে এসে ঘরে শুতেন, আবার সকালে উঠে বেরিয়ে যেতেন।

একদিন রাত্রে শুতে এসে দেখেন, ঘর ভিতর থেকে বন্ধ। কে তাঁর ঘরে ঢুকে খিল দিয়েছে—চোর নয় তো?—তিনি দরজায় জোর ধাক্কা দিয়ে খুলে দেবার জন্য ডাকতে লাগলেন। একটু পরে দরজা খুলে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল চক্রবর্তীর মেয়ে। থর্ থর্ করে সর্বশরীর কাঁপছে তার তখনও—দুচোখ ভেসে যাচ্ছে অশ্রুজলে। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে, চক্রবর্তী তার বন্ধু পাকা বদমায়েস ও মাতাল ঘোষাল-বুড়োর সঙ্গে মেয়েটির বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছে। ঘোষাল-বুড়ো সেজন্যে চক্রবর্তীকে কিছু টাকাও নাকি দিয়েছে। আজ নেশার ঝোঁকে, চক্রবর্তীর মেয়েকে সে নিজের পত্নী বলে দাবি ক'রে অন্দরের মধ্যে তেড়ে এসেছিল। মেয়েটি ভয়ে পালিয়ে এসে দাদাঠাকুরের ঘরে খিল দিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। কিন্তু এমন আর কদিন চলবে! মেয়েটি শরৎচন্দ্রের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল, আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আপনি আমাকে বাঁচান।

শরৎচন্দ্র মেয়েটিকে সে রাত্রের মত সেই ঘরেই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাতে বলে নীচে নেমে গেলেন। বলে গেলেন ভয় নেই, কাল সকালে আমি ফিরে এসে এর বিহিত করবো।

পরের দিন চক্রবর্তীকে মেয়ের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে, শরৎচন্দ্র পড়লেন বিপদে। চক্রবর্তী বলে—মেয়ে যোগ্য হয়েছে, বিয়ে দেব না? আমি গরীব মানুষ, এই বিদেশে ওর চেয়ে ভালো পাত্র আর কোথা পাবো? ঘোষালের টাকা আছে, ছুঁড়িটা ভাত কাপড়ের কষ্ট পাবে না। একটু নেশা ভাঙ করে—

হোক্। সে তো আমিও করি। আর যদি বয়সের কথা বল বাবু—বেটা ছেলের আবার বয়স কি ?

শরৎচন্দ্র অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু চক্রবর্তী সে পাত্রই নয়। ঘোষালের দেনা শরৎচন্দ্র মিটিয়ে দেবেন, তবুও বলে—না, মেয়ের আমার বিয়ে দিতে হবে তো ? শেষকালে চক্রবর্তী ধরে বসলো—এতই যদি তোমার প্রাণে দয়ামায়া বাবু, তুমিই কেন এই গরীব বামুনের মেয়েটাকে নিয়ে আমার জাত কুল রক্ষা কর না।

অগত্যা শরৎচন্দ্রকেই নিতে হয়েছিল সেই মেয়েটির ভার। তাকে নিয়ে শরৎচন্দ্রের দিন সুখেই কাটছিল। একটি পুত্র সন্তানও হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য তখনও ফিরছিল তাঁর পাছে পাছে। রেঙ্গুনে আবার একবার প্লেগের দারুণ মহামারী দেখা দিল—শরৎচন্দ্রের পত্নী, পুত্র সেই প্লেগের আক্রমণে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে যেন স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল। কোমল-হৃদয় শরৎচন্দ্র সেদিন বালকের ন্যায় অধীরভাবে কেঁদেছিলেন। তাঁর সেই সকাতর অশ্রু বিসর্জন দেখে রেঙ্গুনের তাঁর পরিচিত বন্ধু-বান্ধবরা চোখের জল রোধ করতে পারেন নি। রেঙ্গুনের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ কনট্রাক্টর মিঃ জি, এন, সরকার বা গিরীন্দ্রবাবু এই বিপদে শরৎচন্দ্রকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন।”

শরৎচন্দ্রের শান্তি দেবীকে বিবাহ করার এই যে চমকপ্রদ কাহিনীটি নরেন্দ্র দেব তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, এই কাহিনীটি তিনি কোথায় পেলেন, এ সম্বন্ধে আমি নরেনবাবুকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তরে নরেনবাবু বলেছিলেন—শরৎচন্দ্রের বিবাহ কাহিনী এবং তাঁর পুত্রের কাহিনীটিও আমি গিরীন্দ্রনাথ সরকারের কাছেই শুনেছিলাম।

গিরীনবাবু তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—“(শরৎচন্দ্র) স্বজাতীয় কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যাকে সমাজের অবিচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্ব-ইচ্ছায় বিবাহ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন।” গিরীনবাবুর এই উক্তিতেই মনে হয়, তিনি নরেনবাবুর বর্ণিত শরৎচন্দ্রের ঐ বিবাহ কাহিনীটিরই ইঙ্গিত করেছেন।

কিন্তু গিরীনবাবু তাঁর গ্রন্থে শান্তি দেবীর শবদাহের বিস্তৃত বিবরণ লিখলেও শরৎচন্দ্রের পুত্রের শবদাহের কথা বা তার অস্তিত্বের কথা পর্যন্তও লিখলেন না কেন ? তবে কি শরৎচন্দ্রের কোন পুত্র সন্তান ছিল না ? বা তিনি কি নরেন্দ্র দেবের কাছে শরৎচন্দ্রের পুত্রের কাহিনীটি বলেন নি ?

কিন্তু তা তো নয়, নরেনবাবু বলেন, গিরীনবাবু তাঁর কাছে শরৎচন্দ্রের

পুত্রের কথাও বলেছেন। তাহলে গিরীনবাবু তাঁর গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের পুত্রের কথা লিখলেন না কেন?

এ সম্বন্ধে এই বলা যেতে পারে যে, কি শরৎচন্দ্রের বিবাহ কাহিনী (যা নরেনবাবু গিরীনবাবুর কাছে শুনে তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন), আর কি শরৎচন্দ্রের পুত্রের শবদাহের কাহিনী, কোনটারই মধ্যে গিরীনবাবুর আত্মকাহিনী বলার তেমন কোন সুযোগ না থাকায়, তাঁর গ্রন্থে ঐ কাহিনীগুলির উল্লেখ করেন নি। কেননা সত্য কথা বলতে কি, গিরীনবাবুর 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থটি একরূপ তাঁরই আত্মকাহিনী। আর গিরীনবাবু এ বিষয়ে কিছুটা সচেতন ছিলেন বলেই, তিনি তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—"তাঁহার (শরৎচন্দ্রের) সহিত আমার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকায় স্থানে স্থানে আত্মকাহিনীর বাহুল্যদোষ ঘটিয়াছে। সেজন্য সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ ক্ষমা করিবেন।"

যাই হোক, শরৎচন্দ্রের যে একটি পুত্র হয়েছিল এবং সেই পুত্রটি যে এক বৎসর জীবিত ছিল, এ কথাটি সত্য বলেই মনে হয়। এ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের নিজের মুখের একটি উক্তি এখানে বলছি।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে এসে যখন হাওড়ায় বাজে শিবপুরে বাস করতেন, তখন কবি গিরিজাকুমার বসু তাঁর প্রতিবেশী ছিলেন। শরৎচন্দ্র গিরিজাবাবু এবং তাঁর স্ত্রী লেখিকা তমাললতা বসুকে খুব স্নেহ করতেন। শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরে অবস্থানকালে এই বসু-দম্পতির একটি যুবক পুত্র পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করে অকালে মারা যায়। ছেলেটি মারা গেলে, গিরিজাবাবু ও তাঁর স্ত্রী তমাললতা দেবী যখন খুব কান্নাকাটি করছিলেন, তখন শরৎচন্দ্র তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—তোমরা তবু তো ওকে এত বৎসর ধরে লালন পালন করলে, কিন্তু আমি যে এক বৎসরের বেশী লালন পালন করতে পাইনি।

তমাললতা দেবী তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র কর্তৃক তাঁদের প্রতি সান্ত্বনাদানের এই কথাটি উল্লেখ করেছেন।

গিরিজাবাবু ও তমাললতা দেবীর পুত্র-শোকের সময় শরৎচন্দ্র মিথ্যা করে তাঁর নিজের পুত্রশোকের কাহিনী তুলে তাঁদের সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, এ কথা বিশ্বাস হয় না। কেননা মানুষ ঐ সময় ঐ ভাবে মিথ্যা কথা বলতে পারে না। তাই মনে হয়, শরৎচন্দ্র শান্তি দেবীকে যে বিবাহ করেছিলেন এবং শান্তি দেবীর গর্ভে যে তাঁর একটি পুত্র জন্মেছিল, এ কথা সত্য।

দ্বিতীয় বিবাহ

শরৎচন্দ্রের প্রথম পক্ষের স্ত্রী শান্তি দেবীর মৃত্যুতে শরৎচন্দ্রের জীবনে যে পরিবর্তন ঘটেছিল এবং তিনি কিভাবে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন, সে সম্বন্ধে গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন—

"এই ঘটনায় (শান্তি দেবীর মৃত্যু) শরৎচন্দ্রের জীবনের অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল। তিনি ঐ কদর্য পল্লী ত্যাগ করিয়া শহরে কয়েকটি বন্ধু-বান্ধবের সহিত একত্রে বাসা করিয়াছিলেন। দুই বৎসর পরে শরৎচন্দ্র ছুটি লইয়া কলিকাতা যান এবং দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক রেঙ্গুনে আসিয়া আমার বাড়ীর সন্নিকটে ৩৬নং গলিতে বাড়ী ভাড়া করিয়া কয়েক বৎসর ছিলেন। তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই। দুইটি কুকুর ও কয়েকটি পক্ষীশাবক তাঁহার অপত্য-স্নেহের অধিকারী হইয়াছিল।"

শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় বিবাহ সম্বন্ধে নরেন্দ্র দেব তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—

"মধ্যে মধ্যে অল্প কয়েক দিনের জন্য বাঙ্গলা দেশে এসে ভাইবোনদের খবর নিয়ে, আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে দেখাশুনা করে, শরৎচন্দ্র আবার ফিরে যেতেন রেঙ্গুনে। এমনি এক আসা-যাওয়ার মাঝে হিরণ্ময়ী দেবী নামে একটি অসহায়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ রমণীকে তিনি দ্বিতীয়বার সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। ইনি মেদিনীপুর-নিবাসী ৺কৃষ্ণদাস অধিকারী মহাশয়ের কন্যা।"

এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরৎচন্দ্র সংক্রান্ত বই দুখানির কথাও মনে পড়ে। ব্রজেনবাবু তাঁর এই দুখানা বইয়েই হিরণ্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্রের জীবন-সঙ্গিনী বলে গেছেন। কোথাও স্ত্রী বলেন নি, বা শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে বিয়ে করেছিলেন, এরূপ কোন কথা লেখেন নি। জীবন-সঙ্গিনী শব্দের অর্থ স্ত্রী হয়, কিন্তু স্ত্রী ছাড়া জীবন-সঙ্গিনী অর্থে শুধু জীবন-সঙ্গিনীও হতে পারে। তাছাড়া ব্রজেনবাবু যে ইচ্ছা করেই স্ত্রী না লিখে জীবন-সঙ্গিনী লিখেছেন, একথা তিনি আমাকে কয়েকবার বলেছেন। তিনি বলতেন—শরৎচন্দ্রের এই বিবাহ ঠিক আমরা যাকে সামাজিক বিবাহ বলি, তা

ছিল না। অতএব আমি তাকে বিবাহ বলতে পারি না। এই জন্যই স্ত্রী না লিখে জীবন-সঙ্গিনী লিখেছি।

নরেনবাবু লিখলেন, সঙ্গিনী। ব্রজেনবাবু বললেন, জীবন-সঙ্গিনী। এখন প্রশ্ন ওঠে, তবে কি সত্যই শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে বিবাহ করেন নি? শুধু জীবন-সঙ্গিনী হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন?

শরৎচন্দ্রের এই হিরণ্ময়ী দেবীকে গ্রহণ করা সম্বন্ধে, হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর মুখে এবং শরৎচন্দ্রের নিকট আত্মীয়দের কাছ থেকে আমি যা শুনেছি, তা এই :—

হিরণ্ময়ী দেবীর বাপের বাড়ী মেদিনীপুর জেলার শালবনীর কাছে শ্যামচাঁদপুর গ্রামে। তাঁর বাবার নাম কৃষ্ণদাস চক্রবর্তী। হিরণ্ময়ী দেবীর অতি শৈশব অবস্থাতেই তাঁর মা মারা যান। কৃষ্ণদাসবাবুর এক বন্ধু রেঙ্গুনে থাকতেন। সেই সূত্রেই স্ত্রীর মৃত্যুর কয়েক বছর পরে কৃষ্ণদাসবাবু কন্যাকে নিয়ে রেঙ্গুনে যান। রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণদাসবাবুর পরিচয় হয় এবং এই পরিচয়ের ফলেই তিনি রেঙ্গুনেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দেন। বিয়ের সময় হিরণ্ময়ী দেবীর বয়স ছিল ১৪ বছর।

কন্যার বিয়ের পর কৃষ্ণদাসবাবু দেশে তাঁর গ্রামে ফিরে এসেছিলেন। কৃষ্ণদাসবাবুর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। শরৎচন্দ্র তাঁর শ্বশুর মশায়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য রেঙ্গুন থেকে প্রতি মাসে দশ টাকা করে পাঠিয়ে দিতেন।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে হাওড়ায় বাজে শিবপুরে থাকার সময়ও প্রতি মাসে তাঁর শ্বশুরকে ঐ দশ টাকা করেই পাঠাতেন। শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুরে থাকার সময়ই তাঁর শ্বশুর মশায় মারা যান। শরৎচন্দ্র তাঁর শ্বশুর মশায়ের মৃত্যু সংবাদ জানতে পারেন, যেদিন তাঁর পাঠানো মণি অর্ডারের টাকা ফেরৎ আসে। ঐদিনই শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে তাঁর বাবার মৃত্যু সংবাদ জানান।

হিরণ্ময়ী দেবী রেঙ্গুন থেকে এসে বাজে শিবপুরে থাকার সময় একবার মাত্র তাঁর বাপের বাড়ী গিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি তাঁর মেজ-জায়ের ছেলে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে নিজের কাছে রেখেছিলেন এবং তাঁকে নিজের ছেলের মতন করে মানুষ করেছিলেন। এই হিসাবে রামকৃষ্ণবাবু

তাঁর জ্যাঠাইমাকে জ্যাঠাইমা না বলে মা বলেই ডাকতেন। রামকৃষ্ণবাবু তাঁর এই মা অর্থাৎ জ্যাঠাইমার কাছে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হিরণ্ময়ী দেবীর বিয়ে সম্বন্ধে যা শুনেছিলেন, সে সম্বন্ধে বলেন—শরৎচন্দ্র সস্ত্রীক রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে বাজে শিবপুরে বাসা করলে অনিলা দেবী ভাই-এর বাড়ীতে যান। সেখানে গিয়ে একদিন তিনি কথায় কথায় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হিরণ্ময়ী দেবীর বিয়েটা কিভাবে হয়, সে সম্বন্ধে তিনি হিরণ্ময়ী দেবীকে প্রশ্ন করেন। উত্তরে তিনি অনিলা দেবীকে বলেছিলেন যে, হিরণ্ময়ী দেবী যখন রেঙ্গুনে তাঁর বাবার কাছে থাকতেন, সেই সময় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বাবার বিশেষ পরিচয় ছিল। এই বিশেষ পরিচয়ের জোরেই হিরণ্ময়ী দেবীর বাবা একদিন সকালে কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করে বলেন—আমার মেয়েটির এখন বিয়ের বয়স হয়েছে। একে সঙ্গে নিয়ে একা বিদেশ বিভুঁইয়ে কোথায় থাকি। আপনি যদি অনুগ্রহপূর্বক আমার এই কন্যাটিকে গ্রহণ করে আমায় দায়মুক্ত করেন তো গরীব ব্রাহ্মণের বড় উপকার হয়। আর একান্তই যদি না নিতে চান তো, আমায় কিছু টাকা দিন। আমি মেয়েকে নিয়ে দেশে ফিরে যাই। দেশে গিয়ে মেয়ের বিয়ে দিই।

কৃষ্ণদাসবাবু শেষে শরৎচন্দ্রের কাছে টাকার কথা বললেও, তিনি বিশেষ করে শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেন, যেন তিনিই তাঁর কন্যাটিকে গ্রহণ করেন।

শরৎচন্দ্র প্রথমে অরাজী হলেও, কৃষ্ণদাসবাবুর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তাঁর কন্যাকে বিয়ে করেন।

শরৎচন্দ্রের সহিত হিরণ্ময়ী দেবীর বিবাহ সম্বন্ধে এই গেল আমার শোনা কথা। এদিকে বেহালার জমিদার শরৎচন্দ্রের স্নেহভাজন মণীন্দ্রনাথ রায়ও একবার শরৎচন্দ্রের কলকাতার বাড়ীতে গিয়ে কথা-প্রসঙ্গে হিরণ্ময়ী দেবীকে তাঁর বিয়ের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। এবং তাঁর মুখে যা শুনেছিলেন, সেই সম্বন্ধে মণিবাবু ১৩৬১ সালের আশ্বিন সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে 'হিরণ্ময়ী দেবী' নামক একটি প্রবন্ধে লেখেন—

"কেন জানিনা এক দুর্বল মুহূর্তে একটি অসঙ্গত প্রশ্ন বৌদিকে জিজ্ঞাসা করলাম। আচ্ছা বৌদি, আপনার বিয়ে কোথায় হয়েছিল, রেঙ্গুনে না এখানে? এই প্রসঙ্গে পাঠকদের জানাতে চাই যে আমি নিজে বহুদিন পূর্বে একবার দাদাকে ঐ একই প্রশ্ন করেছিলাম। তাতে তিনি বলেছিলেন যে,

মেদিনীপুরে যখন তিনি ছিলেন, তখন এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণের এক অসুন্দরী অরক্ষণীয়া কন্যাকে বিবাহ করে তিনি ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হতে মুক্ত করে ছিলেন। এর বেশী কিছু আমিও জিজ্ঞাসা করি নি, তিনিও বলেন নি।...

বৌদি বললেন যে, তিনি মেদিনীপুরের মেয়ে ও দাদা তাঁকে সেখানেই বিবাহ করেছিলেন, তারপর তাঁকে নিয়ে রেঙ্গুনে যান। বললেন—আমার বাবা বড় গরীব ছিলেন, তোমার দাদা বিয়ের পর রেঙ্গুন থেকে নিয়মিত প্রতি মাসে বাবাকে মণিঅর্ডার করে সাহায্য পাঠাতেন। আমি লেখাপড়া জানি না, বাবার হাতের সই করা টাকা পাওয়ার রসিদ যখন ফিরে যেতো রেঙ্গুনে, তখনই জানতাম যে, বাবা আমার ভালো আছেন—এমন অনেক দিন হয়েছিল। তারপর একদিন টাকার রসিদ না এসে টাকা সমেত মণিঅর্ডার তোমার দাদার নামে ফিরে এলো। সেই দিনই জানলাম, বাবা আমার আর ইহজগতে নেই। সেদিন বেশ মনে পড়ে আজও, কি কান্নাই না কেঁদেছিলাম আমি। ১৪ বছরের মেয়ে বিয়ে করে তোমার দাদা এনেছিলেন—এই দীর্ঘদিন আর বাবাকে দেখিনি; শুধু আশা করে বসে থাকতাম বাবার হাতের সই করা রসিদখানির জন্য। সইটাই তাঁর বার বার করে দেখতাম—হ্যাঁ বাবারই সই, তিনি ভাল আছেন, কত আনন্দই না পেতাম। তারপর তাও একদিন শেষ হয়ে গেল।"

এখানে মণিবাবুর লেখায় দেখা যাচ্ছে—(১) শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে মেদিনীপুরে বিয়ে করেছিলেন এবং তারপর তিনি তাঁকে রেঙ্গুনে নিয়ে যান। (২) হিরণ্ময়ী দেবী বিয়ের পর তাঁর বাবাকে আর দেখেন নি এবং রেঙ্গুনে থাকবার সময়ে তাঁর বাবার মৃত্যু সংবাদ জানতে পারেন।

এদিকে হিরণ্ময়ী দেবী কিন্তু আমাকে বলেছিলেন যে, শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনেই তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। আর তাঁর বাবার মৃত্যু সংবাদ তিনি বাজে শিবপুরে থাকবার সময়েই জানতে পেরেছিলেন।

হিরণ্ময়ী দেবী আমাকে বলেছিলেন, রেঙ্গুনেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল। রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কথা থেকেও জানা যাচ্ছে, হিরণ্ময়ী দেবী অনিলা দেবীকেও বলেছিলেন, রেঙ্গুনেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। অনিলা দেবীর মেজ-জা সুকুমারী দেবীর কাছে শুনলাম, হিরণ্ময়ী দেবী তাঁকেও একবার বলেছিলেন যে, রেঙ্গুনেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল।

এখন মণিবাবু হিরণ্ময়ী দেবীর মুখে শুনেছেন বলে যা লিখেছেন, তা যদি সত্য হয়, তাহলে এই দাঁড়ায় যে, হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর বিয়ের সম্বন্ধে মণিবাবুর কাছে এক রকম কথা বলেছেন, আবার আমার কাছে, অনিলা দেবীর কাছে এবং সুকুমারী দেবীর কাছে আর এক রকম কথা বলেছেন।

হিরণ্ময়ী দেবী মণিবাবুকে কি বলেছিলেন, জানি না। তবে কিন্তু তাঁকে একদিন মণিবাবুর এই লেখার কথা শোনালে, তিনি প্রতিবাদ করে আমাকে বলেছিলেন যে, আমাকে যা বলেছেন তাই ঠিক।

হিরণ্ময়ী দেবী যখন আমাকে এই কথা বলেন, তখন অনিলা দেবীর মেজ দেওরের ছেলে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং সেজ দেওরের ছেলে ব্রজদুর্লভ মুখোপাধ্যায় এঁরাও আমার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি যে, শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুর ছেড়ে হাওড়া জেলার সামতাবেড়েয় তাঁর দিদির বাড়ীর কাছে গিয়ে বাড়ী করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের দিদির কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাই তাঁর দিদির দেওরপোরাই হিরণ্ময়ী দেবী যখন সামতাবেড়েয় থাকতেন, তখন তাঁর দেখাশোনা করতেন।

মণিবাবু বলেছেন—হিরণ্ময়ী দেবী বিয়ের পর তাঁর বাবাকে দেখেন নি এবং মণিঅর্ডারের টাকা ফিরে আসার ব্যাপারটা ঘটেছিল, শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে ছিলেন।

কিন্তু তা নয়। হিরণ্ময়ী দেবী বিয়ের পর তাঁর বাবাকে আরও দেখেছেন এবং টাকা ফিরে আসার ব্যাপারটা ঘটেছিল শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে বাজে শিবপুরে যখন অবস্থান করছিলেন, সেই সময়েই।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য—শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর মেজ দেওরের ছেলে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং সেজ দেওরের ছেলে ব্রজদুর্লভ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, তাঁরা উভয়েই হিরণ্ময়ী দেবীর বাবাকে শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের বাড়ীতে দেখেছেন। অনিলা দেবীর ছোট দেওর তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় বলেন, শরৎচন্দ্র তাঁর শ্বশুর মশায়কে যে টাকা মণিঅর্ডার করতেন, অনেক সময় পোস্ট অফিসে গিয়ে তিনিই মণিঅর্ডার করে আসতেন। শরৎচন্দ্রের পুস্তকের প্রকাশক ও তাঁর বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মশায় আমাকে একদিন বলেছিলেন, শরৎচন্দ্রের নির্দেশক্রমে শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের প্রতিবেশী ভূতনাথ মিত্র একবার হিরণ্ময়ী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে মেদিনীপুরে তাঁর বাপের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। হিরণ্ময়ী দেবীর বাবা তখন বেঁচে ছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র দেব তাঁদের গ্রন্থে হিরণ্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্রের স্ত্রী না বলে 'জীবন-সঙ্গিনী' ও 'সঙ্গিনী' বলেছেন। এঁদের মতে আমরা যাকে সামাজিক বিয়ে বলি, শরৎচন্দ্র নাকি হিরণ্ময়ী দেবীকে সেরূপ ভাবে বিয়ে করেন নি। অবশ্য এঁরা এ কথা যে কিভাবে জেনেছেন, তারও কোন প্রমাণ দেন নি।

অপর পক্ষে হিরণ্ময়ী দেবী নিজে বলেছেন, তাঁর বিয়ে হয়েছিল, শরৎচন্দ্রের আত্মীয়রাও বলছেন বিয়ে হয়েছিল। শরৎচন্দ্র নিজেও হিরণ্ময়ী দেবীকে স্ত্রী বলে গেছেন। আর সে কথা শুধু মুখেই নয়, লিখিতভাবেও তিনি বলে গেছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি যে উইল করেন, তাতে হিরণ্ময়ী দেবীকে তিনি স্ত্রীই বলেছেন।

অতএব ব্রজেনবাবু ও নরেনবাবুর ন্যায় হিরণ্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্রের জীবন-সঙ্গিনী বা সঙ্গিনী না বলে স্ত্রী বলাই ঠিক হবে বলে মনে করি।

তবে একথা সত্য যে, দূর দেশে রেঙ্গুনে যেখানে শরৎচন্দ্র আত্মীয়-স্বজনহীন অবস্থায় একা ছিলেন এবং হিরণ্ময়ী দেবীর বাবাও ঐ অবস্থাতেই সেই বিদেশে মাত্র কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে ছিলেন, সেখানে হিন্দু-বিবাহের সকল প্রকার সামাজিক প্রথা ও লোকাচারগুলি যথাযথ পালন করা হয়তঃ সম্ভবপর হয় নি। কিন্তু ঐ সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও অনুমান করা যেতে পারে যে, হিরণ্ময়ী দেবীর পিতা নিজে উপস্থিত থেকে যখন শরৎচন্দ্রকে কন্যাদান করেছেন, তখন অন্ততঃ নামমাত্রও একটা কিছু বিবাহ অনুষ্ঠান হয়েছিলই।

আজকাল শুনি কালীঘাট ও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পরস্পর প্রণয়মুগ্ধ বহু যুবক-যুবতী কালীকে সাক্ষী রেখে মালা বদল করে নিজেরাই বিবাহকার্য সমাধা করে নেয়। আর কালের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজে বিবাহ প্রথারও তো পরিবর্তন হয়ে চলেছে। যেমন—অসবর্ণ বিবাহ, সধবা বিবাহ, এমন কি বারবণিতা বিবাহ পর্যন্ত। এই প্রকারের সমস্ত বিবাহই আজকাল হিন্দু সমাজে বিবাহ বলে স্বীকৃত হচ্ছে। কেউ কেউ বলেছেন, শরৎচন্দ্র শৈবমতে বিবাহ করেন। শৈবমতেই হোক্ আর বৈষ্ণব মতেই হোক্, যাই হোক্ একটা মতে তো বিবাহ হয়েছিল। আজকাল তো আর্য সমাজের মতে, রেজেস্ট্রী মতে নানা প্রকারের বিবাহ হচ্ছে এবং সমাজ সে সবই বিবাহ বলে মেনে নিচ্ছে। তাই ব্রাহ্মণ্য, শৈবমত যে মতেই হোক্ শরৎচন্দ্রের বিবাহকে বিবাহ

বলতে ক্ষতি কি? বিশেষ করে হিরণ্ময়ী দেবী এবং শরৎচন্দ্র তাঁরা নিজেরা যখন বলেছেন, বিবাহ।

নরেনবাবু হিরণ্ময়ী দেবীর বাবার নাম বলেছেন—কৃষ্ণদাস অধিকারী। অথচ শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর ছোট দেওর তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, অনিলা দেবীর মেজ দেওরের ছেলে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং সেজ দেওরের ছেলে ব্রজদুর্লভ মুখোপাধ্যায় এঁরা সকলেই বলেন, হিরণ্ময়ী দেবীর বাবা চক্রবর্তী উপাধিধারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনকড়িবাবু বলেন, শরৎচন্দ্র তাঁর শ্বশুর মশায়কে প্রতি মাসে যে টাকা পাঠাতেন, অনেক সময় তিনিই সেই টাকা পোস্ট অফিসে গিয়ে মণিঅর্ডার করে এসেছেন। তাঁর বেশ মনে আছে যে, হিরণ্ময়ী দেবীর বাবার উপাধি চক্রবর্তীই ছিল। রামকৃষ্ণবাবু এবং ব্রজদুর্লভবাবু বলেন, শরৎচন্দ্রের শ্বশুর যে 'চক্রবর্তী' ছিলেন, এ কথা তাঁরা শরৎচন্দ্রের নিজের মুখে শুনেছেন। হিরণ্ময়ী দেবীর বাবা চক্রবর্তী ছিলেন কিনা, একথা হিরণ্ময়ী দেবীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনিও একথা সমর্থন করেছিলেন। সামতাবেড়েয় গিয়ে আমি যেদিন হিরণ্ময়ী দেবীকে তাঁর বাবার নাম জিজ্ঞাসা করি, তখন রামকৃষ্ণবাবু এবং ব্রজদুর্লভবাবু এঁরাও আমার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এবং হিরণ্ময়ী দেবীর বাবার উপাধী চক্রবর্তী একথা এঁরা আগেই বলে ফেলায় হিরণ্ময়ী দেবী এঁদের কথাই সমর্থন করেন। তবে তাঁর বাবার নাম যে 'কেষ্ট' একথা তিনি নিজেই বলেন।

হিরণ্ময়ী দেবীর কাছে শুনেছিলাম, তাঁর বাপের বাড়ী মেদিনীপুর জেলার শালবনীর নিকটে শ্যামচাঁদপুর গ্রামে। শালবনীর নিকটে সত্যই শ্যামচাঁদপুর আছে কিনা এবং থাকলে সেই গ্রামে কৃষ্ণদাস অধিকারী বা চক্রবর্তী নামে কোন লোক ছিলেন কিনা জানবার জন্য একদিন আমি শালবনী গিয়েছিলাম। শালবনীতে গিয়ে শুনলাম, সেখান থেকে প্রায় মাইল ছয় দূরে শ্যামচাঁদপুর। তবে একা সে পথে যাওয়া বিপজ্জনক। লোকালয় বর্জিত একটানা ঘন শালবনের মধ্য দিয়ে সরু পথ। প্রায় মাইল দুই করে এমনি ঘন দুটা শালবন পার হতে হয়। বাকি পথটা ফাঁকা মাঠ, মাঝে একটা নদী। এই পথে হিংস্র জন্তুর চেয়ে চোর ডাকাতের উপদ্রব ছিল বেশী। আমি যেদিন যাই, শুনলাম তার মাত্র দুদিন আগেই একটা লোককে শালবনের পথে ডাকাতে ঠেঙিয়ে

মেরেছে। ঐ বছর শালবনী অঞ্চলে অনাবৃষ্টি হেতু ফসল না হওয়ায় পথে এই চুরি ডাকাতি একটু বেশী রকম বেড়েছিল। যাই হোক্, আমি যেদিন যাই, শালবনীতে প্রতি সপ্তাহে একদিন করে যে হাট হয়, সেদিন সেই হাটবার ছিল। শ্যামচাঁদপুরের বহুলোক ঐ হাটে আসায় তাদের সঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে শ্যামচাঁদপুরে যাই। গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম—কৃষ্ণদাস অধিকারী নামে একজন লোক সত্যই ঐ গ্রামে ছিলেন। প্রায় বছর ৩৫ আগে তিনি মারা গেছেন। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন।

কৃষ্ণদাস অধিকারীর ভ্রাতুষ্পুত্র হরিদাস দাস অধিকারীর সঙ্গে আলাপ করলাম। তখন তাঁর বয়স ৮০ বছর। তিনি বললেন—কাকা কৃষ্ণদাস অধিকারীর পুত্র সন্তান ছিল না, শুধু চারটি কন্যা ছিল। ছোটটির নাম মোক্ষদা। কাকীমা যখন মারা যান, তখন মোক্ষদার বয়স বছর আষ্টেক। কাকীমা মারা গেলে, কাকা মোক্ষদাকে নিয়ে বিদেশে চলে যান। কাকা তাঁর অপর মেয়েদের আগেই বিয়ে দিয়েছিলেন।

হিরণ্ময়ী দেবীর নাম যে মোক্ষদা এবং তাঁর যে একাধিক বোন ছিল, একথা তিনি আমাকে একদিন বলেছিলেন। অতএব শ্যামচাঁদপুরের এই কৃষ্ণদাস অধিকারীই যে হিরণ্ময়ী দেবীর পিতা তাতে আর সন্দেহ রইল না। কিন্তু হিরণ্ময়ী দেবীর বাবার উপাধি সামতাবেড়েয় চক্রবর্তী শুনে এসে, এখানে যে অধিকারী শুনলাম, তার কি? এ সম্বন্ধে শ্যামচাঁদপুরে যা দেখলাম, তাতে ব্যাপারটা এইরূপ ঘটেছিল বলেই অনুমান করা যেতে পারে।

শ্যামচাঁদপুরে চক্রবর্তী উপাধিধারী অনেক লোক বাস করেন। তাঁদের মুখেই শুনলাম, আগে তাঁদের উপাধি অধিকারী ছিল। তাঁরা অধিকারী বদলে চক্রবর্তী উপাধি নিয়েছেন। এঁরা নিজেদের রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিলেন।

শ্যামচাঁদপুরের অধিকারীরা সকলেই চক্রবর্তী হলেন দেখে কৃষ্ণদাস অধিকারীরও চক্রবর্তী হওয়া এবং ব্রাহ্মণ শরৎচন্দ্রকে কন্যাদানের জন্য তিনি বৈষ্ণব হয়েও নিজেকে বিদেশে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেওয়াটা এমন কিছুই অসম্ভব নয়।

শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকে আমি যা দেখেছি এবং তাঁর সম্বন্ধে আমি যা শুনেছি, তাতে জানি যে, তিনি একজন অত্যন্ত সরলস্বভাবা, নিষ্ঠাবতী ও

ধর্মশীলা মহিলা ছিলেন। তিনি তাঁর জীবন ভোর পূজা-পার্বণ ও জপতপ নিয়েই ছিলেন। হিরণ্ময়ী দেবীর বয়স যখন অল্প ছিল, তখন থেকেই তাঁর জীবনে এই ধর্মভাব দেখা দেয়। বিবাহের কয়েক বছর পরে শরৎচন্দ্র তাঁর স্ত্রীর এই জপতপ ও পূজা-পার্বণের কথা উল্লেখ করে বিশিষ্ট বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে রেঙ্গুন থেকে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে এক পত্রে লিখেছিলেন—"ইনি ত দিনরাত জপতপ পুজো-আচ্চা নিয়েই থাকেন।"

শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে সস্ত্রীক থাকতেন, অনুমান করা যেতে পারে যে, তখন তাঁরা সেখানে খুব সুখেই ছিলেন।

অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা শরৎচন্দ্রের দু'একটি চিঠিতে তাঁদের তখনকার দাম্পত্য-জীবনের কিছু কিছু খবর পাওয়া যায়। একটি চিঠিতে শরৎচন্দ্র বন্ধুকে রসিকতা করে লিখেছিলেন—

"সকালে আজকাল আবার আরো বিপদ—লোকের অসুখ, আমাকে নিজেই বাজারে যেতে হয়। না গেলে যিনি আছেন তিনি বলেন, 'খেতে পাবে না।'······একটু আধটু লেখাপড়া জানেন বটে, কিন্তু কাজে আসে না। একদিন বলেছিলাম, আমি শুয়ে শুয়ে বলে যাই, তুমি লিখে যাও—স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু সুবিধা হ'ল না। 'বরং' লিখতে জিজ্ঞেস করেন, অনুস্বরের ঐ টানটা ফোঁটার ভেতর দিয়ে দেব, না বাহিরে দিয়ে দেব? অর্থাৎ 'ং' হবে, না 'ऺ' হবে?"

বিয়ের সময় পর্যন্ত হিরণ্ময়ী দেবী আদৌ লেখাপড়া জানতেন না। বিয়ের পর শরৎচন্দ্র নিজে হিরণ্ময়ী দেবীকে কিছুটা লেখাপড়া শেখান। তার ফলে তিনি সামান্য একটু আধটু লিখতে পড়তে শেখেন।

শরৎচন্দ্র প্রমথবাবুকে আর একটি পত্রে লিখেছিলেন—

"একটা দাঁত (কসের) প্রায় তিন চার বছর থেকেই নড়ে। ১০।১২ দিন পূর্বে হঠাৎ তাতে যন্ত্রণা সুরু হয়ে গেল। একটু একটু নড়ে কিনা, তাই নাড়ালে একটু আরাম পাই। উনি পরামর্শ দিলেন, খুব করে নড়াও, যদি ভিতরে বদ রক্ত থাকে ত বার হয়ে যাবে। তখন সেইভাবে তাকে ঘণ্টাখানেক বেশ নড়ানো গেল, তখন রাত্রি প্রায় বারোটা। সকাল বেলা উঠে দেখি আর হাঁ করতে পারিনে। তার পরে সে কি যন্ত্রণা! সে দিন রাত যে কি করে গেল, তা শুধু ভগবানই জানেন। পরদিন ডেন্টিস্ট-এর কাছে গেলাম। তিনি

তিনি বললেন—উপড়ে ফেলে দিতে হবে।—উনিও সঙ্গে গিয়েছিলেন, বললেন —ওরে বাপরে! একটি দাঁত তুললে সব ক'টি দাঁত দুদিনে ঝুর্ ঝুর্ করে পড়ে যাবে এবং বেশ একটু সাইন্টিফিক্ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন যে, দাঁতে দাঁতে ঠেকে আছে—অসময়ে তুললে আর রক্ষে থাকবে না। সাত পাঁচ ভেবে চলে আসা গেল, তারপর জ্বর। বুঝতেই পাচ্ছ, কি কাণ্ড হচ্ছে। আর সহ্য হ'ল না, তার পরদিন তুলে এলাম। সে যা ডেন্টিস্ট—প্রথমে সে নড়া দাঁতের পাশে একটা ভাল দাঁত ধরে প্রায় আধ ওপড়ানো গোছের করে তুলেছিল! যত বলি ওটা না, ওটা না সাহেব, থামো থামো—সে ততই বলে সবুর কর আর একটু টানি। তখন তার সাঁড়াশি হাত দিয়ে ঠেলে দিয়ে তবে দাঁতটা রক্ষা করি। তারপর নড়া দাঁত ওপড়ানো হ'ল। ওপড়ানো তো হ'ল—কিন্তু রক্ত থামে না। ডেন্টিস্ট বললে—বাবু, তোমার দাঁত বড় খারাপ।—কথা শোন প্রমথ! তুই শালা তুলতে জানিস নে—রক্ত পড়ার দোষ হ'ল আমার দাঁতের।"

রেঙ্গুনে গান-বাজনা ও ছবি আঁকা

'ব্রহ্ম-প্রবাসে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের লেখক যোগেন্দ্রনাথ সরকার রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের একজন বন্ধু ছিলেন। শরৎচন্দ্র যখন একজামিনার পাবলিক ওয়ার্কস একাউন্টস অফিসে কাজ করতেন, যোগেনবাবুও তখন ঐ অফিসের একজন কেরাণী ছিলেন। ঐ সূত্রেই উভয়ের মধ্যে পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়েছিল। যোগেনবাবু তাঁর গ্রন্থের আরম্ভেই লিখেছেন :—

"এমন একদিন ছিল, যেদিন এই বিদেশে শরৎচন্দ্র আমাদেরই মত একজন অধম কেরাণী ছিলেন এবং এই রেঙ্গুনের বাঙ্গালী সমাজে তিনি একজন গায়ক বলিয়াই শুধু পরিচিত ছিলেন।"

শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে ছিলেন, তখন সেখানে প্রবাসী বাঙ্গালীদের 'বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাব' নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। এই ক্লাবের সদস্যরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় সংগীত, অভিনয়-চর্চা প্রভৃতিতে সময় কাটাতেন। শরৎচন্দ্র এই ক্লাবের একজন সদস্য ছিলেন। ক্লাবের সদস্যরা যেদিন থেকে শরৎচন্দ্রকে গায়ক হিসাবে জানতে পারেন, সেইদিন থেকেই তিনি ক্লাবের প্রধান গায়ক হয়ে দাঁড়ান।

যোগেন্দ্রনাথ সরকার যেদিন 'বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবে' প্রথম শরৎচন্দ্রের গান শোনেন, সেদিন শরৎচন্দ্রের গান শুনে তাঁর মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল, সে সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—

"...শরৎচন্দ্র প্রথমেই ধরিলেন জ্ঞানদাসের সেই বিখ্যাত পদ 'তোমারি গরবে গরবিণী রাই, রূপসী তোমার রূপে'। মরি, মরি, মরি...শরৎচন্দ্র যে কি গাহিলেন বলিতে পারি না। দেখিলাম তাঁহার চোখ ছল্ ছল্ করিতেছে, রুগ্ন শীর্ণ কণ্ঠ যেন সংগীতের ভারে ফাটিয়া পড়িতেছে। সে কি প্রাণের বেদনা, সে কি মর্মের ক্রন্দন। সংগীতের ভিতর দিয়া আসিয়া সকলের মর্মে প্রবেশ করিতেছে। গান বলিতে যদি কিছু থাকে, যাহার ভিতরে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, সে এই গান, এই প্রাণ-জোড়ানো সংগীত।

সেই হইতে আমরা শরৎচন্দ্রের সংগীতের ভক্ত হইয়া পড়িলাম।"

শরৎচন্দ্রের খুব প্রিয় ছিল রবীন্দ্র-সংগীত। তাই তিনি ক্লাবে রবীন্দ্র-সংগীতই গাইতেন। এ ছাড়া কীর্তন এবং ভজন গানও তিনি গাইতেন। আবার নীলকণ্ঠ, নিধুবাবু, দাশরথি রায় প্রভৃতি বাঙ্গলার প্রাচীন কবিদের গানও মাঝে মাঝে গেয়ে শোনাতেন। ক্লাবের সদস্যরা মুগ্ধ হয়ে শরৎচন্দ্রের গান শুনতেন এবং তাঁর গান বারবার শুনতে চাইতেন।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থাকাকালে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কবি নবীনচন্দ্র সেন একবার রেঙ্গুনে যান। তখন বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবে নবীনচন্দ্রকে একদিন সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। সেদিনকার সেই সম্বর্ধনা সভায় উদ্বোধন সংগীত গেয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্রের গানে মুগ্ধ হয়ে কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁকে 'রেঙ্গুনরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের কণ্ঠ অতি মিষ্ট ছিল বলে তিনি একবার গান গাইতে আরম্ভ করলে, শ্রোতাদের অনুরোধে একটার পর একটা করে তাঁকে অন্তত তিন-চারটা গান গাইতে হ'ত। শরৎচন্দ্র কোনদিনই ভাল স্বাস্থ্য-সম্পদের অধিকারী ছিলেন না। তাই অনেকক্ষণ ধরে হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান করলে, তিনি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। এই কারণেও বটে, আবার সেই সময় কয়েক বৎসর বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা নিয়ে মেতে ওঠার কারণেও বটে, পরে তিনি বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবে যাওয়া ও গান-বাজনা একরূপ ছেড়েই দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থাকার সময় সংগীত ছাড়া আর একটি শিল্পের চর্চা করতেন। সেটি হ'ল চিত্রাঙ্কণ। শরৎচন্দ্র সেই সময় এই ছবি আঁকা শেখার জন্য বেশ কিছুদিন সময় দিয়েছিলেন। তিনি অনেকগুলি তৈলচিত্রও এঁকেছিলেন। তাঁর আঁকা প্রথম ছবিটির নাম ছিল—'রাবণ-মন্দোদরী'। আর তাঁর আঁকা ছবিগুলোর মধ্যে তাঁর 'মহাশ্বেতা' নামক ছবিটিই ছিল বিখ্যাত। এই 'মহাশ্বেতা' ছবিটি সম্বন্ধে যোগেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'ব্রহ্ম-প্রবাসে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন—

"তাঁহার সর্বপ্রথম চিত্র 'রাবণ-মন্দোদরী' খানা কেমন অস্পষ্ট হইয়াছিল, এ খানা দেখা গেল সেই সব অস্পষ্টতা দোষ রহিত, অথচ অতিরিক্ত আলোক সম্পাতেও খুব যে উজ্জ্বল তাও নয়। আলো ও ছায়ার পরস্পর সম্বন্ধটুকু ইহাতে এমন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহা নিতান্ত কাঁচা হাতের বলিয়া মনে করিবার মত নয়, বাস্তবিকই তাহার মধ্যে অ্যানাটমির জ্ঞান,

পারস্‌পেকটিভ এবং ব্যাকগ্রাউণ্ডের আইডিয়া সমস্তই বিদ্যমান ছিল। শিল্পীর বর্ণজ্ঞানও যে নিতান্ত কম ছিল, তাহাও বলিতে চাহি না। মোটের উপর, এক সঙ্গে নিসর্গ চিত্র ও মনুষ্য চিত্র মিলাইয়া যাহা হয়, ঠিক তাই। এই তপস্বিনী মহাশ্বেতার চিত্র সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছিল, প্রকৃতির খেয়ালী সন্তান শরৎচন্দ্রের তুলির মুখে।

বর্ষার দিনে নদীতীর ঝাপসা ঝাপসা দেখাইতেছে, ওপারে মেঘভারানত আকাশ আরও অস্পষ্ট, ইহারই একপাশ দিয়া লাজুক সূর্য উকিঝুঁকি মারিতেছে। তীরে তরুতলে এলোকেশী সদ্যস্নাতা তপস্বিনী মহাশ্বেতা। রোরুদ্যমানা প্রকৃতি দেবীরই যেন একখানা জীবন্ত আলেখ্য।"

মহাশ্বেতা ছবিটি সম্বন্ধে যোগেনবাবুর এই বর্ণনা থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ছবিটি বেশ উচ্চাঙ্গেরই হয়েছিল। কেন না, তপস্বিনী মহাশ্বেতার পারিপার্শ্বিক পরিকল্পনা, ছবিতে রঙের পরিবেশন প্রভৃতি সমস্তই নিখুঁত হওয়ায় এই ছবিখানি শরৎচন্দ্রের একটি সার্থক সৃষ্টি হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র যে পল্লীতে থাকতেন, সেখানে 'নারদ মুনি' নামে একটি বৃদ্ধ ছিল। বৃদ্ধটির মাথায় পাকা লম্বা চুল, মুখেও পাকা গোঁফ দাড়ি এবং গলায় তুলসীর মালা ছিল। বৃদ্ধের জীবন-সঙ্গিনীটি মারা গেলে, তার নিজের বলতে আর কেউ ছিল না। সে পথে পথে হরিনাম করে বেড়াত এবং ভিক্ষে করে খেত। এই জন্যই পাড়ার লোকে তাকে নারদ মুনি বলে ডাকত।

শরৎচন্দ্র একবার এই নারদ মুনির একটা ছবি এঁকেছিলেন। এজন্য বৃদ্ধ কিছুদিন ধরে রোজ সকালে ঘণ্টাখানেকের জন্য শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে আসত। সে এলে শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে অধিকাংশ দিনই মধ্যাহ্ন ভোজনও করত।

শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বন্ধু সতীশচন্দ্র দাস তাঁর 'শরৎ-প্রতিভা' গ্রন্থে লিখেছেন—

"শরৎচন্দ্রের 'ছবি' বই যাঁহারা পড়িয়াছেন, বাথিনের নাম অনেকেই অবগত আছেন।...একজন সামান্য চিত্রকর বাথিনও শরৎচন্দ্রের গ্রন্থে অমরতা লাভ করিয়াছে।...তিনি বর্মাতে বাথিনের কাছেই চিত্রবিদ্যা শিখিয়া নিজ হাতে এত সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকিতে পারিতেন...।"

সতীশবাবু রেঙ্গুনে একদিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এই বাথিনের বাড়ী বেড়াতেও গিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র ছবি আঁকা সম্বন্ধে প্রচুর বইও পড়েছিলেন। দেশ বিদেশের বড় বড় চিত্রকরদের সংবাদাদি তাঁর মুখস্থ ছিল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের চিত্র সম্বন্ধে চিত্র-রসিক বন্ধুমহলে কোন কথা উঠলেই তিনি বলতেন—"র‍্যাফেলের চেয়ে মাইকেল এঞ্জেলো বড়। তবে বড় বড় আর্ট ক্রিটিকদের মতে তিসিয়ান সবচেয়ে বড় পেণ্টার।...একালের চিত্রকরদের মধ্যে মিলের, টার্ণারের খুব নাম। দুজনই বিলাতী চিত্রকর। স্যার জোশুয়া রেনল্ডস্ ও গেইনস্‌বরোর পর এঁরাই বিলাতে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী।...ল্যাণ্ডস্কেপ পেইণ্টিংয়ের চেয়ে হিউম্যান পেইণ্টিং ফোটানো ঢের শক্ত। রীতিমত অ্যানাটমির জ্ঞান না থাকলে হিউম্যান পেইণ্টিং ভাল আঁকা যায় না। ছবিখানি হওয়া চাই হুবহু জীবন্ত, তবে তো ছবি। নইলে ন্যাকড়ার ওপর যা তা রং দিয়ে আঁচড় পাড়লেই ছবি হ'ল না।"

শরৎচন্দ্র ছবি আঁকা সম্বন্ধে কিরূপ যে ব্যাপক পড়াশুনা করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তা তাঁর এই পৃথিবী বিখ্যাত ছবি আঁকিয়েদের ছবির আলোচনা থেকেই পরিষ্কার বুঝা যায়।

শরৎচন্দ্র এই সময় যে বাড়ীতে থাকতেন, সেই বাড়ীতে একদিন আগুন লেগে যাওয়ায় বাড়ীটা ভস্মীভূত হয়। শরৎচন্দ্রের পুস্তকাদি বহু জিনিষের সঙ্গে তাঁর আঁকা ছবিগুলোও ঐদিন পুড়ে শেষ হয়ে যায়। শুধু তাঁর ছবি আঁকার সাজসরঞ্জামগুলো কোন রকমে রক্ষা পায়। এই ছবি পোড়ার কথা উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র তখন ২২-৩-১২ তারিখে রেঙ্গুন থেকে এক পত্রে তাঁর বন্ধু প্রমথ নাথ ভট্টাচার্যকে লিখেছিলেন—

"...আর একটা সম্বাদ তোমাকে দিতে বাকি আছে। বছর তিনেক আগে যখন হার্ট-ডিজিজের প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন আমি পড়া ছাড়িয়া অয়েল-পেইণ্টিং সুরু করি। গত তিন বৎসরে অনেকগুলি অয়েল-পেইণ্টিং সংগ্রহ হইয়াছিল—তাহাও ভস্মসাৎ হইয়াছে। শুধু আঁকিবার সরঞ্জামগুলা বাঁচিয়াছে।"

এই ছবি পোড়ার পর শরৎচন্দ্র আর ছবি আঁকায় হাত দেন নি। এর পর থেকে যেটা তাঁর আজন্মের প্রধানতম নেশা সেই সাহিত্য সাধনাতেই শুধু মন দিয়েছিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সাহিত্যে খ্যাতিও অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে চিত্র-শিল্পের প্রতি তাঁর অনুরাগটা পরবর্তীকালেও বরাবরই ছিল।

'ভারতী'তে 'বড়দিদি' প্রকাশ

ভাগলপুরে বিভূতিভূষণ ভট্টদের বাড়ীতে শরৎচন্দ্রের একটি আস্তানা ছিল। এই ভট্ট বাড়ীতে একটি 'রিজার্ভ করা চেয়ারে বসে শরৎচন্দ্র বই পড়তেন ও অনর্গল গল্প লিখতেন। তাই শরৎচন্দ্রের লেখা গল্পের খাতা তখন ভট্ট বাড়ীতেই থাকত।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এফ, এ, পরীক্ষা দিয়ে ভাগলপুর থেকে কলকাতায় তাঁদের বাড়ীতে চলে আসেন। আসবার সময় তিনি শরৎচন্দ্রের অনুমতিতে বিভূতিভূষণ ভট্টর কাছ থেকে শরৎচন্দ্রের গল্পের দুখানি খাতা নিয়ে এসেছিলেন। সৌরীনবাবুর উদ্দেশ্য ছিল, তিনি তাঁর কলকাতার বন্ধুদের ঐসব গল্প পড়িয়ে তাক লাগিয়ে দেবেন।

সৌরীনবাবু শরৎচন্দ্রের গল্পের যে দুটি খাতা নিয়ে এসেছিলেন, তার মধ্যে একটি খাতায় ছিল, কোরেল, চন্দ্রনাথ, বড়দিদি প্রভৃতি।

সৌরীনবাবু পরে ভট্টবাড়ীতে শরৎচন্দ্রের কাছে তাঁর গল্পের খাতা ফেরত পাঠিয়ে দেবার সময় 'বড়দিদি' গল্পটি নকল করে নিয়ে একটি কপি নিজের কাছে রেখেছিলেন। ভেবেছিলেন, তিনি তাঁদের হাতে লেখা 'তরণী' পত্রিকায় ঐ 'বড়দিদি' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করবেন। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। তবে বড়দিদির কপিটি সৌরীনবাবুর কাছেই থেকে যায়।

সৌরীনবাবু পরে তাঁর কাছে রক্ষিত বড়দিদির এই কপিটি কিভাবে 'ভারতী'তে ছেপেছিলেন সে সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :—

"…১৩১৪ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে ভারতীর সম্পাদিকা সরলা দেবী লাহোর থেকে কলকাতায় আসেন। সে বছরের ভারতী তখনও ছেপে বেরোয় নি— তিনি এসেছিলেন ভারতী প্রকাশের সুব্যবস্থা করতে এবং সেই সঙ্গে তাঁর শিশুপুত্র দীপকের অন্নপ্রাশন দেবেন বলে। আমি তখন বি, এ, পাস করে এটর্ণীর আর্টিকেল আছি এবং ল' পড়ছি।…

একদিন দীনেশচন্দ্র সেন এসে আমায় পাকড়াও করে সরলা দেবীর কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বল্লেন—এর হাতে ভারতীর ভার দিয়ে আপনি লাহোর যেতে পারেন। সরলা দেবী আমার হাতে ভারতীর পরিচালনার ভার দিলেন এবং

তখন বৈশাখ মাসের কপি তৈরির জন্যে আমাকে বল্লেন—একটি মাঙ্গলিক কবিতা এবং একটি ছোট গল্প লিখে দাও। তাঁর হাতে দু'চারটি রচনা ছিল—ইংরাজি ভাষায় লেখা। সেগুলির তর্জমার ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু উপন্যাস চাই!

সরলা দেবী বললেন—ভারতী রেগুলার না হওয়া পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ কেউ ভারতীর জন্য লেখা দেবেন না। আমাকে বললেন, উপন্যাস সংগ্রহ করতে। আমার মনে পড়লো শরৎচন্দ্রের বড়দিদির কথা। আমি বল্লাম, উপন্যাস নেই, তবে আমার এক বন্ধুর লেখা বড় গল্প আছে। সে গল্পটি দু'তিন মাস চলতে পারে। অপূর্ব লেখা! সরলা দেবী পড়তে চাইলেন। দিলুম তাঁকে পড়তে। পড়ে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন—চমৎকার! এক কাজ কর, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়ে তিন মাসে ছাপাও। বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় লেখকের নাম দিও না। সকলে মনে করবে রবীন্দ্রনাথের লেখা। আমাদের দেরির ত্রুটি ঘুচবে এবং গ্রাহক গ্রাহিকা বাড়বে। আষাঢ় সংখ্যায় 'বড়দিদি' শেষ হবে, আর সেই সংখ্যায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখকের নাম ছাপবে।

তাই হ'ল। বৈশাখ সংখ্যায় 'বড়দিদি' ছাপা হওয়া মাত্র বঙ্গদর্শনের সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার (রবীন্দ্রনাথ নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদকের পদ ত্যাগ করার পর সহ-সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার ভার নেন) রবীন্দ্রনাথের কাছে যান। গিয়ে অনুযোগ করে বলেন—আপনি আর উপন্যাস লিখবেন না বলেছেন, অথচ এই তো ভারতীর জন্য উপন্যাস লিখেছেন। কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ অবাক। তিনি বৈশাখের ভারতীতে 'বড়দিদি'র যতটুকু ছাপা হয়েছিল পড়লেন। পড়ে তিনি বলেছিলেন—আমার লেখা নয়, তবে খুব শক্তিশালী কোন লেখকের লেখা। তারপর শৈলেশচন্দ্র আমাকে বার বার জিজ্ঞাসা করেন, কার লেখা। ধৈর্য্য ধরুন, লেখকের নাম ক্রমশঃ প্রকাশ্য। সে বছর আষাঢ় মাসের ভারতী বেরিয়েছিল পূজোর পর এবং সে সংখ্যায় 'বড়দিদি' উপন্যাসের শেষে লেখকের নাম শরৎ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেশ বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছিল। ছাপা হবার পর রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথ আমাকে বার বার বলেছিলেন—'বড়দিদি'র লেখক অসাধারণ শক্তিশালী, অজ্ঞাতবাস ঘুচিয়ে এঁকে তোমরা সাহিত্যের আসরে টেনে আনতে পারবে না?"

এইভাবে ভারতীতে নামসহ শরৎচন্দ্রের প্রথম লেখা প্রকাশিত হলেই তিনি একজন শক্তিশালী লেখক হিসাবে সকলের নিকটে পরিচিত হলেন। ইতিপূর্বে তাঁর 'মন্দির' গল্পটি যদিও কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করায় 'কুন্তলীন পুরস্কার ১৩০৯ সন' নামক পুস্তকে ছাপা হয়েছিল, কিন্তু সেটি তাঁর নামে ছাপা হয় নি। সেটি তাঁর মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে ছাপা হয়েছিল।

ভারতীতে শরৎচন্দ্রের বড়দিদি যখন প্রথম ছাপা হয়, তখন তিনি এর কিছুই জানতেন না। সৌরীনবাবু শরৎচন্দ্রকে কিছু না জানিয়েই ভারতীতে এই লেখাটি ছেপে দিয়েছিলেন।

তবে শেষ দিকে তিনি ঘটনাক্রমে ভারতীতে বড়দিদি ছাপানোর কথা জানতে পেরেছিলেন। তখন এই ব্যাপারে যে ঘটনাটি ঘটেছিল, তা হচ্ছে এই :—

সৌরীনবাবুর কাছে বড়দিদির যে কপি ছিল, ভারতীর আষাঢ় সংখ্যার জন্য প্রেসে কপি দিতে গিয়ে দেখেন, কিভাবে শেষাংশ কপি হারিয়ে গেছে। তখন সৌরীনবাবু মহাবিপদে পড়লেন এবং বিপদে পড়ে ভাগলপুরে বন্ধু বিভূতিভূষণ ভট্টর কাছে বড়দিদির কপি চেয়ে, চিঠি দিলেন।

বিভূতিবাবু সৌরীনবাবুর চিঠি পেয়ে জানালেন, শরৎচন্দ্রের কোন লেখা তাঁর কাছে নেই। তিনি রেঙ্গুন যাওয়ার আগে তাঁর সমস্ত রচনা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে রেখে গেছেন।

সৌরীনবাবু তখন আবার তাঁর বিপদের কথা জানিয়ে সুরেনবাবুর কাছে বড়দিদির শেষাংশ কপি চাইলেন। সৌরীনবাবু এ সম্বন্ধে লিখেছেন—

"সুরেনকে চিঠি লিখলুম—বড়দিদির কপি হারিয়েছে। তুমি যদি 'কপি' করে না পাঠাও তাহলে আষাঢ়ের ভারতী বেরুবে না। ভারতীর জীবন সংশয়াপন্ন জেনো।

এ চিঠির উত্তরে সুরেন লিখলেন—শরতের বিনা অনুমতিতে তুমি তো গল্প ছাপ্‌ছো, এ কাজে তোমাকে সাহায্য করা উচিত হবে কি?—সে যদি এ ব্যাপারে রাগ বা অভিমান করে তো আমি হব তোমার সঙ্গে সমান দায়ী। তবু লেখা যা বেরিয়েছে, সকলে ধন্য ধন্য করেছে। সে জয়ধ্বনি শুনে আনন্দ আর গর্ববোধ করছি খুব বেশী রকম। তা ছাড়া আমার উপর বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ

মাসিক 'ভারতী'র জীবন নির্ভর করছে—অতএব শরতের অনুমতি না পেলেও পাঠালাম আমি বড়দিদির শেষাংশ কপি করে।"

সুরেনবাবু শরৎচন্দ্রকে এ সম্বন্ধে সমস্ত কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন এবং তাঁর অনুমতিও শেষ পর্যন্ত পেয়েছিলেন। সুরেনবাবু এ সম্বন্ধে লিখেছেন—

"শরৎচন্দ্রকে চিঠি দিলাম। উত্তর এলো, 'অগত্যা'। মনে হয়, বিভূতি ভূষণ ও নিরুপমা দেবী চিঠি দেওয়াতে শরৎচন্দ্র তাঁদের অনুরোধ এড়াতে পারেন নি।"

ভারতীতে শরৎচন্দ্রের লেখা পড়ে অনেকেই বিশেষ করে মাসিক পত্রের সম্পাদকরা শরৎচন্দ্রের সন্ধান নিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র তখন কোথায়? বর্মায় কোথায় কোন্ এক অজ্ঞাত স্থানে তিনি তখন পড়ে আছেন। কেউই তাঁর খোঁজ খবর রাখেন না। মাত্র তাঁর দু-একজন বন্ধু ও মাতুলরা কচিৎ কখন পত্র লিখে তাঁর সংবাদ নেন।

রেঙ্গুনে পড়াশুনা ও সাহিত্য সাধনা

শরৎচন্দ্র একবার লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—"১৪ বছর ১৪ ঘণ্টা ধরে পড়ি। সেই যে একজামিন দিতে পারি নি, কেবল সেই রাগে।"

এখানে '১৪ বছর ১৪ ঘণ্টা ধরে' এ কথাটা আক্ষরিকভাবে সত্য না হলেও, এ কথা ঠিক যে তিনি অনেক বছর অনেক সময় দিয়ে প্রচুর পড়াশুনা করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর এই পড়ার কথা উল্লেখ করে ২২-৩-১২ তারিখে রেঙ্গুন থেকে বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকেও এক চিঠিতে লিখেছিলেন—"পড়িয়াছি বিস্তর। প্রায় কিছুই লিখি নাই। গত দশ বৎসরে ফিজিওলজি, বায়লজি অ্যাণ্ড সাইকোলজি এবং কতক হিষ্ট্রি পড়িয়াছি। শাস্ত্রও কতক পড়িয়াছি।"

শরৎচন্দ্র প্রধানতঃ রেঙ্গুনে 'বার্নাড ফ্রি লাইব্রেরী'তেই পড়তেন। তিনি এই লাইব্রেরীর নিয়মিত মেম্বার ছিলেন। তিনি কিছুদিন করতেন কি, অফিসের পর সিধা লাইব্রেরীতে চলে যেতেন এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত লাইব্রেরীতে বসে পড়ে তবে বাড়ী ফিরতেন।

তারপর লাইব্রেরীতে বসে পড়া ছেড়ে দিয়ে, লাইব্রেরী থেকে বই এনে রাত্রে বাড়ীতে পড়তেন। তাঁর এই রাত্রে বই পড়ার কথা উল্লেখ করে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রেঙ্গুন থেকে যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—"সকালবেলা ছাড়া রাত্রে আমি লিখতে পারি নে। রাত্রে আমি শুয়ে শুয়ে পড়ি।"

বার্নাড ফ্রি লাইব্রেরীতে বই পড়া সম্বন্ধে গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন—"দেখিয়াছি রেঙ্গুনের বার্নাড ফ্রি লাইব্রেরী হইতে অনেক ইংরাজি সমাজনীতি, রাজনীতি ও দর্শন সম্বন্ধীয় মোটা মোটা গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি মনোযোগের সহিত পড়িতেন।"

শরৎচন্দ্রের দর্শন সম্বন্ধীয় বই পড়া সম্বন্ধে যোগেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর

'ব্রহ্ম-প্রবাসে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন যে, শরৎচন্দ্র একজামিনার পাবলিক ওয়ার্কস্ একাউন্টস্ অফিসের ডেপুটি একজামিনার এম, কে, মিত্রের বাসায় যখন থাকতেন, তখন 'মিত্তির সাহেবের সঙ্গে একত্রে ফিলসফি পড়তেন'।

যোগেনবাবু আরও লিখেছেন যে, শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থাকাকালে কিছুদিন ডিকেন্স প্রভৃতি ইংরাজ ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস এবং অন্যান্য নামকরা বিদেশী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসের ইংরাজি অনুবাদ খুব পড়েছিলেন। জোলার উপন্যাস পড়তে শরৎচন্দ্রের খুব ভাল লাগত।

শরৎচন্দ্র ১২-২-১৩ তারিখে রেঙ্গুন থেকে ফণীন্দ্রনাথ পালকে লিখেছিলেন—

"এক একবার ইচ্ছে করে এইচ্, স্পেনসারের সমস্ত সিন্‌থেটিক ফিলসফির একটা বাঙ্গলা সমালোচনা—সমালোচনা ঠিক নয়, আলোচনা এবং ইউরোপের অন্যান্য ফিলসফার, যাঁরা স্পেনসার-এর শত্রু-মিত্র তাঁদের লেখার উপর একটা বড় রকমের ধারাবারিক প্রবন্ধ লিখি।"

শরৎচন্দ্র যখন ছবি আঁকতেন, সেই সময় তিনি চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধেও বহু বই পড়েছিলেন। শরৎচন্দ্র ২৫-৭-১৩ তারিখে রেঙ্গুন থেকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা-প্রসঙ্গে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখেছিলেন—"আর্টপেন্টিং আমিও নিজে করি। অয়েল পেন্টিং আমিও বুঝি—ও সম্বন্ধে নিতান্ত কম বইও পড়ি নি।"

শরৎচন্দ্র বিজ্ঞান বিষয়েও প্রচুর বই পড়েছিলেন। একবার 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'জড়-জগৎ' নামে একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বেরুলে, শরৎচন্দ্র ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করতে চেয়ে 'ভারতবর্ষে'র স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তখন রেঙ্গুন থেকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

"আচ্ছা, একটা কথা।—'জড়-জগৎ' সম্বন্ধে যদি কেউ কিছু প্রতিবাদ করে ধরুন আমার দিদিকে দিয়া যদি কিছু লিখাইয়া লই (শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থাকার সময় তাঁর দিদি অনিলা দেবীর ছদ্মনামে প্রবন্ধ লিখতেন), আপনারা সে প্রতিবাদ কি ছাপিবেন? অবশ্য আপনারা নিশ্চয়ই তাহার সঙ্গতি অসঙ্গতি বিবেচনার পর [সিম্বল অর্থাৎ কল্পনা প্রতিমা খাড়া করিয়াই কাজ চলিতেছে (একটা উদাহরণের মত উল্লেখ করিলাম) জর্মাণির সকল পণ্ডিতই তো তা মানে নাই।......তাছাড়া হেল্‌ম হোজ কি শুধু স্টাণ্ডার্ড সম্বন্ধে ঐ বলিয়া শেষ করিয়াছেন? তখন সবাই মানিয়া লইয়াছিল কি? আপনিই বলুন না? আর এটা তো শুধু পদার্থ বিদ্যার ফিলসফি অব্ সায়েন্স।]

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে পরবর্তী জীবনেও বিজ্ঞানের বই পড়তেন।

সজনীকান্ত দাস এক সময় তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে মিলে কমিশন বাবে স্টাণ্ডার্ড লিটারেচার কোম্পানীর বই বেচতেন। সেই সময় শরৎচন্দ্র একবার সজনীবাবুর কাছ থেকে অনেক টাকার বিজ্ঞানের বই কিনেছিলেন। সজনীকান্ত দাস তাঁর 'আত্ম-স্মৃতি' গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের এই বিজ্ঞানের বই কেনার প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"সেই আস্ত রেঙ্গুন লাইব্রেরী গিলিয়া খাওয়ার গল্প আরও সরস করিয়া বলিলেন এবং এক সেট বহুমূল্য বিজ্ঞানের বই নগদ দামে খরিদ করিয়া আমাদের বিদায় দিলেন।"

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে যে কিরূপ গভীরভাবে পড়াশুনা করতেন, তার উদাহরণ হিসাবে ফণীন্দ্রনাথ পালকে লেখা তাঁর আরও দুটি চিঠি থেকে সে কথা উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেছিলেন—

'আমি প্রতিদিন দু' ঘণ্টার বেশি কিছুতে লিখি না—১০।১২ ঘণ্টা পড়ি—এ ক্ষতি আমার নিজের আমি কিছুতে করিব না।' (২৮-৩-১৩)

'আর এত লিখিতে গেলে পড়াশুনা বন্ধ করিতে হয়, সেটা আমার মৃত্যু না হইলে আর পারিব না।' (১৪-৯-১৩)

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থাকার সময় রবীন্দ্র-সাহিত্যও খুব পড়তেন। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন—"সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল কবির খানকয়েক বই—কাব্য ও কথা-সাহিত্য এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ঐ ক'খানা বই-ই বার বার করে পড়েছি।"

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে বৈষ্ণব-সাহিত্যও বিশেষভাবে পড়েছিলেন। ১৫-১১-১৫ তারিখে তিনি রেঙ্গুন থেকে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন—

"আপনি আমাকে 'চৈতন্য চরিতামৃত' পড়িতে দিয়াছিলেন।…এ ছাড়া আরও অনেকগুলি বৈষ্ণব গ্রন্থ পড়িতে দিয়াছিলেন। সমস্ত বইগুলি যে কতবার পড়িয়াছি (এমন কি রোজই প্রায় পড়ি) তা বলিতে পারি না।"

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস থেকে শরৎচন্দ্রের ১ম পর্ব 'শ্রীকান্তে'র ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেছিলেন বোম্বে হাইকোর্টের জজ ক্ষিতীশচন্দ্র সেন এবং মিঃ থিয়োডোসিয়া টমসন। ঐ গ্রন্থের

ভূমিকায় মিঃ ঈ, জে, টম্‌সন শরৎচন্দ্রের একটি ইংরাজি বিবৃতি উদ্ধৃত করেন। সেই বিবৃতির এক জায়গায় শরৎচন্দ্র তাঁর নিজের সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধে যা বলেছেন, তার বাঙ্গলা অনুবাদ হচ্ছে এই :—

"বোধ হয় সতের বৎসর বয়সের সময় আমি গল্প লিখতে সুরু করি। কিন্তু কিছুদিন বাদে গল্প রচনা অকেজোর কাজ মনে করে আমি অভ্যাস ছেড়ে দিলাম। তারপর অনেক বৎসর চলে গেল। আমি যে কোনকালে একটি লাইনও লিখেছি, সে কথা ভুলে গেলাম।

আঠার বৎসর পরে একদিন লিখতে আরম্ভ করলাম। কারণটা দৈব দুর্ঘটনারই মত। আমার গুটিকয়েক পুরাতন বন্ধু একটি ছোট মাসিক পত্র বের করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের কেউই এই সামান্য পত্রিকায় লেখা দিতে রাজি হলেন না। নিরুপায় হয়ে তাঁদের কেউ কেউ আমাকে স্মরণ করলেন। বিস্তর চেষ্টায় তাঁরা আমার কাছ থেকে লেখা পাঠাবার কথা আদায় করে নিলেন। এটা ১৯১৩ সনের কথা।"

১৩৩৮ সালে কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে শরৎচন্দ্র 'রবীন্দ্রনাথ' নামে তাঁর যে লিখিত প্রবন্ধটি পড়েছিলেন, তাতে তিনি এক জায়গায় লিখেছিলেন—"……এর পরেই সাহিত্যের সঙ্গে হলো আমার ছাড়াছাড়ি। ভুলেই গেলাম যে জীবনে একটা ছত্রও কোনদিন লিখেছি। দীর্ঘকাল কাটলো প্রবাসে।"

শরৎচন্দ্র ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রেঙ্গুন যান। তারপর দীর্ঘদিন পরে বন্ধুদের অনুরোধে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় সাহিত্য সাধনা সুরু করেন। এ কথা কিন্তু সর্বাংশে সত্য নয়। কেননা, ১৯০৩ থেকে ১৯১৩-এর মধ্যবর্তী সময়েও তিনি কিছু কিছু সাহিত্য রচনা করেছিলেন। তবে এ কথা সত্য যে, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই তিনি পুনরায় নিয়মিত সাহিত্য সাধনা সুরু করেন।

শরৎচন্দ্র ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে মাস আড়াই পেগুতে পেগু ডিভিসানের একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে একটা অস্থায়ী চাকরি করেছিলেন। ঐ সময় তিনি মাঝে মাঝে পেগু থেকে রেঙ্গুনে আসতেন। রেঙ্গুন পেগু থেকে ৪৫ মাইল দূরে এবং ট্রেনে ৩ ঘণ্টার পথ। গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন—

"শরৎচন্দ্র পেগুতে মিঃ চাটার্জির বাড়ীতে অবস্থানকালে পেগু একজি-

কিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার অফিসে অস্থায়ীভাবে দুই তিন মাস চাকরি করেন। এই সময়ে তিনি মধ্যে মধ্যে রেঙ্গুনে যাতায়াত করিতেন।……একবার রেঙ্গুন আসিবার সময় স্টেশনে পাশাপাশি দুইখানি ট্রেন দেখিয়া তিনি ভুলক্রমে বিপরীতগামী ট্রেনখানিতে উঠিয়া পড়েন। তিন ঘণ্টা পরে হঠাৎ তাঁহার চমক ভাঙ্গিলে দেখেন এটি নেওলবিন স্টেশন। অনেক রাত্রে আবার পেগুতেই ফিরিয়া আসিলেন। সে রাত্রের দুর্ভোগের কথা শুনিয়া সকলে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিলে তিনি বলিলেন—'একটি বইয়ের প্লট তৈরী করতে এই ফ্যাসাদ ঘটেছে।' ”

এখানে দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্র ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দেও তাঁর একটি বইয়ের প্লট তৈরি সম্বন্ধে অনন্যমনা হয়ে চিন্তা করেছিলেন।

রেঙ্গুনে অবস্থানকালে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ শরৎচন্দ্রের একবার হৃদ্‌রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন তিনি বার্নার্ড ফ্রি লাইব্রেরীতে পড়া ছেড়ে 'অয়েল পেন্টিং' ধরেছিলেন। এই ছবি আঁকার কালেই শরৎচন্দ্র তাঁর 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটিও লিখতেন।

যোগেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'ব্রহ্ম প্রবাসে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন যে, এক রবিবারে তিনি শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে তাঁর আঁকা ছবি দেখতে গিয়ে, শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিও দেখেছিলেন এবং সেই পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

যোগেনবাবু তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবের তাঁরা কয়েকজন পুরাতন সদস্য ঐ ক্লাব থেকে বেরিয়ে এসে পৃথকভাবে 'বেঙ্গল ক্লাবে'র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাতে তাঁদের সাহিত্য-চর্চার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়েছিল।

যোগেনবাবু যেদিন শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে তাঁর আঁকা ছবি দেখতে গিয়ে চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি দেখেছিলেন, সেই দিনই তিনি প্রথম জানতে পারেন যে, শরৎচন্দ্র সাহিত্য-চর্চাও করেন। তখন থেকে যোগেনবাবু তাঁদের ক্লাবের সাহিত্য সভায় একটা প্রবন্ধ লিখে পড়বার জন্য শরৎচন্দ্রকে বার বার অনুরোধ করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র কিন্তু যোগেনবাবুর কথায় কর্ণপাত করতেন না। কখন কখন বলতেন—আচ্ছা, পড়বার মত লেখা হ'লে, তখন পড়া যাবে।

শরৎচন্দ্র যোগেনবাবুদের সাহিত্য সভায় মাঝে মাঝে যোগ দিতেন বটে, কিন্তু কিছু লেখা না পড়ে, কেবল গান গেয়ে ও গল্প-গুজব করে চলে আসতেন।

একদিন ক্লাবের অনেকে মিলে শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করলে, তখন তিনি তাঁর লেখা 'নারীর ইতিহাস' নামে একটি প্রবন্ধ পড়বেন বলে কথা দিলেন। প্রবন্ধ লেখা হ'লে সভার দিনে, তিনি সভায় দাঁড়িয়ে প্রবন্ধ পড়তে কিছুতেই রাজী হলেন না। এমন কি সেদিন তিনি সভাতেও এলেন না। শেষে যোগেনবাবু শরৎচন্দ্রের বাড়ী থেকে প্রবন্ধটি এনে, সেই দীর্ঘ প্রবন্ধটি দু-ঘণ্টা ধরে তিনিই সভায় পড়েছিলেন।

যোগেনবাবু শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে যখন তাঁর প্রবন্ধটি আনতে যান, সভাভীরু শরৎচন্দ্র তখন আবার বাড়ীতেও ছিলেন না। তিনি প্রবন্ধটি বাড়ীতে রেখে অন্যত্র সরে পড়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর ঐ 'নারীর ইতিহাস' প্রবন্ধটিকে বই আকারে যখন ৪০০।৫০০ পাতা লেখেন, সেই সময় তাঁর বাড়ীতে আগুন লাগার ফলে, ঐ লেখাটি পুড়ে যায়। ঐ সঙ্গে তাঁর চরিত্রহীন উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিও ভস্মীভূত হয়।

শরৎচন্দ্র এই আগুনে পাণ্ডুলিপি পোড়ার কথা উল্লেখ করে ২২-৩-১২ তারিখে রেঙ্গুন থেকে বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখেছিলেন—

"আগুনে পুড়িয়াছে আমার সমস্তই।······নারীর ইতিহাস প্রায় ৪০০।৫০০ পাতা লিখিয়াছিলাম।···চরিত্রহীন ৫০০ পাতায় শেষ হইয়াছিল, সবই গেল।"

শরৎচন্দ্র তাঁর 'নারীর ইতিহাস' বইটি লিখবার জন্য একদিকে যেমন প্রচুর পড়াশুনা করেছিলেন, অপরদিকে তেমনি বাস্তব ইতিহাস জানবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রমও করেছিলেন। তিনি বহুদিন ধরে বহু পরিশ্রম করে প্রায় ছয় সাত শত বাঙ্গালী কুলত্যাগীনীর ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র পরে আর 'নারীর ইতিহাস' লেখেন নি। তবে ঐ ঘটনার অল্প দিন পরেই তিনি আবার উৎসাহ নিয়ে চরিত্রহীন লিখতে সুরু করেছিলেন। এবং ঐ বৎসরই অক্টোবর মাসের মধ্যেই পুনরায় চরিত্রহীনের গোড়ার দিকের কতকগুলি অধ্যায়ও লিখেছিলেন। কেননা ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে শরৎচন্দ্র যখন অফিসে ১ মাসের ছুটি নিয়ে বাঙ্গলা দেশে আসেন, তখন তিনি চরিত্রহীন লিখছিলেন এবং চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপিটা সঙ্গে করেও এনেছিলেন।

'যমুনা' ও 'সাহিত্যে' রচনা প্রকাশ

শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশে যাওয়ার পর, সেখান থেকে প্রথম বাঙলা দেশে আসেন ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। তখন তিনি অফিসে তিন মাসের ছুটি নিয়ে এসে কলকাতায় ছিলেন।

এরপর, ১ মাসের ছুটি নিয়ে আবার তিনি এসেছিলেন ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। এবার তিনি এসে হাওড়া ময়দানের কাছে একটা বাড়ীতে ছিলেন।

এই হাওড়ায় থাকাকালে শরৎচন্দ্র একদিন তাঁর মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্য তাঁদের ভবানীপুরের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র যখন যান, উপেনবাবু তখন বাড়ীতে ছিলেন না। তাই তিনি, এসেছিলেন, শুধু এই কথাটাই একটা স্লিপে লিখে চাকরের হাতে দিয়ে যান। কিন্তু ঐ স্লিপে তিনি তাঁর হাওড়ার ঠিকানা দিয়ে যান নি।

উপেনবাবু বাড়ী এসে, শরৎচন্দ্র এসেছিলেন, এ কথা জানতে পারলেন বটে, কিন্তু তাঁর ঠিকানা না পাওয়ায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারলেন না।

কয়েকদিন পরে শরৎচন্দ্র আর একবার উপেনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেও তাঁর দেখা পেলেন না। সেদিনও শরৎচন্দ্র নিজের ঠিকানা না দিয়ে শুধু আসার সংবাদটা জানিয়েই স্লিপ রেখে এলেন।

উপেনবাবু এবারও বাড়ী ফিরে শরৎচন্দ্রের স্লিপ পেলেন, কিন্তু তাঁর ঠিকানা জানতে পারলেন না। উপেনবাবু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন।

এই সময় হঠাৎ একদিন উপেনবাবুর মাথায় এল, শরৎচন্দ্রের মেজভাই প্রভাসচন্দ্রের কথা। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে যাওয়ার আগে এঁকে আসানসোলে রেখে গিয়েছিলেন। ইনি সেখানে কয়েক বছর থেকে পরে বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন এবং সন্ন্যাসী হয়ে স্বামী বেদানন্দ নাম গ্রহণ করেছিলেন। শরৎচন্দ্র এ সব কথা জানতেন এবং শরৎচন্দ্রের মামার বাড়ীর লোকেরাও জানতেন। তাই উপেনবাবু ভাবলেন, শরৎচন্দ্র এসে যদি তাঁর ভাইএর সঙ্গে দেখা করেন, তাহলে তাঁকে তাঁর ঠিকানাও দিতে পারেন।

এই ভেবে উপেনবাবু একদিন বেলুড় মঠে গেলেন এবং সেখানে প্রভাস-চন্দ্রের (স্বামী বেদানন্দ) কাছে শরৎচন্দ্রের ঠিকানাও পেলেন।

ঠিকানা সংগ্রহ করে উপেনবাবু একদিন শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

ঠিকানা না জানানো সত্বেও, উপেনবাবুর আগমন দেখে শরৎচন্দ্র প্রথমটায় একটু বিস্মিত হলেন। তারপর তিনি উপেনবাবুর মুখেই, কিভাবে তিনি ঠিকানা সংগ্রহ করেছেন, সমস্ত শুনলেন।

উপেনবাবু যখন যান, শরৎচন্দ্র তখন ঘরের মেঝেয় বসে চরিত্রহীন লিখছিলেন। উপেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কি লিখছিলে?

শরৎচন্দ্র বললেন—চরিত্রহীন নামে একটা উপন্যাস।—এই বলে তিনি চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপিটি উপেনবাবুর হাতে দিলেন।

উপেনবাবু পাণ্ডুলিপিটি হাতে পেয়েই খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন।

একটু পরে শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—কি উপীন, কেমন লাগছে?

উপেনবাবু বললেন—খুব ভাল।

তখন শরৎচন্দ্র বললেন—তবে এক কাজ কর। ওটা নিয়ে বাড়ী যাও এবং সমস্তটা পড়ে কেমন লাগল আমায় জানাবে।

শরৎচন্দ্রের এই প্রস্তাবে উপেনবাবু খুশী হয়ে, শরৎচন্দ্রের লিখবার সুবিধার জন্য শেষের দু-একটা শ্লিপ রেখে সমস্ত পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে এলেন এবং দুদিন পরে পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন, বলেন।

বাড়ী এসে উপেনবাবু রাত্রের মধ্যেই সমস্ত লেখাটি পড়ে ফেললেন। চরিত্রহীন পড়ে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। পাণ্ডুলিপির যে অংশগুলি উপেন-বাবুকে ভাল লেগেছিল, সকালে উঠে তিনি পুনরায় সেই স্থানগুলি বার বার পড়তে লাগলেন; এবং সেই সময়কার বিখ্যাত 'সাহিত্য' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক ও খ্যাতনামা সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নিকটে চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে যাওয়াও মনস্থ করলেন। উপেনবাবু হাওড়ায় শরৎচন্দ্রের নিকটে পাণ্ডুলিপিটি প্রথম পড়বার সময়েই এই মতলব করেছিলেন। তাই তিনি সমাজপতিকে পাণ্ডুলিপি দেখানোর ব্যাপারে সময় লাগবে বলে, শরৎচন্দ্রকে চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মতলব করে একদিন বেশী সময় চেয়ে নিয়েছিলেন।

দুপুরের পর উপেনবাবু চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে সমাজপতির বাড়ীতে গেলেন। উপেনবাবু সমাজপতিকে চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপিটি পড়তে দিলেন।

সমাজপতি পাণ্ডুলিপির খানিকটা পড়ে লেখকের পরিচয় জানতে চাইলেন। তখন উপেনবাবু 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'বড়দিদি'র লেখক ও তাঁর আত্মীয় বলে শরৎচন্দ্রের পরিচয় দিলেন এবং এ কথাও জানালেন যে, শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে এসে হাওড়ায় আছেন।

শরৎচন্দ্র হাওড়ায় আছেন, শুনেই সমাজপতি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন এবং উপেনবাবুকে বললেন—লেখা আজ আমার কাছে থাক, রাত্রে পড়ে শেষ করব। আর কাল এই সময় তুমি শরৎকে নিয়ে আমার এখানে আসবে। তুমি শরৎকে বলবে যে, বাঙ্গলা দেশের একজন শক্তিমান লেখককে আমি সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

পরদিন যথাসময়ে উপেনবাবু একপ্রকার জোর করেই শরৎচন্দ্রকে ধরে নিয়ে সমাজপতির কাছে গেলেন। এইভাবে সমাজপতির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় হ'ল। সমাজপতি শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের উচ্চ প্রশংসা করলেও, 'সাহিত্য' পত্রিকায় ঐ ধরণের উপন্যাস ছাপতে সাহসী হলেন না। তিনি শরৎচন্দ্রকে বললেন—এ লেখা আপনার ফেরৎ দিলাম বটে, কিন্তু শীঘ্রই আমাকে আপনার অন্য লেখা দিতে হবে।

'চরিত্রহীনে'র পাণ্ডুলিপি ফেরৎ নিয়ে শরৎচন্দ্র ও উপেনবাবু সমাজপতির কাছ থেকে চলে এলেন। শরৎচন্দ্র এবার হাওড়ায় ফিরবেন। তাঁকে বিদায় দেবার পূর্বে উপেনবাবু বললেন—আমাদের ভবানীপুরের বাড়ীতে কাল তোমার আসা চাই-ই।

শরৎচন্দ্র সম্মতি জানিয়ে হাওড়ায় চলে গেলেন। উপেনবাবুও নিজের বাড়ীতে ফিরে এলেন।

বাড়ী ফেরার পথে উপেনবাবু চিন্তা করলেন—সমাজপতি যখন 'সাহিত্য' পত্রিকায় চরিত্রহীন ছাপলেন না, তখন এই উপন্যাসটিকে 'যমুনা' পত্রিকায় ছাপলে মন্দ হয় না। 'যমুনা' তো কোন রকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই চলছে। এই রকমের একটা ভাল লেখা ছাপলে কাগজটা যদি একটু চালু হয়।

এই 'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল ছিলেন, উপেনবাবুর বিশেষ বন্ধু। ফণিবাবু উপেনবাবুদের বাড়ীর কাছেই থাকতেন। আর তখন যমুনার

অফিসও ছিল তাঁর বাড়ীতেই। উপেনবাবু প্রতিদিনই প্রায় যমুনা অফিসে যেতেন এবং কাগজ চালানোর ব্যাপারে বুদ্ধি ও পরিশ্রম দিয়ে বন্ধুকে কিছু কিছু সাহায্য করতেন।

উপেনবাবু বাড়ী ফিরেই তখনি যমুনা অফিসে গেলেন। যমুনা অফিসে গিয়ে ফণিবাবুকে শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের কথা বললেন। এবং এ কথাও বললেন, শরৎচন্দ্র আগামীকাল বিকালে আমাদের বাড়ীতে আসবেন।

ফণিবাবু ইতিপূর্বেই উপেনবাবুর কাছ থেকে শরৎচন্দ্রের সমস্ত পরিচয়ই পেয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি নিজেও এর আগে ভারতীতে শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' পড়েছিলেন।

পরদিন বিকালে ফণিবাবু উপেনবাবুদের বাড়ীতে গেলে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হ'ল। তারপর তিনি বিশেষ অনুরোধ ও আমন্ত্রণ জানিয়ে শরৎচন্দ্রকে যমুনা অফিসে নিয়ে এলেন। সঙ্গে উপেনবাবুও এলেন। শরৎচন্দ্র যমুনা অফিসে এলে এই কাগজটির সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হ'ল। শেষে ফণিবাবু ও উপেনবাবু দুই বন্ধুতে মিলে যাতে যমুনায় চরিত্রহীন ছাপা হয়, তার জন্য শরৎচন্দ্রকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন।

শরৎচন্দ্র যমুনায় চরিত্রহীন দিতে সম্মত হলেন।

এরপর শরৎচন্দ্র সেদিন ফণিবাবুর বাড়ীতে ভূরিভোজন করে হাওড়ায় ফিরে গেলেন।

পরে শরৎচন্দ্র হাওড়া থেকে মাঝে মাঝে আরও কয়েকদিন যমুনা অফিসে এসেছিলেন এবং কাগজের উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। যমুনা-সম্পাদক ফণিবাবুর অনুরোধে শরৎচন্দ্র যমুনায় চরিত্রহীন দেওয়া ছাড়াও, রেঙ্গুনে গিয়ে মাঝে মাঝে লেখা দিয়ে যমুনাকে সাহায্য করবেন, এ কথাও বলেছিলেন।

এই সময়ে শরৎচন্দ্র একদিন সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের ভবানীপুরের বাড়ীতেও গিয়েছিলেন। সেদিন গিয়ে তিনি সৌরীনবাবুকে বলেছিলেন—ভারতীতে বড়দিদি কি ছেপেছিলে, কই পড়ত শুনি!

শরৎচন্দ্রের কথায় সৌরীনবাবু বড়দিদি পড়ে শোনান। শুনে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—ভালই লিখেছিলাম তো!

সৌরীনবাবুর বাড়ীতে সেদিন ঐ পড়ার আসরে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং ফণীন্দ্রনাথ পালও উপস্থিত ছিলেন।

ফণিবাবুর সঙ্গে সৌরীনবাবুরও হৃদ্যতা ছিল। সৌরীনবাবু ভারতী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, পাড়ার পত্রিকা বলে যমুনা-পরিচালনায় ফণিবাবুকে সাহায্য করতেন।

শরৎচন্দ্রের নিকট চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি দেখে, যাতে ভারতীতে চরিত্রহীন ছাপা হয়, সৌরীনবাবু তার চেষ্টা করেছিলেন। সৌরীনবাবু চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি পড়ে ভারতীর তৎকালীন সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবীকেও পড়তে দিয়েছিলেন।

স্বর্ণকুমারী দেবী পড়ে সৌরীনবাবুকে বলেছিলেন—লেখা চমৎকার! শেষ করিয়ে নিয়ে এস। এর জন্য আগাম একশ' টাকা এখনি দোব।

সৌরীনবাবু শরৎচন্দ্রকে একথা বললে, শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—এ জিনিষ তাড়া দিয়ে শেষ করবার নয়, তাছাড়া এই গ্রন্থের নায়িকা কিরণময়ী সম্বন্ধে শেষে যা লেখা হবে, সে কথা মহিলা-সম্পাদিত কোন পত্রিকায় ছাপা উচিত হবে না।

এর দিন কয়েক পরে শরৎচন্দ্র একদিন বাঙ্গলা দেশ ছেড়ে আবার রেঙ্গুনে চলে গেলেন।

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে শরৎচন্দ্রের বাল্য-রচনাগুলি আছে এ কথা পরে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শরৎচন্দ্রের আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবরা জেনেছিলেন। এই জেনে সৌরীনবাবু, সুরেনবাবুর কাছ থেকে যমুনার জন্য শরৎচন্দ্রের একটি গল্প চেয়ে আনেন। সেই গল্পটির নাম 'বোঝা'। এই 'বোঝা' গল্পটি ১৩১৯ সালের 'যমুনায়' কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই তিন সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়।

এদিকে উপেনবাবুও সুরেনবাবুর কাছ থেকে শরৎচন্দ্রের 'বাল্যস্মৃতি' ও 'কাশীনাথ' নামে দুটি রচনা আদায় করেন। উপেনবাবু শরৎচন্দ্রের ঐ দুটি রচনা এনে সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে দিলে, সমাজপতি ১৩১৯ সালের মাঘ সংখ্যা 'সাহিত্যে' 'বাল্যস্মৃতি' এবং পরবর্তী ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় 'কাশীনাথ' প্রকাশ করেন।

'সাহিত্য' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের লেখা ছাপানো সম্বন্ধে উপেনবাবু বলেছেন—যমুনায় শরৎচন্দ্রের 'বোঝা' গল্প পড়ে সমাজপতি তাঁর কাছে শরৎ-

চন্দ্রের কোন লেখা চেয়েছিলেন। তাই তিনি সমাজপতিকে শরৎচন্দ্রের লেখা দুটি এনে দিয়েছিলেন।

কিন্তু সুরেনবাবু ও সৌরীনবাবু বলেন, 'সাহিত্যে' শরৎচন্দ্রের লেখা দিয়ে, সাহিত্যে নিজের লেখা ছাপাবার একটা সুবিধা করে নেবার জন্যই উপেনবাবু ঐরূপ করেছিলেন।

এ সম্বন্ধে সুরেনবাবু পরে লিখেছেন—"এ বিষয়ে খোলা কথা বললে অন্যের গ্লানিই করা হয়। এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, কেউ কেউ শরৎচন্দ্রের লেখা দিতে পারেন আশা দিয়ে কোন নামী কাগজে নিজের লেখা চালাবার চেষ্টা যে কোরতেন না এমন নয়। তখন 'সাহিত্যে'র সমাজপতি মশাই যদি কারুর লেখা তাঁর কাগজে বা'র করতেন তো সেই লেখক মনে কোরতেন—তিনি বাজিমাৎ কোরেছেন।" (শরৎ-পরিচয়)

সৌরীনবাবু লিখেছেন—"ইতিমধ্যে একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটলো তাঁর লেখা 'বাল্যস্মৃতি' এবং 'কাশীনাথ' গল্প 'সাহিত্যে' ছাপানো নিয়ে। সাহিত্য-সম্পাদকের কৃপা লাভের বাসনায়, অর্থাৎ নিজের লেখা গল্প সাহিত্যে ছাপাবার সুবিধে হবে ভেবে আমাদের এক বন্ধু শরৎচন্দ্রের লেখা ঐ দুটি গল্প কোন রকমে হস্তগত করেন ; কোরে শরৎচন্দ্র এবং আমাদের সকলের অজ্ঞাতে ও-দুটি লেখা চুপি চুপি সাহিত্য-সম্পাদকের হাতে তুলে দেন এবং সাহিত্যে তা ছাপা হয়। আমরাও এ অপরাধ কোরেছিলাম। সুরেনের কাছ থেকে 'বোঝা' গল্প এনে ছেপে দিলুম যমুনায়।"

যমুনা ও সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের এই বাল্য-রচনাগুলি যখন প্রকাশিত হয়, শরৎচন্দ্র তখন এর কিছুই জানতেন না। পরে তাঁর কাছে পত্রিকা পাঠানো হলে, তিনি তাঁর ঐ লেখাগুলি পড়ে জানতে পারেন। এবং কিভাবে লেখা-গুলি যমুনা ও সাহিত্যে প্রকাশিত হয়েছে, সুরেনবাবুর পত্রে শরৎচন্দ্র সমস্ত জানেন। যমুনায় 'বোঝা' গল্প এবং বিশেষ করে সাহিত্যের মত একটি বিখ্যাত পত্রিকায় তাঁর বাল্য-রচনা প্রকাশিত হওয়ায় শরৎচন্দ্র তখন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। কেন না, তিনি তখন চাইতেন না যে, তাঁর ছেলেবেলাকার লেখাগুলি হুবহু ছাপা হোক্। তাই তিনি মাঘ মাসের সাহিত্যে তাঁর 'বাল্যস্মৃতি' লেখাটি পড়ে, তখনই যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালকে লিখিত একটি পত্রের এক জায়গায় এ বিষয়ের উল্লেখ করে লিখেছিলেন—

"এ মাসের সাহিত্যে আমার নাম দিয়ে কি একটা ছাই-পাঁশ ছাপিয়েছে। ওকি আমার লেখা? আমার তো একটুও মনে পড়ে না। তাছাড়া যদি তাই হয়, তাহলেই বা ছাপানো কেন? মানুষ ছেলেবেলায় অনেক লেখে, সেগুলো কি প্রকাশ করতে আছে? আপনি 'বোঝা' ছাপিয়ে আমাকে যেমন লজ্জিত করেছেন, সমাজপতিও তেমনি ঐটে ছাপিয়ে আমাকে লজ্জা দিয়েছেন। যদি উপীনকে চিঠি লেখেন, এই অনুরোধটা জানাবেন, যেন আমার অমতে আর কিছুই না প্রকাশ হয়।"

শরৎচন্দ্রের এই অনুরোধ সত্ত্বেও ঐ ১৩১৯ সালেই সাহিত্যের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় আবার যখন শরৎচন্দ্রের 'কাশীনাথ' বেরোল, তখন শরৎচন্দ্র ঐ চৈত্র মাসেই ফণীন্দ্রনাথ পালকে এ সম্বন্ধে আবার লিখেছিলেন—

"...আপনি একটা কথা বলিতে পারেন কি? আমার আরও কতদিন শ্রাদ্ধ সাহিত্য কাগজে হইবে? লোকে হয়ত মনে করিবে আমার লেখার ক্ষমতা 'কাশীনাথের' অধিক নয়। এটাতে যে নাম খারাপ হয়, উপীন বেচারার বোধ হয় সে কথা মনেও ছিল না। তথাপি সে যে আমার আন্তরিক মঙ্গলেচ্ছাতেই এরূপ করিয়াছে, এই জন্যই কোনমতে সহ্য করিয়া আছি। আর উপায়ও নাই। তবে জিজ্ঞাসা করি আরও ঐ রকমের গল্প তাঁদের হাতে আছে নাকি? যদি থাকে তাহলেই সারা হব দেখছি।"

এ সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎ-পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন—"এজন্য শরচন্দ্র বহু অনুযোগ জানিয়ে চিঠি লেখেন ফণি পালকে এবং আমাকে। লেখেন, তাঁর অমতে যেন তাঁর আগেকার কোন লেখা আমরা আর না ছাপাই। ......শরৎচন্দ্র তাঁর ছেলেবেলার লেখাগুলি আমার জিম্মায় রেখে আমাকে কেন যে অযথা বিব্রত করেছিলেন।"

যাই হোক্, এদিকে শরৎচন্দ্র ফণিবাবুকে কলকাতায় যে কথা দিয়ে গিয়েছিলেন—যথাসম্ভব মাসে মাসে লেখা পাঠাবেন—সেই অনুযায়ী কিছু দিনের মধ্যেই তিনি প্রথমে দুটি লেখা পাঠালেন। এই লেখা দুটি হ'ল—'রামের সুমতি' ও 'নারীর লেখা'। মাসিক পত্রিকায় লেখা পাঠানো শরৎ-চন্দ্রের এই-ই প্রথম।

'রামের সুমতি' লেখাটি একটি গল্প, আর 'নারীর লেখা'টি একটি প্রবন্ধ। 'রামের সুমতি'র লেখক হিসাবে শরৎচন্দ্র নিজের নাম দিয়েছিলেন, কিন্তু

'নারীর লেখা'য় অনিলা দেবী—তাঁর দিদির এই নামটি, ছদ্মনাম হিসাবে তিনি ব্যবহার করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র এই সময় ১২-২-১৩ তারিখে ফণিবাবুকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—"আমার তিনটে নাম।

সমালোচনা, প্রবন্ধ প্রভৃতি—অনিলা দেবী।

ছোট গল্প—শরৎচন্দ্র চট্টো।

বড় গল্প—অনুপমা।

সমস্তই এক নামে হ'লে লোকে মনে করবে, এই লোকটি ছাড়া আর বুঝি এদের কেউ নেই।"

১৩১৯ সালে যমুনার ফাল্গুন ও চৈত্র এই দুই সংখ্যায় 'রামের সুমতি' প্রকাশিত হয়েছিল, আর ঐ ফাল্গুন সংখ্যাতেই অনিলা দেবী এই ছদ্মনামে শরৎচন্দ্রের 'নারীর লেখা' প্রবন্ধটিও ছাপা হয়েছিল।

এরপর ১৩২০ সালের বৈশাখ সংখ্যা ও শ্রাবণ সংখ্যা যমুনায় যথাক্রমে শরৎচন্দ্রের 'পথ নির্দেশ' ও 'বিন্দুর ছেলে' গল্প দুটি প্রকাশিত হয়।

যমুনায় এইভাবে পর পর শরৎচন্দ্রের কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হলে, সাহিত্যিক ও পাঠকমহলে এক বিরাট সাড়া পড়ে গেল এবং শরৎচন্দ্র যে এক জন মহাশক্তিশালী লেখক, তা বুঝতে আর কারও বাকি রইল না।

'ভারতবর্ষে'র সহিত দৃঢ় সম্বন্ধ

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে ফিরে যাওয়ার আগে যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালকে কথা দিয়েছিলেন, তাঁর যমুনা কাগজেই চরিত্রহীন বেরোবে। আর শুধু চরিত্রহীনই নয়, তিনি আরও বলেছিলেন যে, রেঙ্গুনে গিয়ে তিনি মাসে মাসে গল্প, প্রবন্ধ লিখেও যমুনার জন্য পাঠিয়ে দেবেন।

ফণিবাবু শরৎচন্দ্রের এই কথা পেয়ে কলকাতায় বন্ধুমহলে ব'লে বেড়াতে লাগলেন, ভারতীতে প্রকাশিত 'বড়দিদি'র লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চরিত্রহীন' নামে একটি অপূর্ব উপন্যাস তাঁর কাগজে তো বেরোবেই, তাছাড়া যমুনায় মাসে মাসে সেই শরৎচন্দ্রের গল্প, প্রবন্ধও থাকবে।

ফণিবাবুর এইরূপ প্রচারের ফলে কলকাতার অন্যান্য কাগজের মালিকদের কেউ কেউ তখন ফণিবাবুর উপর ঈর্ষান্বিতও হয়েছিলেন।

ঠিক এই সময়টায় কলকাতার বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের অন্যতম মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় তাঁদের এই প্রতিষ্ঠান থেকে খুব জাঁক করে 'ভারতবর্ষ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বা'র করবার তোড়জোড় করছিলেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা প্রকাশের ইতিহাসটা হচ্ছে এই :—

কলকাতায় তখন 'ইভ্‌নিং ক্লাব' নামে একটা নামকরা ক্লাব ছিল। সেই ক্লাবের সভাপতি ছিলেন কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং সম্পাদক ছিলেন প্রমথনাথ ভট্টাচার্য (এঁর সঙ্গেই মজঃফরপুরে শরৎচন্দ্রের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়েছিল)। হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ঐ ক্লাবের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন।

প্রমথবাবু একদিন ক্লাবের এক সভায় ক্লাবের মুখপত্র হিসাবে একটি মাসিক পত্রিকা বা'র করার প্রস্তাব করেন। কাগজ চালানো অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এবং ক্লাবের সদস্যদের দ্বারা তা সম্ভবপর নয় ব'লে সদস্যরা প্রমথবাবুর প্রস্তাব সমর্থন করলেন না। তখন হরিদাসবাবু বললেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যদি সম্পাদক হন, তাহলে খুব বড় করে এবং জাঁক করে একটি মাসিক পত্রিকা তাঁদের প্রতিষ্ঠান থেকে বা'র করতে তিনি প্রস্তুত আছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পাদক হ'তে রাজী হ'লে, হরিদাসবাবুদের প্রতিষ্ঠান 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স' থেকে

'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকাটি বা'র হয়। ভারতবর্ষ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২০ সালের আষাঢ় (১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন) মাসে। ভারতবর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার কয়েক দিন আগেই দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হওয়ায়, জলধর সেন ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ দুজনে ভারতবর্ষের যুগ্ম-সম্পাদক হয়েছিলেন।

১৩২০ সালের আষাঢ় মাসে 'ভারতবর্ষ' প্রথম প্রকাশিত হলেও, এর ছ-সাত মাস আগে থেকেই এই কাগজ বা'র করবার তোড়জোড় চলেছিল। ভারতবর্ষ কাগজ বা'র করার ব্যাপারে হরিদাসবাবুর প্রধান সহায়ক ছিলেন, তাঁর বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। এই প্রমথবাবু আবার ছিলেন শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট বন্ধু।

এদিকে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন যাওয়ার আগে ফণীন্দ্রনাথ পালকে গল্প, প্রবন্ধ পাঠিয়ে দেবার যে কথা দিয়েছিলেন, সেই কথা অনুযায়ী তিনি প্রথম দফায় তাঁর 'রামের সুমতি' গল্প এবং 'নারীর লেখা' প্রবন্ধ ফণিবাবুর কাছে পাঠিয়ে দেন। ফণিবাবু যমুনার ১৩১৯ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র দু' সংখ্যায় 'রামের সুমতি' এবং ১৩১৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় 'নারীর লেখা' প্রকাশ করেন। ফণিবাবু আবার শরৎচন্দ্রের 'পথ নির্দেশ' গল্পটি পেয়ে যমুনার ১৩২০ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশ করেন।

এই সময় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার প্রধান সহায়ক প্রমথনাথ ভট্টাচার্য দেখলেন, তাঁর বন্ধু শরৎচন্দ্রের গল্প, প্রবন্ধ যমুনায় প্রকাশিত হচ্ছে। প্রমথবাবু, শুধু এই দেখাই নয়, তিনি আরও শুনলেন যে, যমুনায় শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' নামে একটি উপন্যাসও প্রকাশিত হবে।

হরিদাস চট্টোপাধ্যায় একদিন আমাকে বলেছিলেন—শরৎচন্দ্র যখন মজঃফরপুরে ছিলেন, তখনই এই চরিত্রহীন উপন্যাসটি তিনি লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। প্রমথবাবু মজঃফরপুরে শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীনের অর্ধেকটা লেখা পাণ্ডুলিপি দেখেছিলেন।

যমুনায় চরিত্রহীন ছাপা হবে শুনে প্রমথবাবু শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে, চরিত্রহীন 'ভারতবর্ষে'র ন্যায় একটা বড় কাগজে যাতে ছাপা হয়, সেজন্য চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপিটা পাঠিয়ে দেবার জন্য শরৎচন্দ্রকে বিশেষভাবে অনুরোধ ক'রে বারবার চিঠি লিখতে লাগলেন। তাছাড়া ভারতবর্ষে গল্প, প্রবন্ধ দেবার জন্যও প্রমথবাবু শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করতে লাগলেন।

যমুনায় শরৎচন্দ্রের 'মায়ের স্মৃতি' ও 'নারীর মূল্য' পড়ে সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি খুব মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি ইতিপূর্বে চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি পড়ে শরৎচন্দ্রকে ফেরৎ দিয়েছিলেন। তিনিও এখন আবার 'সাহিত্যে' চরিত্রহীন ছাপবেন ব'লে, চরিত্রহীন চেয়ে শরৎচন্দ্রের কাছে চিঠি দিলেন।

একদিকে 'যমুনা', অপরদিকে 'ভারতবর্ষ' ও 'সাহিত্য', কোন্ কাগজে 'চরিত্রহীন' দেবেন, এই নিয়ে শরৎচন্দ্র তখন একটু চিন্তায় পড়েছিলেন। এই সময় তিনি তাঁর মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

"ভারতবর্ষ কাগজের জন্য প্রমথ চরিত্রহীন বরাবরই চাহিতেছিল। শেষে এমনি পীড়াপীড়ি করিতেছে যে, কি আর বলিব! সে আমার বহুদিনের পুরাতন বন্ধু এবং বন্ধু বলিলে সত্য যাহা বুঝায়, তাহাই। সে জাঁক করিয়া সকলের কাছে বলিয়াছে, চরিত্রহীন দেবই এবং এই আশায়······প্রভৃতির লেখা চার পাঁচটি উপন্যাস অহঙ্কার করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে। সে-ই হইতেছে 'ভারতবর্ষে'র মোড়ল। এখন দ্বিজুবাবু প্রভৃতি (হরিদাস, গুরুদাসের পুত্র) তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। এদিকে যমুনায়ও বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে, ঐ কাগজে চরিত্রহীন ছাপা হইবে। সমাজপতিও রেজেস্ট্রি চিঠি ক্রমাগত লিখিতেছেন। কোন্ দিকে কি করি একেবারে ভাবিয়া পাইতেছি না। এইমাত্র আবার প্রমথনাথের দীর্ঘ কান্নাকাটি চিঠি পাইলাম। সে বলে, এটা সে না পাইলে, আর তাহার মুখ দেখাইবার জো থাকিবে না। এমন কি পুরাতন বন্ধু-বান্ধব, ক্লাব প্রভৃতি ছাড়িতে হইবে।"

এইরূপ সংকটের মধ্যে পড়ে শরৎচন্দ্র তখন ভাবলেন, সমাজপতির আবেদন উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। কেননা, তিনি চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি নিয়ে ছাপতে পারবেন না ব'লে ফেরৎ দিয়েছিলেন। আর ফণীন্দ্রনাথ পালকে চরিত্রহীন দেবেন ব'লে কথা দিলেও, বন্ধু প্রমথনাথের অনুরোধটাকেও উপেক্ষা করা যায় না।

শরৎচন্দ্র আরও ভাবলেন, যমুনা ও সাহিত্যে তাঁর কিছু কিছু লেখা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। (উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে শরৎচন্দ্রের বাল্যস্মৃতি ও কাশীনাথ গল্প দুটি এনে সমাজপতিকে দিলে তিনি সাহিত্য পত্রিকায় ঐ গল্প দুটি যথাক্রমে ১৩১৯ মাঘ ও ১৩১৯ ফাল্গুন, চৈত্র মাসে প্রকাশ করেছিলেন। আর শরৎচন্দ্র নিজে

যমুনায় লেখা পাঠাবার আগে, ঐভাবে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ও সুরেন-বাবুর কাছ থেকে শরৎচন্দ্রের 'বোঝা' গল্পটি এনে যমুনার ১৩১৯ কার্ত্তিক-পৌষ সংখ্যায় ছেপেছিলেন।) তাই এঁদের যদি চরিত্রহীন না দেওয়া যায়, এঁরা ততটা দুঃখিত হবেন না।

এই ভেবে শরৎচন্দ্র শেষে বন্ধু প্রমথনাথের অনুরোধে ভারতবর্ষেই চরিত্রহীন দেওয়া স্থির করলেন। এবং চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপির যতটা লেখা হয়েছিল, তা প্রমথবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও ভারতবর্ষের অন্যান্য হিতৈষী বন্ধুগণ কিন্তু শরৎচন্দ্রের প্রেরিত চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপির অংশটি পড়ে সম্পূর্ণ না দেখে ঐ নূতন কাগজে চরিত্রহীন ছাপতে সাহসী হলেন না।

শরৎচন্দ্র চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি ফেরৎ চেয়ে সেই সময় প্রমথবাবুকে লিখেছিলেন—

"······আমি জানিতাম, ওটা তোমাদের পছন্দ হইবে না। এবং সে কথা পূর্ব পত্রে লিখিয়াওছিলাম। তবে, এ সম্বন্ধে আমার একটু বলিবার আছে যে, যে লোক জানিয়া শুনিয়া 'মেসের ঝি'কে আরম্ভতেই টানিয়া আনিবার সাহস করে, সে জানিয়া শুনিয়াই করে। তোমরা ওকে, ওর শেষটা না জানিয়াই অর্থাৎ সাবিত্রীকে মেসের ঝি বলিয়াই দেখিয়াছ। প্রমথ, হীরাকে কাঁচ বলিয়া ভুল করিলে ভাই! অনেক বিশেষজ্ঞ ও বইটা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। ইহার উপসংহার জানিতে চাহিয়াছ! এ একটা 'সাইণ্টিফিক্ সাইকো: এণ্ড এথিক্যাল নভেল:' আর কেউ এ রকম করিয়া বাঙ্গলায় লিখিয়াছে বলিয়া জানি না। এইতেই ভয় পেলে ভাই? কাউন্ট টলস্টয়ের 'রিসারেকশন' পড়েছ কি? 'হিজ বেস্ট বুক' একটা সাধারণ বেশ্যাকে লইয়া লেখা। তবে, আমাদের দেশে এখনো অতটা আর্ট বুঝিবার সময় হয় নাই, সে কথা সত্য।

যা হোক, ওটা যখন হইল না, তখন এ লইয়া আলোচনা বৃথা। এবং আমারও তেমন মত ছিল না। তোমাদের ওটা নূতন কাগজ, ওতে এতটা সাহসের পরিচয় না দেওয়াই সঙ্গত। তবে, আমারও অন্য উপায় নাই। আমি উলঙ্গ বলিয়া 'আর্ট'কে ঘৃণা কারতে পারিব না, তবে যাতে এটা 'ইন স্ট্রিক্টেস্ট সেন্স মরাল' হয় তাই উপসংহার করব। আমাকে রেজেস্ট্রি ক'রে

পাঠিয়ে দিও, ফণিকে দিবার আবশ্যক নাই। তোমাদের প্রথম সংখ্যার জন্ম কি দিব ভাই? কি রকম চাও একটু লিখে জানালে বড় ভাল হয়। আমার যথাসাধ্য করিব।……"

শরৎচন্দ্র এবার চরিত্রহীন ফণীন্দ্রনাথ পালের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ফণিবাবু ১৩২০ সালের কার্তিক থেকে যমুনায় চরিত্রহীন ছাপতে আরম্ভ করলেন।

চরিত্রহীন ফেরৎ দিলেও প্রমথবাবু ভারতবর্ষ পত্রিকায় আবার অন্য লেখা দেবার জন্য শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলেন। প্রমথবাবুর অনুরোধে শরৎচন্দ্র ভারতবর্ষের জন্য এবার 'বিরাজ বৌ' উপন্যাসটি পাঠিয়ে দিলেন। এই বিরাজ বৌ উপন্যাসই ভারতবর্ষের পৃষ্ঠায় শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনা। ১৩২০ সালে ভারতবর্ষের পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় বিরাজ বৌ প্রকাশিত হয়। এরপরই ১৩২১ সালে শরৎচন্দ্রের পণ্ডিতমশাই, আঁধারে আলো, দর্পচূর্ণ ও মেজদিদি এই গল্প কয়টি পর পর ভারতবর্ষে প্রকাশিত হ'ল।

এদিকে যমুনায় শরৎচন্দ্রের নিয়মিত লেখা বেরোতে থাকলেও এবং তিনি যমুনার প্রতি দরদী হলেও, ভারতবর্ষ চরিত্রহীন ফেরৎ দেওয়ার পরেও আবার ভারতবর্ষে শরৎচন্দ্রের লেখা ছাপা হচ্ছে দেখে ফণীন্দ্রনাথ পাল অত্যন্ত বিচলিত হলেন। তিনি যমুনার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্পর্ক আরও দৃঢ় করবার জন্য ১৩২১ সালে এক সময় যমুনার অন্যতর সম্পাদক হিসাবে শরৎচন্দ্রের নাম ছেপে দিলেন। কিন্তু এই ১৩২১ সালেই শরৎচন্দ্র যমুনায় চরিত্রহীন অসমাপ্ত রেখে যমুনার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। এবং এর পর থেকে শরৎচন্দ্র তাঁর প্রায় সকল রচনাই একপ্রকার কেবল 'ভারতবর্ষেই' ছাপাতে লাগলেন।

যমুনার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন

শরৎচন্দ্র ১০-৫-১৩ তারিখে রেঙ্গুন থেকে এক পত্রে যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালকে লিখেছিলেন—

"আগামী মেলে সমালোচনা 'নারীর মূল্য' পাঠাইব। পরের মেলে চন্দ্রনাথ ও একটা যা হয় কিছু। চরিত্রহীন যাতে যমুনায় বা'র হয়, তাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাই হবে। নিশ্চিন্ত হোন্।"

শরৎচন্দ্রের নারীর মূল্য প্রবন্ধ, অনিলা দেবী এই ছদ্মনামে ১৩২০ সালের বৈশাখ-আষাঢ় এবং ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা যমুনায় প্রকাশিত হয়।

১৩২০ সালের আষাঢ় সংখ্যা যমুনায় শরৎচন্দ্রের 'কানকাটা' নামে আর একটি প্রবন্ধও অনিলা দেবী এই ছদ্মনামেই প্রকাশিত হয়েছিল।

চন্দ্রনাথ ১৩২০ সালের বৈশাখ-আশ্বিন সংখ্যা যমুনায় প্রকাশিত হয়। যমুনায় শরৎচন্দ্রের চন্দ্রনাথ উপন্যাস ছাপা শেষ হলেই তার পরের মাস থেকে অর্থাৎ ১৩২০ সালের কার্তিক থেকে চরিত্রহীন ছাপা স্থরু হয়।

যমুনায় চরিত্রহীন ১৩২০ সালের কার্তিক থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত ছাপা হয়ে, ১৩২১ সালেও ছাপা হতে লাগল। এমন সময় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে অর্থাৎ ১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে শরৎচন্দ্র ৬ মাসের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এলেন। এবার তিনি কলকাতায় এসে চোরবাগানে একটি বাড়ীতে রইলেন।

ইতিপূর্বে শরৎচন্দ্রের অনুমতি নিয়ে ফণীন্দ্রনাথ পাল শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন। আর শরৎচন্দ্র নিজেও তাঁর বিরাজ বৌ এবং বিন্দুর ছেলে (বিন্দুর ছেলে, রামের স্থমতি ও পথ নির্দেশ এই তিনটি গল্প নিয়ে) বই দুটি সামান্য অর্থের বিনিময়ে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সকে কপিরাইট বা গ্রন্থের সর্বস্বত্ব বিক্রয় করেছিলেন। বড়দিদি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, আর ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে বিরাজ বৌ এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুলাই বিন্দুর ছেলে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় আসেন, তখন

যমুনা পত্রিকার কার্যালয় ছিল, ভারতবর্ষ পত্রিকার কার্যালয়ের অদূরেই ২২।৩ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে।

শরৎচন্দ্র যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালকে নানা আশা দেওয়া সত্ত্বেও কিভাবে যমুনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল, সে সম্বন্ধে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎচন্দ্রের জীবন-রহস্য' গ্রন্থে একটি বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। সৌরীনবাবু লিখেছেন—

"১৯১৩ (১৩২০) আষাঢ় মাসে ভারতবর্ষ পত্রিকার জন্ম। পরিচালক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য প্রাণপণে চেষ্টা করছেন, শরৎচন্দ্রকে 'যমুনার' কূল থেকে 'ভারতবর্ষে' টেনে নিয়ে যাবার জন্য !···

ফণি পালের যমুনা অফিসের দিকে শরৎচন্দ্র যাতে না ঘেঁষতে পারেন সে সম্বন্ধে প্রমথনাথ সর্বক্ষণ হুঁসিয়ার থাকতেন—ভারতবর্ষ-গোষ্ঠীর সকলেই এ সম্বন্ধে সমান সতর্ক।······

ফণীন্দ্র পালের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রকে এমন বোঝানো হয়েছিল যে, শরৎচন্দ্রের রচনা থেকে ফণীন্দ্র পাল পাচ্ছেন প্রচুর অর্থ এবং প্রতিপত্তি, আর শরৎচন্দ্রকে যৎকিঞ্চিৎ লাভে পরিতৃপ্ত থাকতে হচ্ছে। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের ফার্ম থেকে তাঁর বই বেরোলে হু-হু করে তার সংস্করণ হবে। ফণি পাল তো ঐ 'বড়দিদি' ছাপিয়েছে, কখানা বিক্রি করতে পারছে।"

সৌরীনবাবু আরও লিখেছেন—শরৎচন্দ্রকে এইরূপ বোঝানো হ'লে শরৎচন্দ্র একদিন যমুনা অফিসে গিয়ে ফণি পালের অনুপস্থিতিতেই তাঁর সম্বন্ধীর কাছ থেকে (তাঁর সম্বন্ধী তখন যমুনা অফিসে ছিলেন) দু-তিন শ' কপি 'বড়দিদি' যা বিক্রির জন্য যমুনা অফিসের লাইব্রেরীতে তোলা ছিল, সব ঝাঁকা মুটের মাথায় চাপিয়ে নিয়ে সোজা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে চলে এসেছিলেন।

ফণি পাল, শরৎচন্দ্রের এই ভাবে বই নিয়ে যাওয়ার কথা সৌরীনবাবুকে শোনালে, সৌরীনবাবু তার পরদিনই 'ভারতবর্ষ' অফিসে গিয়ে শরৎচন্দ্রকে বাইরে ডেকে এনে বলেছিলেন—তুমি কাজটা ভাল কর নি। আইনতঃ তুমি দোষ করেছ। কেননা ও-বই ফণি পালের সম্পত্তি। সে নিজের খরচে বই ছাপিয়েছে ও বাঁধিয়েছে। তোমার বইয়ের জন্য তুমি যা টাকা চাইতে ফণি তা দিতে প্রস্তুত ছিল।

সৌরীনবাবুর এই কথায় শরৎচন্দ্র তখন তাঁকে বলেছিলেন—সত্যি, তখন

এতটা বুঝি নি। তুমি ফণিকে বোলো আমার ও বই ছাপতে তার যা খরচ হয়েছে, আমি তাকে দিয়ে দোব। তার কেন লোকসান করি। একটা কথা সৌরীন, শাস্ত্রে আছে, দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী। যে সব লেখক অন্য কাজ করে না, লেখা থেকেই যাদের জীবিকার সংস্থান, তাদের মত দুর্ভাগা জীব সত্যই নেই।

এমনি ভাবে অর্থাৎ এই অভাবের জন্যই শরৎচন্দ্র প্রধানতঃ যমুনা তথা ফণি পালের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন এবং এই অর্থেরই আশায় বড় কাগজ ও বড় দোকান হিসাবে ভারতবর্ষ ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের সঙ্গে লেখা দেওয়া ও বই বিক্রয়ের জন্য পাকাপাকি ব্যবস্থা করেছিলেন।

গ্রন্থাকারে 'পরিণীতা' প্রভৃতির প্রকাশ

১৩২১ সাল। যমুনায় শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন তখনও প্রকাশিত হচ্ছে। শরৎচন্দ্র একেবারে সমস্ত কপি দেন নি। প্রতি মাসে খানিকটা করে লিখে দেন, তাই নিয়েই ছাপা হয়।

ঐ সময় শরৎচন্দ্রও রেঙ্গুন থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসে চোরবাগানে আস্তানা নিয়েছিলেন।

সে মাসে চরিত্রহীনের কপি দিতে শরৎচন্দ্র বড্ড দেরি করছেন। ফলে যমুনা বেরোতেও দেরি হয়ে যাচ্ছে।

পাঠক মহলে যমুনার তখন অসাধারণ পশার। কারণ, শরৎচন্দ্রের রচনা প্রতিমাসে যমুনায় প্রকাশিত হচ্ছে।

ঐ সময় যমুনার কয়েকজন হিতৈষী বন্ধু জুটেছিলেন। তাঁরা নিয়মিত যমুনা অফিসে আসতেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন, সুধীরচন্দ্র সরকার (ইনি এম, সি, সরকার এণ্ড সন্সের অন্যতম মালিক)। সুধীরবাবু তখন বি, এ, পড়েন এবং নিয়মিত যমুনা অফিসে এসে যমুনার প্রকাশনার কাজে ফণিবাবুকে সাহায্য করেন। সুধীরবাবুদের পুস্তকের দোকানে তাঁর দাদারা তখন বসতেন।

সেদিন যমুনা অফিসে বসে যমুনার ঐ হিতৈষী বন্ধুরা সম্পাদক ফণিবাবুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কপি দিতে দেরি করার কথা নিয়েই আলোচনা করছিলেন। সুধীরবাবু বললেন—শরৎচন্দ্র এই যে কপি দিতে দেরি করছেন, এর মধ্যে নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ গোষ্ঠীর হাত রয়েছে।

ঠিক এমনি সময়েই স্বয়ং শরৎচন্দ্র যমুনা অফিসে এসে হাজির হলেন। ফণিবাবু, আসুন, আসুন ক'রে শরৎচন্দ্রকে স্বাগত জানালেন।

শরৎচন্দ্র আসন গ্রহণ ক'রে বললেন—আমি আপনাদের সমস্ত কথাই শুনেছি। কি করব বলুন, শরীর বড় অসুস্থ। তাই কপি দিতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি বুঝি এর জন্য আপনাদের কাগজ বেরোতে দেরি হয়। আপনারা বরং একটু লিখে দিন, লেখকের শরীর অসুস্থ বলে, চরিত্রহীনের কপি দেরিতে পেয়েছি।

সুধীরবাবু ইতিপূর্বে কখনও শরৎচন্দ্রকে দেখেন নি। তিনি বড় অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের কথার উত্তরে তিনিই বললেন—দু-পাতা, তিন পাতা যা পারেন, দয়া করে যদি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দেন তো বড় ভাল হয়। কেননা, মাসের ১লা তারিখে গ্রাহকরা কাগজ না পেলে বড় বিরক্ত হয়।

শরৎচন্দ্র বললেন—আচ্ছা, চেষ্টা করব।

এইভাবেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সুধীরবাবুর প্রথম পরিচয়। তারপর শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে যমুনা অফিসে আসেন, আর সুধীরবাবু তো রোজই আসেন। ক্রমে এঁদের পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল।

এই সময়ে শরৎচন্দ্রের কিছু টাকার প্রয়োজন হয়। ফণিবাবু সে কথা জানতে পারেন। জেনেই তিনি মতলব করলেন, শরৎচন্দ্র, গুরুদাস চট্টো-পাধ্যায় এণ্ড সন্সের খপ্পরে গিয়ে যাতে আর না পড়েন, তার ব্যবস্থা করতে হবে। তখন তিনি শরৎচন্দ্রের পুস্তক প্রকাশের বিনিময়ে শরৎচন্দ্রকে টাকা দেবার জন্য সুধীরবাবুকে পরামর্শ দিলেন।

ঠিক এই সময়টায় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ফার্মের অধ্যক্ষ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় কলকাতায় ছিলেন না। তিনি বায়ু পরিবর্তনের জন্য দেওঘরে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র ইতিপূর্বে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সকে তাঁর দুখানি বই, বিরাজ বৌ ও বিন্দুর ছেলে কপিরাইটে বিক্রি করেছিলেন। তিনিও এবার আর কপিরাইটে না গিয়ে শতকরা ২৫৲ টাকা রয়ালটির ভিত্তিতে তাঁর কখানি বই দিতে সুধীরবাবুর সঙ্গে চুক্তি করলেন।

শরৎচন্দ্র সুধীরবাবুদের ফার্মকে যে-কখানি বই দিতে চুক্তিবদ্ধ হলেন, সেগুলি সবই ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। কেবল চরিত্রহীনটিই তখন প্রকাশিত হচ্ছিল।

শরৎচন্দ্রের চুক্তিবদ্ধ ঐ বইগুলি হ'ল—পরিণীতা, পণ্ডিতমশাই, চন্দ্রনাথ, কাশীনাথ, নারীর মূল্য ও চরিত্রহীন।

পরিণীতা, চন্দ্রনাথ, নারীর মূল্য ইতিপূর্বে যমুনায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'পরিণীতা' ১৩২০ সালের ফাল্গুন সংখ্যা যমুনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পণ্ডিতমশাই বেরিয়েছিল ভারতবর্ষে। কাশীনাথ গ্রন্থের সাতটি গল্প—কাশীনাথ, অনুপমার প্রেম, বাল্যস্মৃতি, হরিচরণ, আলো ও ছায়া, বোঝা ও মন্দির; এর প্রথম চারটি সাহিত্যে, তারপরের দুটি যমুনায় এবং শেষেরটি 'কুন্তলীন

পুরস্কার ১৩০৯ সন'এ প্রকাশিত হয়েছিল। সাহিত্য পত্রিকায় ১৩২০ সালের চৈত্র মাসে 'অনুপমার প্রেম' এবং ১৩২১ সালের আষাঢ় মাসে 'হরিচরণ', আর যমুনা পত্রিকায় ১৩২০ সালের আষাঢ় ও ভাদ্র মাসে 'আলো ও ছায়া' ছাপা হয়েছিল। সমাজপতি শরৎচন্দ্রের কাছে পুনরায় 'চরিত্রহীন' চাইলে, শরৎচন্দ্র তাঁকে আর 'চরিত্রহীন' দেন নি। পরে তিনি তাঁকে 'অনুপমার প্রেম' ও 'হরিচরণ' এই গল্প দুটি দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র বই দিয়ে এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স থেকে টাকা নেবার কয়েকদিন পরেই হরিদাস চট্টোপাধ্যায় দেওঘর থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। ফিরে এসে সমস্ত শুনে তিনি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তাঁর বড় ইচ্ছা ছিল, তিনি শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন বইটা ছাপবেন। আর অন্যান্য বইও তো বটেই।

শরৎচন্দ্র হরিদাসবাবুকে বললেন—চরিত্রহীনের প্রথম সংস্করণ শেষ হতে দেরি হবে না। দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে আপনিই ছাপবেন।

শরৎচন্দ্র ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কলকাতায় ছিলেন। তারপর আবার রেঙ্গুন চলে যান। শরৎচন্দ্রের এই কলকাতায় অবস্থান কালেই এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স শরৎচন্দ্রের পরিণীতা (আগস্ট, ১৯১৪) ও পণ্ডিতমশাই (সেপ্টেম্বর, ১৯১৪) গ্রন্থাকারে ছেপে প্রকাশ করেছিলেন। তারপরে এঁরা শরৎচন্দ্রের কাশীনাথ, চরিত্রহীন ও নারীর মূল্য যথাক্রমে সেপ্টেম্বর-১৯১৭, নভেম্বর-১৯১৭ এবং এপ্রিল-১৯২৩-এ ছেপে প্রকাশ করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র টাকার জন্যই তখন এম, সি, সরকার এণ্ড সন্সকে তাঁর ঐ বইগুলির ১ম সংস্করণ বিক্রয় করলেও, পরে ২য় সংস্করণের সময় কিন্তু এঁদের আর দেন নি। ঐ বইগুলির ২য় সংস্করণ থেকে তিনি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সকে ছাপতে দিয়েছিলেন। তবে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সকে তিনি আর কপিরাইটে বা সর্বস্বত্ব বিক্রি করে বই দেন নি। বিরাজ বৌ ও বিন্দুর ছেলে ছাড়া গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সকে সমস্ত বই রয়ালটির ভিত্তিতে দিয়েছিলেন।

ব্রহ্মদেশ ত্যাগ

ব্রহ্মদেশের জলবায়ু শরৎচন্দ্রের স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল না। সেখানে থাকার সময় তিনি প্রায়ই অসুখে ভুগতেন। অসুখের জন্য অফিসে ছুটি নিয়ে তিনি কয়েকবার কলকাতায় আসতেও বাধ্য হয়েছিলেন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশে যাওয়ার পর তিনি প্রথম দেশে আসেন ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। ঐ সময় তিনি তিন মাসের ছুটি নিয়ে হাইড্রোসিল অপারেশন করাতে কলকাতায় এসেছিলেন এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে চলে গিয়েছিলেন।

তিনি দ্বিতীয়বার দেশে আসেন ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। তখন অফিসে মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়ে এক মাসের ছুটি নিয়ে এসেছিলেন। এসে সেবার তিনি হাওড়া-ময়দানের কাছে একটি বাড়ীতে ছিলেন। এবং এক মাস পরেই ফিরে গিয়েছিলেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে শারীরিক অসুস্থতার জন্য শরৎচন্দ্র আবার কলকাতায় এসেছিলেন। এবার তিনি অফিসে ছ-মাসের ছুটি নিয়ে এসেছিলেন এবং গিয়েছিলেন ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। দু মাস কোনরূপে কাটান। কিন্তু শেষে রেঙ্গুনে রোগ সারার লক্ষণ না দেখে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল তারিখে তিনি দরখাস্ত করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ১১ই এপ্রিল বরাবরের জন্য ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করেন।

শরৎচন্দ্র নিজের অসুখের জন্য মাঝে মাঝে রেঙ্গুন থেকে দেশে এলেও, ঐ সঙ্গে তাঁর দেশে আসার আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল। তিনি রেঙ্গুন যাওয়ার আগে ভাই বোনগুলিকে এখানে রেখে গিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যও দেশে আসতেন।

শরৎচন্দ্র এইরূপ একবার দেশে এসে দেখেন—তাঁর মেজভাই প্রভাসচন্দ্র, যাঁকে তিনি আসানসোলে রেখে গিয়েছিলেন, তিনি আসানসোলেই রেলে একটা চাকরি পেলেও কিছুদিন চাকরি করার পর চাকরি ছেড়ে দেন এবং বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়ে স্বামী বেদানন্দ নাম গ্রহণ করেন।

শরৎচন্দ্র আর একবার এসে তাঁর ছোটভাই প্রকাশচন্দ্রকে, যাঁকে তিনি জলপাইগুড়িতে রেখে গিয়েছিলেন, তাঁকে সেখান থেকে চিঠি দিয়ে আনিয়ে অগ্রদ্বীপের (বর্ধমান জেলায়) জমিদারদের বাড়ীতে রেখে যান। এই জমিদারদের একটা যাত্রা ও থিয়েটারের ক্লাব ছিল। শরৎচন্দ্র যখন ভাগলপুরে আদমপুর ক্লাবে অভিনয় করতেন, সেই সময় একবার তিনি ক্লাবের অভিনয়ের জন্য কলকাতায় এক থিয়েটারের ড্রেসের দোকানে ড্রেস ভাড়া করতে এসেছিলেন। সেদিন ঐ দোকানে অগ্রদ্বীপের জমিদারদেরও একজন তাঁদের ক্লাবের অভিনয়ের জন্য ড্রেস ভাড়া করতে এসেছিলেন। ঐ দোকানেই সেদিন ঐ জমিদারবাবুর সহিত শরৎচন্দ্রের বিশেষ পরিচয় হয়েছিল। এই পরিচয়ের সূত্রেই শরৎচন্দ্র প্রকাশচন্দ্রকে অগ্রদ্বীপের জমিদারদের বাড়ীতে রেখে গিয়েছিলেন। প্রকাশবাবু অগ্রদ্বীপে গিয়ে তাঁদের যাত্রা-থিয়েটারের দলে অভিনয় করতেন এবং তাঁদের বাড়ীতেই থাকতেন খেতেন।

শরৎচন্দ্র ভাগলপুর ছেড়ে আসবার সময়, তাঁর ছোট বোন সুশীলা দেবীকে তাঁদের খঞ্জরপুরের বাড়ীওয়ালার স্ত্রী তার নিজের কাছে রেখেছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই শরৎচন্দ্রের মামারা সুশীলা দেবীকে নিজেদের কাছে নিয়ে আসেন। এবং পরে বিবাহযোগ্যা হ'লে তাঁরাই তাঁর বিবাহ দেন। সুশীলা দেবীর বিবাহ হয়েছিল আসানসোলের কয়লা ব্যবসায়ী রামকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত।

শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশ থেকে এলেই তাঁর দিদি অনিলা দেবীর বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন। আর তিনি যতদিন ব্রহ্ম-প্রবাসে ছিলেন, সেই সময় তাঁর মেজভাই এবং ছোট ভাইও, তাঁদের দিদির বাড়ীতে প্রায়ই যেতেন; কিন্তু ছোট বোন সুশীলা দেবী তখন কোন দিনই অনিলা দেবীর বাড়ীতে যান নি।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকেই দুরারোগ্য ফোলা রোগে আক্রান্ত হন। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ তাঁর পা দুটো ভীষণভাবে ফুলে যায়।

শরৎচন্দ্র ডাক্তার দেখালেন, কিন্তু ফোলা আর কমতে চাইল না। শেষে ডাক্তাররা উপদেশ দিলেন—বর্মা ত্যাগ করলে তবে তাঁর ফোলা রোগ সারবে, নচেৎ তাঁরা এ রোগ সারাতে পারবেন না।

এই সময় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে শরৎচন্দ্র তাঁর এই অসুখের কথা উল্লেখ করে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে এক পত্রে লিখেছিলেন—

"ভায়া, আমি এবার বড়ই পড়িয়াছি।...এ শুনি বর্মা দেশের ব্যারাম—দেশ না ছাড়িলে কোন দিন এও ছাড়ে না। তাই ছুয়ের এক বোধ করি অনিবার্য হইয়া উঠিতেছে। কি জানি ভগবানই জানেন। ভয় হয় হয়ত বা, চিরজীবনের মত পঙ্গু হইয়াই যাইব। এই সম্ভাবনা মনে করিতেও যেন পারি না। যাহাকে যথার্থই বলে ভয়ে 'পেটের ভাত চাল' হইয়া যাওয়া—আমার তাই হইয়াছে। সুতরাং ডিস্‌পেপসিয়াও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। হইবার কথাও বটে। কারণ খাও দাও, স্নান কর, লেখাপড়া কর কিন্তু চলিয়া বেড়াইবার বিশেষ ক্ষমতা না থাকিলে হজম হওয়াও বন্ধ হইয়া আসে। ডান পায়ের হাঁটুর নীচে হইতে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত সে এক প্রকাণ্ড কাণ্ড! অথচ গোদ নয়—কি যে ডাক্তারেরা তাহাও বলিতে পারে না—কতদিনে সারিবে কিম্বা কোনদিন সারিবে কিনা এ খবরও তাঁরা দিতে পারেন না। ছুদিন বা কিছু কমে, ছুদিন বা ঠিক তেমনি হয়ে দাঁড়ায়। গতবারে যখন চিঠি লিখি তখন এইরূপ কমিবার মুখে আসিতেছিল বলিয়া খুব একটা আশা হইয়াছিল, কিন্তু তারপরেই আবার যখন ধীরে ধীরে তেমনি হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন আশা-ভরসা সব গেল।...আমার এই কাঠির মত শরীরে এইরূপ একটা ব্যামো যে কখনও সম্ভব হইতে পারিবে, তাহাও মনে করি নাই।"

ডাক্তারদের উপদেশে শরৎচন্দ্র বর্মা ছাড়াই মনস্থ করলেন। কিন্তু দেশে এলে একদিকে তাঁর এই রোগ, অপরদিকে সংসার খরচ—কিভাবে যে চলবে, এই নিয়ে তিনি খুব ছুশ্চিন্তায় পড়লেন।

শরৎচন্দ্রের এই বিপদের সময় হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্রকে মাসে ১০০৲ টাকা করে দেবেন বলে আশ্বাস দিলেন এবং স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য শরৎচন্দ্রকে তাড়াতাড়ি ব্রহ্মদেশ ছেড়ে আসবার কথাও জানালেন।

শরৎচন্দ্র হরিদাসবাবুর কাছ থেকে মাসিক ১০০৲ টাকার ভরসা পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তখন তিনি স্থির করলেন, আপাততঃ অফিসে এক বছরের ছুটি নিয়েই কলকাতায় যাওয়া যাক্।

শরৎচন্দ্র হরিদাসবাবুর কাছ থেকে মাসিক নিয়মিত ১০০৲ টাকার আশ্বাস পেয়ে যেন অকূলে কূল পেয়েছিলেন। তাই তিনি সেই সময় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে হরিদাসবাবুকে একপত্রে লিখেছিলেন—

"আমার অসুখের কথা শুনিয়া আপনি যাহা লিখিয়াছেন, আমি বোধ

করি তাহা কল্পনা করিতেও ভরসা করিতাম না। অন্তরের সহিত আশীর্বাদ করি দীর্ঘজীবী এবং চিরসুখী হোন্। ভগবান আপনাকে কখনো যেন কোন বিশেষ দুঃখ না দেন।···

আপনি আমাকে যাহা দান করিতে চাহিয়াছেন, সেই আমার যথেষ্ট। এই এক বৎসরের মধ্যে যদি মরিয়া না যাই, তাহা হইলে হয়ত বা টাকাকড়ির দেনাটা শোধ হইতেও পারে—অবশ্য কৃতজ্ঞতার দেনা ত শোধ হইবার নয়।···আমি এক বৎসরের ছুটি লইয়াই যাইব। যে মেলের টিকিট পাইতে পারিব, তাহাতেই চলিয়া যাইবার আন্তরিক বাসনা।···

আমার এখানে কত টাকা চাই, আপনি সহস্রবার ভরসা দেওয়া সত্ত্বেও আমার সঙ্কোচ হইতেছে—অথচ আপনি ছাড়া আমার আপনার কেহও নাই। আপনি আমাকে ৩০০৲ তিন শ টাকা পাঠাইয়া দেবেন। তাহা হইলে বেশ যাইতে পারি। যা কিছু নিজের সঞ্চিত ছিল, এই দুই মাসের অসুখে সব ত গিয়াছেই, বরং কিছু ওদিকেও হেলিয়াছে। আমি কিছুই আপনার কাছে গোপন করিতে চাই না বলিয়াই এরূপ লিখিলাম।···

আমার কোটী আশীর্বাদ জানিবেন। এমন করিয়া আশীর্বাদ বোধ করি আপনাকে কম লোকেই করিয়াছে। ছুটিতে আপিস হইতে কি পাইব জানি না—এখানকার নিয়মকানুন সবই বড় সাহেবের মর্জি। যা-ই পাই—আপনি যা আমাকে দিবেন, সেই আমার বাস্তবিকই যথেষ্ট।”

শরৎচন্দ্রের চাহিদা মত তাঁর আসার খরচের জন্য ৩০০৲ টাকা হরিদাসবাবু যথাসময়েই শরৎচন্দ্রের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই টাকা পেয়ে ঐ মার্চ মাসেই শরৎচন্দ্র হরিদাসবাবুকে আবার লিখেছিলেন—

“কাল আপনার দেওয়া তিন শ টাকা পাইয়াছি। ১১ এপ্রিলের পূর্বে আর কিছুতেই টিকিট পাওয়া যাইতেছে না। দেখি কি হয়।”

হরিদাসবাবু শরৎচন্দ্রকে মাসে যে ১০০৲ টাকা করে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন, সে সম্বন্ধে হরিদাসবাবু একদিন আমাকে বলেছিলেন—এই টাকার মধ্য থেকে শরৎচন্দ্র ৫০৲ টাকা পেতেন ‘ভারতবর্ষে’র লেখক বলে। অবশ্য এই ৫০৲ টাকার জন্য যে প্রতি মাসেই তাঁকে ভারতবর্ষে লেখা দিতে হ’ত তা নয়। যে মাসে তিনি লেখা দিতেন না, সে মাসেও তিনি নিয়মিত টাকা পেতেন। হরিদাসবাবু এই ১০০৲ টাকার বাকি ৫০৲ টাকা দিতেন, তাঁদেরই গুরুদাস

চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স নামক পুস্তকালয় হ'তে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের গ্রন্থসমূহের হিসাব থেকে। এই সময় শরৎচন্দ্রের পুস্তকের সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং আয় তেমন বেশী না হলেও, হরিদাসবাবু শরৎচন্দ্রকে পুস্তকের হিসাবে মাসে মাসে অগ্রিম ৫০৲ টাকা করে দিয়ে যেতেন। পরে শরৎচন্দ্রের পুস্তকের আয় বাড়লে, পুস্তকের হিসাবে অগ্রিম নেওয়া এই টাকা এবং রেঙ্গুন থেকে আসবার সময় হরিদাসবাবুর প্রেরিত ৩০০৲ টাকা সমস্তই শোধ হয়ে গিয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের এই দুরারোগ্য ফোলা ব্যাধি এবং এজন্য তাঁর রেঙ্গুন ছেড়ে চলে আসার কথা উল্লেখ করে, তিনি তাঁর গ্রন্থের আর একজন প্রকাশক সুধীরচন্দ্র সরকারকেও তখন লিখেছিলেন—

"সুধীর, আমার বড় অসুখ। ডান পা'টা হাঁটুর নীচে থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত ফুলে উঠেছে। কি ব্যারাম জানা যায় না। কি হবে তাও ডাক্তার বলতে পারে না। হয়ত অতি সত্বর কলকাতাতেই চিকিৎসার জন্য যেতে হবে।"

শরৎচন্দ্র আর একটি পত্রে সুধীরবাবুকে লিখেছিলেন—"শুনিয়াছ বোধ হয়, আমি প্রায় পঙ্গু হইয়া গিয়াছি। হাঁটিতে পারি না বলিলেই চলে।......আমি কবিরাজী চিকিৎসার জন্য কলিকাতা যাইতেছি। এক বৎসর থাকিব। ১১ই এপ্রিল রওনা হইব। কারণ তার আগে আর টিকিট পাওয়া কোন মতেই গেল না। আজকাল সপ্তাহে একটা, কখনও বা দেড় সপ্তাহে একখানা করিয়া জাহাজ ছাড়িতেছে।......আজ দেড় মাসের উপর হইতে আপিস প্রভৃতি সমস্তই বন্ধ। কোনমতে টিকিয়া আছি মাত্র।"

শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বন্ধু সতীশচন্দ্র দাস তাঁর 'শরৎ প্রতিভা' গ্রন্থেও এ সম্বন্ধে লিখেছেন—

"১৯১৬ ইংরাজি ফেব্রুয়ারী মাসে শরৎদার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। এবার তিনি আর অপেক্ষা না করিয়া এপ্রিল মাসের ৩ তারিখে কাজে ইস্তফা দিয়া বাঙ্গলার শরৎচন্দ্র বাঙ্গলায় ফিরিয়া চলিলেন।......তিনি বোধ হয় ১১ই এপ্রিল তারিখে রেঙ্গুন ছাড়িয়াছিলেন। পাঠক পাঠিকার নিকটে নির্দিষ্ট তারিখ দেওয়া গেল না, কারণ তিনি চাকরি ছাড়িয়াও সামান্য কয়দিন বর্মাতে অবস্থান করিয়াছিলেন।

মোটামুটি ১৯১৬ ইংরাজির এপ্রিলের প্রথম ভাগে তিনি কলিকাতায়

গিয়াছিলেন। এই যাওয়াই তাঁর শেষ যাওয়া, আর তিনি কখনো বর্মাদেশে আসেন নি।"

এখানে শরৎচন্দ্রের নিজের লেখো চিঠিগুলি থেকে দেখা যায় যে, তিনি রোগের চিকিৎসার জন্য এক বৎসরের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। কিন্তু সতীশবাবুর লেখায় দেখা যায়, শরৎচন্দ্র অসুখের জন্য কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে এসেছিলেন।

এ সম্বন্ধে আমার মনে হয়, শরৎচন্দ্র হরিদাসবাবু ও সুধীরবাবুকে যখন চিঠি লেখেন, তখন পর্যন্ত তিনি ঠিক করেছিলেন, ছুটি নিয়েই আসবেন, তারপর হয়ত মত পরিবর্তন করে ৩রা এপ্রিল তারিখে কাজে ইস্তফা দিয়ে কয়েকদিন পরে চলে বর্মা ছেড়ে এসেছিলেন।

এখানে শরৎচন্দ্রের একাধিক চিঠিপত্র এবং তাঁর রেঙ্গুনের বন্ধু সতীশচন্দ্র দাসের থেকে দেখা যায় যে, শরৎচন্দ্র অসুখের জন্যই কলকাতায় চলে এসেছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের আর এক বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন—

"একাউন্‌টেণ্ট জেনারেল অফিসের ছোট-সাহেবের সহিত সামান্য কারণে ঘুষাঘুষি করিয়া তিনি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন।" (ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র—পৃঃ ৩২০)

এখানে প্রশ্ন ওঠে, তবে কি শরৎচন্দ্র অসুখের জন্য আসেন নি, সাহেবের সঙ্গে মারামারি করেই চাকরি ছেড়ে চলে এসেছিলেন ?

এ সম্বন্ধে আমার মনে হয়, শরৎচন্দ্র মূলতঃ যে তাঁর অসুখের জন্যই বর্মা ছেড়ে চলে এসেছিলেন, এ কথাই ঠিক। কেননা, সতীশবাবুর কথা এবং শরৎচন্দ্রের নিজের লেখা একাধিক চিঠিই তার যথেষ্ট প্রমাণ।

তবে অফিসে উপরওয়ালা এক সাহেবের সঙ্গে যে শরৎচন্দ্রের একবার মারামারি হয়েছিল, এ কথাও সত্য।

সাহেবের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের এই মারামারির কথা উল্লেখ করে যোগেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'ব্রহ্ম-প্রবাসে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন—

"সেকশনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট থেকে সুরু করিয়া বড় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর বার্নাড, এমন কি শেষটায় সেকশনের ইন্‌চার্জ অফিসার পর্যন্ত চ্যাটার্জীর প্রতি

বিরক্ত হইয়া গেলেন। চ্যাটার্জীও ক্রমশঃ এমন বেপরোয়া হইয়া উঠিতে লাগিলেন যে, ব্যাপারটা একদিন চরমে উঠিল। দুই দলে লাগিল ঠোকাঠুকি। বাক্‌যুদ্ধে জয়ী হইলেও শরৎচন্দ্র মল্লযুদ্ধে পরাস্ত হইলেন।

সকলেরই মুখে বিশেষতঃ তামিল ভাষী মদ্রদেশীয় দ্রাবিড় জাতির মুখে কেবল ওই কথা, চ্যাটার্জী এবার বার্নাডের বিরুদ্ধে কেস করুক। আরে বাপু, তোদের কেন এত মাথা ব্যথা। কথায় বলে, আপন মান আপনি রাখি, কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকি।

এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের প্রতিপক্ষ ফিরিঙ্গী বার্নাড সাহেবের ব্যবহারও কিন্তু মনে পড়ে। সুন্দর চেহারা, সুশিক্ষিত এই সাহেবটির গলার আওয়াজও সচরাচর কেহ শুনিতে পাইত না। পাছে নিজের ব্যবহার অপরের বিরক্তি উৎপাদন করে, এই দিকেই সাহেবের লক্ষ্যও ছিল খুব বেশী।

আমি কাহারও চরিত্রের সমালোচনা করিতেছি না। যাহা নিছক সত্য, তাহাই বলিতেছি।”

অফিসে সাহেবের সঙ্গে এই মারামারির কথা প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র দাসও তাঁর ‘শরৎ-প্রতিভা’ গ্রন্থে লিখেছেন—

“হঠাৎ একদিন শুনিতে পাইলাম শরৎদার সঙ্গে অফিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সঙ্গে কি গোলমাল হইয়া গিয়াছে।

শরৎদার কিছুদিন হইতে কাজকর্মের উপর মন বসিতে ছিল না। অফিসের কাজকর্ম দ্বারা তিনি ধরা পড়িলেন। উপরস্থ কর্মচারীর হাতে এমন কি তাঁর ডিপার্টমেণ্টের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কাগজপত্র তালাস করিয়া দেখিয়া শরৎদাকে দুচারটা কথাও বলিয়াছিলেন। কাজকর্মের উপর অবহেলা তাঁর এযে প্রথম তাও নহে, আরো দু একবার সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এবার ধরা পড়িল, একটু বেশী দিনের কাজকর্ম জমা হইয়া থাকাতে।

উভয়ের মধ্যে বচসা চলিতে চলিতে মারামারিও হইয়াছিল। এইচ, এম, রায় (হেমেন্দ্রমোহন রায়) মহাশয় এই রিপোর্ট লইয়া বড়সাহেবের নিকটে যান। বড় সাহেব বিচার করিয়া দেখিলেন, দোষ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের। অতএব তিনি বিচার করিলেন ৯০৲ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের একমাস সাস্‌পেণ্ড। টাকা আদায় হইলে চাটুয্যেকেই টাকাটা দেওয়া হইবে।”

শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরের বন্ধু যোগেশচন্দ্র মজুমদার এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের নিজের মুখের কথা হিসাবে যা বলেন, তা এখানে উদ্ধৃত করে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি। তিনি বলেন—

"একবার শীতকালে (সম্ভবতঃ ১৯২০ খ্রীঃ) যখন তিনি তাঁহার মাতুলালয়ে কিছুদিনের জন্য বায়ু-পরিবর্তনের উপলক্ষে অবস্থিতি করেন, সেই সময়ে আমিও কর্মস্থল সিমলা হইতে ছুটি লইয়া ভাগলপুরে আসি। বহুদিন পরে তাঁহার সহিত দেখা হওয়ায় উভয়েই খুব আনন্দিত হই এবং তাঁহার বর্মাপ্রবাস সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হয়। কথায় কথায় তাঁহার চাকুরি ত্যাগের কথা উঠে। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীদের পক্ষে ভবিষ্যতের কোনওরূপ চিন্তা না করিয়া হঠাৎ কর্মপরিত্যাগ করা যে খুবই দুঃসাহসিক ব্যাপার ছিল, সে কথার উল্লেখ করি। কি উপলক্ষে তিনি কর্মত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলে, তিনি কর্মত্যাগের যে সরস বর্ণনা দিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া পরম কৌতুক অনুভব করি।

তিনি বলিলেন যে, অপিসে প্রবেশ করিয়া কিছুদিনের মধ্যে কার্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। কিন্তু এই সুনামের যে কি ভয়ানক পরিণাম হইতে পারে, তিনি তাহা প্রথমে কিছুই অনুধাবন করিতে পারেন নাই। দেখা গেল, যে বিভাগে তিনি কাজ করিতেন, তাহার কঠিন কাজগুলি, তাঁহারই ঘাড়ে আসিয়া পড়িত। কার্যে তাঁহার অবহেলা অবশ্য ছিল না বরং যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে কার্যগুলি সম্পন্ন করিতেন। কথায় কথায় উল্লেখ করিলেন যে, একবার চট্টগ্রাম বন্দর লইয়া বর্মা ও বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের মধ্যে বহু বৎসর হইতে মন কষাকষি চলিতেছিল, এমন কি আমাদের রেলওয়ে বোর্ডও (আমি তখন তথায় কর্মে নিযুক্ত ছিলাম) ইহাতে সংশ্লিষ্ট ছিল। কয়েক বৎসর ধরিয়া একটি প্রকাণ্ড 'কেস' গড়িয়া উঠিয়াছিল, উহা যে কবে শেষ হইবে কেহ ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিত না। এমন কি, যে ব্যক্তি সম্ভবত তাহার কর্মজীবনের মধ্যভাগে ঐ কাজটি আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার কার্যকাল শেষ হইয়া সে যখন অফিস হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিল, তখনও 'কেস'টি শেষ হইবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। পরে উহা পঞ্চতন্ত্রে উল্লিখিত মস্তকে চক্রধারী ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার মস্তকে আসিয়া ভর করে। কার্যটি বিপুল পরিশ্রম করিয়া উহাকে তিনি শেষ সমাধানের পথে পৌছাইয়া দেন।

সুকঠিন কার্যটি সুসম্পন্ন করিবার জন্য তিনি অবশ্য তাঁহার প্রাপ্য প্রশংসা

লাভ করিতে পারেন নাই, বরং একদিন অফিসে পৌছিতে সামান্য বিলম্ব হইলে এংলো-ইণ্ডিয়ান সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাঁহাকে কয়েকটি কঠিন কথা শুনাইয়া দেয়। হয়ত তাহার মন্তব্য কিছু রূঢ় হইয়া থাকিবে, সুতরাং শরৎচন্দ্রও তাহাকে অনুরূপ মন্তব্যে অভিনন্দিত করেন। শেষে কথা ছাড়িয়া উহা হাতাহাতিতে পরিণত হয় এবং তাঁহার ও সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের বক্ষদেশ রক্তরঞ্জিত হইয়া উঠে। উভয়ে মিলিয়া তখন বিচারের জন্য একাউন্‌টেণ্ট জেনারেল এর কক্ষে গিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাদের সেই নাটকীয় বেশে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া একাউন্‌টেণ্ট জেনারেল যে কিরূপ ভীত চকিত হইয়া চেয়ার হইতে পড়িতে পড়িতে রহিয়া গিয়াছিলেন, তাহার একটি সরস বর্ণনা দেন। বিচারের ফলে অবশ্য যাহা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। কর্মজীবনে বিরক্ত হইয়া নিজ টেবিলে ফিরিয়া পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়া চিরকালের জন্য দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হ'ন। এই সময়ে তাঁহার শরীরও ভাল যাইতেছিল না। ১৯১৬ সালে তিনি শেষবারের মত কার্য ত্যাগ করেন ও বাজে শিবপুরে বাস করিতে থাকেন।"

হাওড়া শহরে অবস্থান

শরৎচন্দ্র ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে রেঙ্গুন ছেড়ে চলে আসবার আগে, তাঁর এই আসার কথা তাঁর ছোটভাই প্রকাশচন্দ্রকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন। অল্প ভাড়ায় একটা ছোট বাড়ী বা খান তিনেক ঘর ভাড়া করে রাখবার জন্যও শরৎচন্দ্র প্রকাশবাবুকে তখন লিখেছিলেন। অল্প ভাড়ায় এই জন্য যে, শরৎচন্দ্র এক তো চাকরি ছেড়ে আসছেন, তার উপর তিনি আবার অসুস্থ। আর আয় বলতে, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের আশ্বাস দেওয়া ঐ মাসিক একশ'টি টাকা।

প্রকাশবাবু দাদার চিঠি পেয়ে অগ্রদ্বীপ থেকে হাওড়া জেলায় গোবিন্দপুর গ্রামে তাঁর দিদির বাড়ীতে আসেন এবং দিদিকে সমস্ত কথা বলেন।

শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর মেজ দেওরের এক মেয়ে রাণুবালা দেবীর হাওড়া শহরের বাজে শিবপুরে বিয়ে হওয়ায় রাণুবালা দেবী তাঁর শ্বশুরবাড়ী বাজে শিবপুরে থাকতেন। অনিলা দেবী ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্রকে শরৎচন্দ্রের জন্য ঘর দেখতে রাণুবালার কাছে পাঠিয়ে দেন।

প্রকাশবাবু দিদির নির্দেশে রাণুবালা দেবীর কাছে গিয়ে বলেন—দাদা রেঙ্গুন থেকে সস্ত্রীক চলে আসছেন, তোমাদের পাড়ায় অল্প ভাড়ায় একটা ছোট বাড়ী, না হয় খান তিনেক ঘর ঠিক করে দাও।

প্রকাশবাবু যখন রাণুবালা দেবীর কাছে এই কথা বলছিলেন, তখন রাণুবালা দেবীর এক ভাসুরপো ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ঘর ভাড়া ঠিক করে দিতে হবে, ইন্দুবাবু এই কথা শুনে, তখনই সেখান থেকে উঠে গিয়ে তাঁদের পাড়ায় ৬নং বাজে শিবপুর ফার্স্ট বাই লেনে তিনখানি ঘর ঠিক করে আসেন। ইন্দুবাবু এসে প্রকাশবাবুকে বললে, প্রকাশবাবুও সেই ঘরগুলিই ভাড়া নেওয়া মনস্থ করেন।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে সস্ত্রীক এসে এই ৬নং বাজে শিবপুর ফার্স্ট বাই লেনেই ওঠেন। এই বাড়ীতে তিনি প্রায় ৯।১০ মাস ছিলেন। এরপর তিনি এ বাড়ী ছেড়ে দিয়ে পাশেই ৪নং বাজে শিবপুর ফার্স্ট বাই লেনে উঠে যান। এখানে তিনি প্রায় ৯ বৎসর ছিলেন। এরপর তিনি এ বাড়ী ছেড়ে শিবপুর ট্রাম ডিপোর কাছে ৪৯।৪ কালীকুমার মুখার্জী লেনে গৌরীনাথ মুখো-

পাধ্যায়ের বাড়ী ভাড়া নিয়ে বৎসর খানেক থাকেন। এইখানে থাকার সময়েই তিনি তাঁর দিদিদের গ্রাম হাওড়া জেলায় গোবিন্দপুরের পাশের গ্রাম সামতাবেড়েয় একটি সুন্দর মাটির বাড়ী তৈরি করান। তারপর তিনি ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বরাবরের জন্য হাওড়া শহর ত্যাগ করে সামতাবেড়েয় তাঁর নিজের বাড়ীতে চলে যান।

বাজে শিবপুর ফার্স্ট বাই লেনটা (বর্তমানে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেন) উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটা সরু ছোট রাস্তা। এই রাস্তার উত্তরপ্রান্ত মিশেছে নীলকমল কুণ্ডু লেনে আর দক্ষিণ প্রান্ত গিয়ে পড়েছে বাজে শিবপুর রোডে। ৬নং বাজে শিবপুর ফার্স্ট বাই লেনের বাড়ীটা নীলকমল কুণ্ডু লেনের উপরের একটা বাড়ীর পরেই। তাছাড়া ঐ ৬নং বাড়ীতে যাওয়ার একটা প্রবেশ পথও রয়েছে এই নীলকমল কুণ্ডু লেন দিয়ে।

এই কারণেই হয়ত, শরৎচন্দ্র এই বাড়ীতে থাকার সময় বন্ধু-বান্ধবদের যত চিঠি লিখেছিলেন, সব চিঠিতেই ভুল করে তাঁর ঠিকানা হিসাবে ৬নং নীলকমল কুণ্ডু লেন লিখতেন। যেমন—প্রমথ চৌধুরীকে (বীরবল) লেখা শরৎচন্দ্রের সব কটা চিঠিতেই এই ভুল ঠিকানা দেখা যায়।

শরৎচন্দ্রের শুধু এই বাড়ীর ঠিকানা ভুলই নয়, তিনি ৪নং বাজে শিবপুর ফার্স্ট বাই লেনের বাড়ীতে গিয়েও তাঁর ঠিকানা হিসাবে ৪নং এর বদলে ৫নং বাজে শিবপুর ফার্স্ট বাই লেনও লিখেছেন। যেমন—২-২-১৭ তারিখে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের একটি চিঠিতে ৪নং এর বদলে ৫নং দেখা যায়।

৫নং ঠিকানা লেখাটা শরৎচন্দ্রের ভুলই। কেননা শরৎচন্দ্র কোনদিনই ৫নং বাড়ীতে ছিলেন না। এই বাড়ীর বাসিন্দা শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত স্নেহভাজন হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজের অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার বলেন—শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুরে আসার আগে থেকেই তাঁরা বরাবর এই ৫নং বাড়ীরই বাসিন্দা। শরৎচন্দ্র এ বাড়ীতে কখন ছিলেন না। তিনি এই গলির ৬নং বাড়ী থেকে ৪নং বাড়ীতে উঠে এসেছিলেন।

শরৎচন্দ্র নিজের ঠিকানা লেখার ব্যাপারে আর একটা ভুল প্রায় বরাবরই করতেন। সে ভুলটা হচ্ছে, তিনি কি হাওড়া শহরে থাকার সময়, আর কি হাওড়ার সামতাবেড়ের গ্রামে থাকার সময়, সব সময়েই তিনি ঠিকানা হিসাবে

জেলা—হাওড়া না লিখে, লিখতেন জেলা—হাবড়া। আর শুধু ঠিকানাই নয়, তিনি তাঁর লেখা প্রবন্ধাদিতেও হাওড়ার বদলে হাবড়া লিখে গেছেন।

শরৎচন্দ্র ৬নং বাজে শিবপুর ফার্স্ট বাই লেনে যখন থাকতেন তখন সে বাড়ীতে তেমন ভাল বৈঠকখানা ছিল না। তাই তিনি তাঁর বাড়ীর একটা বাড়ীর পরেই গলির মুখে ৫০নং নীল কমল কুণ্ডু লেনে ভূতনাথ মিত্রের বৈঠকখানাটিকে একরূপ নিজের বৈঠকখানা করে নিয়েছিলেন। এমন কি তিনি ৬নং বাড়ী ছেড়ে ৪নং বাড়ীতে উঠে গেলেও তখনও মাঝে মাঝে এখানে এসে বসতেন।

শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুরে আসার দু'এক দিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে এই ভূতনাথবাবুর পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ভূতনাথবাবুর বন্ধুত্ব হওয়ার কারণ ছিল এই যে, ভূতনাথবাবু নিজে একজন সাহিত্য-রসিক মানুষ ছিলেন এবং বাঙ্গলা দেশের তৎকালীন অনেক সাহিত্যিকের সহিতই তাঁর অল্পবিস্তর পরিচয়ও ছিল। তাছাড়া তাঁর বাড়ীতে নিজের একটা ভাল রকমের লাইব্রেরীও ছিল।

ভূতনাথবাবুর বাড়ীতে লোকজন খুবই কম ছিল এবং তাঁর বৈঠকখানাটিও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। শরৎচন্দ্র সকাল, বিকাল ও সন্ধ্যায় এই বৈঠকখানাতেই কাটাতেন এবং সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সঙ্গেও এইখানেই সাক্ষাৎ করতেন। ভূতনাথবাবুর এই বাড়ীটি আজও (এই প্রসঙ্গ লেখার সময়ও) রয়েছে। তবে সেটি হস্তান্তর হয়েছে। ভূতনাথবাবুর পুত্ররা অন্যলোকদের বেচে দিয়েছেন এবং তখনকার একতলা বাড়ীটি আজ দুতলায় পরিণত হয়েছে।

শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুরে যখন প্রথম আসেন, তখন প্রথম কিছুদিন তাঁর ভাগ্নী রাণুবালার বাড়ীর লোকজন এবং এই ভূতনাথবাবু ছাড়া পাড়ার আর কারও সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। তবে পাড়ার মুদি শরৎ শেঠের দোকানে মাল কিনতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। শরৎ শেঠের সঙ্গে পরিচয় হলে শরৎচন্দ্র রাত্রে তাঁর দোকানে তাস খেলতে যেতেন।

ক্রমে এই পাড়ার সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার সরকার প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। সরোজবাবু এবং অক্ষয়বাবু এঁরা দুজনেই সাহিত্যচর্চা করতেন এবং এঁরা বইও লিখেছিলেন।

সরোজবাবু শরৎচন্দ্রের বাড়ীর খুব নিকটেই নীলকমল কুণ্ডু লেনে থাকতেন। তিনি বাঙ্গালা সরকারের উচ্চপদে চাকরি করতেন। সরোজ-বাবুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের এরূপ বন্ধুত্ব হয়েছিল যে, সরোজবাবু তখন শরৎচন্দ্রের 'অরক্ষণীয়া' গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখে দিলে, শরৎচন্দ্র সেই ভূমিকাটি সহ অরক্ষণীয়া গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন। অরক্ষণীয়া বইয়ের অনেকগুলি সংস্করণেই বইয়ের প্রথমে এই ভূমিকাটি ছিল। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর গ্রন্থের প্রকাশক ঐ ভূমিকাটি তুলে দেন।

অক্ষয়কুমার সরকার শরৎচন্দ্রের বাড়ীর একটু দূরে এই বাজে শিবপুরেই শিবতলা লেনে থাকতেন। ইনি তখন হুগলী গবর্ণমেণ্ট কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। অক্ষয়বাবুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কিভাবে পরিচয় হয়েছিল, সে সম্বন্ধে অক্ষয়বাবু একদিন আমার কাছে যা বলেছিলেন, তা হচ্ছে এই—

শরৎচন্দ্র সেই মাত্র কিছুদিন বাজে শিবপুরে এসেছেন। পাড়ার লোক-জনের সঙ্গে তেমন পরিচয় হয় নি। তাই তিনি একদিন তাঁর বাড়ীর কাছে বাজে শিবপুর রোডের উপর দাঁড়িয়ে রাস্তার ধারে একটা বাড়ীতে গান হচ্ছিল, শুনছিলেন। এমন সময় অক্ষয়বাবু ঐ রাস্তা দিয়ে বাড়ী ফিরছিলেন। অক্ষয়বাবু শরৎচন্দ্রের কাছে এলে শরৎচন্দ্র নিজেই অক্ষয়বাবুকে বলেন—আপনিই কি অক্ষয়বাবু? আমার নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমি নতুন আপনাদের পাড়ায় এসেছি।

'শরৎচন্দ্র' নাম শুনেই অক্ষয়বাবু অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন—নমস্কার! নমস্কার! পাড়ার ছেলেদের কাছে শুনেছি, আপনি এসেছেন। তা আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আসবার সময় করে উঠতে পারি নি। আমার সৌভাগ্য-ক্রমে আজই পরিচয় হয়ে গেল।

এইভাবেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে অক্ষয়বাবুর প্রথম পরিচয় হয়। পরে তাঁদের এই পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। অক্ষয়বাবু অত্যন্ত নীতিবাগীশ ও আদর্শবাদী লোক ছিলেন ব'লে শরৎচন্দ্র তাঁর এই বন্ধুটির চরিত্র নিয়ে এর উপর আরও কল্পনার তুলি চালিয়ে তাঁর 'শেষপ্রশ্ন' গ্রন্থের ইতিহাসের অধ্যাপক অক্ষয়ের চরিত্র চিত্রিত করেছেন।

এখানে বাজে শিবপুর রোডে দাঁড়িয়ে শরৎচন্দ্রের গান শোনার প্রসঙ্গে একটা কথা বলছি:—বাজে শিবপুর নাম দেখে অনেকেই হয়ত ভাবেন,

শিবপুরের বাজে অর্থাৎ নিকৃষ্ট বা অকেজো পল্লীটাই হ'ল বাজে শিবপুর। এই ভেবেই হয়ত, রবীন্দ্রনাথও একবার বাজে শিবপুর থেকে তাঁকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠিতে বাজে শিবপুর ঠিকানা দেখে বলেছিলেন—হাওড়ায় শিবপুর আছে জানতাম, কিন্তু বাজে শিবপুর বলে যে কোন জায়গা আছে, তা শরতের চিঠি থেকে জানতে পারলাম।

বাজে শিবপুরের অর্থ নিকৃষ্ট শিবপুর নয়। এখানে আগে গান বাজনার এত প্রচলন ছিল যে, প্রায় সব সময়েই এ পাড়ায় বাজনার আওয়াজ শোনা যেত। সেই থেকেই এ পাড়ার নাম হয় বাজে অর্থাৎ সব সময়েই বাজছে বা বাজনা চলছে এমন শিবপুর।

শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুরে যখন প্রথম আসেন, পাড়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় না থাকায় তখন তিনি অনেক সময় পাড়ার ছেলেরা যেখানে খেলাধুলা করত, সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের খেলা দেখতেন, কখনবা তাদের সঙ্গে খেলাতেও যোগ দিতেন। আবার তাদের নিয়ে গল্প বলেও শোনাতেন।

শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের বন্ধু সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র বলাই চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল এ সম্বন্ধে লিখেছেন—

"সেদিনের কথা আজও বেশ মনে পড়ে। স্কুলের ছুটির পর, আমরা মার্বেল খেলিতেছিলাম, এমন সময় একটি শীর্ণকায় ভদ্রলোক আমাদিগের খেলা দেখিতে দেখিতে বলিলেন—কিরে ফস্কে গেলি, চেয়ে দেখ আমার কত টিপ্।

সেদিন কয়েকটি বালকের সহিত মার্বেল খেলায় যে কৃতিত্ব তিনি দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে অনেকেই মনে করিয়াছিলাম—আহা, আমাদের যদি এমনই টিপ্ থাকিত।

ইহাই পরিচয়ের সূত্রপাত। পরে শুনিলাম, ভদ্রলোকটি আমাদের পাশের বাড়ীতে ভাড়াটে আসিয়াছেন। সাদাসিধা ধরণের মানুষ, আড়ম্বরহীন বেশভূষা, প্রত্যহই তাঁহাকে আমাদের খেলার দর্শক হিসাবে, অথবা তাঁহার গল্পের শ্রোতা হিসাবে কাছে পাইয়াছি। গল্প শুনিতে শুনিতে আমরা তন্ময় হইয়া যাইতাম। সেদিনের কথা বেশ মনে পড়ে—যেদিন তিনি আমাদের কাছে 'মহাশ্মশানে'র গল্প বলিয়াছিলেন। বড় হইয়া সেই গল্পটি হুবহু শ্রীকান্তের প্রথম পর্বে পাঠ করিবার পর অনেক প্রশ্নই মনে উদিত হইয়াছিল।"
(শরৎ-স্মৃতি—মাসিক বসুমতী, মাঘ ১৩৪৪)

শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুরে এসেই দিদি অনিলা দেবীকে চিঠি দিলে, চিঠি পেয়ে অনিলা দেবী ও তাঁর স্বামী পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় একদিন শরৎচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকে দেখতে এলেন।

শরৎচন্দ্রের নির্দেশে ইতিপূর্বেই তাঁর ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্র অগ্রদ্বীপের জমিদারদের যাত্রা ও থিয়েটারের দল ছেড়ে বাজে শিবপুরে দাদার কাছে চলে এসেছিলেন।

শরৎচন্দ্র এসে মেজভাই প্রভাসচন্দ্রকেও (স্বামী বেদানন্দ) বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনে চিঠি দিলেন। চিঠি পেয়ে প্রভাসচন্দ্র দাদা ও বৌদির সঙ্গে দেখা করে গেলেন।

শরৎচন্দ্র পরে একদিন ছোট বোন সুশীলা দেবীকেও তাঁর শ্বশুরবাড়ী আসানসোল থেকে বাজে শিবপুরে আনালেন।

এদিকে যে ফোলা রোগ নিয়ে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে এসেছিলেন, বাজে শিবপুরে সেই রোগের চিকিৎসা করাতে অল্পদিনের মধ্যে তিনি একেবারে নিরাময় হয়ে উঠলেন।

কিছুদিন পরে শরৎচন্দ্র মুঙ্গেরে ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্রের বিয়ে দিয়ে তাঁকেও সংসারী করে দিলেন। প্রকাশবাবু বিয়ে করে সস্ত্রীক এলে, হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর নিজের গায়ের সমস্ত গহনা খুলে প্রকাশবাবুর নববিবাহিতা স্ত্রীকে সাজিয়ে দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুরে থাকার সময় তাঁর দিদি অনিলা দেবী প্রায়ই বাজে শিবপুরে ভাইয়ের বাড়ীতে আসতেন। কিন্তু প্রভাসচন্দ্র সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ বলে এবং সুশীলা দেবী দূরে থাকার কারণে, এঁরা কচিৎ কখনও দাদার বাড়ীতে আসতেন।

রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচয়

গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন—

রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে জাপান হয়ে আমেরিকা যাওয়ার পথে রেঙ্গুনে গিয়েছিলেন। এর পরদিন ৮ই মে তারিখে রেঙ্গুনের প্রবাসী বাঙ্গালীরা স্থানীয় জুবিলী হলে রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জানান। সেদিন রবীন্দ্রনাথকে বাঙ্গলায় লেখা যে মানপত্রটি দেওয়া হয়েছিল, সেটি শরৎচন্দ্রের রচনা। সেদিনের সম্বর্ধনা সভায় উদ্বোধন সংগীত গাইবার কথা ছিল শরৎচন্দ্রের, কিন্তু তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ দৌর্বল্যবশতঃ শেষ পর্যন্ত গান গাইতে রাজী হন নি। এবং এই কথা ঠিক রাখতে না পাবার জন্য লজ্জায় তিনি সভাতেও যান নি। তবে কয়েকমাস পরে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে দেশে ফেরার পথে আবার রেঙ্গুনে এসে যেদিন বেঙ্গল সোসাল ক্লাবে গিয়েছিলেন, সেদিন সেখানে শরৎচন্দ্রও উপস্থিত ছিলেন।

গিরীনবাবুর এই লেখাটি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, প্রথমতঃ—রবীন্দ্রনাথ ৭ই মে তারিখে রেঙ্গুন যাওয়ার আগেই শরৎচন্দ্র বরাবরের জন্য রেঙ্গুন ছেড়ে চলে এসেছিলেন, দ্বিতীয়তঃ—রবীন্দ্রনাথকে প্রদত্ত মানপত্রটিও শরৎচন্দ্রের রচনা নয় বলেই আমার মনে হয়।

শরৎচন্দ্র যে ৭ই মে তারিখের পূর্বেই রেঙ্গুন ত্যাগ করেছিলেন, তা তাঁর নিজের চিঠি এবং সতীশচন্দ্র দাসের লেখা থেকে পরিষ্কার জানা যায়। আমি আগেই 'ব্রহ্মদেশ ত্যাগ' প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি।

৮ই মে তারিখে রবীন্দ্রনাথকে প্রদত্ত মানপত্রটি এই :—

রেঙ্গুনে রবীন্দ্র-সম্বর্ধনা

জগৎবরেণ্য—

শ্রীযুত স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাইট্, ডি-লিট,

মহোদয় শ্রীকরকমলেষু—

কবিবর,

এই সুদূর সমুদ্রপারে বঙ্গমাতার ক্রোড়বিচ্যুত সন্তান আমরা আজ হৃদয়ের

গভীরতম শ্রদ্ধা ও আনন্দের অর্ঘ্য লইয়া, আমাদের স্বদেশের প্রিয়তম কবি, জগতের ভাব ও জ্ঞানরাজ্যের সম্রাট—আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।

আপনি অপূর্ব কবি-প্রতিভাবলে নব নব সৌন্দর্য ও নব নব আনন্দ আহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছেন এবং নব সুরে, নব রাগিণীতে বঙ্গ-হৃদয়কে এক নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

আপনার কাব্যকলার সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া প্রাচ্য হৃদয়ের এক অভিনব পরিচয় অধুনা প্রতীচ্যের নিকট সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই পরিচয়ের আনন্দে প্রতীচ্য আজ প্রাচ্যের কবিশিরে সাহিত্যের যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা-মুকুট পরাইয়া দিয়াছে, তাহার আলোকে জননী বঙ্গবাণীর মুখশ্রী মধুর স্মিতোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

আপনার কাব্যবীণায় সহস্র অনির্বচনীয় সুরে ভারতের চিরন্তন বাণী, সত্য শিব সুন্দরের অনাদিগাথা ধ্বনিত হইয়া এক বিশ্বব্যাপী আনন্দ, অপরিসীম আশা ও অসীম আশ্বাসে মানব-হৃদয়কে আকুল ও উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। এই বিশাল সৃষ্টির অণুপরমাণু যে এক আনন্দে নিত্য পরিস্পন্দিত হইতেছে এবং এক অপরিচ্ছিন্ন প্রেমসূত্রে যে এই নিখিল জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, আপনার কাব্যে সেই পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছি এবং আপনাকে—কোন দেশ বা যুগবিশেষের নয়—সমগ্র বিশ্বের কবি বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি। আপনার কথায়, কাব্যে, নাট্যে ও সংগীতে যে মহান আদর্শ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, এক লোকাতীত রাজ্যের আলোকে আপনার নয়ন উদ্ভাসিত, এক অমৃত সত্তার আনন্দরসে আপনার হৃদয় অভিষিক্ত।

আপনার অকৃত্রিম একনিষ্ঠ আজন্ম বাণী-সাধনা আজ যে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের স্বর্ণ-উপকূলে আপনাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তথাকার আনন্দ-গীতি নিখিল মানব হৃদয়কে নব নব আশা ও আশ্বাসে পরিপূর্ণ করিয়া আপনার সুমোহন কাব্যবীণায় নিত্যকাল ঝঙ্কৃত হইতে থাকুক, ইহাই বিশ্বেশ্বরের চরণে প্রার্থনা।

রেঙ্গুন ইতি—

২৫শে বৈশাখ ভবদীয় গুণমুগ্ধ

১৩২৩ বঙ্গাব্দ রেঙ্গুন প্রবাসী বঙ্গ-সন্তানগণ

এখানে মানপত্রটির মধ্যে দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্রের ভাষায় যে সহজবোধ্যতা, সরলতা ও মিষ্টতা রয়েছে, মানপত্রটির মধ্যে তেমন নেই। তাছাড়া মানপত্রটির

ঐ অল্পমাত্র লেখার মধ্যেই কয়েকবার 'নব নব', ৭ বার 'আনন্দ', ৬ বার 'হৃদয়' এবং একাধিকবার 'নিখিল', 'কাব্যবীণা', 'আলোক' প্রভৃতি ব্যবহৃত হওয়াতেও মনে হয় যে, এ শরৎচন্দ্রের রচনা নয়। কেননা একটুমাত্র পরিসরের মধ্যে একই শব্দের এত বেশী ব্যবহার শরৎচন্দ্র কোথাও করেন নি। আর অসমাপিকা ক্রিয়া প্রভৃতি দিয়ে টেনে টেনে অত বড় বড় বাক্যও তিনি বড় একটা লেখেন নি। এমন কি তাঁর বাল্য-রচনার মধ্যেও এই সব চোখে পড়ে না। আর এই মানপত্রের মধ্যেকার 'পরিস্পন্দিত' শব্দটি দেখেও মনে হয় যে, এটি শরৎচন্দ্রের রচনা নয়। কেননা, সমগ্র শরৎ-সাহিত্যের মধ্যে কোথাও 'পরিস্পন্দিত' শব্দ দেখেছি বলে তো মনে হয় না। অবশ্য রেঙ্গুনের মানপত্রটির লেখা ভাল কি মন্দ, সে আমার বক্তব্য নয়। আমার বক্তব্য শুধু এই যে, এটি শরৎচন্দ্রের রচনা কিনা ?

গিরীনবাবু লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ ফেরার পথে আবার রেঙ্গুনে এলে সেদিন শরৎচন্দ্র-সহ তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর আমেরিকা ও হনলুলু ভ্রমণের গল্প শুনেছিলেন।

গিরীনবাবু আবার লিখেছেন, শরৎচন্দ্র ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দেই রেঙ্গুন ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন।

কিন্তু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী'তে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ হনলুলুতেই গিয়েছিলেন, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে।

অতএব রেঙ্গুনে বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের প্রথম দেখা হয়েছিল, এ কথা স্বীকার করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের সহিত শরৎচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাতের কথা প্রসঙ্গে দিলীপকুমার রায় তাঁর 'স্মৃতিচারণ' গ্রন্থে লিখেছেন—

"আজ মনে পড়ে, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাতের কথা। ইতিপূর্বে আমি লিখেছি এ সম্বন্ধে, তা থেকে উদ্ধৃত করি।......৺উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুরোধে লিখেছিলাম।

রবীন্দ্রনাথ এসেছেন প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য সদনে, শরৎচন্দ্রও সেদিন উপস্থিত। বঙ্গ-সাহিত্যের সূর্যচন্দ্র একই আকাশের আসরে,—যেন পূর্ণিমার পরের দিন সূর্যোদয় লগ্নে। শরৎদার 'দেনা পাওনা'র প্রসঙ্গ উঠল। রবীন্দ্রনাথ

বললেন—শরৎ তুমি আমাদের সমাজকে দেখেছ ভিতর থেকে। আমি দেখেছি খানিকটা বাইরে থেকেই বলব—আমার যৌবনে ব্রাহ্ম সমাজকে হিন্দু সমাজ খানিকটা একঘরে করে রেখেছিল তো। তাই তোমার ভৈরবী জাতীয় সম্প্রদায় আমি দেখিনি বলেই আরো খুশি হয়েছি যে, এ ধরণের চরিত্রকে নিয়েও তুমি গল্প গাঁথতে পেরেছ। কেবল মুস্কিল এই যে, তোমার ভৈরবীকে দেখলে গানের সুরে 'বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে' বলতে ইচ্ছে হলেও মনে হয় গল্প; নাটক-নভেলে তো বিভীষিকাই জাগাবার কথা—অন্তত নাম শুনলে।

শরৎদা হেসে বলেছিলেন—ভৈরবী কথাটা শুনলে মন 'ও বাবা!' বলে ওঠে মানি। কিন্তু আমার ভৈরবী তো কপালকুণ্ডলার কাপালিকদের মতন ভয় দেখায় না—ভালোই বাসায়।" (স্মৃতিচারণ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮২)

দিলীপকুমার রায়ের এই লেখাটি থেকে দেখা যায় যে, শরৎচন্দ্রের 'দেনা পাওনা' প্রকাশিত হওয়ার পরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় হয়।

রবীন্দ্রনাথের সহিত শরৎচন্দ্রের প্রথম পরিচয় সম্বন্ধে দিলীপবাবুর এই উক্তিটিকে কিন্তু ঠিক বলে আমি মনে করি না। আমার মনে হয়, 'দেনা পাওনা' প্রকাশিত হওয়ার অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথের সহিত শরৎচন্দ্রের সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল। 'দেনা পাওনা' প্রকাশিত হয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে। এর অন্ততঃ ছ-সাত বছর আগে ১৯১৬।১৭ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সহিত শরৎ-চন্দ্রের প্রথম পরিচয় হয়েছিল বলেই আমার মনে হয়।

দিলীপকুমার রায় লিখেছেন যে, প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য সদনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাক্ষাৎ হ'লে, সেদিন রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের দেনা পাওনার প্রসঙ্গ তুলে বলেছিলেন—"তোমার ভৈরবী জাতীয় সম্প্রদায় আমি দেখিনি বলেই আরো খুশি হয়েছি যে, এ ধরণের চরিত্র নিয়েও তুমি সার্থক গল্প গাঁথতে পেরেছ।"

কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর দেনা পাওনার নাট্যরূপ 'ষোড়শী' (এতে ভৈরবী মূলতঃ উপন্যাসের মতই চিত্রিত হয়েছে) রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে তাঁর অভিমত চাইলে রবীন্দ্রনাথ তখন ষোড়শী পড়ে এক পত্রে শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন—

"······যে ষোড়শীকে এঁকেচ সে এখনকার কালের ফরমাসের মনগড়া জিনিষ, সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়। আমি বলিনে যে, এই রকম ভাবের ভৈরবী হতে পারে না—কিন্তু হতে গেলে যে ভাষা, যে কাঠামোর মধ্যে তার

সঙ্গতি হতে পারত, সে এখনকার দিনের খবরের কাগজ পড়া চেহারার মধ্যে নয়। যে কাহিনীর মধ্যে আমাদের পাড়াগাঁয়ের সত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করতে পারত, সে এই কাহিনী নয়।”

এখানে দিলীপবাবুর লেখার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিঠির ভাষার কিন্তু ঐক্য দেখা যায় না।

যাই হোক্, আমি যে বলেছি ১৯১৬।১৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল, এখন সে সম্বন্ধে কিছু বলছি—

শরৎচন্দ্র ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রেঙ্গুন থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। দেশে ফিরে এসে তিনি হাওড়ায় বাজে শিবপুরে বাস করতেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে ইতিপূর্বেই শরৎচন্দ্র যশস্বী লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

ঠিক ঐ সময়টিতে জোড়াসাঁকোয় ঠাকুর বাড়ীতে প্রতি সপ্তাহে সাহিত্য ও শিল্পের আসর ‘বিচিত্রা’র অনুষ্ঠান হ’ত। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের উপস্থিতিই এই আসরের প্রধান আকর্ষণ ছিল। সেই বিচিত্রার আসরে বাঙ্গলাদেশের তৎকালীন প্রায় সকল সাহিত্যিক ও শিল্পীই যোগদান করতেন। আমার মনে হয়, এই সময়েই কোন একদিন হয় রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে কিংবা শরৎচন্দ্র নিজেই অন্য কোন সাহিত্যিক বন্ধুর সহিত বিচিত্রার আসরে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই তিনি প্রথম রবীন্দ্রনাথকে দেখেন ও তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন।

এরপর থেকেই অন্যান্য সাহিত্যিকদের ন্যায় শরৎচন্দ্রও প্রায়ই বিচিত্রার আসরে যেতেন। এই বিচিত্রার আসরেই শরৎচন্দ্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের একটি পরিহাসের কাহিনী সাহিত্যিক মহলে প্রায় প্রবাদের মতই চলে আসছে। সেই কাহিনীটি এই—

ঘরের মেঝেয় ঢালা ফরাসের উপর বিচিত্রার আসর বসত। তাই সকলেই ঘরের বাইরে জুতো খুলে ফরাসে এসে বসতেন।

সভাভঙ্গের পর প্রত্যেকবারই খবর পাওয়া যেত কারও না কারও জুতো হারিয়েছে। এইভাবে প্রতিবারেই দু-একজনের করে জুতো হারাতে থাকলে সকলেই জুতো-সমস্যায় পড়লেন।

সত্যেন দত্ত তো ছেঁড়া জুতোই পায়ে দিয়ে আসতে আরম্ভ করলেন।

সেবারে বিচিত্রার অধিবেশনে শরৎচন্দ্রও এসেছেন। শরৎচন্দ্র এসেই কয়েকজনের মুখে সভায় জুতো চুরির কাহিনী শুনলেন।

শরৎচন্দ্র সেদিন তাঁর সখের নতুন জুতো জোড়াটি পায়ে দিয়ে এসেছিলেন। তাই জুতো চুরির কথা শুনে, তিনি বারান্দার একদিকে গিয়ে তাঁর হাতে যে কাগজটা ছিল, তাই দিয়েই জুতো জোড়াটি মুড়লেন। তারপর মোড়কটি হাতে নিয়ে সভায় রবীন্দ্রনাথের সামনে এসে বসলেন।

শরৎচন্দ্র যখন কাগজে জুতো মোড়েন, সত্যেন দত্ত দূর থেকে তা দেখেছিলেন। এই দেখে তিনি চুপে চুপে রবীন্দ্রনাথকে বলে দেন যে, শরৎ-চন্দ্রের হাতে কাগজের মোড়কের মধ্যে তাঁর জুতো রয়েছে।

এই কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ সভায় বসে এক সময় শরৎচন্দ্রের হাতের মোড়কটির প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন—শরৎ এটা কি ?

শরৎচন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করে বললেন—একটা জিনিস আছে।

রবীন্দ্রনাথ আবার প্রশ্ন করলেন—কি জিনিস শরৎ ? বই-টই নাকি ?

শরৎচন্দ্র মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন—আজ্ঞে···

রবীন্দ্রনাথ এবার সকৌতুকে বললেন—কি বই শরৎ, পাদুকা-পুরাণ নাকি ?

রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে শরৎচন্দ্র তো অবাক !

অপর সকলে কিন্তু তখন খুব হাসছেন।

১৯১৬।১৭ খ্রীষ্টাব্দেই বা ১৩২৩।২৪ সালেই যে 'অভিজাত সাহিত্যিকদের মিলনকেন্দ্র' 'বিচিত্রা' বেশ জমে উঠেছিল, সে সম্বন্ধে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও তাঁর 'রবীন্দ্র-জীবনী' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে লিখেছেন—

"১৩২২ সাল, কবির বয়স ৫৪ বৎসর।···

সেই সময়ে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে একটি ক্ষুদ্র গৃহবিদ্যালয়ের অঙ্কুরোদ্গম হইতেছে, কবির মন সেই অঙ্কুর দেখিয়াই মহীরুহের কল্পনায় উৎসাহিত। ইহাই 'বিচিত্রা' নামে অল্পকালের মধ্যে কলিকাতার অভিজাত সাহিত্যিকদের মিলনকেন্দ্র হয়।···

'বিচিত্রা'র ক্লাব পুরাদস্তুর চলিতেছে। ২৫শে বৈশাখ (৮ই মে) কবির ৫৭তম জন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল।"

সাহিত্য-সাধনায় কুঁড়েমি

শরৎচন্দ্র দেশে ফিরে আসায় সাময়িক-পত্রের সম্পাদকরা এবার তাঁকে নাগালের মধ্যে পেয়ে, লেখা পাবার আশায় তাঁর কাছে যেতে লাগলেন। অনেক প্রকাশকও তাঁর কাছে যেতে সুরু করলেন এবং অনেকে তাঁকে বহু অর্থের প্রলোভনও দেখালেন। শরৎচন্দ্র কিন্তু এবার তাঁর লেখার মূল ধারাটিকে 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই আবদ্ধ রাখলেন। আর তাঁর বইগুলিও ভারতবর্ষের স্বত্বাধিকারী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সকেই প্রকাশ করবার ভার দিলেন।

শরৎচন্দ্র এই সময় প্রধানতঃ ভারতবর্ষ পত্রিকায় লিখলেও, অন্যান্য পত্রিকার সম্পাদকদের অনুরোধে তাঁদের পত্রিকাতেও অবশ্য কিছু কিছু লেখা দিতেন।

লেখার ব্যাপারে শরৎচন্দ্র যে কিরূপ বিখ্যাত কুঁড়ে ছিলেন, মাসিক কাগজের সম্পাদকরা তা মর্মে মর্মে অনুভব করতেন। কোন কাগজের জন্য একটা লেখা পেতে হ'লে সেই কাগজের সম্পাদককে যে কতবার বৃথাই যাতয়াত করতে হ'ত তার সীমা ছিল না। সাধারণ কাগজের কথা তো দূরে থাক, যে ভারতবর্ষে প্রধানতঃ তাঁর উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে বেরোত, সেই ভারতবর্ষের জন্য লেখা পেতে সম্পাদক জলধর সেনকেও মাসে অন্ততঃ ১৫।২০ দিন করে শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে গিয়ে ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকতে হ'ত। এমন কি জলধরবাবুকে অনেকদিন শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে আহারাদিও সারতে হ'ত। শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে জলধরবাবুর এই ধর্ণা দেওয়ার কথা উল্লেখ করে শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশী কবি গিরিজাকুমার বসু লিখেছেন—

"রচনা সম্বন্ধে তাঁর কি আলস্য ছিল তা অনেক সভা সমিতিতে জলধরদার মুখে সকলেই শুনেছেন। তারকেশ্বরে হত্যা দেবার মতো করে জলধরদা শয্যা নিতেন শরৎদার শিবপুর বাড়ীর বৈঠকখানার ঘরে লেখা আদায় করবার জন্যে। সে ব্যাপার বহুদিন আমার চোখের সামনে, আর আমার উপস্থিতিতেই ঘটেছে। সব দিন যে জলধরদার সাধ্য-সাধনা সফল হোতো তা নয়।" (শরৎচন্দ্রের সঙ্গে শিবপুরে—'বিচিত্রা', মাঘ ১৩৪৪)

শরৎচন্দ্রের লেখা পাওয়ার জন্য ভারতবর্ষ পত্রিকার সম্পাদকের যখন এই অবস্থা, তখন অন্য পত্রিকার সম্পাদকদের যে কি অবস্থা হ'ত তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁদের অনেককে শুধু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নয়, বছরের পর বছরও ধর্ণা দিতে হ'ত। 'বিজলী'-সম্পাদক নলিনীকান্ত সরকার একটা লেখা পাবার আশায় সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করেও একটানা দু-বছর হেঁটেছিলেন। এত হেঁটেও যখন লেখা পেলেন না, তখন অন্যভাবে এক মতলব করে তিনি শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে একটি লেখা আদায় করেছিলেন। কিভাবে যে শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে লেখা আদায় করেছিলেন, এ সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখেছেন—

"……আমি কাতরভাবে বল্‌লাম—দাদা এই সম্পাদকী করে যা মাইনে পাই, তাতে সংসার চলে না, তার জন্যে প্রাইভেট টুইশনী করতে হয়। শুনলাম, রামকৃষ্ণপুরে…এর বাড়ীতে একটি টুইশনী খালি আছে। এও শুনেছি তিনি আপনার খুবই পরিচিত। আপনি দয়া করে যদি আমাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের একটু বলে কয়ে দেন—

দুঃখ-দরদী শরৎচন্দ্র আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই বললেন—চল এখনি যাব।

একটি খদ্দরের বেনিয়ান পরে ও একগাছি মোটা লাঠি হাতে নিয়ে তিনি উঠে পড়লেন। দুজনে বার হলাম। বড় রাস্তার উপরে এসেই একখানা খালি ট্যাক্সি যেতে দেখে থামানোর জন্য ইঙ্গিত করলাম। ট্যাক্সি কাছে আসতে শরৎচন্দ্র বললেন—চল হেঁটেই যাব।

আমি একরূপ জোর করেই তাঁকে ট্যাক্সিতে তুলে নিজে উঠে বসলাম।

ট্যাক্সি চলেছে সবেগে—রামকৃষ্ণপুরকে পিছনে ফেলে গাড়ী যখন হাওড়া ময়দানে, তখন শরৎচন্দ্রের চমক ভাঙলো। হঠাৎ বলে উঠলেন—ওহে রামকৃষ্ণপুর যে ছাড়িয়ে এল।

আমি বললাম, 'চলুন না'। ট্যাক্সি হাওড়া ব্রিজের ওপরে। শরৎদা এবার একটু ব্যস্ত হয়ে বললেন—কোথায় যাচ্ছ বলতো ?

আমি পূর্বের উত্তরেরই পুনরুল্লেখ করলাম মাত্র।

শরৎচন্দ্রের মনে উদ্বেগ সঞ্চার করিয়ে নানা রাস্তা অতিক্রম করে গোলদীঘির পাশ দিয়ে ট্যাক্সি এসে ঢুকলো পটুয়াটোলা লেনে। এইখানে

একটি বাড়ীর সামনে গাড়ী এলে শরৎচন্দ্রকে নামতে বললাম। শরৎচন্দ্র চারদিক চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় আনলে বল তো?

ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে উঠলাম সেই বাড়ীর দোতলায় এক কামরায়। সেই ঘরের মধ্যে একখানি চেয়ারে তাঁকে বসিয়ে সামনের টেবিলে দুখানি টোষ্ট্, দু'টি ডিম, এক পেয়ালা চা, এক প্যাকেট সিগারেট, একটি দেশলাই, একখানা রাইটিং প্যাড্ ও দোয়াত-কলম দিয়ে বললাম—লেখা দিলে পর নিষ্কৃতি।

ব'লে দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে তালা দিয়ে পাশের ঘরে বসে রইলাম। বেলা তখন বোধ হয় ন'টা।

এইটে আমার মেস্। মেস্শুদ্ধো লোক শরৎচন্দ্রের এই বন্দীদশার কাহিনী শুনতে লাগলেন। প্রায় তিনঘণ্টা পরে দরজায় ধাক্কা দিয়ে শরৎচন্দ্র চিৎকার সুরু করে দিয়েছেন—ওহে নলিনী, দরজা খোল, তোমার লেখা হয়েছে।

ঘরে ঢুকে দেখি তিনি সত্যিই একটি অপূর্ব ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন। লেখাটির নাম 'দিন কয়েকের ভ্রমণ কাহিনী'। আগাগোড়া নিজেই পড়ে শোনালেন। প্রতারিত হয়ে আসার জন্য রাগ নেই, বন্দী হয়ে থাকার জন্য বিরক্তি নাই—বরং স্বভাব-সুলভ হাস্য-পরিহাস করতে করতে আমাকে নিয়ে তিনি তাঁর শিবপুরের বাড়ীতে ফিরে গেলেন।" (ভারতবর্ষ, ১৩৪৪ ফাল্গুন)

মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকরা শরৎচন্দ্রের কাছে বার বার লেখা চেয়েও, যখন লেখা পেতেন না, তখন তাঁরা বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যাবার সময় যে খুশি হয়ে যেতেন না, এ কথা শরৎচন্দ্র ভালভাবেই জানতেন। তবুও তিনি তাঁদের লেখা দিতেন না বা দিতে পারতেন না। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁর কৈফিয়ৎ হিসাবে তাঁর স্নেহভাজন কবি গিরিজাকুমার বসুকে একবার একপত্রে লিখেছিলেন—

"পরম কল্যাণীয়েষু,

গিরিজা, শয্যাগতও নই, উপবাস করে পড়েও নেই, তবু কেন যে তোমার অনুরোধ রাখতে পারলাম না, তার কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন। ইতিপূর্বেও অনেক নিরাশ করেছি, লিখবো বলেও পারিনি, বলেছি আমি অক্ষম, কিন্তু যাই কেননা বলি, খালি হাতে যাকে ফিরতে হয়—আশীর্বাদ ক'রে সে যায় না।

হয়ত ভাবে, এই ত খায় দায়, এই ত ঘুরে বেড়ায়, দু-ছত্র লেখার বেলাতেই কি হয় যত অসুখ!

দোষ দিতে তাদের পারিনে। কারণ, সাধারণতঃ অসুখের যে চেহারা তাদের পরিচিত, আমাতে তা মেলে কই? মেলে না নিজেও জানি। সুতরাং তর্ক ক'রে ওদিকে আত্মরক্ষার উপায় করা যাবে না, দণ্ড নিতেই হবে, কিন্তু তোমার কাছে অন্য কথা। এ ভরসা করি, দোষ স্খালনের রাস্তা যদি আর কোথাও না খোলা থাকে, তোমার কাছে আছেই। কারণ, তুমি ত শুধু কোন একটা মাসিক বা সাপ্তাহিকের সম্পাদক মাত্র নও,—নিজেও কবি। অর্থাৎ আমাদেরই সগোত্র—জ্ঞাতি। সাহিত্য সেবার আনন্দ বেদনা তুমি জানো, সাহিত্য সেবকের দুর্দিনের খবর রাখো। তোমাকে স্মরণ করানো চলে যে, সাহিত্যিকের বাহ্য ও অভ্যন্তর—সমসূত্রে গাঁথা নয়। একের সাক্ষ্য-প্রমাণে অপরের বিচার করা যায় না। এমন বিড়ম্বনাও ঘটে যখন দেহ দেখায় সুস্থ, কি সুপুষ্ট, মন হয়ত তখন একেবারে দেউলে, মাথাটা হয়ে থাকে মরুভূমি। তাকে নাড়া দিলে ভাবের বদলে অভাবের শুকনো ধূলোই বেরিয়ে আসতে চায়। সেই দুঃসময় চলচে আমার এখন।"

হাওড়ায় অবস্থান কালে শরৎচন্দ্র একবার কাশী বেড়াতে গেলে, সেখানে সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। কেদারবাবু পরে তাঁর কাশী-বাস কালে কাশী থেকে প্রকাশিত 'প্রবাস-জ্যোতি' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। সেই সময় কেদারবাবু তাঁর কাগজের জন্য শরৎচন্দ্রের কাছে লেখা চাইলে, শরৎচন্দ্র কেদারবাবুর কাগজে একটি ধারাবাহিক উপন্যাস দেবেন বলেছিলেন।

কেদারবাবু তখন শরৎচন্দ্রকে বহু চিঠি ও তাগাদা দিয়েও মাত্র এক কিস্তির বেশী আর লেখা আদায় করতে পারেন নি। শরৎচন্দ্রের সেই লেখাটি 'প্রবাস-জ্যোতি'র প্রথম সংখ্যায় (১৩৩৭ আশ্বিন) 'বাড়ীর কর্তা' নাম দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। (এই লেখাটিই পরে ১৩৩৭ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'উত্তরা'য় 'রসচক্র' নামে বারোয়ারী উপন্যাসের সূচনা হিসাবে প্রকাশিত হয়।)

প্রবাস-জ্যোতির জন্য লেখা চেয়ে, শরৎচন্দ্রকে লেখা কেদারবাবুর ঐ সময়কার একটি চিঠির উত্তরে শরৎচন্দ্র তাঁর কুঁড়েমির কথা উল্লেখ করে তখন কেদারবাবুকে লিখেছিলেন—

"কেদারবাবু, আপনার চিঠি ভাগলপুরের ফেরৎ পাইয়াছি। আপনাদের সঙ্গে আমার ব্যবহারটা যথেষ্ট নিন্দার হইয়া পড়িল, কিন্তু নিতান্তই বাধ্য হইয়া। ভরসা করি ভবিষ্যতে আর হইবে না। প্রথমটা ত শয্যাগত অসুখ ছিল, কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। তাহার পরে যখন দেহ সুস্থ হইল তখন অন্য উপসর্গ জুটিল। আপনাদের লেখাটা এ মাসে পাঠাইতে পারিতাম, কিন্তু যেহেতু 'ভারতবর্ষে' দেওয়া হইল না, সেই হেতু আপনাদেরও দিতে পারিলাম না। তাঁহাদের না দিয়া আপনাদের দিলে তাঁহাদের শুধু অপরিসীম ব্যথিত করাই হইত না, অপমান করা হইত।

এ মাস হইতে আবার সমস্ত নিয়মিত হইবে। আমাকে লইয়া যাঁহারাই যে কিছু কারবার করেন, তাঁহাদিগকে এইরূপ ভুগিতে হয়। আমি কেবল নিজেই অন্যায় করি না, আরও পাঁচজনকে বিড়ম্বিত করি। এটা আপনারা নিজগুণে ক্ষমা করিয়া লইবেন। স্বভাবং!"

শরৎচন্দ্র চিঠিতে 'এ মাস হইতে আবার সমস্ত নিয়মিত' হইবে' লিখলেও আর মোটেই লেখা দিতে পারেন নি।

শরৎচন্দ্র সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকদের, এমন কি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদককে লেখা দিতে ভোগালেও, 'নারায়ণ' পত্রিকার সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দাশ (তখনও তিনি 'দেশবন্ধু' আখ্যা পান নি, তিনি তখন কলকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিস্টার।) তাঁর কাগজের জন্য শরৎচন্দ্রের একটি গল্প চাইলে, শরৎচন্দ্র তখন কিন্তু চিত্তরঞ্জনকে আদৌ ভোগান নি। চিত্তররঞ্জন গল্প চাওয়ার পরেই শরৎচন্দ্র তাঁর 'স্বামী' গল্পটি চিত্তরঞ্জনকে দিয়েছিলেন। ঐ স্বামী গল্পটি ১৩২৪ সালের (১৯১৭ খ্রীঃ) শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা 'নারায়ণে' প্রকাশিত হয়েছিল।

চিত্তরঞ্জন শরৎচন্দ্রের গল্পটি পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন। তাই তিনি তখন শুধু তাঁর নাম সহি করে একটি ব্ল্যাঙ্ক চেক শরৎচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, এবং বলে দিয়েছিলেন—টাকার ঘর শূন্য রইল, সেখানে শরৎবাবু যত ইচ্ছা টাকার অঙ্ক বসিয়ে নিতে পারেন।

শরৎচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন দাশের কাছ থেকে এইরূপ একখানি চেক পেয়ে যেমন আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন, তেমনি খুশিও হয়েছিলেন। নির্লোভ শরৎচন্দ্র সেই চেকে কিন্তু এক শত টাকার বেশী বসান নি।

কংগ্রেসে যোগদান

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিক। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সারা ভারতে তখন কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয়ে গেছে। সরকারী চাকুরেরা চাকরির মোহ ত্যাগ করে, উকিল ব্যারিস্টাররা আদালত ছেড়ে, ছাত্ররা স্কুল কলেজ থেকে বেরিয়ে এসে দলে দলে তখন অসহযোগের নীতি অনুসরণ করছে। গান্ধীজীর উদাত্ত আহ্বানে আসমুদ্র-হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষ তখন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে।

দেশের যখন এমনি অবস্থা, শরৎচন্দ্রও তখন নিজেকে আর এক মুহূর্ত স্থির রাখতে পারলেন না। তিনি তাঁর সাহিত্য সেবা ছেড়ে, দেশের মুক্তির জন্য রাজনীতির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

বাঙলা দেশে অসহযোগ আন্দোলনের নেতা তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। দেশবন্ধুর সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় লেখা দেওয়া নিয়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ইতিপূর্বেই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। শরৎচন্দ্র এবার দেশবন্ধুর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। দেশবন্ধুও শরৎচন্দ্রের ন্যায় একজন খ্যাতনামা প্রতিভাবান সাহিত্যিককে সহকর্মী পেয়ে তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন।

শরৎচন্দ্র এই সময় হাওড়া শহরে বাস করতেন বলে, দেশবন্ধু তাঁকে হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি করে দিলেন। শরৎচন্দ্র অনেক বৎসর এই হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন।

শরৎচন্দ্র এইভাবে অসহযোগ আন্দোলনের সুরুতেই কংগ্রেসে যোগদান ক'রে, কংগ্রেসের সকল প্রকার গঠনমূলক কাজের মধ্যেই আত্মনিয়োগ করলেন।

শরৎচন্দ্র সাহিত্য ছেড়ে যখন রাজনীতিতে যোগদান করেন, সেই সময় তাঁর কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধু তাঁকে রাজনীতিতে নামতে নিষেধ করেছিলেন। তাঁরা তখন বলেছিলেন যে, এ কাজ তিনি ভাল করেন নি। তিনি একজন সাহিত্যিক, সাহিত্য ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে ঠিক হয়নি।

এর উত্তরে শরৎচন্দ্র তখন তাঁদের বলেছিলেন—"এটা তোমাদের ভুল;

রাজনীতির আলোচনায় যোগ দেওয়া প্রত্যেক দেশবাসীরই অবশ্য কর্তব্য বোলে আমি মনে করি। বিশেষতঃ আমাদের দেশ হ'ল পরাধীন দেশ, এ দেশের রাজনীতিক আন্দোলন প্রধানতঃ স্বাধীনতার আন্দোলন, মুক্তির আন্দোলন। এ আন্দোলনে সাহিত্যসেবীদেরই তো সর্বাগ্রে এসে যোগ দেওয়া উচিত। কারণ জাতিগঠন ও লোকমত সৃষ্টির গুরুভার পৃথিবীর সর্বদেশে সাহিত্যিকদের উপরই ন্যস্ত। যুগে যুগে মানুষের মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলেন তাঁরাই। তোমাদের নির্দেশমত সাহিত্যিকরা যদি বলেন—'আমি সাহিত্যিক সাহিত্য নিয়েই থাকবো, রাজনীতিতে যোগ দেব না, তাহলে উকিল-ব্যারিস্টাররাও তো বলতে পারেন—আমরা আইন-ব্যবসায়ী, মামলা-মোকর্দমা নিয়েই থাকবো, রাজনীতিতে যোগ দেব না। ছেলেরা বলবে—আমরা ছাত্র, পড়াশুনা নিয়েই থাকবো, রাজনীতির মধ্যে যাব না; তাহলে রাজনীতিটা করবে কারা শুনি?' "

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যিক ও অপরাপর বন্ধুদের সকল নিষেধ অগ্রাহ্য করেই তখন পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য রাজনীতির এই দুঃখবরণের পথে পা দিয়েছিলেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের সুরু থেকেই কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন এবং বহু বৎসর পর্যন্ত এই কংগ্রেসের সহিত যুক্ত ছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের অপর নাম ছিল সত্যাগ্রহ। এই সত্যাগ্রহ আবার ছিল সম্পূর্ণরূপে এক অহিংস সংগ্রাম। তাই মহাত্মার এই অভিনব সংগ্রাম আরম্ভ হ'লে, এই সংগ্রামের সুরু থেকেই কংগ্রেসের অনেক বড় বড় নেতাও সত্যাগ্রহ দ্বারাই স্বাধীনতা আসবে কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকেন। শরৎচন্দ্র কিন্তু কংগ্রেসে যোগদান করে প্রথম থেকেই মহাত্মা গান্ধীর এই অহিংস সংগ্রামের মূল সুরটি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই এই সংগ্রামকে তিনি একজন কংগ্রেস কর্মীর নীতি হিসাবে একদিকে যেমন মেনে নিয়েছিলেন, অপরদিকে তেমনি এই সংগ্রামের মূলতত্ত্ব প্রচারেও উদ্যোগী হয়েছিলেন। আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার অল্পদিন পরেই মহাত্মা গান্ধী যখন রাজদ্রোহের অভিযোগে কারারুদ্ধ হলেন, শরৎচন্দ্র সেই সময় দেশবন্ধুর 'নারায়ণ' পত্রিকায় 'মহাত্মাজী' নামে এক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে লিখেছিলেন—

"দেশের স্বাধীনতা বা স্বরাজ তিনি সত্যের ভিতর দিয়াই চাহিয়াছেন। মারিয়া কাটিয়া ছিনাইয়া লইতে চাহেন নাই। এমন করিয়া চাহিয়াছেন,

যাহাতে দিয়া সে নিজেও ধন্য হইয়া যায়।...এমন কাড়াকাড়ির দেওয়া নেওয়া তো সংসারে অনেক হইয়া গেছে, কিন্তু সে তো স্থায়ী হইতে পারে নাই,—দুঃখ কষ্ট বেদনার ভার তো কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে, কোথাও তো একটি তিলও কম পড়ে নাই। তাই তিনি আজ ও-সকল পুরাতন পরিচিত ও ক্ষণস্থায়ী অসত্যের পথ হইতে বিমুখ হইয়া সত্যাগ্রহী হইয়াছিলেন।"

শরৎচন্দ্র তাঁর এই প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

"তাই দুঃখ দিয়া নহে, দুঃখ সহিয়া, বধ করিয়া নহে, আপনাকে অকুণ্ঠচিত্তে বলি দিতেই এই ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহাই ছিল তাঁহার তপস্যা, ইহাকেই তিনি বীরের ধর্ম বলিয়া অকপটে প্রচার করিয়াছিলেন। পৃথিবী-ব্যাপী এই যে উদ্ধত অবিচারের জাঁতাকলে মানুষ অহোরাত্র পিষিয়া মরিতেছে, ইহার একমাত্র সমাধান গুলি-গোলা, বন্দুক-বারুদ, কামানের মধ্যে নাই, আছে কেবল মানবের প্রীতির মধ্যে, তাহার আত্মার উপলব্ধির মধ্যে।"

তিনি আরও বলেছিলেন—"মহাত্মাজী রাজশক্তির এই হৃদয় লইয়াই পড়িয়াছিলেন। তিনি মারামারি, কাটাকাটি, অস্ত্রশস্ত্র, বাহুবলের ধার দিয়া যান নাই, তাঁর সমস্ত আবেদন-নিবেদন, অভিযোগ-অনুযোগ এই আত্মার কাছে। রাজশক্তির হৃদয় বা আত্মার কোন বালাই না থাকিতে পারে, কিন্তু এই শক্তিকে চালনা যাহারা করে, তাহারাও নিষ্কৃতি পায় নাই এবং সহানুভূতিই যখন জীবনের সকল সুখ দুঃখ, সকল জ্ঞান, সকল কর্মের আধার, তখন ইহাকেই জাগ্রত করিতে তিনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন।"

শরৎচন্দ্র কংগ্রেসে যোগদান করে কংগ্রেসের আদর্শ বা নীতি অনুযায়ী চরকা কাটা, খদ্দর পরা, সরকারের সহিত অসহযোগিতা করা সমস্তই করতে থাকেন।

শরৎচন্দ্র এই সময় রবীন্দ্রনাথকেও কংগ্রেসে যোগদান করানো যায় কিনা চিন্তা করেন। তিনি ভাবেন, রবীন্দ্রনাথ যদি কংগ্রেসে যোগদান নাও করেন, অন্ততঃ তাঁকে দিয়ে অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করানো এবং তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমে চরকা ও খদ্দরের প্রচলন করাতে হবে।

দেশে যখন অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয়, কবি তখন ইউরোপে ছিলেন। কবি বিদেশ থেকে ফিরে এলে শরৎচন্দ্র একদিন তাঁর কাছে গিয়ে অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন ও চরকা-খদ্দর প্রচারের কথা নিবেদন করলেন।

কবি কিন্তু শরৎচন্দ্রের প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারলেন না।
এতে শরৎচন্দ্র একরূপ রাগ করেই কবির কাছ থেকে চলে এলেন।

গান্ধীজীর পরেই নেতাদের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উপর শরৎ-চন্দ্রের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল সবচেয়ে বেশী। একজন বিশ্বস্ত সৈনিকের ন্যায়ই তিনি তাঁর অধীনে থেকে দেশের কাজ করে যেতেন। এমন কি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে দেশবন্ধু জেলে গেলেও জেলের বাইরে তাঁর যে সব সহকর্মী ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে মিশে তিনি দেশবন্ধুর আরব্ধ কাজই করে যেতেন।

দেশবন্ধু জেল থেকে মুক্তিলাভ করলে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কলকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁকে যে অভিনন্দন জানাবার ব্যবস্থা হয়, শরৎচন্দ্র তার অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন। সেদিন সভায় যে অভিনন্দন পত্রটি পঠিত হয়েছিল, সেটি শরৎচন্দ্রই রচনা করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি থাকাকালে লক্ষ্য করেছিলেন যে, অসহযোগ আন্দোলনের সুরুতে যে জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য পাগল হয়ে দলে দলে জেলে গিয়েছিল, তারাই আবার জেলে কষ্ট স্বীকারের ভয়ে গবর্ণমেণ্টের কাছে ক্ষমা চেয়ে দলে দলে ফিরে এসেছিল। এ সম্পর্কে পরে তিনি দেশবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন—

"অসহযোগ আন্দোলনের সার্থকতা তো গণসাধারণ অর্থাৎ 'মাস'-এর জন্য? কিন্তু এই 'মাস' পদার্থটির প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নেই। একদিনের উত্তেজনায় এরা হঠাৎ কিছু একটা করে ফেলতেও পারে, কিন্তু দীর্ঘ দিনের সহিষ্ণুতা এদের নেই। সেবার দলে দলে এরা জেলে গিয়েছিল, কিন্তু দলে দলে ফিরেও এসেছিল। যারা আসেনি, তারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলেরা।"

অসহযোগ আন্দোলনের সময় শরৎচন্দ্র আরও লক্ষ্য করেছিলেন, দেশের আর এক শ্রেণীর মানুষ তারা জীবনে তো স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারেও ঘেঁষল না, অথচ তারা কংগ্রেস, গান্ধীজী ও কংগ্রেসকর্মীদের সমালোচনা করে যেতে লাগল।

দেশের মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে, স্বাধীনতা চাওয়ার ভিতরে অধিকাংশ মানুষেরই এই ফাঁকি ও চালাকি দেখে শরৎচন্দ্র তখন অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। তাই তিনি তখন হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতির

পদ ত্যাগ করতে মনস্থ করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখে উক্ত সভাপতির পদ ত্যাগ করবার সময় হাওড়ার কংগ্রেস কর্মীদের এক সভায় তিনি তাই বলেছিলেন—

"কাজ করবো না, মূল্য দেবো না অথচ পাবো, প্রার্থনার এই অদ্ভুত ধারাই যদি আমরা গ্রহণ করে থাকি, তা হ'লে নিশ্চয় বলছি আমি, কেবলমাত্র সমস্বরে ও প্রবলকণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ও মহাত্মাজীর জয়ধ্বনিতে গলা চিরে আমাদের রক্তই বা'র হবে, পরাধীনতার জগদ্দল শিলা তাতে সূচ্যগ্র ভূমিও নড়ে বসবে না।"

শরৎচন্দ্র এই সময় হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ ত্যাগ করলেও, তা অত্যন্ত অল্পদিনের জন্যই। কেননা, দেশবন্ধু পুনরায় তাঁকে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এরপর তিনি আর ঐ পদ ত্যাগ করেন নি এবং তখন থেকে একটানা প্রায় দশ বৎসর হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে গয়ায় কংগ্রেসের যে বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হয়, দেশবন্ধু তাতে সভাপতি ছিলেন। এই সময় শরৎচন্দ্রও দেশবন্ধুর সঙ্গে গিয়ে গয়া কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। এই গয়া কংগ্রেসেই আইন সভায় যোগদানের ব্যাপার নিয়ে কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতার সঙ্গে দেশবন্ধুর মতভেদ হয়। দেশবন্ধু তাঁর সভাপতির ভাষণে সেদিন বলেছিলেন—"অসহযোগকারীদের আইন সভায় প্রবেশ করা প্রয়োজন। অসহযোগকারীরা আইন সভায় প্রবেশ করলে অসহযোগ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে, এ ধারণা ভুল। তাঁরা যদি আইন সভার সদস্য হতে পারেন, তাতে বরং অসহযোগ কাজেরই বেশী সুবিধা হবে। কারণ তাঁরা তখন ভিতরে থেকে গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেক অন্যায় কাজে বাধা দিতে পারবেন।"

রাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বে একদল কিন্তু দেশবন্ধুর এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন এবং এই দলই সংখ্যায় বেশী থাকায় দেশবন্ধুর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গেল। তখন দেশবন্ধু কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করলেন এবং পরে তিনি ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে তাঁর সমর্থকদের নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যেই 'স্বরাজ্যদল' নামে আলাদা একটা দল গঠন করলেন। বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু দেশবন্ধুর দলে রইলেন।

কংগ্রেসের বৃহত্তর অংশই দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে। মাত্র অল্প কয়েকজন তাঁর পক্ষে। এই সময় দেশের সংবাদপত্রগুলিও দিনের পর দিন দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে

প্রচার করে যেতে লাগল। দেশবন্ধুর এই সঙ্কটকালে শরৎচন্দ্র তাঁর একান্ত বন্ধুর মতই পাশে পাশে থেকে তাঁর কাজ করতেন। এই সময়কার কথা উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র তাঁর 'স্মৃতিকথায়' লিখেছেন—

"গয়া কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া আভ্যন্তরীণ মতভেদ ও মনোমালিন্যে যখন চারিদিক আমাদের মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, এই বাঙ্গলা দেশে ইংরাজি বাঙ্গলা •যতগুলি সংবাদপত্র আছে, প্রায় সকলেই কণ্ঠ মিলাইয়া সমস্বরে তাঁহার স্তব-গান সুরু করিয়া দিল, তখন একাকী তাঁহাকে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যেমন করিয়া যুদ্ধ করিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি, জগতের ইতিহাসে বোধ করি তাহার আর তুলনা নাই।

লোক নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ নাই, অতি ছোট যাহারা তাহারাও গালিগালাজ না করিয়া কথা কহে না, দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা! অর্থাভাবে আমরা অতিশয় অস্থির হইয়া উঠিতাম, শুধু অস্থির হইতেন না তিনি নিজে। একটা দিনের কথা মনে পড়ে। রাত্রি তখন নয়টাই হইবে কি দশটা হইবে, বাহিরে জল পড়িতেছে, আর আমি, সুভাষ ও তিনি শিয়ালদহের কাছে এক বড়লোকের বৈঠকখানায় বসিয়া আছি, কিছু টাকার আশায়। আমি অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিলাম—গরজ কি একা আপনারই? দেশের লোক সাহায্য করতে যদি এতটাই বিমুখ হয়ে ওঠে ত তবে থাক।

মন্তব্য শুনিয়া বোধ হয় দেশবন্ধু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন। বলিলেন— এ ঠিক নয়, শরৎবাবু। দোষ আমাদেরই, আমরাই কাজ করতে জানিনে, আমরাই তাঁদের কাছে আমাদের কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারিনে। বাঙ্গালী ভাবুকের জাত, বাঙ্গালী কৃপণ নয়। একদিন যখন সে বুঝবে, তার যথাসর্ব্বস্ব এনে আমাদের হাতে ঢেলে দেবে।······

এ কথার আর উত্তর কি, আমি চুপ করিয়া রহিলাম।"

দেশবন্ধু অক্লান্ত পরিশ্রম করে সমগ্র দেশ ঘুরে ঘুরে স্বরাজ্যদলের আদর্শ অর্থাৎ আইন সভায় প্রবেশের কথা দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিলে, ক্রমে অনেকেই তাঁকে সমর্থন করতে থাকেন, এমন কি সেদিন গয়া কংগ্রেসে যাঁরা তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেও আইন সভায় প্রবেশের প্রশ্ন নিয়ে পুনরায় চিন্তা করতে থাকেন। কংগ্রেসের ভিতরে ও বাহিরে যখন এইরূপ অবস্থা, তখন এই পরিস্থিতি বিবেচনা করে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর

মাসে দিল্লীতে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা হ'ল। এই অধিবেশনে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সভাপতি হলেন। রাজা-গোপালাচারীর দল ইতিপূর্বে জেলে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলে, অসহযোগ-কারীরা প্রয়োজন বুঝলে দেশের মঙ্গলের জন্য আইন সভাতেও প্রবেশ করতে পারেন, গান্ধীজী একথা তাঁদের জানিয়ে দিয়েছিলেন। তাই সেদিন দিল্লী কংগ্রেসে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল যে, অহিংস অসহযোগ নীতিতে আস্থাবান থেকেও যে সকল কংগ্রেস কর্মী আইন সভায় প্রবেশ ধর্ম বা বিবেকবিরুদ্ধ মনে না করেন, কংগ্রেস তাঁদের আইন সভার নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করবার ও নির্বাচনে ভোট দেবার স্বাধীনতা মঞ্জুর করছে এবং আইন সভায় প্রবেশের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য বন্ধ রাখছে।

কংগ্রেসের এই দিল্লী অধিবেশনেও শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর সঙ্গে গিয়ে যোগ দিয়েছিলেন। সেদিন দিল্লী কংগ্রেসে দেশবন্ধুর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের এই জয় দেখে শরৎচন্দ্র সভার একপ্রান্তে বসে দেশবন্ধু সম্বন্ধে যে কথা ভেবেছিলেন, তিনি তাঁর 'দিন কয়েকের ভ্রমণ কাহিনী' প্রবন্ধে তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন! তিনি লিখেছেন—"এই ভারতবর্ষের এত দেশ এত জাতির মানুষ দিয়া পরিপূর্ণ বিরাট বিপুল এই জনসঙ্ঘের মধ্যেও এত বড় মানুষ বোধ করি আর একটিও নাই। এমন একান্ত নির্ভীক, এমন শান্ত সমাহিত, দেশের কল্যাণে এমন করিয়া উৎসর্গ-করা-জীবন আর কই? অনেক দিন পূর্বে তাঁহারই একজন ভক্ত আমাকে বলিয়াছিলেন, দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং বাঙলা দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা প্রায় তুল্য কথা। কথাটি যে কত বড় সত্য, এই সভার একান্তে বসিয়া আমার বহুবারই তাহা মনে পড়িয়াছে।"

বরিশালে যেবার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয়, শরৎচন্দ্র সেবারও দেশবন্ধুর সঙ্গে বরিশালে যান। বরিশালে যাওয়ার পথে সেদিন স্টীমারে গভীর রাত্রিতে শয্যা ছেড়ে তাঁরা অন্ধকারে ডেকের উপর বসে রাজ-নীতি নিয়ে অনেক আলোচনা করেছিলেন। এই আলোচনা কালে শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুকে যে সব কথা বলেছিলেন, তা থেকে তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক মতামতও অনেক জানা যায়। তাঁদের সেদিনের এই কথোপকথন সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র নিজেই তাঁর 'স্মৃতিকথায়' যা লিখেছেন, এখানে তা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা গেল।—

"......জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি চরকা বিশ্বাস করেন ?

বলিলাম—আপনি যে বিশ্বাসের ইঙ্গিত করছেন, সে বিশ্বাস করিনে।

—কেন করেন না ?

—বোধ হয় অনেক দিন চরকা কেটেছি বলেই।

দেশবন্ধু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—এই ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটী লোকের পাঁচ কোটী লোকও যদি সুতো কাটে, ত ষাট্ কোটী টাকার সুতো হতে পারে।

বলিলাম—পারে। দশ লক্ষ লোক মিলে একটি বাড়ী তৈরিতে হাত লাগালে দেড় সেকেণ্ডে হতে পারে। হয় আপনি বিশ্বাস করেন ?

দেশবন্ধু বলিলেন—এ দুটো এক বস্তু নয়। কিন্তু আপনার কথা আমি বুঝেছি,—সেই দশ মণ তেল পোড়ার গল্প। কিন্তু তবুও আমি বিশ্বাস করি। আমার ভারী ইচ্ছে যে, চরকা কাটা শিখি, কিন্তু কোন রকম হাতের কাজেই আমার কোন পটুতা নেই।

বলিলাম—ভগবান্ আপনাকে রক্ষা করেছেন।

দেশবন্ধু হাসিলেন। বলিলেন—আপনি হিন্দু-মুসলমান ইউনিটী বিশ্বাস করেন !

বলিলাম—না।

দেশবন্ধু কহিলেন—কিন্তু এছাড়া আর কি উপায় আছে বলতে পারেন ? এরই মধ্যে তারা সংখ্যায় পঞ্চাশ লক্ষ বেড়ে গেছে। আর দশ বছর পরে কি হবে বলুন ত ?

—কেবলমাত্র সংখ্যাই আমার কাছে মস্ত জিনিষ নয়। তা'হলে চার কোটী ইংরাজ দেড়শ কোটী মানুষের মাথায় পা দিয়ে বেড়াতে পারত না। নমঃশূদ্র, মালো, নট, রাজবংশী, পোদ এদের টেনে নিন, দেশের মধ্যে দশের মধ্যে এদের একটা মর্যাদার স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়ে এদের মানুষ করে তুলুন, মেয়েদের প্রতি যে অন্যায়, নিষ্ঠুর, সামাজিক অবিচার চলে আসছে, তার প্রতিবিধান করুন, ও দিকের সংখ্যার জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না।...

প্রশ্ন করিলেন—আপনি আমাদের অহিংস অসহযোগ বিশ্বাস করেন ত ?

বলিলাম—না। অহিংস, সহিংস কোন অসহযোগেই আমার বিশ্বাস নেই।...ইতিমধ্যে যতটুকু শক্তি আপনার কাজ করে দিই।...

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আচ্ছা এই রিভোলিউসনারিদের সম্বন্ধে আপনার যথার্থ মতামত কি?

—এদের অনেককে আমি যথার্থ ভালবাসি, কিন্তু এদের কাজ দেশের পক্ষে একেবারে ভয়ানক মারাত্মক। এই অ্যাকৃটিভিটিতে সমস্ত দেশ অন্ততঃ পঁচিশ বছর পেছিয়ে যাবে। তাছাড়া এর মস্ত দোষ এই যে, স্বরাজ পাবার পরেও এ জিনিষ যাবে না, তখন আরও স্পর্দ্ধিত হয়ে উঠবে, সামান্য মতভেদে একেবারে 'সিভিল ওয়ার' বেধে যাবে। খুনোখুনি রক্তারক্তি আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি শরৎবাবু।"

অনেকদিন পরে এই রিভোলিউসনারিদের কথা নিয়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আর একবার যে কথা হয়েছিল, সে সম্বন্ধেও তিনি 'স্মৃতি-কথায়' লিখেছেন—

"দেশের মধ্যে রিভোলিউসনারি ও গুপ্ত সমিতির অস্তিত্বের জন্য কিছুকাল হইতে তিনি নানা দিক দিয়া নিজেকে বিপন্ন জ্ঞান করিতেছিলেন। তাঁহার মুস্কিল হইয়াছিল এই যে, স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা বলিস্বরূপ নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের একান্তভাবে না ভালবাসাও তাঁহার পক্ষে যেমন অসম্ভব ছিল, তাঁহাদের প্রশ্রয় দেওয়াও তাঁহার পক্ষে তেমনি অসম্ভব ছিল।... এই সমিতিকে উদ্দেশ করিয়া আমাকে একদিন বাঙ্গলায় একটা আপিল লিখিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। আমি লিখিয়া আনিলাম—'যদি তোমরা কোথাও কেহ থাকো, যদি তোমাদের মতবাদ সম্পূর্ণ বর্জন করিতেও না পারো তো অন্ততঃ ৫।৭ বৎসরের জন্যও তোমাদের কার্যপদ্ধতি স্থগিত রাখিয়া আমাদের প্রকাশ্যে সুস্থ চিত্তে কাজ করিতে দাও। ইত্যাদি, ইত্যাদি।' কিন্তু আমার 'যদি' কথাটায় তিনি ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিলেন, 'যদি'তে কাজ নেই। সাতাশ বৎসর ধরে 'অ্যাস্যুমিং বাট্ নট্ অ্যাড্‌মিটিং' করে এসেছি, কিন্তু আর ফাঁকি নয়। আমি জানি, তারা আছে, 'যদি' বাদ দিন।

আমি আপত্তি করিয়া বলিলাম—আপনার স্বীকারোক্তির ফল দেশের উপরে অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে।

দেশবন্ধু জোর করিয়া বলিলেন—না। সত্য কথা বলার ফল কখনও মন্দ হয় না।

বলা বাহুল্য, আমি রাজি হইতে পারি নাই এবং আবেদনও প্রকাশিত হইতে পারে নাই।"

শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর একজন বড় সমর্থক এবং অন্যতম প্রধান সহকর্মী হলেও তিনি দেশবন্ধুর সকল নির্দেশই অক্ষরে অক্ষরে মানতেন না। তিনি তাঁর নিজের অভিমত জানাতে কখনই দ্বিধা করতেন না। তাহলেও শরৎচন্দ্র—একজন সৈনিক যেমন সেনাপতির আদেশ মনঃপুত না হলেও মেনে চলে, তেমনি দেশের জন্যই দেশবন্ধুর প্রায় সকল নির্দেশই মেনে চলতেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তিনি তাই বলেছিলেন—

"আমরা করিতাম দেশবন্ধুর কাজ। আজ তিনি নাই, তাই থাকিয়া থাকিয়া মনে হইতেছে, কি হইবে আর কাজ করিয়া? তাঁহার সব আদেশই কি আমাদের মনঃপুত হইত? হায় রে, রাগ করিবার, অভিমান করিবার জায়গাও আমাদের ঘুচিয়া গেছে।"

অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাঙ্গলা দেশে যাঁরা দেশবন্ধুর সহকর্মী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসুর (পরে নেতাজী) সঙ্গেই ছিল শরৎচন্দ্রের বেশী ঘনিষ্ঠতা। সুভাষচন্দ্র ছিলেন তাঁর অত্যন্ত স্নেহভাজন বন্ধু। সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর এই স্নেহ ও বন্ধুত্ব তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অটুট ছিল। অপরদিকে সুভাষচন্দ্রও শরৎচন্দ্রকে একজন খাঁটি দেশকর্মী এবং বাঙ্গলার একজন শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক হিসাবেও যারপর নাই শ্রদ্ধা করতেন। তিনি দেশের কাজের জন্য, আবার অনেক সময়ে অমনিও শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। তখন উভয়ের মধ্যে দেশের বহু সমস্যা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা হ'ত।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় ১১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ 'ফরবেস ম্যানসন' নামক ভবনে দেশবন্ধুর 'মহামণ্ডলীকত্বে' 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন' নামক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনের পরিচালনায় ঐ বাড়ীতেই 'কলিকাতা বিদ্যামন্দির' নামে একটি জাতীয় কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন এই কলেজের অধ্যক্ষ। শরৎচন্দ্র এই কলেজের বাঙ্গলা ভাষার প্রধান অধ্যাপক ছিলেন।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বাঙ্গলাদেশে কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে দুটা দলের সৃষ্টি হয়। এই দলের একদিকে থাকেন জে, এম, সেনগুপ্ত, অপর

দিকে থাকেন সুভাষচন্দ্র বসু। শরৎচন্দ্র তখন সুভাষচন্দ্রের পক্ষই অবলম্বন করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করায় বিরোধী দলের পক্ষ থেকে তাঁকে অনেক সময় অপমানও সহ্য করতে হয়েছিল।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে কুমিল্লায় যুব-সম্মেলনের যে অধিবেশন হয়, তাতে শরৎচন্দ্রও যোগদান করেছিলেন। কুমিল্লা যাওয়ার পথে সুভাষচন্দ্রের বিরোধীদল শরৎ-চন্দ্রের প্রতি এক জায়গায় অসম্মান প্রদর্শন করেন। শরৎচন্দ্র দিলীপকুমার রায়কে লিখিত একটি পত্রে এ সম্পর্কে উল্লেখ করে তখন (৩০শে বৈশাখ ১৩৩৮) লিখেছিলেন—

"মণ্টু,—দেশোদ্ধার করবার জন্য সুভাষের দল আমাকে বলপূর্বক কুমিল্লায় চালান করে দিয়েছিল। পথে একদল শেম্‌, শেম্‌, বললে, গাড়ীর জানালার ফাঁক দিয়ে কয়লার গুঁড়ো মাথায় গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে প্রীতিজ্ঞাপন করলে, আবার একদল বারো ঘোড়ার গাড়ী চাপিয়ে দেড় মাইল লম্বা শোভাযাত্রা করে জানিয়ে দিলে কয়লার গুঁড়োটা কিছুই নয়,—ও মায়া। যাই হোক্‌, রূপনারায়ণের তীরে আবার ফিরে এসেছি।···জয় হোক্‌ কয়লার গুঁড়োর, জয় হোক্‌ বারো ঘোড়ার গাড়ীর।"

বাঙলা কংগ্রেসের ঐ সময়কার ঐ দলাদলির কথা উল্লেখ করে, শরৎচন্দ্র ১৩৩৮ সালের ৫ই আষাঢ় তারিখে সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রসিকতা করে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

সুহৃদ্বরেষু,

কেদারবাবু, যথাসময়েই আপনার স্নেহশীতল চিঠিখানি পেয়েছিলাম, কিন্তু এ ক'দিন এমনি ব্যস্ত ছিলাম যে, উত্তর দিতে পারি নি। কাল আমাদের হাবড়ার জেলা কংগ্রেস ইলেকশন হয়ে গেল। এবার বিরুদ্ধদলের সোরগোল, গালিগালাজ ও লাঠি ঠক্‌ঠকি দেখে ভেবেছিলাম হয়ত বিনা রক্তপাতে শেষ হবে না। আমি প্রেসিডেন্ট, সুতরাং আমাদেরও যথারীতি প্রস্তুত হতে হয়েছিল। সভায় দাঙ্গা হয়, এ আমার ভারি ভয়, তাই কাঁটাতারের বেড়া, মায় ইলেক্‌ট্রিফিকেশন সবই তৈরি রাখতে হয়েছিল। আর তৈরি ছিল বলেই দাঙ্গা হয়নি, নির্বিঘ্নে দখল কায়েম রাখা গেল। বছর দশেক প্রেসিডেন্ট আছি, ভেস্টেড্‌ ইণ্টারেস্ট জন্মে গেছে—সহজে ছাড়া চলে না। চলে কি? আমাদের পক্ষের যুক্তিটা এই যে গলদ যতই থাক, তোমরা বলবার কে? এবং দেশের

মুক্তি যদি আসে তো আমাদের দ্বারাই আসুক। তোমরা পারবে না। তোমরা হাত দিতে যেয়ো না। কিন্তু ওরা সম্মত হয় না বলেই তো আমরা রেগে যাই। নইলে আমাদের অর্থাৎ স্বভাবীদলের মেজাজ খুবই ঠাণ্ডা। অনেকটা আপনার মতো। যাক্, এখন একটু সময় পাওয়া গেল। দু-এক মাস বই লিখতে সুরু করি। কি বলেন?…

আপনার

শরৎ

শরৎচন্দ্র কংগ্রেসে যোগদান করলেও, মহাত্মা গান্ধী তথা কংগ্রেসের সকল নির্দেশই তিনি আবেগের বশে মেনে নিতেন না। তিনি তাঁর নিজের যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে অনেক সময়ই কংগ্রেসের প্রতিটি নির্দেশকে যাচাই করে নিতেন, তাই তিনি অনেক ক্ষেত্রে কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শ মেনে নিলেও কোন কোন বিষয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব অভিমত জানাতে আদৌ ইতস্ততঃ করতেন না। দেশের মুক্তি-সংগ্রামে নারীর অধিকার, রাজনীতিতে ছাত্রদের যোগদান, খদ্দর ও চরকা প্রচার, হিন্দু-মুসলমান মিলন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর নিজের যে ধারণা ছিল, তিনি তা স্পষ্টভাবে দেশবাসীকে জানিয়ে গেছেন।

মেয়েদের রাজনীতি চর্চার ব্যাপারে কংগ্রেসের মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি অনেক নেতার ন্যায় তিনিও এ কথা স্বীকার করতেন যে, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মেয়েদেরও যোগ দেবার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। কিন্তু সমাজের গোঁড়া মানুষগুলো যখন মেয়েদের নানা ভয় দেখিয়ে তাদের ঠকিয়ে, তাদের দূরে সরিয়ে রাখারই ব্যবস্থা করত, তখন তিনি নারীর এই মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা খর্ব করায় বেদনা অনুভব করতেন। তাই এ সম্পর্কে 'স্বরাজ সাধনায় নারী' নামক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—"আজ যাঁরা স্বরাজ পাবার জন্য মাথা খুঁড়ে মরছেন—আমিও তাঁদের একজন। কিন্তু আমার অন্তর্যামী কিছুতেই আমাকে ভরসা দিচ্ছে না। কোথায় কোন্ অলক্ষ্যে থেকে যেন তিনি প্রতি মুহূর্তেই আভাষ দিচ্ছেন, এ হবার নয়। যে চেষ্টায়, যে আয়োজনে দেশের মেয়েদের যোগ নেই, সহানুভূতি নেই, এই সত্য উপলব্ধি করবার কোন জ্ঞান, কোন শিক্ষা, কোন সাহস আজ পর্যন্ত যাদের দিই নি, তাদের কেবল গৃহের অবরোধে বসিয়ে, শুদ্ধমাত্র চরকা কাটতে বাধ্য করেই এত বড় বস্তু লাভ করা যাবে না।

মেয়ে-মানুষকে যে আমরা শুধু মেয়ে করেই রেখেছি, মানুষ হতে দিইনি, স্বরাজের আগে তার প্রায়শ্চিত্ত দেশের হওয়া চাই-ই।"

এইভাবে শরৎচন্দ্র দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরুষের ন্যায় নারীরও সমান অধিকারের কথা মনেপ্রাণে স্বীকার করতেন এবং একথা তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করতেও আদৌ কিন্তু বোধ করতেন না।

ছাত্রদের জাতীয় আন্দোলনে যোগদান সম্পর্কে কংগ্রেস নেতাদের অনেকেরই নির্দেশ ছিল যে, ছাত্ররা স্বাধীনতা সংগ্রামে আসবে না। তারা তাদের যে কর্তব্য সেই পড়াশুনা নিয়েই থাকবে।

শরৎচন্দ্র কিন্তু এ যুক্তি স্বীকার করতেন না। তিনি বলতেন যে, রাজনীতিটা কেবল বুড়োদেরই একচেটে নয়। আর তাছাড়া বয়স কখনও দেশের ডাক থেকে কাউকে আটকে রাখতে পারে না। শরৎচন্দ্রের মত ছিল যে, দেশ সেবার হাতে খড়ি একেবারে ছেলেবেলা থেকে হওয়াই ভাল।

শরৎচন্দ্র কংগ্রেসে যোগদান করার পর, মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে তথা কংগ্রেসের আদর্শ অনুযায়ী বহুদিন যাবৎ তিনি নিয়মিত চরকায় সুতা কেটেছেন এবং খদ্দরও পরেছেন। শুধু তাই নয়, দেশে চরকার প্রচলনের জন্যও তখন তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন যাওয়ার পর তাঁর এই অভিজ্ঞতা হয় যে, চরকা এ যুগে অচল এবং চরকায় দেশের অভাবও মেটানো যাবে না। তখন তিনি চরকা ও খদ্দর প্রচারের চেষ্টা ছেড়ে দিলেন, এবং একথা বলতে আরম্ভ করলেন যে, দেশে কাপড়ের কল তৈরি হোক্, আর এদেশী সুতায় যদি সমস্ত অভাব না মেটে তো তাহলে ব্রিটিশ ছাড়া জাপান কি অন্য কারও সুতা দিয়ে এ দেশের তাঁতে কাপড় হোক্। এই চরকা ও খদ্দর সম্বন্ধে তিনি তাই লিখেছিলেন—"ভারতের বিশ লাখ টাকার খাদি দিয়ে আশী ক্রোর টাকার অভাব পূর্ণ করা যায় না! কাঠের চরকা দিয়ে লোহার যন্ত্রকেও হারানো যায় না এবং গেলেও তাতে মানুষের কল্যাণের পথ সুপ্রশস্ত হয় না।"

কংগ্রেস যখন অসহযোগ আন্দোলন চালায়, সেই সময় ভারতীয় মুসলমানরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে খিলাফৎ আন্দোলন চালাচ্ছিল। মুসলমানদের এই আন্দোলনের কারণ ছিল যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নাকি তাদের খলিফার অবমাননা করেছে। তুরস্কের সুলতান হচ্ছেন মুসলমান জগতের খলিফা বা

ধর্মগুরু। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুরস্কের তৎকালীন সুলতান জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন করে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে ব্রিটিশ জয়ী হ'লে তারা সুলতানকে নজরবন্দী করে এবং তুরস্কে শান্তি রক্ষার জন্য ইংরাজ সৈন্যও মোতায়েন করে। এতে মুসলমানরা খলিফার অবমাননা করা হয়েছে ভেবে এই আন্দোলন চালায়।

কংগ্রেস এতদিন পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করে আসছিল, তাতে দেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের একরূপ কোন যোগই ছিল না। কংগ্রেসের যা কিছু কাজ হচ্ছিল, তা প্রায় শুধু হিন্দুদের দ্বারাই। কংগ্রেসের হিন্দু নেতারা এই সময় স্থির করলেন যে, ভারতের খিলাফৎ আন্দোলনকারী মুসলমানদের বিক্ষোভও যখন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে, তখন মুসলমানদের এই আন্দোলনে সাহায্য করলে, তাদের হয়ত জাতীয় আন্দোলনেও ভিড়ানো যেতে পারে। এদিকে মুসলমানরাও ঠিক এই সময় তাদের এই ক্ষীণ খিলাফৎ আন্দোলনকে জোরদার করবার জন্য নানা উপায় চিন্তা করছিল। তারা হিন্দুদের তখন দলে আনবার জন্যও বহু চেষ্টা করছিল। এমন কি ঐ সময় তারা দিল্লীতে যে খিলাফৎ সভা করেছিল, তাতে নিমন্ত্রণ পত্রে এ কথাও প্রচার করেছিল যে, হিন্দুরা খিলাফতে যোগ দিলে, মুসলমানরা এ দেশে গো-বধ পর্যন্ত বন্ধ করে দেবে।

যাই হোক্ শীঘ্রই কংগ্রেসের হিন্দু নেতাদের সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলনের মুসলমান নেতাদের একটা চুক্তি হয়ে গেল। কংগ্রেস খিলাফতে যোগদান করল, ফলে মুসলমানরাও কেউ কেউ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিল।

শরৎচন্দ্র কংগ্রেসের তথা হিন্দুদের এই খিলাফৎ আন্দোলনে যোগদানকে তখন আদৌ সমর্থন করেন নি। মুসলমানদের দলে আনবার জন্য কংগ্রেসের এই প্রচেষ্টাকে তিনি একটি ঘুষের ব্যাপার ও গোঁজামিল বলেছিলেন। 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' নামক প্রবন্ধে তাই তিনি এ সম্পর্কে লিখেছিলেন—

"……খিলাফৎ আন্দোলন হিন্দুর পক্ষে শুধু অর্থহীন নয়, অসত্য।……যে দেশের সহিত ভারতের সংশ্রব নাই, যে দেশের মানুষে কি খায়, কি পরে কি রকম চেহারা, কিছুই জানি না, সেই দেশ পূর্বে তুর্কীর শাসনাধীন ছিল, এখন যদিচ, তুর্কী লড়াইয়ে হারিয়াছে, তথাপি সুলতানকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হউক, কারণ পরাধীন ভারতীয় মুসলমান সমাজ আবদার ধরিয়াছে—এ

"কোন্ সঙ্গত প্রার্থনা? আসলে ইহাও একটা প্যাক্ট। ঘুষের ব্যাপার। যেহেতু আমরা স্বরাজ চাই এবং তোমরা চাও খিলাফৎ—অতএব এস—একত্র হইয়া আমরা খিলাফতের জন্য মাথা খুঁড়ি এবং তোমরা স্বরাজের জন্য তাল ঠুকিয়া অভিনয় শুরু কর।......এমন ঘুষ দিয়া, প্রলোভন দেখাইয়া, পিঠ চাপড়াইয়া কি স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামে লোক ভর্তি করা যায়, না করিলেই বিজয় লাভ হয়? হয় না এবং কোনদিন হইবে বলিয়াও মনে করি না।

......জিজ্ঞাসা করি, মুক্তি হয় কি গোঁজামিলে? মুক্তি অর্জনের ব্রতে হিন্দু যখন আপনাকে প্রস্তুত করিতে পারিবে, তখন লক্ষ্য করিবারও প্রয়োজন হইবে না, গোটাকয়েক মুসলমান ইহাতে যোগ দিল কিনা।"

কংগ্রেস একদিকে যেমন স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, তেমনি সে বরাবরই তার অনেকখানি শক্তি নিয়োগ করেছে হিন্দু-মুসলমান মিলনের মধ্য দিয়ে মুসলমানদেরও স্বাধীনতা আন্দোলনে নিয়ে আসার। আর এ কথাও অতি সত্য যে, হিন্দুপ্রধান কংগ্রেস মুসলমানদের সঙ্গে মিলনের আশায় তার অনেক স্বার্থ ত্যাগ করেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমানের অন্যায় দাবীও মেনে নিয়েছে। যে জন্য দেশের বহু হিন্দুজনসাধারণ কংগ্রেসের এই মুসলমান তোষণের জন্য অনেক সময় কংগ্রেসের নিন্দাও করেছে। শরৎচন্দ্র বরাবরই হিন্দুদের মুসলমানের সঙ্গে মিলনের জন্য এই তোষণ করে হাত বাড়ানোটাকে আদৌ প্রীতির চক্ষে দেখতে পারতেন না। এ দেশের মুসলমানদের গতিবিধি লক্ষ্য করে তিনি বুঝেছিলেন যে, হিন্দু-মুসলমান মিলন অসম্ভব। তাই তিনি লিখেছিলেন—

"মুসলমান যদি কখনও বলে হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।

একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই! সেদিন কেবল লুণ্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্বহানি করিয়াছে, বস্তুত অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের পরে' যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও তার সঙ্কোচ মানে নাই।

দেশের রাজা হইয়াও তাহারা এই জঘন্য প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি নামজাদা সম্রাটের কথা ছাড়িয়া

দিয়াও যে-আকবর বাদশাহের উদার বলিয়া এত খ্যাতি ছিল, তিনিও কসুর করেন নাই।"

শরৎচন্দ্র তাই হিন্দুদের, হিন্দু-মুসলমান মিলনের বৃথা চেষ্টায় না ঘুরে, শুধু তাঁদেরই ভারতের মুক্তির জন্য জাতীয় আন্দোলন চালিয়ে যেতে উপদেশ দিতেন। তাঁর যুক্তি ছিল যে, মিলনের বৃথা চেষ্টা না করে মুসলমানদের বর্জন করবার নীতি নিয়ে আগিয়ে গেলে, তবেই হয়ত মুসলমানরা তাদের নিজেদেরই আগ্রহে একদিন মিলনের জন্য আসবে। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন—

"......জগতে অনেক বস্তু আছে যাহাকে ত্যাগ করিয়াই তবে পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান মিলনও সেই জাতীয় বস্তু। মনে হয়, এ আশা নির্বিশেষে ত্যাগ করিয়া কাজে নামিতে পারিলেই হয়ত একদিন এই একান্ত দুষ্প্রাপ্য নিধির সাক্ষাৎ মিলিবে। কারণ, মিলন তখন কেবল একার চেষ্টাতেই ঘটিবে না, ঘটিবে উভয়ের আন্তরিক ও সমগ্র বাসনার ফলে।"

শরৎচন্দ্র এইভাবে ভারতের স্বাধীনতার জন্য একদিকে যেমন রাজনীতিতে নেমে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, অপরদিকে তেমনি যেটা তাঁর আসল পেশা সেই সাহিত্যের মধ্য দিয়েও রাজনীতির চর্চা করে গেছেন। তিনি তাঁর লিখিত বহু প্রবন্ধে এবং উপন্যাসেও ভারতের স্বাধীনতা লাভের কথা আলোচনা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী'তে তিনি ভারতের মুক্তি আনয়নের কথাই অপরূপভাবে চিত্রিত করেছেন। এই 'পথের দাবী' পুস্তকের প্রকাশ নিয়ে শরৎচন্দ্রকে অনেক বিপদও বরণ করতে হয়েছিল। বই খানি কোনরূপে প্রকাশ করা গেলেও প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়, আর শরৎচন্দ্রও তখন কোনরূপে জেলের হাত থেকে অব্যাহতি পান।

হাওড়ায় সাহিত্য-সৃষ্টি

শরৎচন্দ্র ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত হাওড়া শহরে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁর নিম্নলিখিত গল্প-উপন্যাসগুলি 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল :—

১৩২৩ সালের জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ সংখ্যায় 'বৈকুণ্ঠের উইল', ১৩২৩ সালের আশ্বিন সংখ্যায় 'অরক্ষণীয়া', ১৩২৩ সালের বৈশাখ-মাঘ সংখ্যায় 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী', (শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থাকাকালেই তাঁর 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ১ম পর্ব 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' নাম দিয়ে ছাপাতে স্থরু করেছিলেন এবং হাওড়ায় আসার আগে ১৩২২ সালের মাঘ-চৈত্র এই তিন মাসে কিছুটা ছাপাও হয়েছিল।), ১৩২৩ সালের চৈত্র এবং ১৩২৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় 'দেবদাস', ১৩২৩ সালের ভাদ্র, কার্তিক ও পৌষ সংখ্যায় 'নিষ্কৃতি'। (১৩২১ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'যমুনায়' 'ঘরভাঙ্গা' নামে এই গল্পটির প্রথমাংশ ছাপা হয়েছিল।) ১৩২৪ সালের কার্তিক সংখ্যায় 'একাদশী বৈরাগী', ১৩২৪ সালের পৌষ-চৈত্র এবং ১৩২৫ সালের বৈশাখ-ভাদ্র সংখ্যায় 'দত্তা', ১৩২৪ সালের আষাঢ়-ভাদ্র, অগ্রহায়ণ চৈত্র ও ১৩২৫ সালের বৈশাখ-আষাঢ়, ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় 'শ্রীকান্ত' ২য় পর্ব, ১৩২৩ সালের মাঘ-চৈত্র, ১৩২৪ সালের বৈশাখ-আশ্বিন, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন, ১৩২৫ সালের পৌষ-চৈত্র, ১৩২৬ সালের আষাঢ়-অগ্রহায়ণ, পৌষ-মাঘ সংখ্যায় 'গৃহদাহ', ১৩২৭ সালের আষাঢ়-আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্র, ১৩২৮ সালের জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, কার্তিক ও চৈত্র, ১৩২৯ সালের বৈশাখ-শ্রাবণ, আশ্বিন-কার্তিক ও মাঘ-চৈত্র, ১৩৩০ সালের বৈশাখ, আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় 'দেনা-পাওনা', ১৩৩০ সালের মাঘ-ফাল্গুন ও ১৩৩১ সালের বৈশাখ, আষাঢ় ও আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় 'নববিধান', ১৩২৭ সালের পৌষ-ফাল্গুন ও ১৩২৮ সালের বৈশাখ, আষাঢ়, ভাদ্র, আশ্বিন ও পৌষ সংখ্যায় আংশিকভাবে 'শ্রীকান্ত' ৩য় পর্ব।

ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের এই গল্প উপন্যাসগুলির প্রত্যেকটিই প্রকাশিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড

সন্স (ভারতবর্ষ পত্রিকার মালিকরাই গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স দোকানেরও মালিক) থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

সেই হিসাবে ৫-৬-১৬ তারিখে 'বৈকুণ্ঠের উইল', ২০-১১-১৬ তারিখে 'অরক্ষণীয়া', ১২-২-১৭ তারিখে শ্রীকান্ত ১ম পর্ব, ৩০-৬-১৭ তারিখে দেবদাস, ১-৭-১৭ তারিখে নিষ্কৃতি, ১৮-২-১৮ তারিখে স্বামী (এই গ্রন্থের 'একাদশী বৈরাগী' গল্পটি ভারতবর্ষে এবং 'স্বামী' গল্পটি নারায়ণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।), ২-৯-১৮ তারিখে দত্তা, ২৪-৯-১৮ তারিখে শ্রীকান্ত ২য় পর্ব, ২০-৩-২০ তারিখে গৃহদাহ, ১৪-৮-২৩ তারিখে দেনা-পাওনা এবং ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে নববিধান, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

এই সময় ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যান্য কাগজে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের ছবি, বিলাসী ও মামলার ফল গল্প তিনটি নিয়ে 'ছবি' বইটিও ১৬-১-২০ তারিখে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশ করেছিলেন।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ছাড়া শিশির পাবলিশিং হাউস এই সময় ১৩২৭ সালের আশ্বিন মাসে শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে' বইটি প্রকাশ করেন।

শরৎচন্দ্র ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রধানতঃ লিখলেও অন্যান্য পত্রিকার সম্পাদকদের অনুরোধে পড়ে, কখনবা দায়ে পড়ে তাঁদের কাগজেও কিছু কিছু লেখা দিতেন। হাওড়ায় থাকাকালে ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যান্য পত্রিকায় তাঁর যে সব গল্প উপন্যাস বেরিয়েছিল, সেগুলি হচ্ছে এই :—

১৩২৪ সালের শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা নারায়ণে 'স্বামী', ১৩২৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা ভারতীতে 'বিলাসী', রবীন্দ্রনাথের জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত ১৩২৫ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত বার্ষিকী পার্বণীতে 'মামলার ফল', সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত ১৩২৬ সালের পূজাবার্ষিকী আগমনীতে 'ছবি', ১৩২৯ সালের আশ্বিন সংখ্যা পল্লীশ্রীতে 'মহেশ', ১৩২৯ সালের মাঘ সংখ্যা বঙ্গবাণীতে 'অভাগীর স্বর্গ', ১৩৩২ সালের শারদীয়া বসুমতীতে 'হরিলক্ষ্মী', ১৩৩২ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত পূজা-বার্ষিকী শরতের ফুলে 'পরেশ'।

এই গল্পগুলি ছাড়া ১৩২৯ সালের ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৩০ সালের বৈশাখ,

আষাঢ়-ভাদ্র, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন, ১৩৩১ সালের জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন-কার্তিক, পৌষ-মাঘ, ১৩৩২ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, কার্তিক-ফাল্গুন সংখ্যা বঙ্গবাণীতে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসটিও প্রকাশিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্র হাওড়া শহর ছেড়ে সামতাবেড়েয় চলে গেলে ১৩৩৩ সালের বৈশাখ সংখ্যায় বঙ্গবাণীতে পথের দাবীর শেষাংশ প্রকাশিত হয়।

এসব ছাড়া এই সময় ভারতীতে প্রকাশিত একটি বারোয়ারি উপন্যাসের একাংশ এবং কাশী হইতে প্রকাশিত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিত প্রবাস-জ্যোতি পত্রিকায় 'বাড়ীর কর্তা' নামে একটি গল্পের প্রথমাংশও লিখেছিলেন। প্রবাস-জ্যোতি পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ গল্পের অংশটি পরে 'রসচক্র' নামক একটি বারোয়ারি উপন্যাসের সূচনাভাগ হয়ে ১৩৩৭ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা উত্তরায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ভারতী পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের 'বিলাসী' গল্প এবং বারোয়ারি উপন্যাসটির একাংশ প্রকাশিত হওয়া সম্বন্ধে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

"১৩২২ সালে বন্ধুবর মণিলাল (গঙ্গোপাধ্যায়) এবং আমি 'ভারতী'র সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করি। ২০ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটে (এখন কৈলাস বসু স্ট্রীট) ছিল ভারতীর কার্যালয় এবং নীচের তলায় কান্তিক প্রেস। তখন শরৎচন্দ্র প্রায় আসতেন ভারতী অফিসে এবং সকলের সঙ্গে যে ব্যবহার করতেন, তা যেমন অমায়িক, তেমনি স্নেহশীল। সকলের প্রীতি-শ্রদ্ধা তিনি নিজের স্বভাবের গুণে পরিপূর্ণ ভোগ করতেন। এই সময়ে আমি তাঁকে বলেছিলুম—আমি ভারতী সম্পাদনা করছি আজ। এই ভারতীতে তোমার প্রথম লেখা 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয়ে তোমাকে বাঙ্গলার সুধীসমাজে পরিচিত করিয়েছিল। তোমার উপর ভারতীর যেমন দাবী, আমারো তেমনি দাবী। ভারতীর জন্য একটা গল্প চাই, তার জন্য যত টাকা চাও, দেবো।

হেসে তিনি বলেছিলেন—না, না, তোমার কাছ থেকে তোমাদের ভারতীর জন্য টাকা নেবো কি! দেবো আমি গল্প। এবং এ কথা তিনি রেখেছিলেন। দিন পনেরো-কুড়ি পরে তিনি 'বিলাসী' গল্পটি লিখে আমার হাতে দেন। সে-গল্প প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা ভারতীতে।

তাঁর স্নেহের আর এক পরিচয়ের কথা বলি। ভারতী সম্পাদনাকালে বারো জন লেখককে দিয়ে লিখিয়ে ভারতীতে আমরা বার করেছিলুম

বারোয়ারি উপন্যাস। বারো মাসে বারোটি পরিচ্ছেদ লিখেছিলেন বারো জন লেখক—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নরেন্দ্র দেব, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, আমি এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর লেখা পরিচ্ছেদটি তিনি এমন ঘোরালো করে তুলেছিলেন, তাতে এত নূতন জটিলতা যে, সে জটিল গ্রন্থি খুলতে গেলে উপন্যাস শেষ করতে আরো পরিচ্ছেদের প্রয়োজন ছিল! তাঁকে ধরে সে পরিচ্ছেদ নূতন করে লিখিয়ে নিয়েছিলুম। সাহিত্য এবং আমাদের উপর স্নেহ খুব বেশী ছিল বলেই তিনি এ কাজ করেছিলেন খুশি মনে এবং এ লেখার জন্য কোন লেখকই ভারতী থেকে অর্থ গ্রহণ করেন নি।"

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত ১৩২৬ সালের পূজা-বার্ষিকী আগমনীতে শরৎচন্দ্রের 'ছবি' গল্পটি প্রকাশিত হওয়া সম্বন্ধেও সৌরীনবাবু তাঁর 'শরৎচন্দ্রের জীবন-রহস্য' গ্রন্থে লিখেছেন—

"১৯১৯ কিম্বা ১৯২০ সালের কথা:

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের মালিক সতীশচন্দ্র একখানি পূজা-বার্ষিকী প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। সুরেশ সমাজপতির উপর ভার দিয়েছিলেন নানা লেখকের কাছ থেকে গল্প সংগ্রহ করার। বার্ষিকীর নাম 'আগমনী'— সুরেশ সমাজপতির সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

সে-বার্ষিকীতে শরৎচন্দ্র একটি গল্প লিখে দিয়েছিলেন। সে-গল্প লেখার সম্বন্ধে তিনি এই কাহিনী বলেছিলেন—সমাজপতি মশাই এসে ধরেচেন গল্প দিতে হবে পূজা-বার্ষিকীর জন্য! তাঁকে ভারী ভয় করি। রাজী হলুম এবং গল্প আসে না, তবু লিখছি নাকের জলে চোখের জলে হয়ে।

—ভয় কেন?

বললেন—তাঁর 'সাহিত্য' পত্রের 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনায়' সম্পাদক মন্তব্য করেছিলেন—শরৎ চট্টোপাধ্যায় লেখকের আবির্ভাব হয়েছে। এঁর মনে মায়া মমতা বড় বেশী। তার প্রমাণ-স্বরূপ তিনি লিখেছিলেন—কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে এই শরৎচন্দ্র একটা নেড়ি কুত্তাকে খাওয়াবার জন্য কাটলেট কিনে তাকে খাওয়াচ্ছেন। অথচ পাশে এক গরীব ভিখারী একটা পয়সা চেয়ে কাত রাচ্ছিল, তার দিকে এই দয়ালু শরৎচন্দ্রের নজর পড়েনি! এ-কাহিনীর

উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—এমনি কটু কথা যদি আবার আমার সম্বন্ধে লেখেন, তাই তাঁকে 'না' বলতে পারি নি। তাঁকে তুষ্ট করতে এত কষ্ট করেও গল্পটি লিখে দিয়েছি।"

শরৎচন্দ্র 'পল্লীশ্রী' মাসিক পত্রিকার জন্য তার 'মহেশ' গল্পটি লিখে দিলে ঐ পত্রিকার ১৩২৯ সালের আশ্বিন সংখ্যায় গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। মহেশ গল্পটি রচনার ও প্রথম প্রকাশের ইতিহাস সম্বন্ধে পল্লীশ্রী পত্রিকার সম্পাদক, শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের বন্ধু অক্ষয়কুমার সরকার আমাকে যা বলেছিলেন, তা হচ্ছে এই :—

অসহযোগ আন্দোলন তখন সুরু হয়েছে। সেই সময় দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল তাঁর নিজের জেলায় মেদিনীপুরে, ইউনিয়ন বোর্ড সরকারী প্রতিষ্ঠান বলে, ইউনিয়ন বোর্ড প্রথা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। দেশপ্রাণ শাসমলের এই দুঃসাহসিক ও সাফল্যজনক কাজে বাঙ্গলার তৎকালীন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েছিল। অন্যান্য জেলাতেও মেদিনীপুরের এই প্রভাব যাতে না যায়, সেজন্য বর্ধমান বিভাগের তৎকালীন কমিশনার সাহেব সরকারী মত প্রচারের জন্য 'পল্লীশ্রী' নামে পল্লী-সংক্রান্ত একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা করেন এবং স্থির করেন যে, তাঁর অধীনস্থ জেলা সমূহের সমস্ত ইউনিয়ন বোর্ডগুলিতে ঐ পত্রিকা বিতরণ করবেন।

বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের হেড কোয়ার্টার হুগলী জেলার চুঁচুড়া শহরে। এই চুঁচুড়া শহরেই হুগলী গবর্ণমেণ্ট কলেজ। অক্ষয়বাবু সেই সময় হুগলী গবর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। অক্ষয়বাবু সাহিত্য-চর্চা করেন, কমিশনার সাহেব কিভাবে এই কথা জেনে হুগলী কলেজের অধ্যক্ষকে ব'লে অক্ষয়বাবুকে তাঁর কাগজের সম্পাদক ঠিক করেন। অক্ষয়বাবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিরুপায় হয়ে 'পল্লীশ্রী' কাগজের সম্পাদক হন।

শরৎচন্দ্র ছিলেন বাজে শিবপুরে অক্ষয়বাবুর প্রতিবেশী ও বন্ধু। তাই অক্ষয়বাবু পল্লীশ্রী পত্রিকার সম্পাদক হয়ে, তাঁর কাগজে পল্লীচিত্র নিয়ে একটি গল্প লিখে দেবার জন্য শরৎচন্দ্রকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন। শরৎচন্দ্র অক্ষয়বাবুর অনুরোধে, তখন এই 'মহেশ' গল্পটি তাঁর পল্লীশ্রী কাগজের জন্য লিখে দিয়েছিলেন।

অক্ষয়বাবু আমাকে বলেছিলেন—"আমি মহেশ গল্পটি নিয়ে আমার কাগজে

ছাপাতে দিলাম বটে, কিন্তু ছাপাতে দিয়ে আমার কেবলি মনে হতে লাগল, এমন ভাল গল্পটা এই রকম একটা ছোট কাগজেই শুধু ছাপা হবে?

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মশায়ের পুত্রদের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। তখন আশুতোষবাবুর পুত্ররা তাঁদের বাড়ী থেকে 'বঙ্গবাণী' কাগজ বা'র করতেন। ঐ বঙ্গবাণীতেও যাতে একই সঙ্গে এই গল্পটি প্রকাশিত হয়, আমি তার ব্যবস্থা করি। এইরূপ ঠিক করে আমি গল্পটি নকল করে নিয়ে মূল মহেশ গল্পটি হাতে নিয়ে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে স্যার আশুতোষের জ্যেষ্ঠপুত্র রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে যাই। ইউনিভার্সিটিতে সেদিন সিণ্ডিকেটের মিটিং ছিল, সেই মিটিং থেকে রমাপ্রসাদবাবুকে ডেকে তাঁর হাতে মহেশ গল্পটি দিয়ে এসেছিলাম। তাই মহেশ গল্পটি ঐ ১৩২৯ সালের আশ্বিন সংখ্যা বঙ্গবাণীতেও তখন প্রকাশিত হয়েছিল।"

এই বঙ্গবাণীতেই ঐ বছরের (১৩২৯ সালের) ফাল্গুন মাস থেকে শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হ'তে সুরু হয়েছিল। বঙ্গবাণীতে পথের দাবী বেরোনোর এবং পথের দাবী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার একটা বিস্তৃত ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস হচ্ছে এই :—

রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অর্থে ও পরিচালনায় বঙ্গবাণী মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক হন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও দীনেশচন্দ্র সেন। পরে দীনেশবাবু নিজের অসুবিধাবশতঃ সম্পাদনা ছেড়ে দিয়েছিলেন। বঙ্গবাণী কাগজের কর্মসচিব ছিলেন, আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

বঙ্গবাণীতে শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পটি প্রকাশিত হবার পর ঐ বছর মাঘ মাসে তাঁর 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পটিও বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত হয়। সেই সময়েই রমাপ্রসাদবাবু একদিন কুমুদবাবুকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবাণীর জন্য শরৎচন্দ্রের আরও কিছু লেখা পাওয়ার আশায়, শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের বাসায় যান। রমাপ্রসাদবাবু যখন যান, শরৎচন্দ্র তখন বৈঠকখানায় বসে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন।

রমাপ্রসাদবাবু গিয়ে শরৎচন্দ্রের কাছে বঙ্গবাণীর জন্য কিছু লেখা চাইলে, শরৎচন্দ্র বললেন—লেখা নেই। এক ভারতবর্ষের লেখাই নিয়মিত লিখতে পারছি না।

শরৎচন্দ্র এই কথা বললেও রমাপ্রসাদবাবু শরৎচন্দ্রের লেখার টেবিলের কাছে গিয়ে, শরৎচন্দ্রের কোন লেখা আছে কিনা দেখতে লাগলেন। এমন সময় শরৎচন্দ্রের একটি খাতায় অসমাপ্ত খানিকটা লেখা রমাপ্রসাদবাবুর চোখে পড়ল। তখন তিনি শরৎচন্দ্রকে বললেন—লেখা নেই বলছেন, এই তো একটা খাতায় খানিকটা লেখা রয়েছে।

রমাপ্রসাদবাবুর কথার উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন—ও লেখা তোমরা ছাপতে পারবে না। শুধু তোমরা কেন, কেউই ও লেখা ছাপ্‌তে সাহস করবে না। তাই, কেউ ছাপবে না ভেবেই লিখতে লিখতে ফেলে রেখেছি। অনেকদিন আর লিখি নি।

রমাপ্রসাদবাবু বললেন—আপনার যে লেখা কেউ ছাপতে সাহস করবে না, সেই লেখা আমি ছাপব। আমাকে দিন।

—ছাপবে? ছাপলে হয়ত জেলও হতে পারে।

—তা হয় হবে। দিন আমাকে, আমি বঙ্গবাণীতে ছাপি।

—আচ্ছা, তাহলে তোমাকেই দোব। ওটা একটা বড় উপন্যাস হবে। নাম দিয়েছি 'পথের দাবী'। তোমাদের কাগজে অনেকদিন ধরে বেরোবে।

এরপর রমাপ্রসাদবাবু একদিন শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে বঙ্গবাণীতে প্রকাশের জন্য পথের দাবীর প্রথম কিছুটা কপি নিয়ে এলেন। এইভাবে পথের দাবী বঙ্গবাণীতে প্রথম ছাপা সুরু হ'ল ১৩২৯ সালের ফাল্গুন মাসে।

পথের দাবী দীর্ঘদিন ধরে বঙ্গবাণীতে বেরিয়েছিল। তখন শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে মাসে মাসে পথের দাবীর কপি আনবার জন্য সাধারণতঃ বঙ্গবাণীর কর্মসচিব কুমুদবাবুই বাজে শিবপুরে শরৎচন্দ্রের বাসায় যেতেন। কুমুদবাবু একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, বঙ্গবাণীর এক এক সংখ্যার জন্য শরৎচন্দ্রের লেখা পেতে মাসের শেষদিকে তাঁকে অন্ততঃ দশ দিন করে শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে ঘুরতে হ'ত। কুমুদবাবু শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে গিয়ে দেখতেন, ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধর সেনও গিয়ে শরৎচন্দ্রের লেখার জন্য ধর্ণা দিয়ে বসে আছেন। কুমুদবাবুকে ঐ সময় এক একদিন লেখা পাওয়ার আশায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্তও শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে বসে থাকতে হ'ত।

বঙ্গবাণীর জন্য পথের দাবীর কপি আনতে শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে কেবল কুমুদবাবুই যে যেতেন তা নয়, রমাপ্রসাদবাবু নিজে এবং কখন কখন তাঁর

'পথের দাবী' রচনা কালে

মধ্যম ভ্রাতা শ্যামাপ্রসাদবাবু ও তাঁর তৃতীয় ভ্রাতা উমাপ্রসাদবাবুও যেতেন। উমাপ্রসাদবাবুকে শরৎচন্দ্র খুবই স্নেহ করতেন। এঁরা গিয়েও অনেক সময় লেখা না পেয়ে শুধু হাতেই ফিরে আসতেন।

বঙ্গবাণীতে যখন পথের দাবী ছাপা হ'ত, সেই সময় শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে রমাপ্রসাদবাবুদের বাড়ীতেও আসতেন।

পথের দাবী কিছুদিন বঙ্গবাণীতে বেরোবার পর এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স তাঁদের দোকান থেকে পথের দাবী পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন এবং এজন্য তাঁরা তখন শরৎচন্দ্রকে এক হাজার টাকা অগ্রিমও দিয়েছিলেন।

কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী বলেন—বঙ্গবাণীতে তখন পথের দাবী ছাপা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সেই সময় শরৎচন্দ্র একদিন আমাকে বললেন, বঙ্গবাণীতে পথের দাবী যা ছাপা হয়েছে, তার একটা ক'রে ফাইল কপি এম, সি, সরকার এণ্ড সন্সকে দিও। তাহলে বইটা ছাপতে তাঁদের সুবিধা হবে।

কুমুদবাবু, এম, সি, সরকার এণ্ড সন্সকে ঐ ফাইল কপি দেবার কিছুদিন পরে, রমাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে একদিন শরৎচন্দ্রের শিবপুরের বাড়ীতে যান। (শরৎচন্দ্র ঐ সময় তাঁর বাজে শিবপুরের বাসা ছেড়ে শিবপুর ট্রাম ডিপোর কাছে একটা বাড়ীতে থাকতেন।) কুমুদবাবু বলেন—সেদিন আমরা শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে গিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় একজন উকিল সঙ্গে নিয়ে এম, সি, সরকার এণ্ড সন্সের একজন মালিক (সুধীরবাবুই গিয়েছিলেন কিনা ঠিক মনে পড়ছে না) পথের দাবীর সেই ফাইল হাতে শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে যান। গিয়ে শরৎচন্দ্রকে বলেন—দেখুন শরৎবাবু, আমাদের এই উকিলবাবু বলছেন, বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত পথের দাবী হুবহু ছাপলে আমাদের একটু বিপদে পড়তে হবে। তাই ইনি এই ফাইল কপিতে কয়েকটা জায়গায় কালি দিয়ে দাগ দিয়েছেন, ঐ জায়গাগুলো যদি একটু একটু করে বদলে দেন তো ভাল হয়।

এই কথা শুনেই শরৎচন্দ্র বলে উঠলেন—আমার লেখার একটা বর্ণও কোথাও বদলাব না। ইচ্ছা যায় তোমরা ছাপ, না হয় তোমাদের ছেপে কাজ নেই।

—তাহলে আমাদের পক্ষে ছাপা সম্ভব হবে না।

—বেশ তোমাদের ছাপতে হবে না। তোমাদের দেওয়া টাকা আমি

দিয়ে দোব। (শরৎচন্দ্র পরে তাঁর 'ছেলেবেলার গল্প' বইটি এঁদের দিয়ে এঁদের টাকা শোধ করেছিলেন।)

এঁরা চলে গেলে রমাপ্রসাদবাবু শরৎচন্দ্রকে বললেন—কেউ যদি না ছাপে তো আমাকে দিন, আমিই বইটা ছাপি।

শরৎচন্দ্র বললেন—বেশ, তোমরাই বইটাও প্রকাশ কর।

এইভাবে রমাপ্রসাদবাবু শরৎচন্দ্রের পথের দাবী পুস্তকাকারে প্রকাশ করবার অনুমতি পেলেন।

বঙ্গবাণীতে পথের দাবী ছাপা শেষ হওয়ার কয়েক মাস আগে থেকেই, পথের দাবী বই আকারে প্রকাশ করবার জন্য কপি প্রেসে দেওয়া হয়েছিল। তাই বঙ্গবাণীতে পথের দাবী ছাপা শেষ হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই বইও প্রকাশিত হয়েছিল (ভাদ্র ১৩৩৩)। পথের দাবীর প্রকাশক হিসাবে নাম ছিল রমাপ্রসাদবাবুর তৃতীয় ভ্রাতা উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের। শরৎচন্দ্র ঠিক ঐ সময়টায় হাওড়া শহর ছেড়ে সামতাবেড়েয় তাঁর নিজের বাড়ীতে উঠে গিয়েছিলেন।

সেই সময় কলকাতা পুলিশ কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর ছিলেন, স্যার তারকনাথ সাধু। তারকবাবু নিজে একজন সাহিত্যিক মানুষ ছিলেন। তাই শরৎচন্দ্রের উপর তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। তাছাড়া তারকবাবু নিজে একজন আইন ব্যবসায়ী ছিলেন ব'লে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপর তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। সেই হিসাবে তিনি আশুতোষবাবুর পুত্রদেরও সম্মানের চোখে দেখতেন।

এই উভয় কারণে, পথের দাবী বঙ্গবাণীতে বেরোবার সময় গবর্ণমেন্ট লেখাটির উপরে দৃষ্টিপাত করেছে জানতে পেরেই, তারকবাবু রমাপ্রসাদবাবুর কাছে নিজে গিয়ে বলে আসেন—আপনাদের কাগজের উপর গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি পড়েছে।

গবর্ণমেন্ট এই সময় বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত পথের দাবীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় কিনা, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্য অ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল স্যার বি, এল, মিত্রকে নির্দেশ দেয়।

বি, এল, মিত্র অনুসন্ধান করে গবর্ণমেন্টকে জানান, পথের দাবীর লেখক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার যোগ্য।

ইতিমধ্যে পথের দাবী বই আকারে প্রকাশিত হয়ে গেল। পথের দাবী ছাপা হয়েছিল, বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী এস, কে, লাহিড়ী বা শরৎকুমার লাহিড়ীর 'কটন প্রেসে'। তবে কটন প্রেসের মুদ্রাকর হিসাবে নাম ছিল সত্যকিঙ্কর বিশ্বাসের।

বই বেরোলে গবর্ণমেণ্ট পথের দাবীর লেখক, প্রকাশক এবং মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক অভিযোগ আনবার জন্য পাবলিক প্রসিকিউটর তারকনাথ সাধুকে নির্দেশ দিল।

তারকবাবু গবর্ণমেণ্টের নির্দেশ পেয়ে তখন নিজে বুদ্ধি করে, গবর্ণমেণ্টকে জানিয়েছিলেন—পথের দাবীর লেখক শরৎচন্দ্র বর্তমান বাঙলার সবচেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। আর প্রকাশক উমাপ্রসাদবাবুও বাঙলার একজন শ্রেষ্ঠ মণীষী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। এঁদের শাস্তি দিলে গবর্ণমেণ্টের হিতের চেয়ে অহিতই বেশী হবে। তাই আমার মনে হয়, লেখক, প্রকাশক ও মুদ্রাকরকে কিছু না বলে, শুধু বইটি বাজেয়াপ্ত করলেই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সুবিবেচনার কাজ হবে।

তারকবাবুর এই যুক্তিপূর্ণ রিপোর্টটি পেয়ে গবর্ণমেণ্ট তখন একটু থমকে গেল এবং শেষে তারকবাবুর নির্দেশকে যুক্তিযুক্ত বলেই বিবেচনা করল। গবর্ণমেণ্ট পথের দাবী বইকে বাজেয়াপ্ত করে লেখক, প্রকাশক ও মুদ্রাকরকে অব্যাহতি দিল।

গবর্ণমেণ্ট পথের দাবী বই বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই, পুলিশ সমস্ত বই আটক করবার জন্য প্রকাশকের ঠিকানায় উমাপ্রসাদবাবুদের বাড়ীতে এল।

বই বাজেয়াপ্ত হবে জেনেই উমাপ্রসাদবাবু সমস্ত বই আগে থেকেই কলকাতায় ও কলকাতার বাইরে দোকানে দোকানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

যখন পুলিশ বই আটক করতে এল, তখন প্রকাশকের বাড়ীতে একটিও বই ছিল না, এমন কি প্রকাশকও তখন বাড়ীতে ছিলেন না।

পুলিশ রমাপ্রসাদবাবুকে বললে—আপনাদের বাড়ীতে আর কি সার্চ করব, বই যা আছে অনুগ্রহ করে দিয়ে দিন, নিয়ে চলে যাই।

রমাপ্রসাদবাবু বললেন—আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আমি বলছি—একটিও বই বাড়ীতে নেই।

—কোথায় আছে বলুন, আমরা সেখান থেকেই নিয়ে আসছি।

—তা জানি না। মনে হয় সব বই-ই বিক্রি হয়ে গেছে।

—তা কি করে সম্ভব! এই মাত্র বই বেরোল, এর মধ্যেই সমস্ত বই বিক্রি হয়ে গেছে? যাই হোক, একটা বই অন্ততঃ আমাদের জোগাড় করে দিন, তা না হলে আমরা গবর্ণমেণ্টকে কি জবাব দোব।

তখন উমাপ্রসাদবাবু, নিকটেই তাঁর ছোট বোনের বাড়ীতে যে একটা পথের দাবী বই ছিল, তাই আনিয়ে পুলিশকে দিলেন।

পুলিশ অগত্যা সেইটা নিয়েই চলে গেল।

বই বাজেয়াপ্ত হওয়ায় প্রকাশক উমাপ্রসাদবাবু আর বই ছাপাতে পারলেন না বটে, তবে বাঙ্গলার তৎকালীন বিপ্লবীদের উৎসাহে ও উদ্যোগে অজ্ঞাত প্রেস থেকে পথের দাবী মুদ্রিত হয়ে গোপনে গোপনে খুব বিক্রি হয়েছিল।

উমাপ্রসাদবাবু একদিন এই প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন—"ঐ সময় একখানা বই ৩৲ টকার জায়গায়, বহুগুণ মূল্যে ১০০৲ টাকাতেও বিক্রি হতে দেখেছি। আবার বই-এর অভাবে হাতে লেখা সম্পূর্ণ বই-এর কপিও আমি লোকের হাতে হাতে ঘুরতে দেখেছি। পথের দাবী পড়ার এবং একটা পথের দাবী সংগ্রহ করার লোকের তখন কি আগ্রহ!"

পথের দাবী বাজেয়াপ্ত হওয়ার কিছুদিন পরে সেই সময়কার কলকাতার পুলিশ কমিশনার কলসন্ সাহেব শরৎচন্দ্রকে একদিন বলেছিলেন—শরৎবাবু, আপনি পথের দাবী লিখে আমাদের কি ক্ষতি করেছেন জানেন? আমরা যেখানেই বিপ্লবীদের ধরছি, সেখানেই দেখছি, তাদের সকলের কাছেই একটা করে গীতা ও একটা করে পথের দাবী। আপনার পথের দাবী বিপ্লবীদের কিভাবে মাতিয়েছে একবার দেখুন!

শরৎচন্দ্র, হাওড়া শহরে অবস্থানকালে প্রধানতঃ গল্প-উপন্যাস লিখলেও, কিছু কিছু প্রবন্ধও লিখেছিলেন। তাঁর সেই প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই ছিল রাজনৈতিক প্রবন্ধ। যেমন—স্বরাজ সাধনায় নারী, আমার কথা, স্মৃতি-কথা, সত্য ও মিথ্যা, মহাত্মাজী, শিক্ষার বিরোধ।

শরৎচন্দ্র তাঁর লেখা 'স্বরাজ সাধনায় নারী' প্রবন্ধটি ১৩২৮ সালের পৌষ মাসে শিবপুর ইনস্টিটিউটে পড়েছিলেন। 'আমার কথা' প্রবন্ধটি তিনি হাওড়া

জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদত্যাগকালে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখে হাওড়ায় কংগ্রেস কর্মীদের সভায় পড়েন। 'স্মৃতি-কথা' প্রবন্ধটি তিনি দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর লিখেছিলেন। এটি তখন ১৩৩২ সালের আষাঢ় মাসে মাসিক বসুমতীর 'দেশবন্ধু স্মৃতি-সংখ্যায়' প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটি পড়ে ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেল থেকে ১২-৮-২৫ তারিখে সুভাষচন্দ্র বসু তখন শরৎচন্দ্রকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

"শ্রদ্ধাস্পদেষু,

'মাসিক বসুমতী'তে আপনার 'স্মৃতিকথা' তিনবার পড়লুম।...আপনি স্মৃতিকথার মত দেশবন্ধু সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ বা কাহিনী লিখুন।... সুদূর মান্দালয় জেলে বসে কয়েকজন বাঙ্গালী রাজবন্দী যে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সে রচনা পাঠ ও উপভোগ করবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।... আপনি আমাদের সকলের প্রণাম গ্রহণ করবেন।"

'সত্য ও মিথ্যা' প্রবন্ধটি ১৩২৮ সালের ২০শে মাঘ ও ৫ই ফাল্গুন তারিখের 'বাঙ্গলার কথা' কাগজে এবং 'মহাত্মাজী' প্রবন্ধটি ১৩২৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'নারায়ণে' প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ থেকে বেড়িয়ে এসে পূর্ব ও পশ্চিমের শিক্ষার মিলন সম্বন্ধে কলকাতায় উপরি উপরি কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র তখন রবীন্দ্রনাথের ঐ 'শিক্ষার মিলন' বক্তৃতার বিরুদ্ধে 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন এবং প্রবন্ধটি তিনি ১৩২৮ সালে গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনে পাঠ করেছিলেন।

এই প্রবন্ধগুলি ছাড়া, ১৩২৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত 'আসার আশায়', ১৩৩১ সালের ফাল্গুন সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত 'ভারতীয় উচ্চ সংগীত', ১৩৩০ সালের ২৩শে কার্তিকের 'বিজলী'তে প্রকাশিত 'দিন কয়েকের ভ্রমণ কাহিনী' প্রবন্ধ ক'টিও এই সময়কার রচনা।

শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুরে আসার একেবারে প্রথম দিকেই ১৩২৩ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ভারতবর্ষে তাঁর 'সমাজধর্মের মূল্য' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলেও, এটি তাঁর রেঙ্গুনে বসে লেখা। এই প্রবন্ধটি লিখবার সময় তিনি তখন রেঙ্গুন থেকে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে এক পত্রে লিখেছিলেন—

"একটি প্রার্থনা আছে। একখণ্ড 'মনু' একটু ভাল এডিশন (অর্থাৎ নোট্-টোট্ আছে) যদি পাঠিয়ে দেন, আমার এই 'সমাজের মূল্য' লিখতে একটু

ঘুমিয়ে হয়। বইখানা আমার নেই। অবশ্য আরও কত কি রেফারেন্স চাই, কিন্তু এই পোড়া দেশে ত মেলবার যো নেই।"

এরপর প্রবন্ধটি লেখা হয়ে গেলে, রেঙ্গুন ছাড়ার কিছুদিন আগে ২২-২-১৬ তারিখে হরিদাসবাবুকে আবার লিখেছিলেন—"জলধর দাদাকে…এই 'সমাজধর্মের মূল্য' পড়িতে দিবেন। ইহার 'ফেয়ার কপি' করা এইটুকু মাত্র পারিয়াছিলাম। বাকি লেখাটা 'ফেয়ার' করিয়া পড়ে পাঠাইতেছি।"

হাওড়ায় বাজে শিবপুরে থাকার সময়, শরৎচন্দ্র কয়েক জায়গায় সাহিত্য-সভায় সভাপতি হওয়ায় তখন কয়েকটি অভিভাষণও লিখেছিলেন। তাঁর সেই লিখিত অভিভাষণগুলি হ'ল—আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ, সাহিত্য ও নীতি সাহিত্য আর্ট ও দুর্নীতি।

১৩৩০ সালের ১৬ই আষাঢ় তারিখে শিবপুর ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভায় সভাপতির অভিভাষণে শরৎচন্দ্র তাঁর 'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ' প্রবন্ধটি পড়েছিলেন।

১৩৩১ সালের ১০ই আশ্বিন তারিখে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নদীয়া শাখার যে বার্ষিক অধিবেশন হয়, তাতে সভাপতির আসন থেকে শরৎচন্দ্র তাঁর 'সাহিত্য ও নীতি' প্রবন্ধটি পড়েন।

১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে মুন্সীগঞ্জে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সভার সভাপতি হিসাবে শরৎচন্দ্র 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' প্রবন্ধটি পড়েছিলেন।

এই সমস্ত ছাড়া শরৎচন্দ্র, ১৩২৬ সালে 'কর মজুমদার এণ্ড কোং' প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'র একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন এবং কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জীবনের ভ্রম' নামে একটি বইয়ের ছোট একটি সমালোচনাও লিখেছিলেন। সেই সমালোচনাটি ১৩২৯ সালের ভাদ্র সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র এই সময় মাসিক বসুমতীতে 'জাগরণ' নামে একটি ধারাবাহিক উপন্যাসও লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। এই উপন্যাসটি ১৩৩০ সালের কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও চৈত্র সংখ্যায়, ১৩৩১ সালের বৈশাখ, আষাঢ়, পৌষ এবং ১৩৩২ সালের বৈশাখ সংখ্যায় অনেকটা প্রকাশিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্র তাঁর এই উপন্যাসটি আর শেষ করতে পারেন নি বা শেষ করেন নি।

বাজে শিবপুরে থাকার সময় শরৎচন্দ্র ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বসুমতীর স্বত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে তাঁর গ্রন্থাবলী প্রকাশ করবার অনুমতি দেন। শরৎচন্দ্র প্রথমে স্থির করেছিলেন, কা'কেও গ্রন্থাবলী প্রকাশের অনুমতি দেবেন না। কিন্তু পরে তিনি অর্থের প্রয়োজনে তাঁর এই মত পরিবর্তন করেছিলেন। এই গ্রন্থাবলী প্রকাশের ব্যাপার নিয়ে সেই সময় তিনি হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে এক পত্রে জানিয়েছিলেন—

"সতীশবাবু আজ সকালেও আসিয়াছিলেন। মত দিই নাই। কিন্তু তিনি তাঁর পিতার মৃত্যুর পরে এরূপ 'ইন্‌ভলভ্‌ড' হইয়া পড়িয়াছেন যে শুনিলে ক্লেশ বোধ হয়। আপনার আশ্রয়ে আমার এক প্রকার করিয়া চলিয়া যায় বটে, কিন্তু আজ এই পর্যন্তই ভাবিতে পারিয়াছি।

তিনি বলেন ত এই ৩ বৎসরে ২৫।৩০ হাজার টাকা হয়ত দিতেও পারেন—অসম্ভব নয়, সম্ভবও নয়। অথচ সে হইলে আমার পশ্চিমে যাওয়ার একটা উপায় হয়, ইহাও সত্য। ওদিকে যাবার জন্য মনটা চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে।

আগামী বৃহস্পতিবারে কিম্বা শুক্রবারে যাহোক একটা 'ফাইন্যাল' করিয়া ফেলিব। এই ক্রমাগত লেখার উপর খাওয়া পরার নির্ভর করাটা ভাল নয়—আর ইহাও মনে করি এরা যে টাকা দেবে বলে—সে ত বর্তমান অবস্থায় সারা জীবনেও পাওয়া যায় না—অবশ্য জীবনটার মেয়াদ যদি আরও ১০ বছর ধরা যায়।

আপনার দোকানের হয়ত কিছু ক্ষতি হইতে পারে, আবার নাও হইতে পারে। কারণ 'চীপ্‌ এডিশন' তারাই কেনে, যারা কোন কালে বই কেনে না।"

যাই হোক্‌, শরৎচন্দ্র সতীশবাবুকে গ্রন্থাবলী প্রকাশের অনুমতি দিলে সতীশবাবু তাঁদের বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে ঐ বছরই ২০শে অক্টোবর তারিখে দত্তা, পরিণীতা, শ্রীকান্ত (১ম পর্ব), অরক্ষণীয়া, একাদশী বৈরাগী, মেজদিদি, মামলার ফল একত্র করে 'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী' ১ম খণ্ড প্রকাশ করেন। এরপর বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে ২০-১-২০ তারিখে শ্রীকান্ত ২য় পর্ব, দেবদাস, দর্পচূর্ণ, পল্লীসমাজ ও বড়দিদি নিয়ে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ২য় খণ্ড, ১৮-৬-২০ তারিখে স্বামী, বৈকুণ্ঠের উইল, পণ্ডিতমশাই, আঁধারে আলো, চন্দ্রনাথ ও নিষ্কৃতি নিয়ে গ্রন্থাবলীর ৩য় খণ্ড, ২৫-৯-২০ তারিখে

চরিত্রহীন, ছবি ও বিলাসী নিয়ে গ্রন্থাবলীর ৪র্থ খণ্ড এবং ২১-২-২৩ তারিখে গৃহদাহ, বামুনের মেয়ে ও মহেশ নিয়ে গ্রন্থাবলীর ৫ম খণ্ড প্রকাশিত হয়।

পরে শরৎচন্দ্র হাওড়া শহর ছেড়ে সামতাবেড়েয় চলে গেলে ২৫-৯-৩৪ তারিখে শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব, নববিধান, ষোড়শী, হরিলক্ষী ও অভাগীর স্বর্গ নিয়ে গ্রন্থাবলীর ৬ষ্ঠ খণ্ড এবং ১৭-৯-৩৫ তারিখে শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব, দেনা-পাওনা, রমা ও নারীর মূল্য নিয়ে গ্রন্থাবলীর ৭ম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র হাওড়া শহরে ছিলেন ১০ বৎসর। হাওড়ায় আসার আগে তাঁর বড়দিদি (১৯১৩) যমুনা অফিস থেকে, বিরাজ বৌ (১৯১৪), বিন্দুর ছেলে (১৯১৪), মেজদিদি (১৯১৫) ও পল্লীসমাজ (১৫ই জানুয়ারী ১৯১৬) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স থেকে এবং পরিণীতা (১৯১৪), পণ্ডিত মশাই (১৯১৪) ও চন্দ্রনাথ (১২ই মার্চ ১৯১৬) এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র হাওড়া শহর ত্যাগ করার পরে যে ১২ বৎসর জীবিত ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে তিনি শেষপ্রশ্ন, শ্রীকান্ত (৪র্থ পর্ব) ও বিপ্রদাস এই ক'টি উপন্যাস এবং 'অনুরাধা, সতী ও পরেশ' গল্পগ্রন্থের অনুরাধা ও সতী গল্প দু'টি এবং 'ছেলেবেলার গল্প' গ্রন্থের ক'টি গল্প লিখেছিলেন। অবশ্য ঐ সময় তিনি তাঁর ক'টি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন এবং অসমাপ্ত 'শেষের পরিচয়' ছাড়া কয়েকটি টুকরো প্রবন্ধাদিও লিখেছিলেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, হাওড়া শহরে থাকার সময়েই তিনি তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থই রচনা করেছিলেন। তাই এই সময়টাকে তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির সুবর্ণ-যুগ বলা যেতে পারে।

সাহিত্যে খ্যাতি ও সম্মান

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্রকে 'জগত্তারিণী স্বুবর্ণ পদক' দিয়ে সম্মানিত করেন। শরৎচন্দ্রের আগে মাত্র রবীন্দ্রনাথই এই পদক লাভ করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র এফ, এ, পর্যন্ত পড়লেও, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে, এই সময় একবার বি, এ, পরীক্ষায় বাঙ্গলার প্রশ্নপত্র-রচয়িতাও নিযুক্ত করেছিলেন।

দেশবন্ধুর স্বরাজ্য পার্টি গঠিত হওয়ার পরে, বরিশালে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির যে বিশেষ অধিবেশন হয়েছিল, তাতে দেশবন্ধুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রও গিয়েছিলেন। কংগ্রেস অধিবেশনের পর বরিশালের সাহিত্য পরিষদ শাখা শরৎচন্দ্রকে এক সভায় সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। সেই সভায় দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

এই সময়েই শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের পাঠক-পাঠিকারাও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে তাঁকে 'অপরাজেয় কথাশিল্পী', 'সাহিত্য-সম্রাট' বিশেষণেও বিভূষিত করেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর লেখার কোন্ গুণে এমন সম্মানলাভ করতে সক্ষম হলেন? তাঁর সৃষ্ট যে সাহিত্যের জন্য তাঁর এতখানি সাহিত্যিক খ্যাতি ও সম্মান, তাঁর সেই সাহিত্য নিয়ে এখন কিছু আলোচনা করা যাক্ :—

শরৎচন্দ্র তাঁর রচিত গল্প-উপন্যাস সমূহে সুখে-দুঃখে ও আনন্দ-বেদনায় ভরা বাঙ্গালীর জীবনচিত্র এঁকেছেন। এমনি এক সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে সুগভীর দরদ ও সহানুভূতির সহিত তিনি চিত্রগুলি এঁকেছেন, যার ফলে সেগুলি খুবই বাস্তব ও স্বাভাবিক হয়ে ফুটে উঠেছে। একজন অভিজ্ঞ মনস্তাত্ত্বিকের ন্যায় মানব হৃদয়ের গভীরতম রহস্য ও মানসিক দ্বন্দ্বের প্রকাশও তিনি তাঁর সাহিত্যের মধ্যে দেখিয়েছেন। পাঠকের চেনা ও জানা এবং মনের কথাকেই তিনি এমনি করে বাস্তবরূপ দিতে পেরেছেন বলেই, তাঁর সাহিত্য এতখানি হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

শরৎচন্দ্র মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের হাসিকান্নার কথা বলতে গিয়ে, যে

সমাজ জীবনের সঙ্গে এই 'ব্যক্তি' ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, সেই সমাজের কথাও তিনি তাঁর সাহিত্যের মধ্যে তুলেছেন। সমাজের মধ্যে যে সব মিথ্যা, অনাচার ও নিষ্ঠুরতা এবং বহুদিনের পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের স্তূপ তিনি দেখেছেন, তাদের কঠোর সমালোচনা করতে বা কশাঘাত করতে ছাড়েন নি। তবে তাঁর সাহিত্যে সমাজের ত্রুটি এবং সমস্যার কথা থাকলেও, কোথাও তিনি সমাধানের কোন পথ দেখান্ নি। সমাধান সংস্কারকের কাজ বলে, তিনি ওপথে না গিয়ে শুধু সমস্যারই উল্লেখ করেছেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে সমাজের প্রচলিত রীতি ও নীতির বিরুদ্ধে অনেক কথা বললেও তিনি সমাজকে কিন্তু অস্বীকার করেন নি। সমাজকে তিনি স্বীকার করেছেন। তবে সমাজের কুসংস্কার ও ফাঁকিকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। বিশেষ করে নরনারীর উভয়ের মিলিত ত্রুটিতে সমাজ যেখানে পুরুষকে স্থান দিয়েছে, কিন্তু নারীকে দেয়নি, বরং তাকে লাঞ্ছিতা করেছে, সেইখানেই তিনি এই লাঞ্ছিতা নারীদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন।

সমাজচ্যুতা, পতিতা ও বিধবার প্রেম বা ভালবাসা সমাজবিরোধী এবং সমাজের চোখে অবৈধ। এই প্রকারের প্রেম সমাজের কাছে দোষনীয় হলেও শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন যে, নারী সে পতিতা বা বিধবা হতে পারে, কিন্তু তার নারী-হৃদয়ে যে স্বাভাবিক দুর্বার প্রেমের আকাঙ্ক্ষা জাগে, সে তো কখন মিথ্যা নয়। শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে তাই এই সত্যকেই স্বীকার করেছেন। উপন্যাস যখন সমাজের ছবি, তখন সমাজের এই স্বাভাবিক সত্যকে উপন্যাসে স্থান দিতে আপত্তিই বা থাকবে কেন?

শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প উপন্যাসের অনেকগুলি নারীচরিত্রে সমাজে অপ্রচলিত এই প্রকারের অবৈধ প্রণয়ের প্রকাশ দেখালেও, তিনি সামাজিক বৈধ প্রণয়ের চিত্রও বহু এঁকেছেন। বহু পতিভক্তি-পরায়ণা সতী নারীর চিত্র, তাদের দাম্পত্য-জীবনের হাসি-কান্না, মান-অভিমান প্রভৃতির কথাও তিনি সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন।

শরৎচন্দ্র নরনারীর কি বৈধ আর কি অবৈধ উভয় প্রকারের প্রণয়-চিত্রগুলিকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে প্রণয়িনীদের দিয়ে তাদের প্রেমাস্পদদের খাওয়ানোর চিত্র এঁকেছেন। মেয়েরা যে সাধারণতঃ তাদের প্রেমাস্পদদের নিজের হাতে যত্ন করে খাওয়াতে ভালবাসে, এ কৌশল

বা টেকনিকটা শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প-উপন্যাসে প্রণয়-চিত্র ফোটানোর ব্যাপারে অনেক জায়গায় প্রয়োগ করেছেন।

শরৎচন্দ্র প্রেমের চিত্র ফোটাবার জন্য এই খাওয়ানো ছাড়া আর একটি কৌশলও অবলম্বন করেছেন। সেটি হ'ল প্রণয়িনীদের দিয়ে তাদের প্রেমাস্পদের অসুখে সেবা করানো।

নারীর প্রণয়চিত্র ছাড়া নারী-হৃদয়ের স্নেহবাৎসল্যের চিত্রও শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। তবে এই ব্যাপারে শরৎ-সাহিত্যে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করার এই যে, নারী-হৃদয়ের এই স্নেহবাৎসল্য প্রায়ই তার নিজের স্নেহাস্পদ বা সন্তান অপেক্ষা কোন না কোন আত্মীয়সন্তানের উপরই বেশী করে গিয়ে পড়েছে। প্রত্যেক মা-ই তার সন্তানকে স্নেহ-যত্ন করে, এর মধ্যে এমন কিছু নতুনত্ব নেই। তাই শরৎচন্দ্র মায়ের অপত্যস্নেহের চিত্র তেমন বেশী করে দেখাতে চেষ্টা করেন নি। বরং মানুষের যে ধারণা, কোন নারী তার সপত্নী-পুত্রকন্যাদের স্নেহ করে না, কোন বৌদি তার ছোট বৈমাত্রেয় দেবরকে ভাল চোখে দেখে না, কোন কাকী তার বড় জায়ের ছেলেকে ভালবাসে না, মানুষের এই ভুল ধারণাকেই শরৎচন্দ্র ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। তিনি মানুষের এই অবিশ্বাসকে বিশ্বাসে পরিণত করিয়েছেন।

'বড়দিদি'তে তাই তিনি দেখিয়েছেন—সুরেন্দ্রর বিমাতা তার নিজের সন্তানের প্রতি উদাসীন হলেও, সুরেন্দ্রর প্রতি তার হেফাজতের সীমা ছিল না।

দেবদাসে পার্বতী তার বড় বড় সপত্নীপুত্র ও কন্যাদের কি সুন্দর আদর যত্ন করছে ও কেমন ভাবে তাদের আপন করে নিয়েছে। পার্বতী তার নিজের গয়নাগুলো পর্যন্তও তার সপত্নীকন্যা যশোদাকে পরিয়ে দিল। যশোদা সৎমার স্নেহে অভিভূত হয়ে তার দাদা মহেন্দ্রকে তাই জিজ্ঞাসা করেছিল—'আচ্ছা দাদা, সৎমায়ে এত আদর যত্ন করতে পারে?'

হেমাঙ্গিনী তার বড় জা কাদম্বিনীর বৈমাত্রেয় ভাই কেষ্টকে খুব যত্ন করত। রামের সুমতিতে নারায়ণী তার পুত্র গোবিন্দ অপেক্ষা বৈমাত্রেয় দেবর রামকে কম স্নেহ করত না। আর বিন্দু তো তার বড় জায়ের ছেলেকে আপন ছেলেই করে নিয়েছিল।

শরৎ-সাহিত্যে আরও কয়েকটি বিভিন্ন প্রকৃতির নারীচরিত্র রয়েছে। এদের মধ্যে একদিকে যেমন পল্লীসমাজের জ্যাঠাইমা, গৃহদাহের পিসিমা

প্রভৃতি কয়েকটি উদার-হৃদয়া আদর্শ নারী আছে, অপরদিকে তেমনি স্বামীর স্মৃতির বৃন্দাবনী, বামুনের মেয়ের রাসমণি, মেজদিদির কাদম্বিনী প্রভৃতি কয়েকটি নীচমনা, ক্রূর প্রকৃতির নারীচরিত্রও রয়েছে। এই উভয় প্রকারের নারীচরিত্রগুলিই নিজ নিজ ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

(শরৎচন্দ্র তাঁর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসেই নারীর প্রতি অধিকতর সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে এবং নারীকে নারীত্বের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে নারী-চরিত্রগুলিকেই প্রধান বা মুখ্য করে তুলেছেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর পুরুষচরিত্রগুলি অপ্রধান বা গৌণ হয়ে পড়েছে তাই শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত পুরুষচরিত্রগুলি অপেক্ষা নারীচরিত্রগুলিই বেশীর ভাগ বলিষ্ঠ।

তবে শরৎচন্দ্র চরিত্রহীনে উপেন, পল্লীসমাজে রমেশ, গৃহদাহে মহিম, পথের দাবীতে সব্যসাচী প্রভৃতি কয়েকটি বলিষ্ঠ পুরুষচরিত্রও এঁকেছেন।

শরৎ-সাহিত্যে কতকগুলি বোহসারী, অবৈষয়িক, আপনভোলা, পরোপকারী মানুষের চিত্রও রয়েছে। নিষ্কৃতির গিরীশ, বৈকুণ্ঠের উইলের গোকুল, বিরাজ বৌ এ নীলাম্বর, বামুনের মেয়ের প্রিয়নাথ, বড়দিদির সুরেন্দ্র প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে যেমন কতকগুলি আত্মভোলা মানুষকে দেখিয়েছেন, তেমনি পল্লীসমাজের বেণী ঘোষাল, দত্তার রাসবিহারী প্রভৃতির ন্যায় অনেকগুলি স্বার্থপর, পরছিদ্রান্বেষী চরিত্রের কথাও বলেছেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প-উপন্যাসে শিশু ও কিশোরকিশোরীর চরিত্রগুলিও চমৎকারভাবে চিত্রিত করেছেন। শিশুর মনস্তত্ত্বকে তিনি নিখুঁতভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। শিশুর প্রশ্ন ও কৌতূহল, ভয় ও বিস্ময়, হাসি ও কান্নার কথা পড়তে পড়তে পাঠক পাঠিকারাও যেন অজ্ঞাতে আপন আপন শৈশবে ফিরে যান এবং এই সব শিশুদের কার্যকলাপের কথা প'ড়ে, নিজেদের শৈশব-স্মৃতি স্মরণ করে পুলকিত হন। রামের সুমতিতে রাম ও গোবিন্দ, বিন্দুর ছেলেয় অমূল্য, বিরাজ বৌ এ পুঁটি, দত্তায় পরেশ, শ্রীকান্তে ইন্দ্রনাথ, বালক শ্রীকান্ত, যতীন প্রভৃতি, দেবদাসে শিশু দেবদাস ও পার্বতী, নিষ্কৃতিতে কানাই, বিপিন, পটল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকৃতির শিশু ও কিশোর-কিশোরীর নিখুঁত চরিত্র তিনি এঁকেছেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প-উপন্যাসে অনেক ধনী, অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ও জমিদারের

কথা বললেও, মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজকে নিয়েই তাঁর সাহিত্য রচনা করেছেন। কিন্তু তাই বলে তাঁর সাহিত্যে অতি সাধারণ মানুষ বা দরিদ্র ব্যক্তিদের যে স্থান নেই তা নয়। এই অতি সাধারণ এবং দরিদ্র মানুষেও তাঁর সাহিত্যের অনেকখানি জায়গা দখল করেছে। বিরাজ বৌ, অরক্ষণীয়া, মহেশ, হরিলক্ষ্মী, অভাগীর স্বর্গ প্রভৃতি গল্প উপন্যাসগুলিতে শরৎচন্দ্র বহু দারিদ্র্যের চিত্র দেখিয়েছেন। এই অভাবী ও বঞ্চিত মানুষদের কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—"সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেল না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই—এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে নালিশ জানাতে।"

দরিদ্র, বঞ্চিত ও সাধারণ মানুষের প্রতি শরৎচন্দ্রের একটা অকৃত্রিম দরদ ছিল বলেই তিনি এমন কথা বলতে পেরেছিলেন।

এক শ্রেণীর কথা-সাহিত্যিক আছেন, যাঁরা তাঁদের গল্প উপন্যাসে কাহিনীকে মুখ্য এবং চরিত্রসৃষ্টিকে গৌণ মনে করেন। অপর শ্রেণীর সাহিত্যিকরা আবার চরিত্রসৃষ্টিকে প্রধান এবং আখ্যান ভাগকেই অপ্রধান ভাবেন। শরৎচন্দ্র ছিলেন এই শেষোক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাঁর কোনও গ্রন্থ রচনার আগে কাহিনীর কথা চিন্তা না করে, প্রথমে কেবল কয়েকটি চরিত্রের কথাই চিন্তা করতেন। তারপর সেই চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য কাহিনী যোজনা করতেন।

শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের দিকে চাইলেই দেখা যায় যে, কাহিনী হয়ত অতি সামান্য এবং অতি পরিচিতও। তার মধ্যে তেমন অভিনবত্ব নেই বা চমকও নেই, কিন্তু এই সব সাধারণ কাহিনীর মধ্যেই তিনি যে সব চরিত্র এঁকেছেন, সেগুলি তাঁর নিপুণ তুলির আঁচড়ে অপরূপ হয়েছে। মানব মনের নিগূঢ় রহস্য তার জটিলতা ও দ্বন্দ্ব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

শরৎচন্দ্রের রচনার একটি বড় গুণ, তাঁর লেখার মধ্যে অসাধারণ সংযম। তাঁর সাহিত্যে কোথাও অবান্তর বা বাহুল্য আদৌ নেই। যেটুকু না বললে নয়, সেইটুকুই তিনি কেবল বলেছেন, তার বেশী বলেন নি। কোন ঘটনাকে

অহেতুক ফেনিয়ে বড় করবার চেষ্টা তিনি মোটেই করেন নি। কি প্রকৃতির বর্ণনায়, কি নরনারীর রূপ বর্ণনায়, আর কি মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণের সময়, তিনি কোথাও উচ্ছ্বাসের বশীভূত হন নি। সর্বত্রই তাঁর রচনা সংযত ও পরিমিত। তিনি কোন কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করে বা সামান্য খুঁটিনাটি ঘটনারও উল্লেখ করে বক্তব্য বিষয়ের সবটাই বলে শেষ করে দিতেন না, পাঠক-পাঠিকাদের জন্যও কিছুটা রেখে দিতেন। এই অলিখিত অংশটাকে তিনি তাঁর পাঠক-পাঠিকাদের নিজেদের কল্পনা ও অনুভূতি দিয়ে পূরণ করে নেবার সুযোগ দিতেন। লেখার মধ্যে কোথায় কতটা বলতে হবে এবং কতটা বলতে হবে না, এ সম্বন্ধে তিনি সর্বদাই সচেতন থাকতেন।

শরৎচন্দ্র একজন নিপুণ শিল্পীর ন্যায় চরিত্রচিত্রণের ফলে, তাঁর গল্প-উপন্যাসের চরিত্রগুলি সজীব ও সত্য হয়ে উঠে যেমন একদিকে তাঁর পাঠক-পাঠিকাদের মুগ্ধ করেছে, অপরদিকে তেমনি তাঁর অপূর্ব রচনাশৈলী বা রচনারীতির মাধুর্যও তাঁর পাঠক-পাঠিকাদের খুশি করেছে। তাঁর শব্দসম্পদ, ভাষা, বর্ণনা, উপমা ও প্রকাশভঙ্গী সবকিছু মিলে তাঁর রচনায় যেন এক ইন্দ্রজালের সৃষ্টি হয়েছে। গদ্য যেন কাব্য হয়ে উঠেছে। ভাষার মধ্যে যে কতখানি শক্তি ও যাদু থাকতে পারে, শরৎচন্দ্র তাঁর রচনায় তা-ই দেখিয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের ভাষা যেমন অতি সহজ ও প্রাঞ্জল, তেমনি অভিনবও। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী লেখকদের মত বা তাঁর সমসাময়িক বহু সাহিত্যিকের ন্যায় বেশী সংস্কৃত শব্দ বা অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার ক'রে তাঁর রচনাকে কোথাও কষ্টবোধ্য করে তোলেন নি। তিনি তাঁর সাহিত্যে সচরাচর প্রচলিত বাঙলা শব্দই বেশী ব্যবহার করেছেন। এই প্রচলিত শব্দের ব্যবহারেই তিনি এক অপূর্ব প্রাণময় ভাষার সৃষ্টি করেছেন। একজন দক্ষ কারিকর যেমন সাধারণ কাদামাটি থেকে অতি সুন্দর প্রতিমা গড়ে তোলেন, শরৎচন্দ্রও তেমনি সাধারণ বাঙালীর মুখের প্রচলিত শব্দসম্ভার নিয়েই এক মনোহর 'ভাষার তাজমহল' তৈরি করেছেন।

গদ্যেরও যে একটা ছন্দ আছে, একটা সুর আছে, শরৎচন্দ্র তাঁর রচনায় এইটাকে বিশেষভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর রচনায় এক একটি বাক্যের মধ্যে মনে হয় কোথাও যেন একটি অযথা শব্দ বা বাড়তি অক্ষরও পর্যন্ত নেই।

যেটির যেখানে প্রয়োজন, বাছাই করে ঠিক সেইটিকেই তিনি সেখানে বসিয়ে দিয়েছেন। একটু এদিক ওদিক হ'লে বা একটির অভাব হ'লে, যেন বেসুরো হয়ে যাবে বা ছন্দপতন হবে। শরৎচন্দ্রের শব্দ প্রয়োগের এই নিপুণতার গুণেই তাঁর ভাষা স্বচ্ছ ও সাবলীল গতিতে চলে শান্ত স্রোতস্বিনীর কুলু কুলু শব্দের ন্যায় যেন এক মনোরম সুরের সৃষ্টি করেছে।

শরৎচন্দ্রের এই ভাষা সম্বন্ধে বিখ্যাত সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন—

"শরৎচন্দ্র তাঁহার এই ভাষা নির্মাণে এমন সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তার কারণ, তিনি স্ব-সমাজের একেবারে বুকের নিকটে কান পাতিয়াছিলেন— তাহাদের মুখের বুলিই শুধু শোনেন নাই, সেই বুলির প্রাণসঞ্চারী রসধ্বনিও শুনিয়াছিলেন ; তাই কথ্যভাষার রূপ,. তাহার 'এ্যাক্‌সেণ্ট' বা স্বরবৈচিত্র্যের সূক্ষ্মতম ধ্বনি আর কেহ এমন করিয়া কানে ও প্রাণে প্রত্যক্ষ করিতে পারে নাই।"

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে প্রধানতঃ সহজ, সরল ও মানুষের মুখের ভাষাকেই ব্যবহার করলেও, তাই ব'লে তাঁর ভাষা যে অলঙ্কারবর্জিত, তা নয়। তিনি তাঁর ভাষাকে পরিমিত ও যথাযথ অলঙ্কারেও সাজিয়েছেন। তবে তিনি তাঁর রচনার মধ্যে কোথাও অলঙ্কারের আড়ম্বর দেখান নি। যেখানে প্রয়োজন হয়েছে, সেইখানেই কেবল উপমা, রূপক, অনুপ্রাস প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগ করেছেন।

(কোনও বক্তব্য বিষয়কে সুপরিস্ফুট ও সুন্দর করে তুলবার জন্যই সাধারণতঃ উপমা বা রূপকের প্রয়োজন হয়। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের উপমাগুলিও লক্ষ্য করার মত। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আশপাশের জিনিষ নিয়েই তিনি সাধারণতঃ উপমার সাহায্যে তাঁর বক্তব্য বিষয়কে আরও সহজ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। যেমন একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

"মেয়েরা শিলের উপর নোড়া দিয়া যেমন করিয়া বাটনা বাটে, কল্যকার সাইক্লোন এই তিন-চারশ লোক দিয়া ঠিক তেমনি করিয়া সারারাত্রি বাটনা বাটিয়াছে।" (শ্রীকান্ত ২য় পর্ব))

এখানে সকলের দেখা ও পরিচিত মেয়েদের বাটনা বাটার উপমাটি দেওয়ায় কথাটি সহজ ও সর্বজনবোধ্য হয়ে উঠেছে।

মানুষের দৈহিক রূপের বর্ণনায় কিংবা প্রাকৃতিক বর্ণনারও শরৎচন্দ্রের

নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। শরৎচন্দ্রের বর্ণনার বিশেষত্ব এই যে, তিনি অল্প কথায় যেন অনেকখানিই বলে দিতে সক্ষম হয়েছেন। মানুষের রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি তার নাক, কান, চোখ, মুখ প্রভৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেন নি, কিংবা শরীরের এক একটি অঙ্গকে এক একটি জিনিষের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখিয়ে বর্ণনাকেও তেমন ভারাক্রান্ত করে তোলেন নি।

যুবতী নারীর দৈহিক বর্ণনার সময়ও তিনি অত্যন্ত সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। এখানেও বর্ণনার মধ্যে তাঁর যেমন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তেমনি বর্ণনার মধ্যে কোথাও এতটুকু উচ্ছ্বাস বা আদৌ বাড়বাড়ি নেই। পাঠকের সামনে তাকে আনবার জন্য যেটুকু বর্ণনা না দিলে নয়, শুধু সেই বর্ণনাটুকুই দিয়েছেন। তবে এই বর্ণনা পরিমিত হলেও, শরৎচন্দ্রের প্রকাশ-ভঙ্গীর মধ্যে কিন্তু নিজস্ব এক অভিনবত্ব রয়েছে।

শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প উপন্যাসসমূহে মানুষের হাসি-কান্না ও তাদের সুখ-দুঃখময় জীবনের কথা বললেও, তাঁর সাহিত্যে প্রকৃতিও অনেকটা স্থান নিয়েছে। সমুদ্র, নদী, মাঠ, আকাশ, বাতাস, মেঘ, গাছপালা প্রভৃতির বহু বর্ণনা তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। তিনি একদিকে যেমন শান্ত প্রকৃতির বহু বর্ণনা দিয়েছেন, অপরদিকে তেমনি আবার অনেক দুর্যোগময় প্রাকৃতিক বর্ণনাও দিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের এই প্রাকৃতিক বর্ণনাগুলি তাঁর শব্দ প্রয়োগের নৈপুণ্যে, ভাষার লালিত্যে ও বর্ণনাভঙ্গীর অভিনবত্বে পাঠকের চোখের সামনে যেন ছবির মত হয়ে ফুটে উঠেছে।

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে নৈসর্গিক বর্ণনাই শুধু দেন নি। প্রকৃতির সঙ্গে মানব-মনেরও যে একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ রয়েছে, এ বিষয়েও তাঁর কবিমন বিশেষ ভাবেই অবহিত ছিল। তাই তিনি অনেক জায়গায় মানব-মনের উপর প্রকৃতির যে প্রভাব পড়ে, তারও উল্লেখ করে প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন। গ্রীষ্মের রৌদ্রময় মধ্যাহ্ন, বর্ষার সজল আবহাওয়া, শীতের অপরাহ্নবেলা, বসন্তের মলয়ানিল প্রভৃতি মানুষের মনের উপরে কিরূপ রেখাপাত করে, তিনি তাঁর সাহিত্যে বহু জায়গায় তা দেখিয়েছেন।

ভাষা, উপমা, বর্ণনা প্রভৃতির কথা বাদ দিলেও শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের কথোপকথনগুলিও লক্ষণীয়। তাদের সংলাপ একদিকে যেমন

সহজ ও স্বাভাবিক হয়েছে, অপরদিকে তেমনি নাট্যরসসমৃদ্ধও হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসসমূহে নাটকীয় উপাদান প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে। সেই কারণেই বাঙ্গলার বহু শৌখীন ও পেশাদার নাট্য-সম্প্রদায় শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসগুলিকে নাটকে রূপান্তরিত করে অভিনয় করেছে এবং আজও করছে।

শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসগুলি শুধু নাট্যাভিনয়েই নয়, ছায়াচিত্রেও একের পর এক করে রূপায়িত হয়েছে ও হচ্ছে।

শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প-উপন্যাস সমূহের অনেক জায়গায় নির্মল হাস্যরস পরিবেশন করেছেন। কুশলী শিল্পীর ন্যায় তাঁর এই হাস্যরস পরিবেশনের ব্যবস্থা এমনি সহজ ও স্বাভাবিক যে, কোথাও কাতুকুতু দিয়ে বা জোর করে হাসাবার এতটুকু চেষ্টা নেই। আর তাঁর এই সহজ প্রচেষ্টার মধ্যে কোথাও কোন বক্রূপ বা শ্লেষের গন্ধও নেই এবং কোথাও ভাঁড়ামিরও স্থান নেই। তিনি স্বচ্ছ স্বাভাবিক হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে মাঝে মাঝে যেমন হাস্যরস পরিবেশন করেছেন, অনেক জায়গায় তেমনি করুণ রসেরও সৃষ্টি করেছেন। এই করুণ রসের চিত্রের অনেকগুলিই আবার পড়বার সময় আপনা হতেই পাঠক-পাঠিকাদের চোখে জল নেমে আসে এবং বুকও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। শরৎচন্দ্র অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হয়ে এবং দরদী মন নিয়ে কলম ধরেছিলেন বলেই তাঁর করুণ রসের চিত্রগুলি তাঁর পাঠক পাঠিকাদের চিত্তকে স্পর্শ করতে পেরেছে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন শরৎচন্দ্রের এই করুণ রসসৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে উদাহরণ স্বরূপ 'রামের সুমতি' গল্পের আলোচনা করে বলেছেন—

"...বৌদিকে সে পেয়ারা ছুঁড়িয়া ব্যথা দিয়াছিল, এ কষ্ট তাহার রাখিবার জায়গা ছিল না। সে নিজের কপালে পেয়ারা ঠুকিয়া বুঝিতে চেষ্টা পাইতেছিল, সে আঘাতের পরিমাণ কত। সে নিজেকে কত মিথ্যা সান্ত্বনা দিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, বাহিরে নিজের তেজ বজায় রাখিবার জন্য কত বিফল চেষ্টা পাইয়াছিল,—কিন্তু যেদিন বৌদি তাহাকে ডাকেন নাই, খাইতে দেন নাই, সেদিন তাহার উদ্দামভাব ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া রেণু হইয়া গিয়াছিল। অত অল্প জায়গায় এরূপ প্রবলভাবের করুণরস সৃষ্টি করিতে বঙ্গীয় অন্য কোন আধুনিক লেখক পারিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না।"

আর রামায়ণী যেদিন তাঁর স্বামীর দেওয়া শপথ বাক্য উপেক্ষা করে রান্নার জন্য রাঁধতে বসেছিলেন, সেদিনকার কথা-প্রসঙ্গে দীনেশবাবু লিখেছেন—

"সেই রান্না, সেই পরিবেশনের কথা চক্ষের জলে পড়া যায় না। প্রাচীন সমালোচক অক্ষয়কুমার সরকার মহাশয়কে উহা পড়িয়া শুনাইতেছিলাম, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'আপনি আমার চক্ষুর পীড়া বাড়াইয়া দিলেন'।"

কেউ কেউ বলেন যে, শরৎচন্দ্র আদর্শবাদী (আইডিয়ালিস্টিক) সাহিত্যিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন বাস্তববাদী (রিয়্যালিস্টিক) সাহিত্যিক। তাঁদের যুক্তি এই যে, শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে কোনও আদর্শ প্রচারের জন্য উঠে পড়ে লাগেন নি, বরং সমাজের বাস্তব ও সত্য ঘটনাকেই তিনি তাঁর সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। তাই এই দিক থেকে তাঁকে আদর্শবাদী না বলে বাস্তববাদীই বলা যেতে পারে।

কিন্তু আসলে শরৎচন্দ্র সমাজের বাস্তব ও সত্য ঘটনাসমূহের দিকে দৃষ্টি দিলেও, ঠিক সেই ঘটনাগুলিকেই তিনি তাঁর সাহিত্যে হুবহু তুলে দেন নি। এই সব সত্য ও বাস্তব ঘটনার উপরে কল্পনার রং চড়িয়ে সেগুলিকে সাহিত্যের উপযোগী করে তবেই তিনি প্রকাশ করেছেন। এই আদর্শবাদী ও বাস্তববাদী কথার উত্থাপন করে তিনি নিজেই এক জায়গায় বলেছেন—

"গোটা দুই শব্দ আজকাল প্রায় শোনা যায়, 'আইডিয়ালিস্টিক এণ্ড রিয়্যালিস্টিক'। আমি নাকি এই শেষ সম্প্রদায়ের লেখক। এই দুর্নামই আমার সবচেয়ে বেশী। অথচ, কি করে যে এই দুটোকে ভাগ করে লেখা যায় আমার অজ্ঞাত। 'আর্ট' জিনিষটা মানুষের সৃষ্টি, সে 'নেচার' নয়। সংসারে যা কিছু ঘটে এবং অনেক নোঙ্‌রা জিনিসই ঘটে—তা কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয়। প্রকৃতি বা স্বভাবের হুবহু নকল করা—'ফটোগ্রাফি' হতে পারে, কিন্তু সেকি ছবি হবে? দৈনিক খবরের কাগজে অনেক কিছু লোমহর্ষক ভয়ানক ঘটনা ছাপা থাকে, সে কি সাহিত্য? চরিত্রসৃষ্টি কি এতই সহজ? আমি ত জানি, কি করে আমার চরিত্রগুলি গড়ে উঠে। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আমি উপেক্ষা করচি নে, কিন্তু বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণে কত ব্যথা, কত সহানুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে ফোটে, সে আর কেউ না জানে, তা আমি ত জানি।"

শরৎচন্দ্র তাই সত্য ও বাস্তব ঘটনাকে ব্যাখ্যা ও সহানুভূতি দিয়ে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে পাঠকের হৃদয়গ্রাহী করবার চেষ্টা করেছেন, আর এতে তিনি বিশেষভাবে সাফল্যলাভও করেছেন।

কিন্তু এই কল্পনার তুলি বোলাবার আগে সাহিত্যের যেটা আসল 'বনেদ'—সেই সত্য ও বাস্তব ঘটনাকে প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই সংগ্রহ করতে হয়। যে সাহিত্যিকের এই ঘটনা বা কাহিনী সম্বন্ধে যত বেশী বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকে, তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিও তত বেশী সার্থক ও সফল হয়। শরৎচন্দ্রের রচনা যে এতখানি সাফল্যলাভ করেছে, তার কারণ হচ্ছে, ঘটনা ও চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা। তাঁর সমস্ত সাহিত্যই মূলতঃ তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। শরৎচন্দ্র বাঙ্গলা, বিহার ও ব্রহ্মদেশে বহু বৎসর কাটিয়েছেন এবং সর্বত্রই তিনি ব্যাপকভাবে লোকের সঙ্গে মিশেছেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসের মধ্যে আমরা যে সকল অপূর্ব চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হই, সেগুলি সবই তাঁর অভিজ্ঞতা-প্রসূত। শরৎচন্দ্র এ কথার উল্লেখ করে তাঁর বন্ধু ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে একবার বলেছিলেন—

"চারু, আমার মত করে তোমাদের যদি উপন্যাস রচনা করতে হ'ত, তাহলে তোমরা উপন্যাস লিখ্‌তেই পারতে না। এমন দিন গেছে, যখন দু-তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায় থেকেছি। কাঁধে গামছা ফেলে এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছি। কত বাড়ীতে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে—তাঁরা ভদ্রলোক। কত হাড়ী বাগ্দীর বাড়ীতে আহার করেছি। গ্রামের সকলের সঙ্গে মিশেছি, তাদের সুখ-দুঃখে সহানুভূতি জানিয়ে তাদের মুখ থেকে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কাহিনী জেনে নিয়েছি। তারপর খুব ভাল করে দেখে নিয়েছি পল্লীগ্রাম ও পল্লীসমাজ। তাছাড়া আমার উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র এবং ঘটনা আমার স্বচক্ষে দেখা।" ('শরৎ-স্মৃতি'—প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৫)

শরৎচন্দ্রের একদিকে এই স্বচক্ষে দেখা চরিত্র ও ঘটনা, অপরদিকে তাঁর অপূর্ব ভাষা, প্রকাশভঙ্গী, বর্ণনা, উপমা প্রভৃতি, এই সমস্তর সংযোগে তাঁর সাহিত্য মনোহর ও অপরূপভাবে দেখা দেয়। শরৎচন্দ্রের এই অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক, পরিচয়পুষ্ট কাহিনী ও চরিত্রগুলি তাঁর পাঠক-পাঠিকাদের একেবারে হৃদয়কে গিয়ে স্পর্শ করে। তাঁরা এই সাহিত্য পাঠে যেমন খুশি হন, তেমনি

মুগ্ধও হন। এই কারণেই তাঁরা শরৎচন্দ্রকে তাঁদের হৃদয়ের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা দিয়ে 'সাহিত্য সম্রাট' 'অপরাজেয় কথাশিল্পী' প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করেন।

এই সময়েই দেশের বিভিন্ন সাহিত্য প্রতিষ্ঠানে ও সাহিত্যিক সমাবেশে যোগ দেওয়ার জন্য শরৎচন্দ্রের ডাক আসতে লাগল। লোকে তাঁকে দেখবার জন্য, তাঁর মুখের বাণী শুনবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠল।

কিন্তু এত সব ডাক এলে কি হবে, শরৎচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত সভা-ভীরু মানুষ। তিনি আদৌ বক্তৃতা দিতে পারতেন না। সভায় যেতে হবে এবং সেখানে গিয়ে বক্তৃতা দিতে হবে, শুনলেই তিনি ভয়ে পাশ কাটাতেন। তবে একান্ত যেখানে যেখানে এড়াতে পারতেন না, অনিচ্ছাসত্ত্বেই সেই সেই সভায় গিয়ে যোগ দিতেন। এই ভাবে শরৎচন্দ্র হাওড়া শহরে থাকাকালে ১৩২৯ সালে কলকাতায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর স্মৃতি-সভায়, ১৩৩০ সালে শিবপুরে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভায়, ১৩৩১ সালে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনে, আবার ঐ বছরই মুন্সীগঞ্জে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভায় সভাপতিত্ব করেন। (মুন্সীগঞ্জ থেকে শরৎচন্দ্র ঢাকা শহরে গেলে, সেখানকার বিশ্বভারতী সম্মিলনী নামক সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান তাঁকে সুন্দর কারুকার্য করা একটি শাঁখে করে মানপত্র দিয়েছিল।)

শরৎচন্দ্র ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে একবার কাশী গেলে, সেই সময় সরস্বতী পূজার দিন কাশী বিশ্বনাথ লাইব্রেরীর ৯ম বার্ষিক সারস্বত সম্মেলনেও তাঁকে সভাপতিত্ব করতে হয়েছিল।

সমালোচনার সম্মুখে

শরৎচন্দ্র একদিকে যেমন তাঁর দেশবাসীর কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা পেতে লাগলেন, অপরদিকে তেমনি তাঁকে এক শ্রেণীর লোকের তীব্র সমালোচনা এবং আক্রমণেরও সম্মুখীন হতে হ'ল। শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে এঁদের সব চেয়ে বড় অভিযোগ ছিল এই যে, তিনি তাঁর সাহিত্যে সমাজচ্যুতা ও পতিতাদের দরদ ও সহানুভূতির সহিত চিত্রিত করেছেন। যতীন্দ্রমোহন সিংহ তাঁর 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' নামক পুস্তকে এবং আরো অনেকে তাঁদের প্রবন্ধাদিতে শরৎচন্দ্রের কঠোর সমালোচনা করলেন।

তখন এঁরা শুধু লিখিতভাবেই নয়, প্রকাশ্য সভাতে ডেকে নিয়ে গিয়েও কেউ কেউ শরৎচন্দ্রকে অপমান করতে ছাড়েন নি। এ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র নিজেই পরে বলেছিলেন—"আমার মনে পড়ে বয়স যখন আমার অল্প ছিল, এ ব্রতে যখন নতুন ব্রতী, তখন আমন্ত্রণ পেয়েও কত সাহিত্য সভায় দ্বিধায় সঙ্কোচে উপস্থিত হতে পারি নি। নিশ্চিত জানতাম, সভাপতির সুদীর্ঘ অভিভাষণের একটা অংশ আমার জন্য নির্দিষ্ট আছেই। কখন নাম দিয়ে, কখন নাম না দিয়ে। বক্তব্য অতি সবল। আমার লেখায় দেশ দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ হয়ে এল এবং সনাতন হিন্দু সমাজ জাহান্নামে গেল বলে।"

শরৎচন্দ্র বলেছেন—"পাপীর চিত্র আমার তুলিতে মনোহর হয়ে উঠেছে, আমার বিরুদ্ধে তাঁদের সবচেয়ে বড় এই অভিযোগ।"

শরৎচন্দ্র কয়েকটি প্রবন্ধে এবং অভিভাষণ ও পত্রাদিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগের উত্তর দিয়েছেন। উত্তরে তিনি বলেছেন—"লোকে বলে আমি পতিতাদের সমর্থন করি। সমর্থন আমি করি নে। শুধু অপমান করতেই মন চায় না। বলি তারাও মানুষ, তাদেরও নালিশ জানাবার অধিকার আছে এবং মহাকালের দরবারে এদের বিচারের দাবী একদিন তোলা রইল। অথচ লোকে সংস্কারের অন্ধতায় এ-কথাটা কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না।"

এ সম্বন্ধে তিনি আরও বলেছেন—"পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়।...

অত্যন্ত সতী নারীকে আমি চুরি, জুয়াচুরি, জাল ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে দেখেছি এবং ঠিক এর উল্টোটা দেখাও আমার ভাগ্যে ঘটেছে।...সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্বেও ছিল না, পরেও হয়ত একদিন থাকবে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একবস্তু নয়, এ কথা সাহিত্যের মধ্যে যদি স্থান না পায় ত, এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?"

তাই শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প-উপন্যাসে সমাজ-পরিত্যক্তা ও পতিতা নারীদের মধ্যেও 'একনিষ্ঠ প্রেম' ও 'মনুষ্যত্বের' সন্ধান পেয়ে তাদের জয়গান করতে আদৌ ইতস্ততঃ করেন নি। তিনি দেখিয়েছেন যে, সামান্য একটা পদস্খলনই তাদের জীবনের সব নয়। এটুকু বাদ দিলেও তাদের স্নেহ, মায়া, মমতা, প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি গুণগুলিও উপেক্ষার নয়।

শরৎচন্দ্র বলেছেন—'প্রথম যখন চরিত্রহীন লিখি, তখন পাঁচ ছ বছর ধরে গালাগালির অন্ত ছিল না। তবে মনের মধ্যে আমার এই ভরসা ছিল যে, সত্যি জিনিসটা আমি ধরেছিলুম।'

ঐ সময় 'উপাসনা' নামক একটি কাগজে শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীনে'র তীব্র সমালোচনা বেরিয়েছিল।

অনেকে তখন শুধু শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' বইটি নিয়েই নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও তাঁকে মিথ্যা আক্রমণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে এখানে একটি গল্প বলছি :—

শরৎচন্দ্রের মজঃফরপুরের বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের পুত্র পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় (পাঁচুগোপালবাবু তাঁর পৈতৃক ভট্টাচার্য পদবী বদলে মুখোপাধ্যায় করেছিলেন) শরৎচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। এই পাঁচুগোপালবাবু একদিন শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে বেড়াতে গেলে, সেদিন কথায় কথায় শরৎচন্দ্র পাঁচুগোপালবাবুকে এই কথাগুলি বলেছিলেন—

এই দেখ না, আমার লেখার যাঁরা সমালোচনা করেন, তাতে কী থাকে? শুধু গালাগালি আর বিষোদ্গার। যখন প্রথম সাহিত্য ক্ষেত্রে এলাম, এদের আক্রমণটা আরও তীব্র ছিল। সেদিন এরা আমার অতীত জীবন নিয়ে কত আজগুবি গবেষণাই না করেছে!

একবার শরৎ চাটুজ্যে নামে কোথাকার কে একটা লোক টাকা চুরির দায়ে ধরা পড়ে। খবরটা কাগজে ছাপা হতেই, আর সব যায় কোথা!

তারা ধরে নিলে—ঐ টাকা চোর শরৎ চাটুজ্যে লোকটা নিশ্চয় আমি। প্রচার করে দিলে—ঐ টাকা চোর আর নভেল-লিখিয়ে শরৎ চাটুজ্যে একই ব্যক্তি। এতে কোন ভুল নেই!

চারদিক থেকে চিঠি আসতে লাগল। তার কী ভাষা, কী বক্তব্য! বোঝ দেখি একবার অবস্থাখানা!

এ রকম অন্যায় অত্যাচার আমার উপর হয়েছে। আমি কিন্তু টলিনি। আক্রমণ যতই তীব্র হোক, নিজে আমি যা সত্য বলে বিবেচনা করেছি, তা বলতে কিছুতেই ভয় পাই নি।

এই সময় লোকে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তি-জীবন নিয়ে কিরূপ বদনাম ছড়াত, তার আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি :—

১৩৩১ সালে একদিন অনেকটা রাত্রে শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর বাড়ী থেকে হাওড়ায় বাজে শিবপুরে তাঁর বাড়ীতে ফিরবার সময় দেশবন্ধু তাঁকে একটি বেশ বড় ও সুন্দর রাধাকৃষ্ণের মূর্তি দান করেন। শরৎচন্দ্র সেই রাত্রেই ট্যাক্সি করে ঐ মূর্তিটি নিয়ে বাড়ী ফেরেন। বাড়ীর সামনে বাজে শিবপুর রোডের উপর ট্যাক্সি রেখে শরৎচন্দ্র তাঁর স্নেহভাজন প্রতিবেশী অমরেন্দ্রনাথ মজুমদারকে ডাকেন। তারপর দুজনে মিলে অতি সাবধানে ট্যাক্সি থেকে রাধাকৃষ্ণের মূর্তিটি বাড়ী নিয়ে আসেন।

এঁরা যখন মূর্তিটি ট্যাক্সি থেকে আনেন, সেই সময় রাত্রে ঐ পথ দিয়ে যারা যাচ্ছিল, তারা সব কিছু ভাল করে না দেখেই, পরদিন সকালে প্রচার করে দিল—কাল রাত্রে শরৎবাবু এত মদ খেয়ে বাড়ী ফিরেছিলেন যে, তাঁকে ধরে ট্যাক্সি থেকে নামাতে হয়।

অমরবাবু বলেন—সকালে পাড়ার লোকের মুখে এইরূপ কথা শুনে আমি তো একেবারে হতবাক্! যাই হোক্, পরে আমি আবার তাদের প্রকৃত ঘটনাটা বুঝিয়ে বলি।

অমরবাবু আরও বলেন—লোকে জানত না যে, তিনি আগে মদ খেলেও বাজে শিবপুরে এসে মদ খেতেন না। আগেই তিনি মদ ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর তিনি যে আফিং খেতেন, তাও ক্রমশঃ কমিয়ে একেবারে ছাড়ার দিকেই তখন এনেছিলেন।

এই যেমন শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে লোকের মিথ্যা প্রচার, আবার তেমনি কেউ

কেউ শরৎচন্দ্রের নিন্দার কথা লিখতে গিয়ে নানা মনগড়া কথাও লিখেছেন। যেমন—কার্তিক, ১৩৬০-এর 'মাসিক বসুমতী'তে একজন লিখেছিলেন—

"১৯১৭ সাল। চরিত্রহীন প্রকাশিত হয়েছে।...

শরৎচন্দ্র বসে আছেন তাঁর ইজিচেয়ারে। তিন-চারটি যুবক একখানি 'চরিত্রহীন' বই হাতে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন।

প্রথম যুবক—(শরৎচন্দ্রকে) দেখুন, এই রকম বই লিখলে, এ পাড়ায় আপনার থাকা চলবে না। এটা ভদ্রপাড়া। লোকে বৌ-ঝি নিয়ে ঘর করে।

দ্বিতীয় যুবক—গুয়ের পোকা যেমন ময়লা আর নোংরা ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না, আপনিও সমাজে সাবিত্রী আর কিরণময়ী ছাড়া আর ভাল চরিত্র দেখতে পান না।

তৃতীয় যুবক—আপনার এই বই-এর পরিণাম কি হওয়া উচিত জানেন? এই দেখুন,—বলে একখানি চরিত্রহীন বই-এর উপর কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিল।"

এই কাহিনীটি পড়ে তখন ঐ লেখককে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আপনি এ কাহিনীটি পেলেন কোথায়?

উত্তরে তিনি বলেছিলেন—'বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবনপ্রশ্ন' নামে একটি বইয়ে আমি পড়েছি। এ ব্যাপারটি ঘটেছিল বাজে শিবপুরে।

তখন আমি ঐ বইটি পড়ে দেখলাম। তাতে আছে—"তিন-চারিটি যুবক চরিত্রহীন বই হাতে করে এসে নানা ইতর কথা বলে। তাঁকে শাসিয়ে বললে—এ রকম বই লিখলে, এ পাড়ায় তাঁর থাকা চলবে না। এটা ভদ্র পাড়া। লোকে বৌ-ঝি নিয়ে ঘর করে। পরে তাঁরা কেরোসিন ঢেলে তাঁর সামনেই বইখানা পুড়িয়ে চলে গেল।"

এখানে দেখা যাচ্ছে, ঐ বইয়ের 'নানা ইতর কথা'কে বসুমতীর লেখক নিজে কল্পনা করে গুয়ের পোকার সঙ্গে উপমা দেওয়ার কথা ঠিক করে নিয়েছেন।

যাই হোক্, শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন নিয়ে তাঁর বাজে শিবপুরের বাসায় এরূপ কোন ঘটনা ঘটেছিল কিনা, এ সম্বন্ধে আমি শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে এবং তাঁর পাশের বাড়ীর প্রতিবেশীদের কাছে খোঁজ নিয়েছিলাম। তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলেছিলেন—'না, এরূপ কোন ঘটনা

ঘটেনি।' শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের বন্ধুরা বলেছিলেন—এরূপ কাণ্ড হ'লে শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই আমাদের বলতেন।

শরৎচন্দ্রের পাশের বাড়ীর প্রতিবেশী তাঁর স্নেহভাজন অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ মজুমদারও আমাকে বলেছিলেন—এরূপ কোন ঘটনা ঘটলে, শরৎচন্দ্র তখনই আমাকে ডেকে বলতেনই। আর একান্ত যদি তিনি নাও বলতেন, পাড়ার ছেলেদের কাছ থেকেও আমি জানতে পারতাম। তাই এ কাহিনী আদৌ সত্য নয়।

যতীন্দ্রমোহন সিংহ তাঁর 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' পুস্তকে শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজের রমাকে লক্ষ্য করে লিখেছিলেন—"তুমি না অত্যন্ত বুদ্ধিমতী? তুমি বুদ্ধিবলে পিতার জমিদারী শাসন করিয়া থাক, কিন্তু নিজের চিত্ত দমন করিতে পারিলে না?...তোমার এই পতন নিতান্তই ইচ্ছাকৃত, ইহা তোমার একটা শখ...!"

পল্লীসমাজের বিধবা রমা তার বাল্যবন্ধু রমেশকে ভালবেসেছিল ব'লে শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে এমনও অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, এত বড় দুর্নীতির প্রশ্রয় দিলে গ্রামে আর বিধবা কেউ থাকবে না।

১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে মুন্সীগঞ্জে সাহিত্য সভায় সভাপতির অভিভাষণ হিসাবে শরৎচন্দ্র 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' নামে যে প্রবন্ধটি পড়েছিলেন, তাতে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগের উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

"...ইহার প্রশ্রয় দিলে ভাল হয় কি মন্দ হয়, হিন্দু-সমাজ স্বর্গে যায় কি রসাতলে যায়, এ মীমাংসার দায়িত্ব আমার উপরে নাই। রমার মত নারী ও রমেশের মত পুরুষ কোন কালে, কোন সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দু সমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হ'ল এই যে, এত বড় দুটি মহাপ্রাণ নর-নারী এ জীবনে বিফল, ব্যর্থ, পঙ্গু হয়ে গেল। মানবের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে বেদনার এই বার্তাটুকুই যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি ত তার বেশী আর কিছু করবার আমার নেই। এর লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহিত্যিকের নয়।"

শরৎচন্দ্রের এই 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' নামক অভিভাষণটি তখন ছাপা

হলে, সেই সময়ের 'নবযুগ' পত্রিকায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে এরও সমালোচনা বেরিয়েছিল। সমালোচক তাঁর প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রের এই উত্তরের বিরুদ্ধে তখন লিখেছিলেন—

"আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, হিন্দু-সমাজ স্বর্গে যায় কি রসাতলে যায়, এই মীমাংসার দায়িত্ব যখন শরৎচন্দ্রের নাই, উদ্দেশ্য নিয়া লেখা যখন সাহিত্যিকের কাজ নয়, তখন তিনি ব্যথা-বেদনায় জর্জরিত হৃদয়ে বিধবার বেদনার বার্তাটুকুই শুধু সমাজের নিকট পৌঁছাইতে ব্যস্ত কেন?"

শরৎচন্দ্র মুন্সীগঞ্জে তাঁর লিখিত অভিভাষণে এ কথাও বলেছিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিকরা তখন যদি বিদ্যাসাগর মশায়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকে সমর্থন করতেন, তাহলে হিন্দু-সমাজের চেহারা আজ অন্য রকম হয়ে যেত।

'নবযুগে'র ঐ প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রের এ কথার উত্তরে ছিল—বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর সমসাময়িক কোন কোন সাহিত্যিক তবুও তাঁদের গ্রন্থে বিধবা বিবাহ দিয়েছিলেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র এঁদের প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পরে উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেও তাঁর কোন উপন্যাসেই বিধবা বিবাহ দিতে পারেন নি এবং বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কোন যুক্তিও দেখিয়ে যান নি।

শুধু এই নয়, নবযুগের ঐ প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ' সম্বন্ধে যে সমালোচনাটি ছিল, তা হচ্ছে এই :—

"আমাদের মনে হয় বিরাজের ন্যায় অভিনব সৃষ্টি বিলাতী আর্ট ভিন্ন কিছুই নয়। বিলাতী উপন্যাস পাঠ করিয়া অনেকেই যে হিন্দুর আদর্শ ভুলিয়া যান, এই চরিত্র তাহারই উজ্জ্বল নিদর্শন। যাহা হউক, এইরূপ সৃষ্টিতে সমাজের কোন্ বেদনাটা হৃদয়ে পৌঁছে? স্বামীর দুর্ব্যবহারে নারীর যথেচ্ছাগমন? না পরিত্যাগের পর অনুশোচনা এবং পূর্ব-পাপের প্রায়শ্চিত্ত?"

শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে' প্রকাশিত হলে বাঙ্গলার কুলীন ব্রাহ্মণরা শরৎচন্দ্রকে গালি দিয়েছিলেন। এই বই লেখার জন্য শরৎচন্দ্রকে আজও হয়ত কোন কোন কুলীন ব্রাহ্মণ গালি দেন।

বামুনের মেয়ে লিখবার সময় শরৎচন্দ্র যখন রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে বলেন—এ সম্বন্ধে আমার অনেক ব্যক্তিগত এক্সপিরিয়েন্সেস আছে, এই রকম একটা বই লিখতে ইচ্ছা করি। তখন রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—এখন তো

আর কৌলিন্য নেই, একজনের একশটা বিয়ে নেই, প্লটের তো ভাবনা নেই—আর এটাকে ঘেঁটে কি হবে? তবে যদি সাহস থাকে লেখ, কিন্তু কিছু মিছে কল্পনা করো না। মিথ্যার আশ্রয় নিও না—কুলীন ব্রাহ্মণ আমি, আমারও লাগবে, ও রকম করো না। (চন্দননগর আলাপ সভায়)

'গৃহদাহ' প্রকাশিত হলে ব্রাহ্ম-সম্প্রদায় শরৎচন্দ্রের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। শুধু তখনই নয়, আজও এমন অনেক ব্রাহ্ম আছেন, যাঁরা শুধু গৃহদাহ লেখার জন্যই শরৎচন্দ্রের উপর বিরূপ। এ সম্বন্ধে এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি:—

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক বছর পরের ঘটনা। আমি তখন 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় কাজ করি।

ভারতবর্ষ কার্যালয়ের কাছেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরী। এই লাইব্রেরী ভারতবর্ষ পত্রিকার গ্রাহক ছিল। এই লাইব্রেরীর বৃদ্ধ লাইব্রেরীয়ান প্রতি মাসে ভারতবর্ষ পত্রিকা প্রকাশিত হলেই, নিজে ভারতবর্ষ কার্যালয়ে এসে পরিষ্কার দেখে বেছে একটি পত্রিকা নিয়ে যেতেন। তিনি এসে ভারতবর্ষের সম্পাদকীয় বিভাগে আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করেও যেতেন। এই বৃদ্ধ লাইব্রেরীয়ান সত্যকারের একজন পণ্ডিত মানুষ ছিলেন।

একবার কথা-প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের কথা উঠলে, আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আচ্ছা দাদা, আপনি কি শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ বইটি পড়েছেন?

এই কথা শুনেই বৃদ্ধ দুইকানে আঙ্গুল দিয়ে বলে উঠেছিলেন—আরে ছিঃ ছিঃ, ও আবার একটা বই! ও বই কি ভদ্রলোকে পড়ে?

তারপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আচ্ছা গৃহদাহ পড়ার কথা যাক, আপনার লাইব্রেরীতে শরৎচন্দ্রের কোন বই আছে কি?

তিনি বলেছিলেন—শরৎচন্দ্রের কোন বই-ই আমাদের লাইব্রেরীতে নেই। তাঁর বই পড়লে ছেলেমেয়েদের মানসিক অধোগতি হতে পারে। তাই তাঁর কোন বই-ই আমরা লাইব্রেরীতে রাখি না।

শুধু এই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ লাইব্রেরীর ব্রাহ্ম লাইব্রেরীয়ানের কথাই কেন, অনেক ব্রাহ্ম নেতাই, শরৎচন্দ্র শুধু গৃহদাহ বইটি লেখার জন্যই তাঁর অন্যান্য বইও পড়তেন না।

'পথের দাবী' পড়ে এক রায় সাহেব 'মানসী' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রকে আক্রমণ করেছিলেন। এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছেন—"পথের দাবী লিখিয়া সেদিন মানসী পত্রিকার মারফতে এক রায় সাহেব সাব-ডেপুটির ধমক খাইয়াছি। বই-এর মধ্যে কোথায় নাকি সোনাগাছির ইয়ারকি ছিল, অভিজ্ঞ ব্যক্তির চোখে তাহা ধরা পড়িয়া গিয়াছিল।"

'মহেশ' গল্পটি লেখার জন্য শরৎচন্দ্রের উপর তখন হিন্দু জমিদাররা তো ক্রুদ্ধ হয়েছিলেনই, এমন কি অনেক শিক্ষিত মুসলমানও রেগে গিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র তাঁর 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' প্রবন্ধে বলেছেন—

"……মুসলমান-সম্পাদিত কাগজে এই গল্পটির……কড়া আলোচনা বেরিয়েছিল…।

…নিঃসংশয়ে জানি এক হিন্দু জমিদার রক্তচক্ষু হয়ে শাসিয়ে বলেছিলেন, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্যে ছাপা মাসিক বা সাপ্তাহিকে এ ধরণের গল্প যেন আর ছাপা না হয়। এতে জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজা ক্ষেপিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ দেশের সর্বনাশ হয়।"

'পল্লীশ্রী' কাগজ প্রকাশিত হলে বর্ধমান বিভাগের কমিশনার সাহেব তখন ঐ কাগজ শুধু ইউনিয়ন বোর্ড সমূহেই নয়, লোকাল বোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, এমন কি গবর্ণমেণ্টের অনুগত মোসাহেব বা দালাল ধনী জমিদারদের কাছেও পাঠাবার আদেশ দিয়েছিলেন। ঐ হিন্দু জমিদারটি পল্লীশ্রী কাগজেই মহেশ গল্পটি পড়ে ঐরূপ মন্তব্য করেছিলেন। পল্লীশ্রী কাগজ চালাবার জন্য কমিশনার সাহেবের নির্দেশে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডকেও অর্থ সাহায্য করতে হ'ত বলে, ঐ জমিদারটি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্যের কথাও উল্লেখ করেছিলেন।

মহেশ গল্প লেখার জন্য হিন্দু বা মুসলমান যে-ই শরৎচন্দ্রের উপর চটুক না না কেন, এ কথা অতি সত্য যে মূক প্রাণী নিয়ে লেখা এমন সার্থক গল্প শুধু বাঙলা সাহিত্যেই নয়, পৃথিবীর সাহিত্যেও খুব কমই আছে। মূক জীবজন্তুর উপরেও শরৎচন্দ্রের একটা গভীর দরদ ছিল বলেই, তিনি এমন গল্প লিখতে পেরেছিলেন।

ভেলু

শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুরে থাকার সময় সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকরা তাঁর কাছে লেখা চাইতে যেতেন এবং বহু সাহিত্যিকও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। এঁদের প্রত্যেকেই শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে ঢুকবার আগেই বাইরে দরজার কাছে শরৎচন্দ্রের কুকুর ভেলুর কাছে তাড়া খেতেন।

ভেলুর ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনে শরৎচন্দ্র ভেলুকে ডাকলে তবে ভেলু ফিরে যেত। তখন আগন্তুক বাড়ীতে প্রবেশ করে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতেন।

শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের বাড়ীতে গেছেন, এমন কোন কোন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গ লিখতে গিয়ে শরৎচন্দ্রের ভেলুর কথাও লিখে গেছেন। যেমন, ভারতবর্ষ-সম্পাদক সাহিত্যিক জলধর সেন ভেলুর সম্বন্ধে লিখেছেন—

"শরৎচন্দ্রের একটা কুকুর ছিল—তিনি বিলাতী নহেন, খাঁটি দেশী। তার নাম ছিল ভেলু। শরৎচন্দ্র কুকুরটির এ নামকরণ কেন করেছিলেন তা জানি নে। কুকুরটি দেখতে ছিল কদাকার, আর তার আচরণ ছিল অতি অভদ্র। যে কেউ শরৎচন্দ্রের শিবপুরের বাসায় গিয়েছেন, তিনিই জানেন যে, অভ্যাগতকে কি বিপুল গর্জনে ভেলু অভ্যর্থনা করত, শরৎ-দর্শনপ্রার্থীবৃন্দ ভেলুর এই সম্ভাষণে আত্মরক্ষার্থে দশ হাত পিছিয়ে পড়তেন। ভেলুর গর্জন শুনে শরৎচন্দ্র ঘরের মধ্য থেকে যেই বলতেন—'এই ভেলু!' আর অমনি মেষ শাবকের মত দৌড়ে গিয়ে প্রভুর কোলে চড়ে বসত। শরৎচন্দ্র তাঁর এই ভেলুকে যে কি ভালবাসতেন, তা আর বলতে পারি নে।

সেই ভেলু একবার অসুস্থ হয়ে পড়ল। বাড়ীতে যত রকমের চিকিৎসা করা যেতে পারে, শরৎচন্দ্র তা করলেন। দুহাতে অর্থ ব্যয় করতে লাগলেন। শেষে অনন্যোপায় হয়ে ভেলুকে বেলগাছিয়া পশুচিকিৎসালয়ে নিয়ে গেলেন—পাঠিয়ে দিলেন না। ভেলু যে কয়দিন সেখানে বেঁচে ছিল, শরৎচন্দ্র প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠে সেই চিকিৎসালয়ে গিয়ে ভেলুর পিঞ্জরপ্রান্তে বসতেন। সারাদিন স্নান আহার ত্যাগ করে ভেলুর দিকে সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে থাকতেন। রাত্রিতে যদি সেখানে থাকতে দেয়ার আদেশ থাকত, তাহলে শরৎচন্দ্র অনাহারে অনিদ্রায় তাঁর ভেলুর পিঞ্জর পার্শ্বেই বসে থাকতেন। কিছুতেই

তিনি ভেলুকে বাঁচাতে পারলেন না। তার মৃতদেহ শিবপুরে নিয়ে সমাধিস্থ করলেন। আমি সংবাদ পেয়ে সেইদিনই শিবপুরে গেলাম। আমাকে দেখে দৌড়ে এসে শরৎচন্দ্র আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন—'দাদা, আমার ভেলু আর নেই।' তাঁর মুখ দিয়ে আর কথা বের হ'ল না।" (শরৎ-বন্দনা)

জলধর সেন ভারতবর্ষের জন্য লেখা চাইতে মাসে অন্তত ১০।১৫ দিন করে নিয়মিত শরৎচন্দ্রের কাছে যেতেন। সেই হিসাবে তিনি ভেলুর ভালরকমই চেনা হয়েছিলেন। কিন্তু তবুও ভেলু তাঁকে তাড়া না করে ছাড়ত না।

জলধরবাবু লিখেছেন, 'ভেলু কদাকার ছিল'। ভেলু কিন্তু ঠিক কদাকার ছিল না। ভেলুর গায়ের রং ছিল সাদায়-কালোয় মেশানো, আর চেহারা ছিল বেশ গোলগাল ও লম্বা। শরৎচন্দ্র এই কুকুরটি বাচ্চা অবস্থায় রেঙ্গুনে মাত্র আট আনায় কিনেছিলেন। শরৎচন্দ্র যেদিন এই কুকুরটিকে কেনেন, তার পরের দিনই তিনি দু'শ টাকার এক মণিঅর্ডার পেয়েছিলেন। তখন শরৎচন্দ্রের আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। সেদিন দু'শ টাকার মূল্য তাঁর কাছে দু হাজার টাকারও অধিক ছিল। তাই তিনি ভেলুকে খুব পয়মন্ত মনে করে পুত্রস্নেহে পালন করতেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে শরৎচন্দ্র ছ মাসের ছুটি নিয়ে যখন সস্ত্রীক কলকাতায় এসেছিলেন, তখন তিনি ভেলুকেও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। ডিসেম্বর মাসে অফিসের জরুরী চিঠি পেয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকে এবং কুকুর ভেলুকে কলকাতায় রেখে তখন একাই তাড়াতাড়ি রেঙ্গুনে চলে গিয়েছিলেন। পরে শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে ও ভেলুকে রেঙ্গুনে পাঠিয়ে দেবার জন্য বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন, তা হচ্ছে এই :—

"...এঁকে ত এবার পাঠানই চাই। আমারও চলে না—তাঁর ত প্রায় আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে। এই চিঠি পাইবা মাত্র একখানা টিকেট রিজার্ভ করিবার জন্য বি, আই, এস, এন,কে ইন্টিমেশান দিয়ো। তাহারাই বলিয়া দিবে কোন্ জাহাজে বার্থ পাওয়া যাইবে। তারপর যেদিন হোক্, টাকা লইয়া টিকিট লইয়া আসিও। তাঁর ৪৫৲+ভেলুর ৪৲=৪৯৲ টাকা।"

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শরৎচন্দ্র একবার সপরিবারে কাশীতে গিয়ে কাশীর ২৬৬ শিবালয়, এই ঠিকানায় কিছুদিন ছিলেন। তখন তিনি ভেলুকেও

সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। সাহিত্যিক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কাশীধামে শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে লিখেছেন—

"শিবালয়ে একখানা ভাল বাড়ীই শরৎবাবু ভাড়া করিয়া বাসা পাতিয়াছিলেন।...শরৎবাবুর প্রিয় কুকুরটিও সঙ্গে আসিয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে কত কথাই তিনি শুনাইলেন। সে কি খায়, কি ভালবাসে, কিসে রাগিয়া উঠে, কোন্ কোন্ লেখা আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে, সে সমস্তই আমাদিগকে শুনাইলেন—যে দিন আমরা কয়েকজন তাঁহার বাসা-বাড়ীতে দেখা করিতে গিয়াছিলাম।"

জলধরবাবু লিখেছেন, যে কেউ শরৎচন্দ্রের শিবপুরের বাসায় গেছেন, তিনিই ভেলুর তাড়া খেয়েছেন। এখানে শিবপুর বলতে বাজে শিবপুরই বুঝতে হবে। কেননা শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুর ছেড়ে শিবপুরে যখন যান, তখন আর ভেলু বেঁচে ছিল না। ভেলু বাজে শিবপুরেই মারা গিয়েছিল।

জলধরবাবুর লেখায় আরও দেখা যায়, যেন ভেলুর মৃত্যু হাসপাতালে হয়েছিল এবং 'মৃতদেহ শিবপুরে নিয়ে সমাধিস্থ' করা হয়েছিল। কিন্তু তা নয়, ভেলু হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে বাজে শিবপুরেই মারা যায়।

ভেলুর অসুখ করলে, শরৎচন্দ্র ভেলুকে বেলগাছিয়া পশুচিকিৎসালয়ে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দেন। তিনি প্রতিদিনই ভেলুকে দেখতে যেতেন। এই সময় ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ও ১১ই এপ্রিল তারিখে ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জে যে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন হয়, তাতে সাহিত্য শাখার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। তাই শরৎচন্দ্র বাধ্য হয়ে ভেলুকে অসুস্থ রেখেই মুন্সীগঞ্জে গিয়েছিলেন। মুন্সীগঞ্জের সাহিত্য সম্মিলন শেষ হ'লে শরৎচন্দ্র মুন্সীগঞ্জ থেকে ঢাকায় যান। সেখানে গিয়ে তিনি বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে উঠেছিলেন। চারুবাবু তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। ঢাকা থেকে ফিরে এসে চারুবাবুর এক চিঠির উত্তরে শরৎচন্দ্র তখন দুদিনে তাঁকে এই চিঠিখানি লিখেছিলেন—

বাজে শিবপুর। ২১শে এপ্রিল '২৫

ভাই চারু,

এই মাত্র তোমার চিঠি পেলাম। আজ আমার চিঠিপত্র লেখবার মত মনের অবস্থা নয়, তবুও তোমাকে এই কথাটা না জানিয়ে থাকতে পারলাম

না। তোমার হয়ত মনে পড়বে, আসবার সময় পথের ধারে একটা মৃতপ্রায় বাছুর, তারপরেই একটা জবাই করা মোরগ আমার চোখে পড়ে। আমি তোমাকে বলি, আজ যাবার সময় এত মৃত্যুর চেহারা দেখি কেন? তুমি বললে, একটা গোধাও ত ছিল। আমি বললাম, কই আমি ত তা দেখি নি।

তারপর তোমরা স্টেশন থেকে চলে গেলে গাড়ী ছাড়বার পরেই দেখি রাস্তার ধারে একপাল শকুনি আর একটা মরা কুকুর। আমার নিজের কুকুর ছিল হাসপাতালে, মন যে আমার কি খারাপ হয়েই গেল তা লেখা যায় না। ইংরাজিতে যাকে বলে 'সুপাবস্টিশন' সে আমার নেই, কিন্তু তিন তিনটে মৃত্যুর কথা সমস্ত পথ আমাকে একটা মুহূর্তের শান্তি দিলে না। বাড়ী এসে শুনলাম, ভেলু ভাল আছে এবং হাসপাতালের চিঠি পেলাম।

২৭শে এপ্রিল '২৫

বাড়ীতে নিয়ে এলাম বৃহস্পতিবারের পরের বৃহস্পতিবার। সকাল ৬টায় ভেলু মারা গেল। আমার চব্বিশ ঘণ্টার সঙ্গী আর নেই। সংসারে এত বড় ব্যথার ব্যাপারও আছে, এ আমি ঠিক বুঝতাম না। বোধ হয়—তাই এটা আমার প্রয়োজন ছিল। আব একটা জিনিষ টের পেলাম চারু, পৃথিবীর 'অবজেকটিভ্'টা কিছুই নয়, 'সাবজেকটিভ্'টাই সমস্ত। নইলে একটা কুকুর বইত নয়। রাজা ভবতেব উপাখ্যান কিছুতেই মিথ্যে নয়।

তোমার—শরৎ

শরৎচন্দ্র সেই সময় ভেলুব মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে তাঁর মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কেও একটি চিঠি লিখেছিলেন। সে চিঠিখানি এই :—

বাজে শিবপুর। হাবড়া
২৮-৪-২৫

· ·শরীরটা তেমন সুস্থ নয়।

ভেলু বেঁচে নেই। গত বৃহস্পতিবারের আগের বৃহস্পতিবার আমি ঢাকা থেকে সকালে এসে পৌঁছাই। তখনি বেলগেছে হাসপাতাল থেকে তাকে মোটরে ক'রে বাড়ী আনি। এসেই কিন্তু সে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়ে।··· সাত দিন সাত রাত খাই নি, ঘুমাই নি—তবুও পরের বৃহস্পতিবার ভোর ৬টার সময় তার প্রাণ বাব হয়ে গেল। শেষ দিন বড় যন্ত্রণা পেয়েই সে গেছে।

বুধবারে জোর ক'রে কড়া ওষুধ খাওয়াবার চেষ্টা করি, চামচে দিয়ে মুখে গুঁজে দেবার অনেক চেষ্টা ক'রেও ওষুধ তার পেটে গেল না ; কিন্তু রাগের ওপর আমাকে কামড়ালে। সেদিন সমস্ত রাত আমার গলার কাছে মুখ রেখে কি তার কান্না। ভোর বেলায় সে কান্না তার থামলো।

আমার ২৪ ঘণ্টার সঙ্গী, কেবল এ দুনিয়ায় আমাকেই সে চিনেছিল। যখন কামড়ালে এবং সবাই ভয় পেলে, তখন রবিবাবুর এই কথাটাই শুধু মনে হ'তে লাগ্‌লো—'তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইক অবহেলা।' তার আঘাত ছিল, কিন্তু অবহেলা ছিল না। এর পূর্বে এত ব্যথা আমি আর পাই নি।

· ·ডাক্তার প্রভৃতি বহু বন্ধু-বান্ধবেই এখন ধরেছেন চিকিৎসা করাতে। অর্থাৎ পাগলা কুকুর কামড়ানোর পরে যা করা উচিত। উচিত যা তাই চলবে। ২৮টা ইঞ্জেক্‌শনের আজ ১০টা ইঞ্জেক্‌শন হয়ে গেল। আরো ১৮টা বাকি। তাও সম্পূর্ণ হবে। মানুষকে বাঁচতেই হবে,—কারণ, 'ইওর লাইফ্ ইজ্ ট্যু ভ্যালুয়েবল্'! দেখাই যাক্ 'ভ্যালুয়েবল্ লাইফ'-এর শেষটা কি দাঁড়ায়!—

তোমার—শরৎ

হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজের অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার যখন কলেজের ছাত্র, তখন তিনি শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের বাড়ীর ঠিক পাশের বাড়ীতেই থাকতেন। সেই হিসাবে শরৎচন্দ্রের বাড়ীর সকলের সঙ্গেই তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর অমরবাবু শরৎচন্দ্রের কলকাতার বাড়ীতে (শরৎচন্দ্র পরে কলকাতায় বাড়ী করেছিলেন) শরৎচন্দ্রের একটি লেখার খাতা দেখেছিলেন। সেই খাতার মলাটের ভিতর পিঠে শরৎচন্দ্র কয়েকটি মৃত্যু সংবাদ লিখে রেখেছিলেন। সেখানে ভেলুর মৃত্যু সংবাদও ছিল। ভেলুর মৃত্যু সংবাদটি এইরূপ লেখা ছিল :—

ভেলু

দেহত্যাগের দিন—

১০ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩২

সকাল ৬টা—২৩শে এপ্রিল ১৯২৫

সমাধি—বেলা ৯॥

বাজে শিবপুর। হাবড়া

রাত্রি দিনের সঙ্গী
আমার পরম স্নেহের বস্তু।

অমরবাবু বলেন—শরৎচন্দ্র ভেলুর শোওয়ার জন্য একটা ছোট তক্তপোষ তৈরি করিয়েছিলেন। তাতে কার্পেট পাতা থাকত এবং ভেলুর জন্য তার উপর একটা ছোট তাকিয়াও ছিল। শীতকালে আবার ভেলুর জন্য গরম বিছানারও ব্যবস্থা হ'ত।

শরৎচন্দ্র তাঁর ছেলেবেলা থেকে অনেক কুকুরই পুষেছিলেন, কিন্তু ভেলুই ছিল তাঁর সবচেয়ে আদরের। তাই তিনি তাঁর মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গো-পাধ্যায়ের কাছে ভেলুর সম্বন্ধে একদিন বলেছিলেন—

"ওর আগে পরে অনেক কেউ এলো গেল, কিন্তু ও যেন মাঝের মাণিকটি।" (শরৎ-পরিচয়)

ভেলু প্রায় ১৬ বছর বেঁচে ছিল। ভেলু মারা যাবার পরে, শরৎচন্দ্র শিবপুরে কালীকুমার মুখার্জী লেনে যখন থাকতেন, তখন আর কোন কুকুর পোষেন নি। তবে সামতাবেড়েয় গিয়ে তিনি আর একটি কুকুর পুষেছিলেন। তার নাম রেখেছিলেন 'বাঘা'।

সামতাবেড়ে বাস

শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীদের গ্রাম গোবিন্দপুর হচ্ছে, হাওড়া জেলার বাগনান থানার অন্তর্গত। বি, এন, আর-এর দেউলটি স্টেশন থেকে মাইল দুই উত্তর-পশ্চিমে এই গ্রাম। গ্রামটি খুবই ছোট। এর দক্ষিণেই লাগোয়া সামতা গ্রামটি কিন্তু খুব বড়। সামতা এবং গোবিন্দপুর দুটি গ্রামই রূপনারায়ণের তীরে অবস্থিত।

শরৎচন্দ্র হাওড়া শহরে থাকার সময় যখন মাঝে মাঝে তাঁর দিদির বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন, সেই সময় এখানে রূপনারায়ণের তীরে একটা মাটির বাড়ী করবেন, মনে করেছিলেন। এইরূপ মনস্থ করায়, কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এখানে গোবিন্দপুরের ঠিক গায়েই সামতায় একটা ভাল জায়গারও সন্ধান পেলেন।

সেই সময়ে (২১শে চৈত্র, ১৩২৫) এই জায়গাটার কথা উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র তাঁব পুস্তকের প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

"...অনেকদিন থেকে রূপনারায়ণ নদীর ধারে একটা মাটির বাড়ী করবার চেষ্টা করছি। খবর পেলাম আজই গেলে যা হোক্ একটা কিছু হয়। জমিটার দাম ১১০০৲ টাকা। এত টাকা ব্যাঙ্ক থেকে বার করতে আমার ভাবি মায়া হচ্ছে। তা ছাড়া বাড়ী করবার খরচটাও বেশী থাকবে না। আপনার কাছে নিবেদন যে, সেদিনের টাকা থেকে নিজে ৭০০৲ টাকা দিই, আর আপনি যদি ধার দেন ৪০০৲ টাকা তাহলে সুন্দর সুবিধে হয়।"

শরৎচন্দ্র এই জায়গাটাই কিনে এখানে বেশ বড় একটি বাড়ী করেছিলেন। জায়গাটা অনেকটা ছিল, তাই বাড়ী এবং বাড়ীর সংলগ্ন উঠান, গোয়ালঘর প্রভৃতি ছাড়াও, এই জায়গায় তিনি দুটা পুকুর কাটিয়েছিলেন এবং পুকুরের পাড়ে বাগানও করেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের মাটির বাড়ীটি দুতলা এবং প্যান টাইল দিয়ে সুন্দরভাবে ছাওয়া। বাড়ীর চার পাশেই ঢাকা বারান্দা। বাড়ীটি মাটির হলেও এর একতলায়, এমন কি দুতলায়ও মেঝে ও বারান্দা সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো।

বাড়ীটি দেখলেই মনে হবে অনেকটা বর্মীজ প্যাটার্ণের। বাড়ীটি বেশ

মজবুত ও শক্ত। এর দেওয়ালগুলি খুব চওড়া এবং দেওয়াল মাটির সঙ্গে উলু ঘাস মিশিয়ে 'উলুটি' করে মসৃণ করা।

শরৎচন্দ্র এখানে বাড়ী করে বাড়ীর পাশেই গোবিন্দপুরের মাঠে কয়েক বিঘা ভাল ধান জমিও কিনেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের বাড়ীটি সামতার একেবারে প্রান্তে বা বেড়ে অবস্থিত বলে, শরৎচন্দ্র তাঁর এই জায়গাটার নাম দিয়েছিলেন, সামতাবেড়। এই জন্যই তাঁর এখান থেকে লেখা সমস্ত চিঠিপত্রেই ঠিকানা হিসাবে দেখা যায়—সামতাবেড়, পানিত্রাস—পোস্ট, জেলা—হাবড়া। (আগেই বলেছি, শরৎচন্দ্র হাওড়াকে বরাবর লিখতেন, হাবড়া।)

শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে বাড়ী, পুকুর প্রভৃতি করতে মোট প্রায় সতেরো হাজার টাকা খরচ করেছিলেন। এ সম্বন্ধে পরে তিনি হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—"এ বাড়ীতে আজ পর্যন্ত বোধ করি হাজার ষোল সতেরো নষ্ট করলুম।"

শরৎচন্দ্র হাওড়া শহরে থাকার সময়েই সামতাবেড়ের বাড়ীটি তৈরি করান। বাড়ী তৈরি হওয়ার সময় তাঁর ভগ্নীপতি ও ভগ্নীপতির ভাইরা দেখাশুনা করতেন। শরৎচন্দ্র, ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্রকেও দেখাশুনার জন্য মাঝে মাঝে সামতাবেড়ে পাঠাতেন। আর তিনি নিজেও মাঝে মাঝে যেতেন। গিয়ে মিস্ত্রী ও মজুরদের নির্দেশ ও উপদেশ দিয়ে আসতেন।

শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ী যখন তৈরি হয়, তখন তিনি শিবপুরে কালীকুমার মুখার্জী লেনে থাকতেন। সামতাবেড়ের বাড়ী হলে প্রথমটায় তিনি ভেবেছিলেন, শহরে একটা আস্তানা রাখবেন এবং কিছুদিন সামতাবেড়ের বাড়ীতে, আবার কিছুদিন শিবপুরের ভাড়া বাড়ীতে কাটাবেন।

সেই সময় ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শরৎচন্দ্র তাঁর স্নেহভাজন কাশীর হরিদাস শাস্ত্রীকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

"কাল বাড়ী থেকে এসে তোমার চিঠি পেলাম।…আমার যথাপূর্বং।… 'কনস্টিপেশন' আমাকে নিয়ে তবে যাবে, এইটেই অবশেষে স্থির হয়েছে—যাক্, একটা কিছু এতদিনে বোঝা গেছে। অথচ দেশে গিয়ে জলবায়ুর গুণেই হোক, বা কিছু কিছু শারীরিক পরিশ্রম করি ব'লেই হোক—এ রোগটা ঢের কম থাকে। অতএব, শেষ চেষ্টার জন্য সপরিবারে শিবপুর ছেড়ে রূপনারায়ণ নদের তীরেই বছর খানেক বাস করব ঠিক করেছি।"

কিন্তু ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি সেই যে শিবপুর ছেড়ে গেলেন, আর হাওড়া শহরে ফিরলেন না। তখন থেকে তিনি সামতাবেড়েই বাস করতে লাগলেন।

শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে একজন সম্পন্ন গৃহস্থের মতই বাস করতেন। তাঁর নিজের ধান জমিতে বছরের ধান হ'ত। তাই চাল কিনতে হ'ত না। পুকুরে মাছের চাষ করেছিলেন। মাছের অভাবও ছিল না। বাড়ীতে জাল ছিল, ভৃত্য জাল ফেলে মাছ ধরত। কখন কখন জেলে এসেও মাছ ধরে দিয়ে যেত। কয়েকটা গরু পুষেছিলেন। প্রচুর দুধ হ'ত। বাগানে কিছু তরিতরকারীও হ'ত।

শরৎচন্দ্র হাওড়া শহর থেকে সামতাবেড়ে যখন যান, তখন তাঁর বই থেকে আয় দাঁড়িয়েছিল, মাসে ৬।৭ শ টাকারও বেশী। আর তাঁর এই আয় তখন ক্রমশঃ বাড়তির পথেই চলেছিল।

শরৎচন্দ্র কলকাতা থেকে দূরে গ্রামে চলে গেলেও, তাঁর কলকাতার স্নেহভাজন সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিকের দল প্রায়ই সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। আর সাময়িক পত্রের সম্পাদকরা তো লেখার আশায় যেতেনই। সভা-সমিতিতে শরৎচন্দ্রকে সভাপতি •করবার জন্যও কত লোক সেখানে যেতেন।

শরৎচন্দ্র যখন হাওড়া শহর ছেড়ে সামতাবেড়ে যান, তখনও তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। তাই হাওড়া শহর ও গ্রামাঞ্চলের কংগ্রেসকর্মীরা নিয়তই তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন।

এই সময় ১৩৩৩ সালে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাস প্রকাশিত হ'লে বাঙ্গলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরাও শরৎচন্দ্রকে তাঁদের একজন বড় সমর্থক জেনে গোপনে তাঁর কাছে যেতেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর সামতাবেড়ের বাড়ীতে সকল আগন্তুককেই কিছু না খাইয়ে কখন ছাড়তেন না। অতিথিদের কেউ কেউ খেতে না চাইলে, তিনি তাঁদের বলতেন—তোমরা কত কষ্ট করে এত দূরে আমার বাড়ীতে যখন এসেছ, তখন কিছু খেয়ে যেতেই হবে।—এই বলে তিনি সকলকেই কিছু না কিছু খাওয়াতেন। সকালে গেলে অনেককে মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়ে এবং বিশ্রাম করিয়ে, বিকালে ছাড়তেন।

শরৎচন্দ্র আগন্তুক সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের শুধু খাওয়াতেনই না, তাঁদের তিনি রীতিমত অর্থ সাহায্যও করতেন। এই সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা সাধারণতঃ গভীর রাত্রে অন্ধকারে রূপনারায়ণে ডিঙি বেয়ে শরৎচন্দ্রের কাছে আসতেন। দিনে যাঁরা আসতেন, তাঁরা ছদ্মবেশে আসতেন। কারণ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তখন অর্ডিন্যান্স জারি করে বাঙলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের ব্যাপকভাবে ধর-পাকড় সুরু করেছিল। বিপ্লবীরা তখন আত্মগোপন করে বেড়ালেও, কিন্তু আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল পুরা মাত্রায়।

এই সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের যোগাযোগের কথা জেনে তখন কোন কোন কংগ্রেসকর্মী শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করতেন—আপনি হাওড়া কংগ্রেসের নেতা হিসাবে কংগ্রেস হাই-কমাণ্ডের নির্দেশ অনুযায়ী অহিংস সংগ্রামে বিশ্বাসী হয়েও, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন কেন ?

এঁদের এ প্রশ্নের উত্তরে শরৎচন্দ্র তখন বলতেন—দেখ, সন্ত্রাসমূলক আন্দোলনকে আমি সমর্থন করি না সত্য, কিন্তু তবুও কি জানি এই বিপ্লবীদের উপর আমার একটু সহানুভূতি আছে। আমার দেশের স্বাধীনতার জন্য যে যে-পথেই কাজ করুক না কেন, আমি সকলকেই শ্রদ্ধা করি। সেই জন্যেই আমি এঁদের খোঁজ-খবরও রাখি এবং নিজের সাধ্যমত কিছু কিছু সাহায্যও করে থাকি।

সামতাবেড়ের পাশেই পানিত্রাসে ছেলেদের একটি উচ্চ বিদ্যালয় থাকলেও, তখন এখানে মেয়েদের শিক্ষার জন্য কোন বিদ্যালয় ছিল না। তাই শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে এসে এ অঞ্চলে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর চেষ্টায় একটি বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপিত হ'ল। সে বিদ্যালয়টি আজও রয়েছে এবং সেটি এখন একটি বড় বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের বাড়ী থেকে তাঁর দিদিদের বাড়ী, হেঁটে বড় জোর ৫ মিনিটের পথ। শরৎচন্দ্রের ভগ্নীপতি পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় খুবই অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। তিনি তাঁর আরও তিন ভাইকে নিয়ে একান্নভুক্ত হয়ে বাস করতেন। শরৎচন্দ্রের ভগ্নীপতি পঞ্চাননবাবু প্রতিদিন সকালে শরৎচন্দ্রের বাড়ী বেড়াতে আসতেন। আর শরৎচন্দ্রও প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময় দিদির বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন। সেখানে রাত্রি প্রায় ৯টা পর্যন্ত গল্পগুজব করে তবে বাড়ী ফিরতেন।

শরৎচন্দ্র বিকালের দিকটায় সাধারণতঃ পাড়ার ছেলেরা যেখানে খেলা করত, সেখানে গিয়ে বসতেন। তিনি প্রায়ই বিকালে সের দুয়েক করে ছোলা কড়াই কিনে নিয়ে তাঁর দিদির মেজ জা সুকুমারী দেবীর কাছে গিয়ে বলতেন—মেজদি, এই ছোলাগুলো ভেজে দিন।

ছোলা ভাজা হলে, শরৎচন্দ্র একটা পাত্রে করে ছোলাভাজা নিয়ে, ছেলেরা যেখানে খেলা করত সেখানে গিয়ে বসতেন এবং ছেলেদের মুঠো মুঠো করে ছোলাভাজা দিতেন।

তিনি এদের যে শুধু ছোলাভাজাই খাওয়াতেন তা নয়, সপ্তাহে দুদিন করে বিস্কুটও খাওয়াতেন। শরৎচন্দ্র একজন বিস্কুট-ফেরিওয়ালার সঙ্গে চুক্তি করে রেখেছিলেন। সে সপ্তাহে দুদিন—মঙ্গলবার আর শনিবার বিকালে ঐ ছেলেদের খেলার জায়গায় বিস্কুট নিয়ে আসত। সে এলে তার কাছ থেকে সমস্ত বিস্কুট কিনে নিয়ে তিনি ছেলেদের খাওয়াতেন।

শরৎচন্দ্র সামতাবেড় ও এর আশেপাশের দুঃস্থ ও দরিদ্রদের নিয়মিত সাহায্য করতেন। শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে আসার সময় থেকেই যে এখানকার দুঃস্থ দরিদ্রদের সাহায্য করতেন তা নয়, তিনি যখন হাওড়া শহরে থাকতেন, তখনও তিনি তাঁর দিদির বাড়ীতে এসে এখানকার দরিদ্রদের সাহায্য করে যেতেন। এ সম্পর্কে ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধর সেনের একটি লেখা এখানে উদ্ধৃত করছি। শরৎচন্দ্রের ৫৭তম জন্মদিনে তাঁকে যে 'শরৎ-বন্দনা' পুস্তক উপহার দেওয়া হয়েছিল, সেই পুস্তকে জলধরবাবুর 'শরৎচন্দ্র' নামক প্রবন্ধে এই অংশটি আছে। জলধরবাবু লিখেছেন—

"শরৎচন্দ্র তখনও শিবপুরে বাস করেন। একদিন প্রাতঃকালে আমি শিবপুরে শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলাম। সেদিন রবিবার। আমি প্রায় প্রতি রবিবারেই শরতের বাসায় যেতাম, সারাদিন সেখানে কাটিয়ে রাত আটটা-নটায় কলিকাতায় ফিরে আসতাম।

সেদিন প্রাতঃকালে গিয়ে দেখি, ঘরের মধ্যে একরাশি ছোট বড় কলের ধুতি শাড়ী ছড়ানো রয়েছে। শরৎচন্দ্রের ভৃত্য সেগুলি গুছিয়ে বাঁধবার আয়োজন করছে। শরৎ একখানি চেয়ারে বসে সুমুখের টেবিলে আনি-দুয়ানি, সিকি গণে গণে গোছাচ্ছেন। আমাকে দেখেই বললেন—দাদা, আমি এই

দশটার গাড়ীতে দিদির বাড়ী যাব। তা ব'লে আপনি চলে যাবেন না। যাবেন রাত সেই দশটায়।

আমি বললাম—দিদির বুঝি কোন ব্রত-প্রতিষ্ঠা আছে? তাই এত কাপড় নিয়ে যাচ্ছ, আর কাঙালী বিদায়ের জন্য ঐ আনি-দুয়ানি?

শরৎ আমার দিকে চেয়ে বললেন—না দাদা, দিদির ব্রত-প্রতিষ্ঠা নয়! এই বলেই সে চুপ করল, আসল কথাটা গোপন করাটাই তার ইচ্ছা।

আমি বললাম—ব্রত-প্রতিষ্ঠা নয়, তবে এত নূতন কাপড়ই বা নিয়ে যাচ্ছ কেন? অত সিকি দুয়ানিরই বা কি দরকার।

শরৎ অতি মলিনমুখে বললেন—দাদা, দিদির গাঁয়ের আর তার চার পাশের গাঁয়ের গরীব দুঃখীদের যে কি দুর্দশা! তাদের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, চালে খড় নেই। সে যে কি—শরৎ আর বলতে পারল না; তার দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

এই আমার শরৎচন্দ্র! এই শরৎচন্দ্রকে আমি ভালবাসি, ভক্তি করি। এই শরৎচন্দ্রকে আজ আমি বন্দনা করছি।"

শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে ছিলেন, তখনই তিনি তাঁর সেখানকার দুঃস্থ প্রতিবেশীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। তিনি রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে হাওড়া শহরে থাকার সময়ও তাঁর পাড়ার গরীব দুঃখীদের কোন অর্থ না নিয়ে চিকিৎসা করতেন। এমন কি এই সময় তিনি হাওড়া শহর থেকে তাঁর দিদির বাড়ীতে গিয়েও সেখানকার দরিদ্রদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করে আসতেন এবং পথ্যও দিয়ে আসতেন। এ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের নিজেরই লেখা একটি চিঠি এখানে উদ্ধৃত করছি। এই চিঠিটি তিনি ২৪-১১-১৯ তারিখে বাজে শিবপুর থেকে তাঁর সাহিত্য-শিষ্যা লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন। চিঠিটি এই :—

"পরম কল্যাণীয়াসু,

...দিদির শাশুড়ীর কাজকর্ম খুব ঘটাপটা করিয়া সারা হইল। আমি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তাদের দেশে ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর বড্ড বেশী, গরীব দুঃখীরা মরছেও মন্দ না। ওষুধের বাক্স নিয়ে গিয়েছিলাম, নিজে গোটা দুই মাত্র মারিতে পারিয়াছি—আরও কিছুদিন থাকিতে পারিলে আরও কোন না গোটা দুই তিন শিকার মিলিত! দুর্ভাগ্য—কাবু হইয়া পড়িলাম (ওষুধ ও

বিশেষ করিয়া পথ্যের অভাবেই,—তোমাদের ভগবানের শ্রীচরণে তাদের দ্রুত আশ্রয় মিলিতেছে)। তবু ফিরিয়া আসিয়াছিলাম আর কিছু ওষুধ ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে, কিন্তু মনে হইতেছে কাল সকাল নাগাদ নিজের জ্বরটাই বেশ সুস্পষ্ট হইতে পারিবে। আজকের দিনটা কোনমতে চাপা আছে। আর এমনি চাপাই থাকে ত পরশু আবার যাইব।"

শরৎচন্দ্র হাওড়া শহর ছেড়ে সামতাবেড়ে যখন থেকে বাস করতে লাগলেন, তখন থেকে ঐ অঞ্চলের লোকদের অসুখে চিকিৎসা করা, তাঁর একটা কাজই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রোগী দেখে তিনি শুধু ওষুধই দাতব্য করতেন না, অভাবী রোগীদের পথ্যও কিনে দিতেন। আবার অনেক সময় তাঁকে না ডাকলেও, তিনি লোকের বিপদ শুনে নিজেই গিয়ে চিকিৎসা করে আসতেন। একবার রূপনারায়ণের বন্যার সময় এক নৌকার মাঝির বিপদ শুনে কিভাবে তার চিকিৎসা করে এসেছিলেন, সামতাবেড় থেকে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা তাঁর সেই সময়কার একটি চিঠি থেকে তা পরিষ্কার জানা যায়। শরৎচন্দ্রের সেই চিঠিটি এই —

"··· এই মাত্র একজন নৌকার মাঝির চিকিৎসা ক'রে এলাম। সর্বাঙ্গে 'টিন্চার আয়োডিন্' মাখিয়ে 'আরণিকা' খাবার ব্যবস্থা ক'রে, তাপ সেকের বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে ফিরছি। কাল রাত্রে তার নৌকো ডুবে, তার ওপর দিয়ে নৌকো ভেসে গিয়েছিল।"

সমাজ লাঞ্ছিতা, অনাথা, অসহায় বিধবা—এদের উপর শরৎচন্দ্রের বরাবরের একটা গভীর দরদ ছিল। তিনি যখন সামতাবেড়ে বাস করতেন, তখন এ অঞ্চলের, শুধু এ অঞ্চলেরই কেন, অন্য স্থানেরও এই সব শ্রেণীর নারীদের শুধু অর্থ সাহায্যই করতেন না, প্রয়োজন হলে তাদের নিজের বাড়ীতে আশ্রয়ও দিতেন। এ সম্পর্কে একটা উদাহরণ দিচ্ছি :—

শরৎচন্দ্র ১৯১৯।২০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ একবার কাশী গেলে সেখানে প্রতুল মুখোপাধ্যায় নামে একটি যুবকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। প্রতুলবাবু হাওড়ার শিবপুরের লোক। তিনি তখন কাশীতে কাজ করতেন। এই প্রতুলবাবু কয়েক বছর পরে দুর্গা দেবী নামে একটি বিধবাকে বিবাহ করেন। বিবাহ দেয় হিন্দু মিশন। এই বিধবা-বিবাহে প্রতুলবাবুর আত্মীয়-স্বজনদের আদৌ সমর্থন ছিল না।

প্রতুলবাবু ঐ সময় শরৎচন্দ্রের উপদেশ ও সাহায্য চাইলে, শরৎচন্দ্র দুর্গা দেবীকে কন্যার মত করে নিজের সামতাবেড়ের বাড়ীতে কিছুদিন আশ্রয় দিয়েছিলেন। আর শুধু আশ্রয় দেওয়াই নয়, তখন তাঁকে নিজেই কিছু কিছু লেখাপড়া শেখাবারও চেষ্টা করেছিলেন। ঐ সময় শরৎচন্দ্র হিন্দু মিশনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী সত্যানন্দকে এঁদের বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করে একটি চিঠি দিলে, স্বামী সত্যানন্দ তখন যে উত্তর দিয়েছিলেন, সেই চিঠিটি প্রতুলবাবু ও তাঁর স্ত্রীর কাছে আমি দেখেছি। তাতে শরৎচন্দ্রের দুর্গা দেবীকে আশ্রয় দেওয়ার কথা পরিষ্কার রয়েছে। সে চিঠিটি এই :—

হিন্দু মিশন। ত্রিকোণেশ্বর মন্দির।
৩২বি হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কালীঘাট,
কলিকাতা।
২-৩-১৯৩৪

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু,

প্রতুলবাবুর সহিত প্রেরিত আপনার পত্র পাইলাম। আপনি মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়াছেন এবং কন্যার মত কাছে রাখিয়াছেন জানিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। বিবাহ আমাদের এখানে হইয়াছে—আইন সঙ্গত প্রমাণ প্রয়োগ সমুদয় যথাযথ আছে। এবং আমাদের সাহায্য যখনি প্রয়োজন হইবে. তখনি পাইতে পারিবেন। প্রতুলবাবুর প্রতি আমাদের বেশী সহানুভূতি নাই—কিন্তু শ্রীমতী দুর্গা দেবীর প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে—এবং তাঁহার যাহাতে শুভ হইবে, এমন কাজে আমাকে সর্বদাই পাইবেন।

আপনি যে আমাকে মনে রাখিয়াছেন এবং কনিষ্ঠের মত ভালবাসেন, তাহা আপনার পত্রে বুঝিতে পারিয়া খুবই আনন্দ পাইলাম। আমি আজ ৺কাশীধামে যাইতেছি, ১২।১৩ দিন পরে ফিরিব। আপনি যখন কলিকাতা আসিবেন, তৎপূর্বে অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন—আপনার সহিত আমি সাক্ষাৎ করিতে যাইব। শ্রীভগবানের নিকট আপনার দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি। ইতি—

ভবদীয়—বিনীত
স্বামী সত্যানন্দ

সাহিত্যিক মনোজ বসুর একটি লেখায় শরৎচন্দ্রের সামতাবেড় অঞ্চলের

দুঃস্থ ব্যক্তিদের অর্থ সাহায্য করা, চিকিৎসা করা, সমাজ-লাঞ্ছিতাদের প্রতি দরদী হওয়া প্রভৃতির নজির পাওয়া যায়। তাঁর সেই লেখাটি এই :—

"সামতাবেড়ের পল্লীবাসে শরৎচন্দ্রকে দু একবার দেখেছি।…মনে পড়ে সেটা শীতকাল। উঠান ও বারাণ্ডা ভরে গেছে—গ্রামের নানাবয়সী স্ত্রী-পুরুষের সকলের মাঝখানে ইজিচেয়ারে বসে দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র।…

সুদূর গ্রামপ্রান্তে দাদাঠাকুরের গোপন কীর্তি অনেকক্ষণ ধরে দেখা গেল। শুধু পয়সা দিয়ে দায় সারা নয়, ঘর-গৃহস্থালীর সকল খবর নিয়ে তবে এক একজনের ছুটি। একজনকে বললেন—তোর মেয়ে কেমন আছে রে ছবির মা?

—ভাল আছে দাদাঠাকুর, ওষুধ তোমার ধন্বন্তরী।

—কিন্তু ছেলেটাকে তোরা এমন অসাবধানে ফেলে দিলি! ভেসে ভেসে শেষে ঐ চড়ায় এসে আটকাল। কাকে শকুনে ভীড় করে এসেছে—দেখে থাকতে পারলাম না। তুলে আবার মাঝ নদীতে ফেলে দিয়ে এলাম। বামুনকে দিয়ে শেষটা মড়া ফেলিয়ে ছাড়লি, হাঁরে ছবির মা?

বুড়ি ছবির মা আঁচলে চোখ ঢাকল।

সেদিন সন্ধ্যায়…সকাল বেলাকার সেই ছবি মেয়েটির প্রসঙ্গ উঠল। মেয়েটি কুলীন জাতের নয়। বছর আষ্টেক বয়সে বিয়ে হয়। পতিটি পিতামহ-কল্প—অন্তত বয়সের দিক দিয়ে—সত্বরই পরমাগতি লাভ করলেন। রইল মেয়েটা আর তার অটুট স্বাস্থ্য। সম্প্রতি ঘরের চাল কেটে মেয়ে ও মাকে পাড়ার মধ্যে থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে; তারা নাকি কোন কোন সমাজ-মণির বংশদুলালকে খারাপ করছে। বংশদুলালেরা যে পাড়ার বাইরের পথ না চেনেন এমন নয়। বিপন্ন মা-মেয়ের দিন কাটছিল দাদাঠাকুরের দয়ায়। মেয়েটির অনেক দুঃখের ধন একটি ছেলে—সেটিও আগের দিন মারা গেছে।" ('শরৎ-কথা'—ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪৪)

শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীটা একেবারে রূপনারায়ণের তীরেই। শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে রূপনারায়ণ সামতাবেড়ের কোল ঘেঁষে বয়ে যেত এবং এই দিকেরই কূল ভাঙ্গত। রূপনারায়ণ এখন তার গতি বদলে সামতাবেড় থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছে এবং অপর পারে পশ্চিম তীরের গা দিয়েই বয়ে চলেছে।

শরৎচন্দ্র অনেক সময় তাঁর এই বাড়ীর দুতলায় নদীর দিকের ঢাকা

বারান্দার ইজিচেয়ারে শুয়ে গড়গড়ায় তামাক খেতে খেতে নদীর জলের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। জোয়ার ভাটায় নদীর জলের গতি, নদীতে মাঝিদের পাল তোলা নৌকার যাতায়াত, অপরাহ্নে নদীর জলে সূর্যাস্তের দৃশ্য প্রভৃতি দেখতেন।

বর্ষাকালে এক একবার বন্যার সময় রূপনারায়ণ ভীষণ আকার ধারণ করত। তখন রূপনারায়ণের জল শরৎচন্দ্রের বাড়ীর ভিতরেও এসে যেত। রূপনারায়ণের এইরূপ একবারের বন্যাব কথা উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র তখন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

"...যাক্, একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে। এ বাড়ী রূপনারায়ণকে উৎসর্গ করে বেঁচেছি। বান ও বন্যায় ঐ নদী যে কি ভীষণ হতে পারে, এবারে ভাল করে দেখলাম। যে নদীর ধারের বাঁধ দিয়ে তোমরা আমাদের এখানে আসতে, সে নেই। বোধ হয় আজকের জোয়ারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তারপর জল আর জল! বাঙলা দেশের ষড়-ঋতুর অর্থ যে সত্য সত্যই কি বস্তু, তা এখানে বছরখানেক না থাকলে বোধ করি জানাই যায় না। এও একটা পরম লাভ।...

দিন দশ পনেরো বান আব জোয়ার। এখানে মাটি দেওয়া আর ওখানে গর্ত বোজানো, এই নিয়েই কেটে যাচ্ছে।"

রূপনারায়ণের বন্যার সময় শরৎচন্দ্র শুধু নিজের বাড়ীতেই মাটি দিতেন বা গর্ত বোজাতেন না, প্রয়োজন হলে তখন ঐ অঞ্চলের পাঁচজনের সঙ্গে মিশে বড় কাজেও লেগে যেতেন। শরৎচন্দ্রের এই ধরণের একটি কাজের এখানে উল্লেখ করছি :—

সামতাবেড়ে থাকার সময় শরৎচন্দ্র প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময় তাঁর দিদিদের বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন এবং রাত্রি ৮।৯টা পর্যন্ত বাড়ীর পুরুষ ও মেয়েদের সঙ্গে গল্প করে তবে বাড়ী ফিরতেন।

সেদিন রাত্রি প্রায় ৯টা। শরৎচন্দ্র গল্প সেরে উঠি উঠি করছেন, এমন সময় জনকয়েক লোক এসে শরৎচন্দ্রের দিদির সেজ দেওর পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়কে খবর দিল, রূপনারায়ণের বন্যার জলে বিরামপুরের খাল কানায় কানায় ভরে গেছে। খালের জলের চাপে গোবিন্দপুরের মাঠের বাঁধ ভেঙে গিয়ে মাঠে জল ঢুকছে। এখনি বাঁধ না বাঁধলে মাঠের ধানগাছ সব বন্যার জলে ডুবে যাবে।

পাঁচকড়িবাবু স্থানীয় ওড়কুলি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং গ্রামের একজন প্রধান ও কর্মীপুরুষ। তাই লোকে প্রথমেই পাঁচকড়িবাবুকে এই সংবাদটা দিতে এসেছে।

খবর শুনে পাঁচকড়িবাবু তো মহা ভাবনায় পড়লেন। বন্যার হাত থেকে মাঠের বাঁধকে কিভাবে রক্ষা করা যায়, চিন্তা করতে লাগলেন।

গ্রামের লোক এসে পাঁচকড়িবাবুকে যখন বাঁধ ভাঙার সংবাদটা দেয়, তখন শরৎচন্দ্রও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি শুনেই বললেন—সর্বনাশ, বাঁধ ভেঙেছে কি করে! মাঠ ডুবে গেলে লোকে বাঁচবে কি খেয়ে? এখনি বাঁধ বাঁধবার জোগাড় কর পাঁচকড়ি। আমিও যাচ্ছি চল।

তারপর তিনি তাঁর দিদির দেওরপোদের কয়েকজনকে ডেকে বললেন—তোরা এখনি আমার বাড়ীতে গিয়ে, আমার সেই হ্যাসাক আলোটা নিয়ে আয়। হ্যাসাক জ্বাললে অনেকদূর পর্যন্ত আলোয় দেখা যাবে। তাতে এই অন্ধকার রাত্রে বাঁধ বাঁধার কাজে সুবিধে হবে।

সে রাতটা ছিল আবার কৃষ্ণপক্ষের রাত। তার উপর আকাশে জমাট মেঘ থাকায় চারদিক যেন মসীগোলা দেখাচ্ছিল।

গোবিন্দপুর গ্রামটি যেমন ক্ষুদ্র, এই গ্রামের সংলগ্ন মাঠটিও তেমনি ছোট। মাত্র ৮০।৯০ বিঘা জমির মাঠ।

গোবিন্দপুরে ৫০।৬০ ঘর লোকের বাস। তার মধ্যে অনেকের আবার জমি নেই। তাই এই মাঠে যাদের জমি আছে, তারাই কেবল ঝোড়া, কোদাল ও কাটারি নিয়ে এসে হাজির হল। শরৎচন্দ্রসহ জন পঁচিশ মাত্র লোক হল।

শরৎচন্দ্রের হ্যাসাক আলোটা জ্বালা হলে, আলোর চারপাশে অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যেতে লাগল।

সকলে মিলে আগে বাঁশ কাটতে বার হলেন। এর ওর ঝাড় থেকে কতকগুলো বাঁশ কেটে নিয়ে সকলেই সেই বাঁধের ধারে গেলেন। তারপর বাঁশগুলো কয়েক খণ্ড করে কেটে বাঁধের যে-জায়গাটা ভেঙে গিয়েছিল, সেখানে ঘন ঘন পুতলেন।

বাঁশ পোতা হলে সেই বাঁশের গায়ে মাটির চাপ বসানো সুরু হল।

বানের জলে বাঁধের আশপাশ ডুবে যাওয়ায় মাটি নেই দেখে পাশে উঁচু শ্মশান থেকেই মাটি কাটা ঠিক হল।

যারা যুবক ও শক্তিমান, তারাই প্রধানত কোদাল দিয়ে মাটির চাপ কাটতে লাগল। অন্যরা সেই মাটির চাপগুলো বাঁশের গায়ে বসিয়ে বসিয়ে বাঁধ দিতে লাগল।

তাড়াতাড়ি বাঁধ বাঁধতে পারলেই বন্যার জলকেও তাড়াতাড়ি রোখা যাবে, তাই খুব ব্যস্ততার সঙ্গেই বাঁধ বাঁধা হচ্ছিল।

শরৎচন্দ্রও এঁদের সঙ্গে বাঁধ বাঁধছিলেন। একটি যুবক বড় বড় করে মাটির চাপ কেটে কোদালে করেই শরৎচন্দ্রের হাতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিল, আর শরৎচন্দ্র সেই চাপগুলোকে বাঁধে বসিয়ে বসিয়ে দিচ্ছিলেন।

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল, যুবকটির কোদাল থেকে মাটির চাপ না এসে একটি অর্ধগলিত শিশু শরৎচন্দ্রের হাতে এসে পড়ল। এই গন্ধময় গলিত শিশুটি হাতে পড়তেই শরৎচন্দ্র বলে উঠলেন—আ-হা-হা, কাদের একটা শিশুকে এখানে মাটি দিয়ে গিয়েছিল রে! সেই শিশুটাই কোদালের মুখে উঠে এসেছে।

এই বলে তিনি সেই অর্ধগলিত শিশুটির কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কোদালের মুখে কাটা গেছে কিনা আলোয় মেলে দেখতে লাগলেন। শিশুটির কোন অঙ্গ ছিন্ন হয়নি দেখে, শরৎচন্দ্র অত্যন্ত মমতার সহিত সেই শিশুর অর্ধগলিত দেহটিকে একটু দূরে শুইয়ে রাখলেন। শুইয়ে রেখে এসে আবার বাঁধে মাটির চাপ বসাতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে বাঁধ বাঁধা হয়ে গেলে, শরৎচন্দ্র এবার একটি যুবককে দিয়ে বেশ গভীর করে একটি গর্ত খুঁড়িয়ে নিজের হাতে শিশুটিকে সেই গর্তে শুইয়ে মাটি দিলেন।

শরৎচন্দ্রের যে হ্যাসাক আলোটি ছিল, আশপাশের গ্রামের কারও বাড়ীতে অন্নপ্রাশন, পৈতা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কাজকর্ম হলেই সে এই আলোটি নিয়ে যেত। নিজের যত না হোক্‌, গ্রামের লোকের প্রয়োজন হবে বলেই শরৎচন্দ্র তখন এই আলোটি কিনেছিলেন।

শরৎচন্দ্র এইরূপ নিজের জন্য তো বটেই, তাছাড়া আশপাশের কারও বাড়ীতে রাত্রে যাতে না চোর ডাকাত আসে, সেজন্য একটি দুনলা বন্দুক কিনেছিলেন। এছাড়া তাঁর একটি রিভলবারও ছিল। শরৎচন্দ্র তখন সাধারণতঃ রাত্রে কোথাও বেরোলে, এই রিভলবারটি জামার পকেটে নিয়ে বেরোতেন।

একবার তখন গ্রীষ্মকাল। শরৎচন্দ্র রাত্রে তাঁর দিদির বাড়ী থেকে নিজের বাড়ীতে ফিরছেন। এমন সময় দেখেন পথে এক জায়গায় অনেকগুলি লোক হ্যারিকেনের আলো হাতে নিয়ে জটলা করছে। শরৎচন্দ্র কাছে এসে কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করায়, একজন বললে—এই যে দেখুন না, একটা গোখরো সাপ ঐ বড় গাছটার গোড়ায় কোটরে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। কিভাবে সাপটাকে মারা যাবে, তাই আমরা ভাবছি।

শরৎচন্দ্র শুনে একজনকে বললেন—কই হ্যারিকেনটা দেখি।—এই বলে তিনি হ্যারিকেনটা নিয়ে, জামার পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে সাপটাকে মেরে দিলেন।

তখন লোকগুলি সেই মরা সাপটাকে রূপনারায়ণের চড়ায় পোড়াবার জন্য নিয়ে গেল।

পথের দাবী বাজেয়াপ্ত হওয়ার কিছুদিন পরে তৎকালীন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট শরৎচন্দ্রের এই রিভলবারটি তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের প্রতিবেশী অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাড়ী সামতাবেড়ের নিকটেই দেউলগ্রামে। হাওড়া শহর থেকে দেউলগ্রাম যেতে হলে সামতাবেড় অতিক্রম করে যেতে হয়। এই অমরবাবুও বলেন—"শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে থাকার সময় আমি বাড়ী যাওয়ার পথে প্রতিবারেই আগে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে তবে বাড়ী যেতাম। পথের দাবী বাজেয়াপ্ত হওয়ার কিছুদিন পরে এইরূপ একবার বাড়ী যাওয়ার পথে শরৎচন্দ্রের কাছে গেলে, তিনি আমাকে দেখেই বলে উঠলেন—আজ যামিনীবাবু নামে কে এক পুলিশ অফিসার এসে আমার রিভলবারটা কেড়ে নিয়ে গেল। নেবার সময় বললে—কি করি বলুন শরৎবাবু! আমরা নিরুপায়। গবর্ণমেণ্টের আদেশ, নিয়ে যেতেই হবে।"

'পথের দাবী' ও রবীন্দ্রনাথ

পথের দাবী বাজেয়াপ্ত হলে, সেই সময় শরৎচন্দ্র একখানি এই বই রবীন্দ্রনাথের কাছে দিয়ে আসেন। শরৎচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, বইখানি বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রতিবাদ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বইটি পড়ে কোন প্রতিবাদ না করে শরৎচন্দ্রকে তখন এই চিঠিখানি লিখেছিলেন—

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

তোমার 'পথের দাবী' পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। লেখকের কর্তব্যের হিসাবে সেটা দোষের না হতে পারে—কেননা লেখক যদি ইংরেজ-রাজকে গর্হণীয় মনে করেন, তাহলে চুপ করে থাকতে পারেন না। কিন্তু চুপ করে না থাকার যে বিপদ আছে, সেটুকু স্বীকার করাই চাই। ইংরেজরাজ ক্ষমা করবেন, সেই জোরের উপরেই ইংরেজরাজকে আমরা নিন্দা করব, সেটাতে পৌরুষ নেই। আমি নানা দেশ ঘুরে এলাম—আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে এই দেখলেম, একমাত্র ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোনো গবর্ণমেণ্টই এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না। নিজের জোরে নয়, পরন্তু সেই পরের সহিষ্ণুতার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাতে চাই, তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনা মাত্র—তাতে ইংরেজ রাজের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়, নিজের প্রতি নয়। রাজশক্তির আছে গায়ের জোর, তার বিরুদ্ধে কর্তব্যের খাতিরে যদি দাঁড়াতেই হয়, তাহলে অপর পক্ষে থাকা উচিত চারিত্রিক জোর—অর্থাৎ আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোর। কিন্তু আমরা সেই চারিত্রিক জোরটাই ইংরাজরাজের কাছে দাবী করি, নিজের কাছে নয়। তাতে প্রমাণ হয় যে, মুখে যাই বলি, নিজের অগোচরে ইংরেজকে আমরা পূজা করি—ইংরেজকে গাল দিয়ে কোন শাস্তি প্রত্যাশা না করার দ্বারাই সেই পূজার অনুষ্ঠান। শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে তোমাকে কিছু না বলে

তোমার বইকে চাপা দেওয়া প্রায় ক্ষমা। অন্য কোন প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিদেশী রাজার দ্বারা এটি হত না। আমরা রাজা হলে যে হতই না, সে আমাদের জমিদারের ও ভারতীয় রাজন্যের বহুবিধ ব্যবহারে প্রত্যহই দেখতে পাই। কিন্তু তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? আমি তা বলি নে—শাস্তিকে স্বীকার করেই কলম চলবে। যে কোনো দেশেই রাজশক্তিতে প্রজাশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটেছে, সেখানে এমনিই ঘটেছে—রাজ-বিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাকতে পারে না, এই কথাটা নিঃসন্দেহ জেনেই ঘটেছে।

তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখতে, তাহলে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হত—কিন্তু তোমার মত লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে—দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই—অপরিণত বয়সের বালক বালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরেজরাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ করে না দিত, বোঝা যেত যে সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা বা অজ্ঞতা। শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য—আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করলে, সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই মাটি করে দেওয়া হয়। ইতি—২৭ মাঘ, ১৩৩৩

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি পেয়ে শরৎচন্দ্র সেই সময় পথের দাবীর প্রকাশক উমাপ্রসাদবাবুকে লিখেছিলেন—

"পরম কল্যাণীয়েষু,

বিজু,...শ্রীযুক্ত রবিবাবুর চিঠি পেয়েছি। তাঁর অভিমত মোটের উপর এই যে, বইখানি পড়লে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। এবং তাঁর অভিজ্ঞতা এই যে, স্বদেশে বিদেশে যত রাজশক্তি আছে, ইংরাজের মত ক্ষমাশীল আর কেউ নয়। মাত্র বইখানি চাপা দিয়ে আমাকে কিছু না বলা আমাকে ক্ষমা করা। অর্থাৎ এটুকু বোঝা গেল, এ বই পড়ে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন।

তোমার গল্প পাতাখানেক লিখেই থেমে আছে। আজ আবার আরম্ভ কোরব। কিন্তু কোন কিছুতেই যেন আর মনঃসংযোগ করতে পারছি নে।...»

শরৎচন্দ্র এই সময় হাওড়া জেলার রূপনারায়ণ নদের তীরে সামতাবেড় গ্রামে নিজের বাড়ীতেই বাস করছিলেন। উমাপ্রসাদবাবু শরৎচন্দ্রের এই চিঠি পেয়েই সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের কাছে যান। গিয়ে তিনি দেখেন, শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে খুবই উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ। উমাপ্রসাদবাবু আরও দেখলেন যে, শরৎচন্দ্র ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের চিঠির একটা উত্তরও লিখে রেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথের চিঠির জবাবটি পাঠানো হবে কিনা, এ বিষয় নিয়ে শরৎচন্দ্র উমাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে আলোচনা করলেন। শেষে, বাদানুবাদের মধ্যে যেতে আর ইচ্ছা করে না, এই স্থির করে শরৎচন্দ্র চিঠির উত্তরটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠালেন না।

পরে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ঐ চিঠি এবং নিজের লেখা ঐ উত্তর দুই-ই উমাপ্রসাদবাবুকে রাখতে দিয়েছিলেন। সে দুটি চিঠি আজও (এ প্রসঙ্গ লেখার সময় পর্যন্ত) উমাপ্রসাদবাবুর কাছেই আছে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের সমস্ত চিঠিরই নকল শান্তিনিকেতনে রয়েছে। সেই হিসাবে পথের দাবী নিয়ে শরৎচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিটির নকলও শান্তিনিকেতনে থাকে। রবীন্দ্রনাথেব মৃত্যুর পর বিশ্বভারতী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ঐ চিঠিটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের উত্তরটি উমাপ্রসাদ-বাবুর কাছে অপ্রকাশিতভাবেই থেকে যায়।

১৩৫৯ ও ১৩৬০ সালে 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় আমি যখন শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ লিখি এবং শরৎচন্দ্রের বহু অপ্রকাশিত পত্র প্রকাশ করতে থাকি, সেই সময় আমি উমাপ্রসাদবাবুর মুখেই শরৎচন্দ্রের রবীন্দ্রনাথকে লেখা ও না-পাঠানো ঐ চিঠিটির কথা শুনি। শুনে তাঁকে ঐ চিঠিটি প্রকাশ করতে বলি। উমাপ্রসাদবাবু আমার আগ্রহে 'শরৎচন্দ্রের পথের দাবী ও রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে আমার হাতে দেন। ঐ প্রবন্ধটি এনে আমি ১৩৬০ সালের কার্তিক সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশ করি। আমি তখন ভারতবর্ষ পত্রিকায় কাজ করতাম। ঐ প্রবন্ধেই উমাপ্রসাদবাবু শরৎচন্দ্রের সেই না-পাঠানো চিঠিটিও দিয়েছিলেন। ঐ প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত সাধারণে সেই

চিঠির বিষয়বস্তু, এমন কি চিঠিটির কথাও জানতেন না। শরৎচন্দ্রের সেই না-পাঠানো চিঠিটি এই :—

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা—হাবড়া

শ্রীচরণেষু,

আপনার পত্র পেলাম। বেশ, তাই হোক্। বইখানা আমার নিজের বলে একটুখানি দুঃখ হবারই কথা ; কিন্তু সে কিছু নয়। আপনি যা কর্তব্য এবং উচিত বিবেচনা করেছেন, তার বিরুদ্ধে আমার অভিমানও নেই, অভিযোগও নেই। কিন্তু আপনার চিঠির মধ্যে অন্যান্য কথা যা আছে, সে সম্বন্ধে আমার দু একটা প্রশ্নও আছে, বক্তব্যও আছে। কৈফিয়তের মত যদি শোনায় সে শুধু আপনাকেই দিতে পারি।

আপনি লিখেছেন, ইংরাজরাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। ওঠবারই কথা। কিন্তু এ যদি আমি অসত্য প্রচারের মধ্যে দিয়ে করবার চেষ্টা করতাম, লেখক হিসেবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুই-ই ছিল। কিন্তু জ্ঞানতঃ তা আমি করি নি। করলে পলিটিশিয়ানদের প্রোপাগাণ্ডা হ'ত, কিন্তু বই হ'ত না। নানা কারণে বাঙ্গলা ভাষায় এ ধরণের বই কেউ লেখে না। আমি যখন লিখি এবং ছাপাই তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করেছিলাম। সামান্য সামান্য অজুহাতে ভারতের সর্বত্রই যখন বিনা বিচারে, অবিচারে অথবা বিচারের ভান করে কয়েদ, নির্বাসন প্রভৃতি লেগেই আছে, তখন আমি যে অব্যাহতি পাবো, অর্থাৎ, রাজপুরুষেরা আমাকেই ক্ষমা করে চলবেন, এ দুরাশা আমার ছিল না। আজও নেই। তাঁদের হাতে সময়ের টানাটানি নেই, সুতরাং দুদিন আগে পাছের জন্য কিছুই যায় আসে না। এ আমি জানি এবং জানার হেতুও আছে। কিন্তু এ যাক্। এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের গ্রন্থকার হিসেবে গ্রন্থের মধ্যে যদি মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে থাকি এবং তৎসত্ত্বেও যদি রাজরোষে শাস্তিভোগ করতে হয় ত করতেই হবে—তা মুখ বুজেই করি বা অশ্রুপাত করেই করি, কিন্তু প্রতিবাদ করা কি প্রয়োজন নয়? প্রতিবাদেরও দণ্ড আছে এবং মনে করি তারও পুনরায় প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক। নইলে, গায়ের জোরকেই প্রকারান্তরে ন্যায্য বলে স্বীকার করা হয়। এই জন্যেই প্রতিবাদ চেয়েছিলাম। শাস্তির কথাও ভাবিনি এবং প্রতিবাদের জোরেই যে এ বই আবার ছাপা হবে, এ সম্ভাবনার কল্পনাও করিনি।

চুরি ডাকাতির অপরাধে যদি জেল হয়, তার জন্যে হাইকোর্টে আপিল করা চলে, কিন্তু আবেদন যদি অগ্রাহ্যই হয়, তখন দু বছর না হয়ে তিন বছর হল কেন, এ নিয়ে বিলাপ করা সাজে না। রাজবন্দীরা জেলের মধ্যে দুধ, ছানা, মাখন পায় না বলে, কিম্বা মুসলমান কয়েদীরা মহরমের তাজিয়ার পয়সা পাচ্ছে, আমরা দুর্গোৎসবের পয়সা পাই না কেন, এই বলে চিঠি লিখে কাগজে কাগজে রোদন করায় আমি লজ্জাবোধ করি, কিন্তু মোটা ভাতের বদলে যদি জেল অথরিটিরা ঘাসের ব্যবস্থা করে, তখন হয়ত তাদের লাঠির চোটে তা চিবোতে পারি। কিন্তু ঘাসের জ্বালা কণ্ঠরোধ না করা পর্যন্ত অন্যায় বলে প্রতিবাদ করাও আমি কর্তব্য বলে মনে করি।

কিন্তু বইখানা আমার একার লেখা, সুতরাং দায়িত্বও একার। যা উচিত বলে মনে করি, তা বলতে পেরেছি কিনা এইটেই আসল কথা। নইলে ইংরাজ সরকারের ক্ষমাশীলতার প্রতি আমার কোন নির্ভরতা ছিল না। আমার সমস্ত সাহিত্য সেবাটাই এই ধরণের। যা উচিত মনে করেছি, তাই লিখে গেছি।

আপনি লিখেছেন, আমাদের দেশের রাজারা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অন্যান্য রাজশক্তির কারও ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের মত সহিষ্ণুতা নেই। এ কথা অস্বীকার করবার অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু এ আমার প্রশ্নই নয়। আমার প্রশ্ন ইংরেজ রাজশক্তির এ বই বাজেয়াপ্ত করবার জাস্টিফিকেশন যদি থাকে, পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে 'প্রোটেস্ট' করার 'জাস্টিফিকেশন'ও তেমনি আছে।

আমার প্রতি আপনি এই অবিচার করেছেন যে, আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদের ঝড় তুলতে চেয়েছি এবং সেই ফাঁকে নিজে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। দেশের লোকে যদি প্রতিবাদ না করে আমাকে করতেই হবে। কিন্তু সে হৈ-চৈ করে নয়, আর একখানা বই লিখে।

আপনি বহুদিন যাবৎ দেশের কাজে লিপ্ত আছেন, দেশের বাহিরের অভিজ্ঞতা আপনার অত্যন্ত বেশী, আপনি যদি শুধু আমাকে এইটুকু আদেশ দিতেন যে, এ বই প্রচারে দেশের সত্যকার মঙ্গল নেই, সেই আমার সান্ত্বনা হ'ত। মানুষের ভুল হয়, আমারও ভুল হয়েছে মনে করতাম।

আমি কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাব নিয়ে এ চিঠি আপনাকে লিখি নি, যা মনে

এসেছে তাই অকপটে আপনাকে জানালাম। মনের মধ্যে যদি কোন ময়লা আমার থাকতো, আমি চুপ করেই যেতাম। আমি সত্যকার রাস্তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাই সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে নির্বাসনে বসে আছি। অর্থে, সামর্থ্যে, সময়ে কত যে গেছে সে কাউকে জানাবার নয়। দিনও ফুরিয়ে এলো, এখন সত্যিকার কিছু একটা করবার ভারি ইচ্ছে হয়।

উত্তেজনা অথবা অজ্ঞতাবশতঃ এ পত্রের ভাষা যদি কোথাও রূঢ় হয়ে থাকে, আমাকে মার্জনা করবেন। আপনার অনেক ভক্তের মাঝে আমিও একজন, সুতরাং কথায় বা আচরণে আপনাকে লেশমাত্র ব্যথা দেবার কথা আমি ভাবতেও পারি নে। ইতি—২রা ফাল্গুন ১৩৩৩!

সেবক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের চিঠির উত্তরে শরৎচন্দ্র তখন এইরূপ লিখে থাকলেও, তিনি কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ঐ চিঠির কথা ভুলতে পারেন নি। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই ১৩৩৪ সালের ১০ই ভাদ্র তারিখে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—"রবিবাবুর সে চিঠি আমি ভুলতে পারি নি, কোনদিন পারবো বলেও মনে হয় না।"

পথের দাবীর ন্যায় শরৎচন্দ্রের আর একটি বই নিয়েও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্র-বিনিময় হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের সেই বইটি হল 'ষোড়শী'।

'ষোড়শী' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

শরৎচন্দ্র একবার তাঁর 'ষোড়শী' নাটকের জন্য রবীন্দ্রনাথকে কয়েকটি গান লিখে দিতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গান লিখে দিতে পারেন নি। পরে ষোড়শী নাটকাকারে প্রকাশিত হলে শরৎচন্দ্র একখানি ষোড়শী রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নাটকটি সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানতে চান। কবি ষোড়শী পড়ে শরৎচন্দ্রকে তখন এই চিঠিখানি লিখেছিলেন—

কল্যাণীয়েষু,

তোমার ষোড়শী পড়েছি। বাঙ্গলা সাহিত্যে নাটকের মত নাটক নেই। আমার যদি নাটক লেখবার শক্তি থাকত তাহলে চেষ্টা করতুম ; কেননা নাটক সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

আমার বিশ্বাস তোমার নাটক লেখবার শক্তি আছে। ভিতরের প্রকৃতি আর বাইরেব আকৃতি এই দুইটিই যখন সত্যভাবে মেলে, তখন চরিত্র-চিত্র খাঁটি হয়—আমার বিশ্বাস তোমার কলম ঠিকভাবে চললে এই রূপের সঙ্গে ভাব মিলিয়ে তুলতে পারে, কেন না, তোমার দেখবার দৃষ্টি আছে, ভাববার মন আছে, তার উপরে এদেশের লোকযাত্রা সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত। তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকেব অভিরুচিকে না ভুলতে পারো তাহলে তোমার সেই শক্তি বাধা পাবে। সকল বড় সাহিত্যের যে পরিপ্রেক্ষিত (পাবস্‌পেকটিভ্) সেটা দূরব্যাপী, সেইটির সঙ্গে পরিমাণ রক্ষা করতে পারলে, তবেই সাহিত্য টিকে যায়—কাছের লোকের কলরব যখন দেয়াল হয়ে সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টনে তাকে অবরুদ্ধ করে, তখন সে খর্ব হয়ে অসত্য হয়ে যায়।

ষোড়শীতে তুমি উপস্থিত কালকে খুসি করতে চেয়েচ এবং তার দামও পেয়েচ। কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করেচ। যে ষোড়শীকে এঁকেচ সে এখনকার কালের ফরমাসের, মনগড়া জিনিষ, সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়। আমি বলিনে যে, এই রকম ভাবের ভৈরবী হতে পারে না,—কিন্তু হতে গেলে যে ভাষা ও কাঠামোর মধ্যে তার সঙ্গতি হতে পারত, সে এখনকার দিনের খবরের কাগজপড়া চেহারার মধ্যে নয়। যে কাহিনীর মধ্যে আমাদের পাড়াগাঁয়ের সত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করতে পারত সে এই কাহিনী নয়।

সৃষ্টিকর্তারূপে তোমার কর্তব্য ছিল, এই ভৈরবীকে একান্ত সত্য করা, লোকরঞ্জনকর আধুনিক কালের চলতি 'সেন্টিমেন্ট' মিশ্রিত কাহিনী রচনা করা নয়। জানি আমার কথায় তুমি রাগ করবে। কিন্তু তোমার প্রতিভার 'পরে শ্রদ্ধা আছে বলেই আমি সরল মনে, আমার অভিমত তোমাকে জানালুম। নইলে কোন দরকার ছিল না। সাহিত্যে তুমি বড় সাধক, ইন্দ্রদেব যদি সামান্য প্রলোভনে তোমার তপোভঙ্গ করেন, তাহলে সে লোকসান সাহিত্যের। তুমি উপস্থিত কালের কাছ থেকে দাম আদায় করে খুসি থাকতে পারো—কিন্তু সকল কালের জন্য কি রেখে যাবে? ইতি—৪ ফাল্গুন, ১৩৩৪।

তোমার—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবির চিঠি পেয়ে শরৎচন্দ্র তখন তার উত্তরে কবিকে এই দীর্ঘ চিঠিখানি লিখেছিলেন—

সামতাবেড়, পানিত্রাস—পোষ্ট
জেলা—হাবড়া

শ্রীচরণেষু,

আপনার চিঠি পেয়েছি। অসুস্থতার জন্যে যথাসময়ে উত্তর দিতে না পারায় অপরাধ হয়ে গেল। ষোড়শীর সম্বন্ধে আপনার অভিমত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছি। কিন্তু দু একটা কথাও আমার নিবেদন করবার আছে, এ কেবল আমার ব্যক্তিগত বিষয় নয়, সাধারণভাবে অনেকেরই ঠিক এমনি ব্যাপার ঘটে বলেই আপনাকে জানানো প্রয়োজন। এই নাটকখানা লিখেছি আমার একটি উপন্যাস অবলম্বন করে। তাতে যত কথা বলতে পেরেছি, চরিত্র সৃষ্টির জন্যে যত প্রকার ঘটনাব সমাবেশ করতে পেরেছি, এতে তা পারিনি। কালের দিক দিয়েও নাটকের পরিসর ছোট, ব্যাপ্তির দিক দিয়েও এর স্থান সঙ্কীর্ণ, তাই লেখবার সময় নিজেও বারম্বার অনুভব করেচি—এ ঠিক হচ্চে না। অথচ উপন্যাসটাই যখন এর আশ্রয়, তখন ঠিক কি ভাবে যে হতে পারে তাও ভেবে পাইনি। বোধ করি উপন্যাস থেকে নাটক তৈরির চেষ্টা করতে গেলেই এই ঘটে, একদিক দিয়ে কাজটা হয়ত সহজ মনে হয়, কিন্তু আর একদিকে ত্রুটিও আছে প্রচুর, হয়েছেও তাই। আরও একটা হেতু আছে। এ জীবনে নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাবার কালে চোখে পড়েছে অনেক জিনিস, আপনি যাকে বলেছেন, এ দেশের লোকযাত্রা সম্বন্ধে আমার

অভিজ্ঞতা। কিন্তু অনেক কিছু দেখা এবং জানা সাহিত্যিকের পক্ষে নিছক ভালো কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মেছে। কারণ অভিজ্ঞতার কেবল শক্তি দেয় না হরণও করে। এবং সাংসারিক সত্য সাহিত্যের সত্য নাও হতে পারে। বোধ হয় এই বইখানাই তার একটা উদাহরণ। এটা লিখি একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানা বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি করে। সেই জানাই হল আমার বিপদ। লেখবার সময় পদে পদে জেরা করে সে আমার কল্পনার আনন্দ ও গতিকে কেবল বাধাই দেয়নি, বিকৃত করেছে। সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনা মেশাতে গেলেই বোধ হয় এমনি ঘটে। জগতে দৈবাৎ যা সত্যই ঘটেছে তার যথাযথ বিবৃতিতে ইতিহাস রচনা হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য রচনা হয় না। অথচ সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে হোলো আমার ষোড়শী। এই উপায়ে সাধারণের কাছে সমাদর লাভ করা গেল প্রচুর, কিন্তু আপনার কাছে দাম আদায় হলো না। এ আমার বাইরের পাওয়া সমস্ত প্রশংসাই নিষ্ফল করে দিলে।

এমনি আমার আর একখানা বই আছে পল্লীসমাজ, এর বিক্রিও যত, খ্যাতিও তত। অথচ যতই লোকে এর প্রশংসা করে, ততই মনে মনে আমি লজ্জা পাই। জানি এ টিকবে না। কারণ এ-ও সত্যে মিথ্যায় জড়ানো। মিথ্যাও বরঞ্চ টেকে, কিন্তু সত্যের বনেদের ওপর যে অসত্য, সে পড়তে দেরি হয় না। কথাটা হঠাৎ যেন উল্টো মনে হয়।

এক সময় আমি খুব ছবি আঁকতাম। ছবিতে এর মুণ্ড, ওর ধড়, তার পা এক কোরে চমৎকার জিনিস দাঁড় করানো যায়। কারণ সে কেবল বাইরের বস্তু, চোখে দেখেই তার বিচার চলে। কিন্তু সাহিত্যে চরিত্র সৃষ্টির বেলায় তা হয় না। মানুষের মনের খবর পাওয়া কঠিন। সেখানে নিজের খেয়াল বা প্রয়োজন মত এর একটু, তার একটু, কতক সত্য, কতক কল্পনা জোড়া-তাড়া দিয়ে উপস্থিত মত লোকরঞ্জন করা যায়, কিন্তু কোথায় মস্ত ফাঁকি থেকে যায়, এবং এই ফাঁকিটাই একদিন ধরা পড়ে। কি জানি, হয়ত এই জন্যেই আজকাল প্রখর বাস্তব সাহিত্যের চলন সুরু হয়েছে। তাতে দলে দলে লোক আসে সবাই ছোট, সবাই সত্য, সবাই হীন, কারও কোন বিশেষত্ব নেই, অর্থাৎ যেমনটি সংসারে দেখা যায়। অথচ সমস্ত বইখানা পড়ে মনে হয় এতে লাভ কি? কেউ হয়ত বলবে, লাভ নেই—এম্‌নি। মাঝে মাঝে হয়ত অত্যন্ত সাধারণ মামুলি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও নিপুণ বর্ণনা থাকে—তার

ভাষাও যেমন, আড়ম্বরও তেমনি—কিন্তু তবুও মন খুশি হয় না, অথচ এরা বলে, এই ত সাহিত্য।

ষোড়শীর সম্বন্ধে আপনি ঠিক যে কি বলেছেন আমি বুঝতে পারিনি। শুধু এইটুকুই বুঝেছি এ যে ঠিক হয় নি, সে আপনার দৃষ্টি এড়ায় নি।

আপনি পরিপ্রেক্ষিতের উল্লেখ করেছেন। ছবি আঁকায় এতে দূরত্বের পরিমাণে বড় জিনিস ছোট, গোল জিনিস চ্যাপ্টা, চৌকো জিনিস লম্বা, সোজা জিনিস বাঁকা দেখায়। কতদূরে কোন্ সংস্থানে বস্তুর আকারে প্রকারে কিরূপ এবং কতটা পরিবর্তন ঘটবে তার একটা বাঁধাধরা নিয়ম আছে। এ নিয়ম ক্যামেরার মত যন্ত্রকেও মেনে চলতে হয়। তার ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু সাহিত্যের বেলা তো এর তেমন কোন বাঁধাধরা আইন নেই। এর সমস্তই নির্ভর করে লেখকদের রুচি ও বিচার-বুদ্ধির পরে। নিজেকে কোথায় এবং কতদূরে যে দাঁড় করাতে হবে, তার কোন নির্দেশই পাবার যো নেই। সুতরাং ছবির 'পারস্পেকটিভ্' এবং সাহিত্যের 'পারস্পেকটিভ্' কথার দিক দিয়ে এক হলেও কাজের দিক দিয়ে হয়ত এক নয়। তাছাড়া সাহিত্যের বর্তমান কালটা যতবড় সত্য, ভবিষ্যৎ কালটা কিছুতেই ঠিক অতবড় সত্য নয়। নর-নারীর যে একনিষ্ঠ প্রেমের ওপর এতকাল এত কাব্য লেখা হয়েছে, মানুষে এত তৃপ্তি পেয়েছে, এত চোখের জল ফেলেছে, সেও হয়ত একদিন হাসির ব্যাপার হয়ে যাবে। অন্ততঃ অসম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে তো আজ তাকে কল্পনাতেও গ্রাহ্য করা চলে না।

একটা 'কংক্রিট' উদাহরণ দিই। রামায়ণে রাম রাবণের যুদ্ধের বিবরণে অনেক জায়গা জুড়ে আছে। রাক্ষসে-বাঁদরে মিলে কোন্ পক্ষ কি রকম লড়াই করলে, কে কি অস্ত্র নিক্ষেপ করলে, তার কত রকমের নাম, কত রকমের বর্ণনা। কার হাত, কার পা, কার গলা কাটা গেল তাও উপেক্ষিত হয় নি। যুদ্ধক্ষেত্রে এ ব্যাপার ছোটও নয়, তুচ্ছও নয় এবং কবির কাছে হয়ত সেকালের লোকে ভিড় কোরে চেয়েছিল এবং পেয়ে অকৃত্রিম আনন্দও উপভোগ করেছিল। কিন্তু আজ সুদূর ব্যবধানে যুদ্ধক্ষেত্রের ও যুদ্ধার্থী বীরগণের যুদ্ধকৌশল অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে, সাহিত্যের দূরব্যাপী 'পারস্পেকটিভ্' বলতে কি আপনি এই ধরণের জিনিসই ইঙ্গিত করেছেন?

আমি পূর্বে কখনো নাটক লিখি নি। এখন দু একটি লিখতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু বাধা বিস্তর। আমার উপন্যাসের বিচার পাঠক সমাজ করেন, তার

প্রশস্ত ক্ষেত্র, কিন্তু নাটকের পরীক্ষক যে কে বোঝা কঠিন। থিয়েটারওয়ালারা না বোঝা দর্শকরা—কোথায় যে এর হাইকোর্ট তা কেউ জানে না। রামায়ণ, মহাভারত থেকে কিম্বা তেমনি প্রতিষ্ঠিত টড্ সাহেবের রাজস্থান থেকে নাটক লিখলে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কিন্তু আপনার কাছে তাড়া খেতে হয়।

পরিশেষে আপনি আমার শক্তির উল্লেখ করে লিখেছেন, 'তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পারো, তা হলে তোমার এই শক্তি বাধা পাবে'। আপনি নানা কাজে ব্যস্ত, কিন্তু আমার ভারি ইচ্ছে হয়, আপনার কাছে গিয়ে এই জিনিসটা ঠিক মত জেনে আসি। কারণ উপস্থিত কালটাও যে মস্ত ব্যাপার, তার দাবী মানবো না বললে, সেও শাস্তি দেয়।

আপনি অনুমতি না দিলে আপনার সময় নষ্ট করে দিতে আমার সঙ্কোচ হয়। আমার চিঠি লেখার ধরণটা ভারি এলোমেলো—কোন কথাই প্রায় গুছিয়ে বলতে পারি নে। লেখার দোষে কোথাও যদি অপরাধ হয়ে থাকে মার্জনা করবেন। ইতি ২৬শে ফাল্গুন, ১৩৩৪।

সেবক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-সদনে কবিকে লেখা শরৎচন্দ্রের কিছু চিঠি এবং শরৎচন্দ্রকে লেখা কবির অনেক চিঠির নকল থাকলেও শরৎচন্দ্রের এই চিঠিটি কিন্তু নেই। শরৎচন্দ্রের এই চিঠিটি কবির কাছে পৌছবার কিছুদিন পরেই কবির তৎকালীন সেক্রেটারীর এক আত্মীয় সেক্রেটারীর দপ্তর থেকে তাঁকে না জানিয়েই চিঠিটি নিয়ে চলে যান এবং নিজের কাছেই যত্ন করে রেখে দেন।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ঐ ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের এই চিঠিটি কোন একটি পত্রিকায় প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি লুকিয়ে নিয়ে আসা এই চিঠিটি ছাপাতে সাহস পান নি।

আমার সম্পাদিত 'শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র' বইটির জন্য যখন আমি শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র সংগ্রহ করছিলাম, তখন জনৈক সাহিত্যিক এই চিঠিটির শান্তিনিকেতন থেকে উধাও হওয়ার সমস্ত ইতিহাস বলে, এর একটি নকল আমাকে দিয়েছিলেন। এটি পেয়ে তখন আমি টীকা-টিপ্পনী সমেত ১৩৬০ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলাম। এতেই সাধারণে সর্বপ্রথম এই চিঠিটির কথা জানতে পারেন।

যাই হোক্, কবি শরৎচন্দ্রের উত্তর পেয়ে শরৎচন্দ্রকে তখন আর একখানি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিখানি এই :—

কল্যাণীয়েষু,

আমি জ্বরে পড়ে আছি, তবু তোমার চিঠির উত্তর দিতে বসলুম। ভয় হয়েছিল পাছে আমার সমালোচনা পড়ে তুমি অতিশয় বিরক্ত হয়ে থাক। তোমার চিঠিখানি পেয়ে আমি আশ্বস্ত হয়েছি।

গোড়াতেই একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। তোমার প্রতিভা আছে বলেই তোমার কাছে দাবী করি—সে দাবী সাহিত্যের তরফের দাবী। অন্য অনেক বিষয়েই এক এক যুগের বর্তমানের ভোগ বর্তমানেই নিঃশেষ হয়ে যায়—রাজ্য সাম্রাজ্যও তারি অন্তর্গত। সাহিত্যে প্রত্যেক জাতি তার চিরকালের সম্পদ কামনা করে। এই সম্পদ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা যাদের আছে বর্তমানের কোন প্রলোভন এসে তাদের তপোভঙ্গ না করে এই আমরা একান্ত মনে ইচ্ছা করি। বর্তমান কালের মন জোগাবার জন্যে বায়না নিয়ে যারা মর্ত-লোকে এসেছে, তাদের সংখ্যার সীমা নেই—তারা প্রচুর পরিমাণেই নগদ বিদায় পেয়ে থাকে—মাসিকে, সাপ্তাহিকে, সভাসমিতিতে তারা আসর সরগরম করে রেখেছে। তাদের বারোয়ারির আসর বাঁশে বাখারিতে তৈরি; তোমরা সেখানে যদি পা দেও, তবে তোমাদের জাত যাবে। তুমি লিখেছ, 'উপস্থিত কালটাও যে মস্ত ব্যাপার।' সেইখানেই সে বস্তুতই মস্ত যেখানে অনুপস্থিতকালের মধ্যেও তার প্রবেশাধিকার আছে। বর্তমানকালের একটা বৃহৎ অংশ আছে, যেটা ক্ষীণজীবীদের—মোটের উপর তাদের ক্ষমতা কম নয়, তাদের ভোগের আয়োজনও প্রচুর, আধুনিক 'ডিমক্রাসি'র যুগে সাহিত্যের দরবারে তারাও তারস্বরে ফরমাস করে থাকে। এ ফরমাস এড়িয়ে চলা এখনকার কালে একটা বিষম সমস্যা। এ সমস্যা আগেকার দিনে এত কঠিন ছিল না। হাল আমলের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির প্রচলিত বুলি দশের মুখে মুখে কেবল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—সেই দশের দল এই সমস্ত বুলিরই সর্বত্র পুনরাবৃত্তির জন্যে উন্মত্ত। তোমার মতো সাহিত্যিক যেন সেই দশকে এই কথাই বলে যে, তোমাদের বুলি আমার বুলি নয়—তোমাদের খাঁচার পাখী না হলে তোমাদের দানাপানি আমার ভাগ্যে না জুটতে পারে, কিন্তু আমার খাদ্য বৃহৎকালে বৃহৎদেশে। দাশুরায়ের আমলের উপস্থিতকালে

দাশুরায়কে প্রচুর পুরস্কার দিয়েছিল—কিন্তু সে যে চেক সই করেছিল, আধুনিক কালের ব্যাঙ্কে তা ক্যাশ করা চলে না। অথচ ময়মনসিংহের গাথাকাব্য লোক-সাহিত্য, আজও তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয় নি—তা অশিক্ষিত লোকের সহজ ভাষায় লেখা কিন্তু তা চিরকালের ভাষায় লেখা। দাশুরায়ের শ্লেষ অনুপ্রাসের অগভীর কৃত্রিমতায় সত্য ছিল না। ময়মনসিংহের গাথায় সত্য ছিল। আধুনিক কালের মুখরোচক বুলিগুলো সেই দাশুরায়ের শ্লেষ অনুপ্রাসের জায়গা জুড়েচে, এরা প্রতিদিন সাহিত্যের সত্য নষ্ট করচে। এরা কচুরিপানার মতো সাহিত্যের সকল স্রোতকেই রোধ করতে বসেচে। আমি তোমার যে সব গল্প পড়েচি, তাতে তুমি অতি অনায়াসে চিরকালের সত্যকে মূর্তি দিয়েচ—দশের বাণী তোমার বাণীর মধ্যে প্রবেশ করে ঐ সত্যের ছবিতে নিজের দাগ দেগে দিতে পারে নি। তখন তুমি জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে ছিলে। তোমার এখনকার লেখা পড়তে ভয় হয়, পাছে চোখে পড়ে যে, তোমার কলমের উপরে তোমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভিড়ের লোকের মনটা ভর করেছে। সে এত বড় লোকসান যে সে আমি চোখে দেখতে পারব না।

তোমার নাটকে যে 'পারস্পেকটিভ্'-এর কথা বলেছি, সে হচ্ছে নাটকের আখ্যান বস্তুগত। অর্থাৎ যে পল্লীগ্রামের মধ্যে যে পরিবেষ্টনেব মধ্যে সমস্ত ঘটনা স্থাপিত, তার ভাষায় চরিত্রে ব্যবহারে যথাযথ পরিমাণ সামঞ্জস্য রক্ষা হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। অর্থাৎ তুমি যা কিছু বলতে চেয়েচ, তাকে যদি তার পরিবেষ্টনের সঙ্গে সঙ্গত করে বলতে, তাহলে ভাষায় ঘটনায় অন্যরকম হত—মূল কথাটা বজায় থাকত কিন্তু রূপটা থাকত না। আর্টে বিষয়ের সঙ্গে রূপের মিল হলে তবেই সেটা সত্য হয়।

একটা কথা মনে রেখো, আমি তোমার এই নাটক সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করলুম, যদি তোমার নিজের মনে হয় সেটা অসঙ্গত, তাহলে সেটাকে মন থেকে একেবারে লুপ্ত করে দিয়ো। তোমার নিজের সৃষ্টির আদর্শ তোমার নিজেরই মনে, যদি সেটাকে রক্ষা করে থাকো তাহলে বলবার কিছুই নেই—যদি জনসাধারণের ফরমাস তোমার লেখনীকে বিচলিত করে থাকে তাহলেই ভাববার কথা।

এখন কলকাতায় আছি—যদি কোনদিন দেখা হয় মোকাবিলায় আলোচনা হতে পারবে। ইতি—১১ই মার্চ, ১৯২৮

তোমাদের—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মেজভাই প্রভাসচন্দ্র

শরৎচন্দ্রের মেজভাই প্রভাসচন্দ্র বা স্বামী বেদানন্দ বহু বৎসর বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন।

শরৎচন্দ্র যখন হাওড়া শহরে ছিলেন, সেই সময় প্রভাসচন্দ্র মাঝে মাঝে বৃন্দাবন থেকে এসে দু-একদিন করে দাদার কাছে থেকে যেতেন। প্রভাসচন্দ্রের শরীর বড় ভাল ছিল না। তিনি মাঝে মাঝে অসুখে ভুগতেন। তাই যখনই তাঁর একটু ভারী অসুখ হ'ত, তখনই তিনি আর কোথাও না গিয়ে একেবারে সিধা দাদার কাছে চলে আসতেন। এখানে থেকে সুস্থ হয়ে, তারপর নিজের আশ্রমে ফিরে যেতেন।

শরৎচন্দ্র যখন বাজে শিবপুর ছেড়ে শিবপুরে কালীকুমার মুখার্জী লেনে থাকতেন, সেই সময় প্রভাসচন্দ্র একবার খুব অসুস্থ হয়ে দাদার কাছে এসেছিলেন। প্রভাসচন্দ্রের ঐ রোগমুক্তির কথা উল্লেখ করে, তখন শরৎচন্দ্র ৩০-১-২৬ তারিখে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এক পত্রে লিখেছিলেন—

"আমার মেজ ভাই এ যাত্রা রক্ষা পেলেন। আরোগ্য হবার মুখে চলেছেন, আশা করি শীঘ্রই পুনরায় কাজের জন্য প্রস্তুত হতে পারবেন।"

শরৎচন্দ্র ছোট ভাইবোনদের খুবই স্নেহ করতেন। প্রভাস সন্ন্যাসী মানুষ, কাছে থাকেন না, আশ্রমে থাকেন। তাই প্রভাস তাঁর কাছে এলে তাঁর আদর যত্নের আর সীমা থাকত না। শুধু তাই নয়, শরৎচন্দ্র সুযোগ সুবিধা পেলে নিজে বৃন্দাবনে গিয়ে ভাইকে দেখেও আসতেন।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে যেবার কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়, সেবার শরৎচন্দ্র কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদানের জন্য দিল্লী গিয়েছিলেন। কংগ্রেস অধিবেশনের শেষে শরৎচন্দ্র দিল্লী থেকে বৃন্দাবনে প্রভাসচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলেন। ঐ সময় দিলীপকুমার রায়ও তাঁর সঙ্গে বৃন্দাবনে যান। আর শরৎচন্দ্রের নির্দেশে, তাঁর সংবাদ নিয়ে কাশীর সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী একদিন আগেই দিল্লী থেকে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র বৃন্দাবনে গেলে প্রভাসচন্দ্র দাদাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং নিজে

সঙ্গে সঙ্গে থেকে বৃন্দাবনের প্রধান প্রধান মন্দিরগুলি দাদাকে দেখিয়েছিলেন ও মন্দিরের ইতিহাস বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর 'দিন-কয়েকের ভ্রমণ কাহিনী' প্রবন্ধে তাঁর এই বৃন্দাবন ভ্রমণের প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"দিল্লী হইতে শ্রীবৃন্দাবন বেশী দূর নয়।…যথাকালে সেবাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অধ্যক্ষ স্বামীজী বেদানন্দ আমাদের সানন্দে ও সমাদরে গ্রহণ করিলেন। গরম চা পাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না।…

শহরের একান্তে যমুনাতটে পনর কুড়ি বিঘার এক খণ্ড ভূমির উপর এই সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত। বছর দশ বারো পূর্বে এই বাঙ্গলা দেশেরই একজন ত্যাগী ও কর্মী যুবক কেবলমাত্র নিজের অদম্য শুভেচ্ছাকেই সম্বল করিয়া এই সেবাশ্রম স্থাপিত করিয়া তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।…

…এই রাত্রেই আবার সকলে মন্দিরাদি দেখিতে বাহির হইয়া পড়িলাম। স্বামীজী আমাদের পথ দেখাইয়া চলিলেন।··না গেলেই হয়ত ভাল করিতাম।··

সেই আবার পুরাতন ইতিহাস। শুনিতে পাইলাম, এখানে ছোট বড় প্রায় হাজার পাঁচেক মন্দির আছে। কিন্তু অধিকাংশই আধুনিক,—ইংরাজ আমলের। ইংরাজের আর যাহাই দোষ থাক, যে মন্দিরের প্রতি তাহার বিশ্বাস নেই তাহারও চূড়া ভাঙে না, যে বিগ্রহের সে পূজা করে না তাহারও নাক কান কাটিয়া দেয় না। অতএব যে কোন দেবালয়ের মাথার দিকে চাহিলেই বুঝা যায়, ইহার বয়স কত। স্বামীজী দেখাইয়া দিলেন, ওটা ওমুক জীউর মন্দির সম্রাট আওরঙ্গজেব ধ্বংস করিয়াছেন, ওটি ওমুক জীউর মন্দির ওমুক বাদশাহ ভূমিসাৎ করিয়াছেন, ওটি ওমুক দেবায়তন ভাঙিয়া মসজেদ তৈরি হইয়াছে; ওখানে আর কেন যাইবে, আসল বিগ্রহ নাই,—নূতন গড়াইয়া রাখা হইয়াছে,—ইত্যাদি পুণ্যময় কাহিনীতে চিত্ত একেবারে মধুময় করিয়া আমরা অনেক রাত্রে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। পথে সুরেশচন্দ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—যাক্, সে অনেক কালের কথা।

স্বামিজী কহিলেন, কালের জন্য আসিয়া যায় না সুরেশ, মন্দির ভাঙিয়া মসজেদ ও বিগ্রহ দিয়া সিঁড়ি তৈরির সুযোগ আর নাই,—এই যা তোমাদের ভরসা। তোমরা কংগ্রেসের দল ইংরাজ-রাজার এই গুণটা অন্ততঃ স্বীকার করো।"

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কাজে প্রভাসচন্দ্রকে কখন কখন বৃন্দাবনের বাইরেও যেতে হত। এইভাবে ১৩৩৩ সালে একবার তিনি রেঙ্গুনে গিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র ঐ সময় সামতাবেড়ে তাঁর নিজের বাড়ীতে বাস করতেন।

প্রভাসচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে সামতাবেড়ে দাদার কাছে যান এবং গিয়ে সামতাবেড়ে দিন কতক থাকেন। সেই সময়েই একদিন তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে দেহত্যাগ করেন।

প্রভাসচন্দ্রের এই আকস্মিক মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে, শরৎচন্দ্র সেই সময় ১৩৩৩ সালের ১৩ই কার্তিক তারিখে লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—

"পরম কল্যাণীয়াসু,

...আমার মেজ ভাই প্রভাস সন্ন্যাসী ছিলেন, বোধ করি শুনিয়া থাকিবে। তিনি দিনকয়েক পূর্বে বর্মা হইতে ফিরিয়া মঙ্গলবার রাত্রে অসুখে পড়েন। ক্রমাগতই বলিতে লাগিলেন, বারম্বার অসুখে এ দেহ অপটু হইয়া পড়িয়াছে, ইহা পরিত্যাগ করাই প্রয়োজন। পরদিন বেলা একটায় ঘর ও বিছানা ছাড়িয়া নিজে বাহিরে আসিলেন এবং আমার বুকের উপর মাথা রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন। দিদি, আমি, বৌ ও প্রকাশ—আমরাই শুধু ছিলাম।"

প্রভাসের মৃত্যু হলে শরৎচন্দ্র শোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তখন তিনি যে কিরূপ শোকাভিভূত হয়েছিলেন, বন্ধুবান্ধবদের কাছে লেখা তাঁর সেই সময়কার চিঠিপত্র থেকে তা পরিষ্কার জানা যায়। যেমন—

২২শে কার্তিক (১৩৩৩) তারিখে তিনি কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন—"কেদারবাবু, বলিবার কিছু আর নাই। বাড়ীর একটা পশুপক্ষীর মৃত্যুও যাহার সহে না, তাহার বলিবার আছেই বা কি! একবার আপনাদের কাছে গিয়া বসিবার বড় ইচ্ছা করে, আর ভাবি ভিতরে ভিতরে আমি যে এতবড় দুর্বল ছিলাম, এ কথা ত জানিতাম না। এ ব্যথা (ভ্রাতৃ-বিয়োগের) আমার সহিবে কি করিয়া!"

ঐ সময় হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন—"বাড়ীর একটা পশুপক্ষীর মৃত্যু পর্যন্ত সহিতে পারি না, এই আকস্মিক ছোট ভাইয়ের শোক আমাকে

যেন প্রতিনিয়ত দগ্ধ করিতেছে। ব্যথা যে এত বড় থাকে, এ যেন আমি জানিতাম না। কে জানিত আমি এতখানি দুর্বল ছিলাম।"

প্রভাসচন্দ্রের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে ১৮ই কার্তিক, তারিখে শরৎচন্দ্র উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন—"তোমার চিঠি পেয়েছিলাম, কিন্তু জবাব দিতে পারি নি। আমার মেজভাই সন্ন্যাসী বেদানন্দ বর্মা ঘুরে এ বাড়ীতে আসেন। গত বুধবার একদিনের অসুখে দেহত্যাগ করেন। আজও আবার বুধবার এল!"

শরৎচন্দ্র বাড়ীর মধ্যেই উঠানের এক পাশে রূপনারায়ণের তীরে প্রভাস চন্দ্রের মৃতদেহ সংকার করে সেখানে একটি সমাধিমন্দির তৈরি করিয়েছিলেন। তিনি সামতাবেড়ে যতদিন ছিলেন, প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় নিজের হাতে একটি প্রদীপ জেলে ভাইয়ের সমাধি মন্দিরে দিয়ে আসতেন। শুধু এই নয়, তিনি প্রতি বৎসর প্রভাসচন্দ্রের মৃত্যুদিবসে তাঁর সমাধি মন্দিরের কাছে কীর্তন গাওয়াতেন এবং কীর্তন শেষে গ্রামের লোকজনকে খাওয়াতেন।

প্রভাসচন্দ্রের মৃত্যুর ৮ বছর পরে কলকাতা থেকে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের এক চিঠিতে প্রভাসচন্দ্রের মৃত্যুদিবস পালনের উল্লেখ দেখা যায়। শরৎচন্দ্র সেই সময় কলকাতায় বাড়ী করে অধিকাংশ সময় কলকাতাতেই থাকতেন। শরৎচন্দ্রের চিঠিটি এই :—

"পরম কল্যাণবরেষু,

…কালিয়া (যশোর) থেকে পরশু রাত্রে ফিরেছি, আজ বাড়ীতে যাচ্ছি। কাল আমার লোকান্তরিত মেজ ভাই বেদানন্দের মৃত্যু দিন। তার সমাধির কাছে দু-পাঁচজনকে নিয়ে বসতে হয়। দেশের দশজন খায় দায়, কীর্তন করে। এই জন্যে যাওয়া। ৮।১০ দিন পরে ফিরবো। ৯ই কার্তিক, ১৩৪১

তোমাদের শুভার্থী

দাদা

মামলায় জড়িত

১৩৩৬ সালের ২৫শে কার্তিক তারিখে শরৎচন্দ্র সামতাবেড় থেকে সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

"পল্লীগ্রামে বাস করতে আসার যথাযোগ্য ফলভোগ আরম্ভ হয়েছে, অর্থাৎ মামলায় জড়িয়ে—'সিভিল' এবং 'ক্রিমিন্যাল'—বেশ উত্তেজনায় ছুটোছুটি সুরু করেচি। এই তিন বছর নির্লিপ্ত নির্বিকারভাবে দিব্যি ছিলাম, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের দেব্‌তার আর সইল না, ঘাড়ে চাপলেন। বড় জমিদারের কাছে পার আছে, কিন্তু স্থানীয় অতি ক্ষুদ্র পত্তনিদারের চাপ দুর্বিসহ। ২।৪ বিঘে ছিল বহুকালের শিবোত্তর, জমিদারের দান, কিন্তু ২।৪ বছরের নতুন পত্তনিদারের তা সইল না। গরীব প্রজারা কেঁদে এসে পড়লো—লেগে গেলাম।"

এই ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলায় শরৎচন্দ্র নিজে ঠিক আসামী ও বাদী ছিলেন না বটে, তবে তাঁকে রীতিমত ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হয়েছিল। মামলার কাহিনীটি এই :—

শরৎচন্দ্রের দিদিদের গ্রাম গোবিন্দপুর একেবারে রূপনারায়ণের ঠিক পূর্ব তীরেই অবস্থিত। এই গোবিন্দপুরের পূর্বদিকে আবার রূপনারায়ণের এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্ট বা নদীতীরে গবর্ণমেণ্টের তৈরি বড় বাঁধ। তাই গোবিন্দপুর গ্রামটা রূপনারায়ণ আর গবর্ণমেণ্টের বাঁধের ঠিক মাঝখানে।

গোবিন্দপুরের উত্তর পাশে রূপনারায়ণের একটা মাঝারি গোছের শাখা খাল আছে। এই খালটা আরও কয়েকটা গ্রামের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে অনেকদূর পর্যন্ত চলে গেছে। খালটার নাম বিরামপুরের খাল।

গোবিন্দপুরের পূর্বদিকে সরকারী বড় বাঁধটার একেবারে কোল পর্যন্ত ঘেঁষে ৮০।৯০ বিঘার মত ধানজমির একটা ছোট মাঠ আছে। এটি গোবিন্দ-পুরের মাঠ। এই মাঠের পূর্বপ্রান্তে, বাঁধের কোলে বাঁধ তৈরি করার সময়কার একটা আধমজা খাল আছে। এই খালটা গিয়ে মিশেছে বিরামপুর খালের সঙ্গে। বাঁধের কোলের এই খালটা জমিদারের খাসের।

বর্ষার সময় রূপনারায়ণ যখন ফুলে ওঠে, তখন রূপনারায়ণের জল বিরাম-পুরের খালের ভিতর দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত উপরে উঠে যায়। বিরামপুরের খাল আবার তার শাখা প্রশাখা খালগুলোর দ্বারায় রূপনারায়ণের এই জলকে মাঠে মাঠে চারিয়ে দেয়। এইভাবে বর্ষার সময় গোবিন্দপুরের মাঠটিও রূপনারায়ণের জল থেকে বঞ্চিত হয় না। মাঠে শুধু রূপনারায়ণের জলই আনে না, ঐ সঙ্গে প্রচুর পলি এবং অপরিমিত নদীর মাছও চলে আসে।

সামতাবেড়ের দক্ষিণে সামতা, তার পরেই যে গ্রাম তার নাম হল ম্যাল্লক। এই ম্যাল্লকের বিখ্যাত ধনী মোহিনীমোহন ঘোষাল সেবার গোবিন্দপুরের জমিদারীটা কিনেই ঠিক করলেন যে, গোবিন্দপুরের মাঠের খালটা বিরামপুরের খালের সঙ্গে যেখানে মিশেছে, ঐ দুই খালের সংযোগ স্থানটায় বর্ষার সময় একটা ভাল রকমের জলকর বিলি করা যেতে পারে। এই ভেবে তিনি গোবিন্দপুরের দুই রাজবংশী প্রজা কেষ্ট বাগ ও দুর্লভ মণ্ডলকে জলকর বিলি করে দিলেন।

নতুন জমিদার এই জলকর বিলি করায় গোবিন্দপুরের লোকেরা বড় অসুবিধায় পড়ে গেল। তারা এতদিন জমিদারের এই খাসের খালে ইচ্ছামত মাছ ধরে খেত, কিন্তু এখন তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

একদিন গ্রামের সকলে মিলে জমিদার মোহিনী ঘোষালের কাছে গিয়ে বললে—মশায়, আমরা যে এতদিন আমাদের ইচ্ছামত খালে মাছ ধরে খেয়ে আসছিলাম, আপনি আমাদের সে সুবিধাটা বন্ধ করলেন কেন? আপনি এই জমিদারী নেওয়ার আগে যাঁর জমিদারী ছিল এবং তাঁরও আগের আমলেও আমরা কখনো কোন জমিদারকেই ঐখানে জলকর বিলি করতে দেখিনি। আপনি বিলি করলেন কেন? তাছাড়া আপনি যেখানে জলকর বিলি করেছেন, ওটা তো শিবোত্তর জায়গা। জমিদারের খাসের ছাড়।

জমিদার তাদের হাঁকিয়ে দিয়ে বললেন—আগে কে কি করতেন না করতেন এবং কোথায় শিবোত্তর ওসব আমি শুনতে চাই না। এখন আমি জমিদারী কিনেছি, যাতে আমার জমিদারীর আয় হয়, সে চেষ্টা তো আমাকে দেখতে হবে। ওখানে জলকর বিলি থাকবেই। ও আর বন্ধ হবে না।

গোবিন্দপুরের অধিবাসীরা জমিদার মোহিনী ঘোষালের কাছ থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। ফিরে এসে তারা ঠিক করল, আমরা গোবিন্দপুরের কেউ যদি না এই জলকর নিই, তাহলে অন্য কোন গ্রাম থেকে লোক এসে এখানে

জলকর নিতে সাহস করবে না। গ্রামের লোকে এই ঠিক করে তারা কেষ্ট বাগ ও দুর্লভ মণ্ডলের কাছে গেল। গিয়ে তাদের দুজনকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল্‌ল এবং তাদের ঐ জলকর নিতে নিষেধ করল।

গোবিন্দপুরের রাজবংশীদের মধ্যে কেষ্ট আর দুর্লভ ছিল তাদের মাথা। মাছধরা এবং মাছের ব্যবসা করাই হল এই রাজবংশীদের পেশা। ঐ জলকরটায় দু-পয়সা লাভের সম্ভাবনা আছে দেখে, এরা কিছুতেই ঐ জলকর নেওয়া ছাড়তে চাইল না। অবশ্য মোহিনী ঘোষালের বলেই এরা গ্রামের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এতখানি সাহস দেখাতে পারল।

কেষ্ট এবং দুর্লভ কথা না মানায় রাজবংশীরা বাদে গ্রামের যে সব লোক তাদের কাছে গিয়েছিল, তারা নিজেদের বেশ অপমানিত বোধ করল। তখন তারা বল্‌ল—দেখ্‌, ঐ জায়গায় আমরা কিছুতেই জলকর বিলি হতে দোব না। জমিদারের সাহসে তোরা দুজনে কত ক্ষমতা ধরিস্‌ দেখা যাবে। আমরা এখনি ওখানে গিয়ে তোদের ঘুনি, মুগরি, আটা, জাল ইত্যাদি মাছ ধরার যা কিছু সরঞ্জাম আছে, সব তুলে ফেলে দোব।

এই বলেই তারা খালের কাছে গিয়ে ঘুনি, মুগরি সব তুলে ফেলে দিতে লাগল। কেষ্ট এবং দুর্লভ সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে বাধা দিতে গেল। এই নিয়ে কেষ্ট ও দুর্লভ ঠিক মার না খেলেও গ্রামের লোকের কাছে কয়েকটা ধাক্কা-ধুক্কি খেল।

এই ঘটনার পরেই সঙ্গে সঙ্গে কেষ্ট ও দুর্লভ জমিদার মোহিনী ঘোষালের কাছে গেল। গিয়ে তাঁকে সমস্ত জানাল এবং এ কথাও তারা কাঁদতে কাঁদতে বল্‌ল যে, গ্রামের লোকে তাদের দুজনকে খুব মেরেছে।

শুনেই জমিদার মোহিনী ঘোষাল খুব রেগে গেলেন। তারপর তাদের অভয় দিয়ে বললেন—আচ্ছা, ওদের কত বাড় হয়েছে দেখছি, সব ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি। হাঙ্গামার সময় কে কে ছিল বলত? তোরা চল এখনি আমার সঙ্গে উলুবেড়েয়। একধার থেকে সব ক'টাকে ফৌজদারীতে জুড়ে দিচ্ছি। আপনা হতেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এখন প্রায় ১১টা বেজেছে, এখনি চল উলুবেড়েয়।

এই বলে মোহিনী ঘোষাল, কেষ্ট আর দুর্লভকে নিয়ে তখনই উলুবেড়িয়ার কোর্টে রওনা হলেন এবং সেখানে গিয়ে ২৬ জনকে আসামী করে কেষ্ট আর দুর্লভকে দিয়ে মামলা রুজু করিয়ে দিলেন। হাঙ্গামার সময় যারা সত্যই ছিল

না, এমনও কয়েকজন বাছা বাছা লোককে ঐ মামলায় জড়িয়ে দিলেন। এই আসামীদের মধ্যে ১নং আসামী হলেন গ্রামের অন্যতম প্রধান পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়। ইনি শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর সেজ দেওর। পাঁচকড়িবাবু ছিলেন গোবিন্দপুরের নিকটবর্তী ওড়ফুলি এম, ই, স্কুলের হেডমাস্টার।

শরৎচন্দ্রের বাড়ী থেকে মিনিট পাঁচেক দূরেই ছিল তাঁর দিদির বাড়ী। তিনি প্রতিদিন বিকালে তাঁর দিদিদের বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন।

পাঁচকড়িবাবু তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারীর কথা জানতে পেরে, একদিন শরৎচন্দ্রকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললেন। ক্রমে অন্যান্য আসামীরাও শরৎচন্দ্রকে তাঁদের কথা জানালেন।

শরৎচন্দ্র সব শুনে, কাকেও কিছু না বলে নিজে একদিন জমিদার মোহিনী ঘোষালের বাড়ীতে গেলেন। গিয়ে মামলা-মোকদ্দমা মিটিয়ে নেবার জন্য মোহিনী ঘোষালকে অনুরোধ করলেন। মোহিনীবাবু শরৎচন্দ্রের অনুরোধ তো রাখলেনই না, বরং বললেন—আমি কারও উপদেশ শুনতে চাই না। আমি যা ভাল বুঝব তাই করব। গোবিন্দপুরের লোককে আমি মামলার দ্বারাই শায়েস্তা করে দোব। শুনেছি, আপনি ওদের বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করছেন। তা করুন। আমি কিছু ভয় করিনা।

এইভাবে শরৎচন্দ্র মোহিনীবাবুর কাছ থেকে উপেক্ষিত হয়েই ফিরে এলেন।

এদিকে যথাসময়ে সমন পেয়ে আসামীরা কোর্টে গিয়ে হাজিরা দিলেন। কেষ্ট ও দুর্লভকে তাঁরা মেরেছেন বলে তাঁদের নামে যে অভিযোগ ছিল, মিথ্যা বলে তাঁরা তা অস্বীকার করলেন। তাঁরা হাকিমকে বললেন—হুজুর, আমরা এতলোক মিলে ঐ দুজনকে যদি মারতাম, তাহলে ওদের আর অস্তিত্ব থাকত না। তবে আমরা ওদের মাছ ধরার যন্ত্রপাতি তুলে ফেলে দিয়েছি সত্য। কেননা ওটা শিবোত্তর জায়গা, সকলের খাসের। জমিদারের কাছ থেকে জলকর বিলি নেওয়ার অধিকার ওদের নেই। আর জমিদারও ওখানে জলকর বিলি করতে পারেন না।

হাকিম শুনে আসামীদের বললেন—তাহলে আপনারা দেওয়ানী করুন। ওটা শিবোত্তর কিনা দেওয়ানীতে আগে স্থির হয়ে যাক্। তারপরে ফৌজদারী বিচার হবে। ততদিন আমি ঐ জায়গায় আইন জারি করে দিচ্ছি, উভয় পক্ষের কেউই ওখানে যেতে পারবে না।

এবার গোবিন্দপুরের রাজবংশীয়া বাদে অন্য সকলে মিলে জমিদারের নামে দেওয়ানী মোকদ্দমা রুজু করলেন। এইভাবে গোবিন্দপুরের লোকেরা ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমায় জড়িয়ে নাস্তানাবুদ হতে লাগলেন।

এদিকে ফৌজদারী মোকদ্দমা আটকে থাকলেও, দেওয়ানী মোকদ্দমা চলতে লাগল। দেওয়ানী মামলায় সাধারণতঃ একটু দেরিতে দেরিতে দিন পড়ে। কয়েকটা দিন পড়ল এবং দেখতে দেখতে কয়েক মাস কেটে গেল। ক্রমে চৈত্র মাস এল।

চৈত্র মাসে গ্রামে গ্রামে শিবের গাজন হয় এবং গাজনে লোকে সন্ন্যাসী হয়। গাজনে গোবিন্দপুরের অনেকেই সন্ন্যাসী হল, এমন কি যে কেষ্ট ও দুর্লভ গ্রামের সকলের কথা উপেক্ষা করে মোহিনী ঘোষালের কাছ থেকে জলকর বিলি নিয়েছিল তারাও সন্ন্যাসী হল।

গোবিন্দপুর গ্রামের প্রধানরা এই সময় একদিন সভা করে ঠিক করলেন যে, যেহেতু গ্রামের সকলের কথা উপেক্ষা করে কেষ্ট আর দুর্লভ শিবোত্তরের খাসের জায়গায় জলকর বিলি ব্যবস্থা করে নিয়েছে, সেই কারণে ওদের দুজনকে আমাদের গ্রামের শিবের গাজনে যোগ দিতে দোব না।

চৈত্র সংক্রান্তির কয়েকদিন আগেই গ্রামের প্রধানরা সভা করে এটা স্থির করলেন।

কেষ্ট আর দুর্লভ ছিল রাজবংশীদের মাথা। তাই অন্যান্য রাজবংশী যারা সন্ন্যাসী হয়েছিল, যদিও গাজনে যোগ দিতে তাদের কোন বাধা ছিল না, তবুও তাদের সমাজপতিদের ফেলে তারা আসে কি করে? তাই গ্রামের প্রধানদের সিদ্ধান্তে তারাও বিপদে পড়ল।

কেষ্ট ও দুর্লভ এই আসন্ন বিপদ দেখে মোহিনী ঘোষালের শরণাপন্ন হল। মোহিনীবাবু ভিন্ন গ্রামের লোক। তিনি গোবিন্দপুরের গ্রাম ষোল-আনার ব্যাপারে প্রধানদের কাজে হাত দিতে পারেন না। তাই অন্য মতলব আঁটলেন।

মোহিনীবাবু অবস্থাপন্ন জমিদার তো বটেই, তাছাড়া তিনি ছিলেন, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। তাঁদের থানা বাগনানের দারোগা এবং মহকুমা উলুবেড়িয়ার এস, ডি, ও-র সঙ্গে মোহিনীবাবুর যথেষ্ট দহরম-মহরম ছিল। তিনি তাঁদের সাহায্যে, গোবিন্দপুরের গাজন নিয়ে হাঙ্গামা হতে পারে বলে চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন অর্থাৎ নীলের বিয়ের দিন থেকেই

গোবিন্দপুরে ১৪৪ ধারা জারি করিয়ে দিলেন। ১৪৪ ধারা জারি করিয়ে ঐদিন সকাল থেকেই গ্রামের মোড়ে মোড়ে এবং শিবতলায় ও তার চারপাশে পুলিশ মোতায়েন করিয়ে দিলেন।

পুলিশ দেখে গ্রামের লোকে একটু যে ভয় না পেল, তা নয়। কিন্তু তবুও তারা তাদের প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় রইল। কেষ্ট আর দুর্লভকে তারা কিছুতেই গাজনে যোগ দিতে দেবে না। এজন্য তারা মরিয়া হয়ে উঠল। তারা পুলিশ মানবে না। ধর্মের ব্যাপারে পুলিশের হাত সহ্য করবে না। তারা পুলিশের সঙ্গেও লড়বে এবং প্রয়োজন হলে জান কবুল করবে—এ কথা তারা বলে বেড়াতে লাগল। শুধু বলে বেড়ানই নয়, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের পুরুষ মেয়ে সকলেই সংগ্রামের জন্য তৈরি হতে লাগল।

দারোগা কয়েকজন সেপাই নিয়ে গিয়েছিলেন মাত্র। গ্রামবাসীরা লাঠি সড়কী নিয়ে তাঁর উপর আক্রমণ চালাবে, এই শুনে তিনিও ভয় পেয়ে গেলেন। তাই তিনি তখনই কিছু সশস্ত্র পুলিশ চেয়ে ২টি চিঠি লিখে এক সেপাইয়ের হাতে দিয়ে তাকে উলুবেড়িয়ার এস, ডি, ও, এবং সাব্-ডিভিসনাল পুলিশ অফিসারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

এদিকে গ্রামে একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামার সম্ভাবনা দেখে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ইতিমধ্যেই শরৎচন্দ্রের কাছে আসেন এবং তাঁর পরামর্শ চান।

শরৎচন্দ্র সব শুনে মহা ভাবনায় পড়লেন। গ্রামের লোকদের এ অবস্থায় থামানো যাবে কিনা সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হতে পারলেন না। ওদিকে মোহিনী ঘোষালের উস্কানিতে পুলিশও চটে রয়েছে। তাই তিনি পরামর্শ প্রার্থীদের কেবল শান্ত থাকতে বলে এবং আর কাকেও কিছু না বলে তখনই বাড়ী থেকে রওনা হলেন। একেবারে সিধা তিনি হাওড়ায় ডিস্টিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চলে এলেন।

বেলা প্রায় ১২টা নাগাদ শরৎচন্দ্র ডিস্টিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এলেন। এসে ম্যাজিস্ট্রেটকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললেন।

গ্রামের হাঙ্গামার ব্যাপারে বাঙলার শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক, পল্লী-সমাজের লেখক শরৎচন্দ্র নিজে ছুটে এসেছেন দেখে, ম্যাজিস্ট্রেটও মহাব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি সব শুনে, তখনই হাওড়ার এস, পি,কে (পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট) ডাকালেন।

এস, পি, এসে শরৎচন্দ্রকে দেখে বিস্মিত হলেন। ম্যাজিস্ট্রেট এখন

নিজেই এস, পি,কে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন এবং তাঁকে বললেন—আপনি এখনি শরৎবাবুর হাতে এমন একটা চিঠি লিখে দিন, যাতে করে গোবিন্দপুরের শিবতলায় যে পুলিশ অফিসারই থাকুন না কেন, শরৎবাবু তাঁকে আপনার চিঠি দেখালেই তিনি যেন কোনরূপ আপত্তি না করেই, সেখান থেকে চলে যান। তাহলে শরৎবাবু নিজে উপস্থিত থেকে নির্বিঘ্নেই গ্রামের গাজন সম্পন্ন করিয়ে দেবেন।

ম্যাজিস্ট্রেটের কথামত এস, পি, শরৎচন্দ্রকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেই বসিয়ে নিজের অফিসে ফিরে এসে, তখনি চিঠি লিখে, চিঠির উপর নিজের শীলমোহর দিয়ে শরৎচন্দ্রের কাছে এলেন। তারপর তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে চিঠিখানি দেখিয়ে শরৎচন্দ্রের হাতে দিলেন।

শরৎচন্দ্র চিঠিখানি হাতে নিয়ে তাঁদের উভয়কে ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়লেন। শরৎচন্দ্র যখন ডিস্টিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠী থেকে ওঠেন, তখন প্রায় ১টা বাজে। ডিস্টিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠীর অদূরেই হাওড়া স্টেশন। একটু পরেই ফেরার ট্রেন ছিল। সেই ট্রেনেই শরৎচন্দ্র ফিরলেন।

শরৎচন্দ্র ট্রেনে সেকেণ্ড ক্লাসে আসছিলেন। ট্রেন উলুবেড়িয়া স্টেশনে এলে তিনি দেখলেন—একজন পুলিশ অফিসার নিজে সশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এবং সঙ্গেও এক সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নিয়ে ট্রেনে উঠলেন।

এই পুলিশ অফিসার হলেন উলুবেড়িয়াব সাব্-ডিভিসনাল পুলিশ অফিসার বা এস, ডি, পি, ও,। ইনি, সেকেণ্ড ক্লাসেব যে কামরায় শবৎচন্দ্র বসেছিলেন, সেই কামরায় গিয়ে উঠলেন। এই উলুবেড়িয়া স্টেশনে ঐ অঞ্চলের আরও দু-তিনজন যাত্রীও সেকেণ্ড ক্লাসের ঐ কামরাটিতে উঠলেন। সেই কামরায় শরৎচন্দ্র ছাড়া আরও কয়েকজন ছিলেন। শরৎচন্দ্র এক কোণে বসেছিলেন।

গাড়ী ছেড়ে দিল। এমন সময় উলুবেড়িয়া থেকে যে কজন যাত্রী ঐ কামরায় উঠেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন এস, ডি, পি, ও,কে ঐরূপ সশস্ত্র অবস্থায় দেখে বললেন—কি ভুবনেশ্বরবাবু (এস, ডি, পি, ও,-র নাম), এই অবস্থায় এখন কোথায় চললেন?

উত্তরে ভুবনেশ্বরবাবু বললেন—আর বলেন কেন মশায়! গ্রামের লোকের স্পর্ধাখানা একবার দেখুন না! দেউলটি স্টেশন থেকে কিছুটা দূরে গোবিন্দপুর

বলে একটা গ্রাম আছে। সেই গ্রামে গাজন নিয়ে একটা মহা হাঙ্গামা হবে বলে, গ্রামে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে। বাগনান থানার ও, সি, কয়েকজন সেপাই নিয়ে গ্রামে পাহারা দিচ্ছেন, তা গ্রামের লোক দারোগার উপরেই আক্রমণ করছে। বিকালে গাজনের সময় লাঠি, সড়কী নিয়ে গ্রামের সমস্ত লোক একত্র হয়ে দারোগাকে মারবে ঠিক করেছে। দারোগা ভয়ে পড়ে উলুবেড়েয় খবর দিয়েছিলেন। এস, ডি, ও, আমাকে বললেন—যান্ তো মশায়, কিছু পুলিশ-টুলিশ নিয়ে গিয়ে গ্রামের লোকগুলোকে একটু ঠাণ্ডা করে দিয়ে আসুন তো। বড় বাড় বেড়েছে। তাই তাদের শায়েস্তা করবার জন্যে এখন সেই গোবিন্দপুরেই যাচ্ছি।

ভুবনেশ্বরবাবু যখন তাঁর কথা শেষ করলেন, ঠিক সেই সময় যিনি ভুবনেশ্বর বাবুকে প্রশ্ন করছিলেন, তিনি গাড়ীর এক কোণে যে শরৎচন্দ্র বসে আছেন, এতক্ষণে দেখতে পেলেন। দেখেই বললেন—শরৎবাবু নমস্কার! এমন সময় কোথা থেকে আসছেন?

প্রশ্নকারী এই লোকটি বাগনানের লোক। শরৎচন্দ্রকে ইনি ভালভাবেই চিনতেন। শরৎচন্দ্রও এঁকে তাঁর বাড়ীতে দু-একবার যেতে দেখেছেন। তাই ইনিও ছিলেন শরৎচন্দ্রের চেনা।

শরৎচন্দ্র এঁর কথার উত্তরে বললেন—ভুবনেশ্বরবাবুর কাছ থেকে তো ব্যাপারটা সবই শুনলেন। আমিও ঐ কারণেই ডিস্টিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়েছিলাম। তবে গোবিন্দপুরের লোককে শায়েস্তা করতে নয়, তাদের বাঁচাবার ব্যবস্থা করতে।

ট্রেনের সেকেণ্ড ক্লাস বগীটা ছোট ছিল। তাই একজন কথা বললে, বগীর অপর সকলেই শুনতে পাচ্ছিলেন।

ভুবনেশ্বরবাবু শরৎচন্দ্রকে চাক্ষুষ চিনতেন না। তিনি ইতিমধ্যে পাশের একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে, উনিই সাহিত্যরথী শরৎচন্দ্র।

ভুবনেশ্বরবাবু শরৎচন্দ্রের একজন ভক্ত পাঠক। তিনি এখন শরৎচন্দ্রের পরিচয় পেয়ে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে জোড় হাতে শরৎচন্দ্রকে নমস্কার করলেন। তারপর এগিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে বসে বললেন—কি ব্যাপার বলুন তো শরৎবাবু?

শরৎচন্দ্র সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললেন।

শরৎচন্দ্রের মুখে সমস্ত শুনে এবং শরৎচন্দ্রের হাতে এস, পি,র আদেশপত্রটি

দেখে ভুবনেশ্বরবাবু একেবারে থ হয়ে গেলেন। জমিদার মোহিনী ঘোষাল, দারোগা ও এস, ডি, ও,কে হাত করে কিভাবে হাঙ্গামা পাকিয়েছেন, তিনি এখন সমস্তই বুঝলেন।

দেউলটি স্টেশনে নেমে ভুবনেশ্বরবাবু এবং তাঁর সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী শরৎচন্দ্রকে ছাড়লেন না। তাঁরা শরৎচন্দ্রের সঙ্গেই প্রথমে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন।

শরৎচন্দ্রও তাঁর এই অতিথিদের জন্য চা ও জলযোগের ব্যবস্থা করলেন। চা-টা খেয়ে ভুবনেশ্বরবাবু এবার শরৎচন্দ্রের বাড়ী থেকে শরৎচন্দ্রকে পুরোভাগে নিয়ে এবং নিজের পুলিশ বাহিনীকে পিছনে করে গোবিন্দপুরের শিবতলার দিকে রওনা হলেন।

শরৎচন্দ্রের বাড়ীর অদূরেই ঐ শিবতলা। শরৎচন্দ্রের বাড়ী থেকে শিবতলায় যেতে যে রাস্তাটা, ঐ রাস্তাটা কয়েক জনের বাড়ীর পিছন দিয়ে গেছে এবং পথ অল্প হলেও পথটায় ঘন ঘন বাঁক আছে।

ভুবনেশ্বরবাবুর দলের পুরোবর্তী হয়ে শরৎচন্দ্র আগিয়ে আগিয়ে চলেছেন। শিবতলার একেবারে কাছে এসে গেছেন, এমন সময় পথের একটা বাঁকেব মুখে শরৎচন্দ্রকে আসতে দেখেই, শিবতলায় উপস্থিত মোহিনী ঘোষালের দলের কয়েকজন লোক, যারা দারোগার কাছে দাঁড়িয়েছিল, তারা দারোগাকে বল্‌ল—শরৎবাবু আসছেন!

দারোগা শুনে চেয়ারে বসে বসে তাচ্ছিল্য ভবে বললেন—রেখে দে, রেখে দে, তোদের শরৎবাবু। খানকতক বই-ই না হয় লিখেছে, তাই বলে এখানে মুড়ুলি করতে এলে চলবে না। অপমানিত হয়েই ফিরতে হবে।

দারোগাকে শরৎচন্দ্রের আসার সংবাদ যারা দিয়েছিল, তারা পথের বাঁকের মুখে প্রথমে শরৎচন্দ্রকে দেখেই ঐ সংবাদ দিয়েছিল। শরৎচন্দ্রের পিছনে যাঁরা আসছিলেন, পথের বাঁকে একজনের বাড়ীর আড়ালে থাকায়, ঐ সংবাদদাতারা তাদের তখন দেখতে পায়নি। কয়েক মুহূর্ত পরেই তাঁরাও পথের মুখে এলে, ঐ সংবাদদাতারা এবার ভুবনেশ্বরবাবুর সদলবলে আসার সংবাদটা দারোগাকে দিল।

শিবতলার একেবারে পাশেই ঐ পথের বাঁকটা। তাই শিবতলায় কথা বললে, শুধু ঐ পথের বাঁক থেকে কেন, আরও কিছুটা দূর থেকেও সমস্তই ভালরূপে শোনা যায়। দারোগাবাবু লোকমুখে শরৎচন্দ্রের আসার কথা শুনে

যে উক্তি করেছিলেন, সে কথা শুধু শরৎচন্দ্রই নয়, ভুবনেশ্বরবাবু এবং তাঁর সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীও পরিষ্কার শুনতে পেয়েছিলেন।

ভুবনেশ্বরবাবু এক তো শরৎচন্দ্রের ভক্ত, আর তা না হলেও শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে দারোগাবাবুর অহেতুক ঐরূপ উক্তিতে তিনি রাগে জ্বলে উঠলেন।

যাই হোক্, কয়েক মুহূর্ত পরেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই ভুবনেশ্বরবাবু ও তাঁর দলবল শিবতলায় এসে উপস্থিত হলেন।

ভুবনেশ্বরবাবু এসেই রেগে দারোগাবাবুকে বললেন—একটু ভদ্রতাও শেখেন নি? বর্তমান বাঙ্গলার যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক তাঁর সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলতে হয়, সেটুকু জ্ঞানও হয় নি। জমিদারের ঘুষ খেয়ে এখানে বুঝি এই সব কাণ্ড হচ্ছে। যান্, এখান থেকে বেরিয়ে যান। যেখানে যা সেপাই মোতায়েন করেছেন, সব তুলে নিয়ে, আমি যতক্ষণ না যাই, পাশের ঐ পানিত্রাস হাইস্কুলে গিয়ে অপেক্ষা করুন গে।

ভুবনেশ্বরবাবুর কথা শুনে দারোগাবাবু ভয়ে তো রীতিমত কাঁপতে লাগলেন। মোহিনীবাবুর দলীয় লোকদের অবস্থাও তদ্রূপ।

দারোগাবাবু, যে কজন সেপাই শিবতলায় ছিল, তাদের নিয়ে শিবতল থেকে চলে গেলেন। মোহিনীবাবুর দলীয় যারা এতক্ষণ দারোগাবাবুর কাছে কাছে ছিল, তারা আগেই সরে পড়েছিল।

দারোগাবাবুকে সেপাই নিয়ে বিষণ্নমুখে শিবতলা থেকে চলে যেতে দেখে এবং শিবতলায় শরৎচন্দ্র এসেছেন ও ভুবনেশ্বরবাবু তাঁর কথামত চলেছেন শুনে গ্রামের লোকজন সকলেই এবার শিবতলায় আসতে সুরু করল। গ্রামের প্রধানরা একে একে সকলেই এলেন। গাজনের সন্ন্যাসীরাও এল।

এবার শরৎচন্দ্র এবং ভুবনেশ্বরবাবু উভয়ের অনুরোধে গ্রামের প্রধানরা কেষ্ট বাগ ও দুর্লভ মণ্ডলকে গাজনে যোগ দিতে অনুমতি দিল।

শরৎচন্দ্র এবং ভুবনেশ্বরবাবুর উপস্থিতিতে বেশ নির্বিঘ্নেই সেদিনের গাজন উৎসব সম্পন্ন হল। তারপর অনেকটা রাত্রি হলে ভুবনেশ্বরবাবু শরৎচন্দ্রকে ধন্যবাদ দিয়ে পানিত্রাস স্কুলে গিয়ে দারোগাবাবুকে সমস্ত সেপাই নিয়ে চলে যেতে বললেন এবং নিজেও নিজের দল নিয়ে উলুবেড়িয়া রওনা হলেন।

শরৎচন্দ্রের উপস্থিতিতে পরের দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির দিনও গোবিন্দপুরের গাজন নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হ'ল।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরের কথা। শরৎচন্দ্র সেদিন সকালে তাঁর সামতাবেড়ের বাড়ীর বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন ; এমন সময় এক ভদ্রলোক ও এক ভদ্রমহিলা উভয়ে এসে ভক্তিভরে শরৎচন্দ্রকে প্রণাম করলেন।

শরৎচন্দ্র থাক্ থাক্ বলে সামনের পাতা চেয়ারে তাঁদের বসতে বললেন এবং পরে তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

ভদ্রলোকটি তখন বললেন—ধুতি পাঞ্জাবী পরে এসেছি বলে, বোধ হয় আমাকে চিনতে পারছেন না, আমি সেই বাগনানের ও, সি, আর ইনি আমার স্ত্রী।

—তা কি মনে করে বলুন তো ?

—আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে এসেছি।

কেন কি হয়েছে ? ক্ষমা প্রার্থনা আবার কিসের ?

—সেদিন গাজনে এসে আপনার প্রতি যে অশ্রদ্ধাপূর্ণ উক্তি করে মহা অপরাধ করেছি, তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি। আপনি আমাকে তার জন্য ক্ষমা করুন। এস, ডি, পি, ও, সাহেবের কাছে আমি ঐ জন্যে কত গালাগাল খেয়েছি এবং এখনও খাচ্ছি। এই জন্যেই কিনা তা জানি না, তবে, আমি জমিদারের ঘুষ খেয়েছি, এই অভিযোগ করে তিনি আমাকে সাসপেণ্ড করিয়েছেন। এখন আমার চাকরি যেতে বসেছে। চাকরি গেলে আমি স্ত্রী-পুত্রকন্যা নিয়ে না খেয়ে মারা যাব।

এই সময় দারোগাবাবুর স্ত্রীও শরৎচন্দ্রের পা দুটো ধরে তাঁদের ক্ষমা করবার জন্য এবং তাঁদের প্রতি কৃপা করবার জন্য অতি কাতরভাবে মিনতি করতে লাগলেন।

শরৎচন্দ্র সব শুনে দারোগাবাবুকে বললেন—আরে, গাজনের দিনে কি বলেছিলে, সে তো সঙ্গে সঙ্গে ভুলেই গেস্‌লাম। সেদিনেই তো তোমাকে ভুবনেশ্বরবাবু বকলেন। আবার বকাবকি কেন ? তাছাড়া, তুমি কিই বা এমন বলেছিলে। তার জন্যে আবার ক্ষমা চাইতে হবে কেন ?

দারোগাবাবু বললেন—না আপনাকে ক্ষমা করতেই হবে।

—তা আর কি করতে হবে বল !

—আমি চাকরিটা যাতে না হারাই, সেজন্য দয়া করে আপনি এস, ডি, পি, ও, সাহেবকে একটা চিঠি লিখে দিন।

—এই কথা! তা এখনই দিচ্ছি, বলে শরৎচন্দ্র ঘর থেকে প্যাড ও কলম এনে দারোগাবাবুর সামনেই, যাতে তাঁর চাকরিটা থাকে সেরূপ অনুরোধ করে ভুবনেশ্বরবাবুকে একটা চিঠি লিখে দিলেন। চিঠিটা দারোগাবাবুকে শুনিয়ে, তাঁর হাতে দিয়ে বললেন—এবার নিশ্চিন্ত তো?

দারোগাবাবু এবং তাঁর স্ত্রী উভয়েই আবার শরৎচন্দ্রের পদধূলি নিয়ে বললেন—হ্যাঁ, আপনি যে ক্ষমা করলেন, সেজন্য এখন নিশ্চিন্ত।

শরৎচন্দ্র বললেন—এবার আমাকেও তাহলে নিশ্চিন্ত কর। তোমরা দুটিতে স্নান আহার করে তবে যাও, না হলে ছাড়ছি না। অনেক বেলা হয়ে গেছে।

শরৎচন্দ্রের কথা নাড়তে না পেরে দারোগাবাবু সেদিন সস্ত্রীক শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজন করলেন।

পরে ঐদিনই বিকালে দারোগাবাবু ভুবনেশ্বরবাবুর কাছে গিয়ে তাঁকে শরৎচন্দ্রের চিঠিখানি দিলে, তাঁর উপর থেকে ভুবনেশ্বরবাবুর রাগ অনেকটা গেলেও তাঁকে কিন্তু আর বাগনানে রাখলেন না, তাঁকে বাগনান থেকে অন্যত্র বদলি করে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

পরে শরৎচন্দ্রের এবং পরোক্ষে ভুবনেশ্বরবাবুর চেষ্টায় গ্রামের ঐ ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় মামলাই মিটে গিয়েছিল। গ্রামবাসীরাই জিতেছিল। কেন না জলকর বিলির জায়গাটা শিবোত্তর, এবং জমিদারের খাস হিসাবে বিলি না হয়ে আগের মতই পড়ে থকেবে, এই-ই স্থির হযেছিল।

শরৎচন্দ্র তাঁর পুস্তকের প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে ২৯-৬-১৬ তারিখে এক পত্রে লিখেছিলেন—

"...জানেন বোধ হয় আমার ভাগ্নীর বিয়ে এই শুক্রবারের পরের শুক্রবার। তাতে আমারই সমস্ত দায়। আবার আমি আপনার দায়। এতদিন কথাটা আপনাকে বলিনি যে দেশে আমি 'একঘরে', আমার কাজকর্মের বাড়ীতে যাওয়া ঠিক নয়। যাক্ সেজন্যেও ভাবিনি কিন্তু টাকা দেওয়া চাই, অথচ আমি না যাই, এই তাঁদের গোপন ইচ্ছা। আমার চারশ টাকার অকুলান। এটা আমার চাই।"

শরৎচন্দ্র ঐ সময় বাজে শিবপুরে বাস করতেন এবং মাঝে মাঝে তিনি তাঁর দিদি অনিলা দেবীদের বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন। এখানে চিঠিতে 'দেশে আমি একঘরে' বলতে শরৎচন্দ্র তাঁর দিদিদের গ্রাম এবং তার আশপাশের গ্রামগুলির কথাই বলেছেন।

ঠিক এই সময়েই শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' ধারাবাহিকভাবে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হচ্ছিল। আর ইতিপূর্বে তাঁর অনেকগুলি গ্রন্থও প্রকাশিত হওয়ায়, তাঁর দিদিদের গ্রাম গোবিন্দপুর ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির লোকের তাঁকে চিনতে বাকি ছিল না। তারা শরৎচন্দ্রকে একজন শক্তিশালী লেখক হিসাবে জানলেও, 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী'তে রাজলক্ষ্মীর কথা পড়ে এবং শরৎচন্দ্রের বর্মার অজ্ঞাত-জীবন সম্বন্ধে লোকের মুখে নানা জল্পনা-কল্পনা শুনে তাঁর ব্যক্তি-জীবন সম্বন্ধে তাদের মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত ধারণা গড়ে উঠেছিল। আর তারা কৌতূহলের সহিত সব চেয়ে বেশী দৃষ্টি দিয়েছিল, হিরণ্ময়ী দেবীর সহিত শরৎচন্দ্রের সম্পর্কটার উপরেই। তারা ধরে নিয়েছিল হিরণ্ময়ী দেবী 'ভবঘুরে' শরৎচন্দ্রের সামাজিক প্রথানুযায়ী বিয়ে করা স্ত্রী নন। আর হিরণ্ময়ী দেবী ব্রাহ্মণকন্যাও নন। তারা অনেক সময়েই ভাবত, এই হিরণ্ময়ী দেবীই বোধ হয় রাজলক্ষ্মী।

শরৎচন্দ্রের একটা স্বভাব ছিল, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কথা গোপন রেখে লোককে তাঁর সম্বন্ধে নানারূপ কল্পনা করতে দিয়ে মজা দেখা।

শরৎচন্দ্রের আর একটা স্বভাব ছিল এই যে, লোকে তাঁর জীবনের ইতিহাস নিয়ে মিথ্যা রটনা করে বেড়ালেও, তিনি কখন তার প্রতিবাদ করতেন না। তাঁর এই স্বভাবের কথা উল্লেখ করে তিনি নিজেই এক জায়গায় বলেছেন—

"…আমার বিগত জীবনের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত উদাসীন। জানি এ লইয়া বহুবিধ জল্পনা-কল্পনা ও নানাবিধ জনশ্রুতি সাধারণে প্রচারিত আছে। কিন্তু আমার নির্বিকার আলস্যকে তাহা বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। শুভার্থীরা মাঝে মাঝে উত্তেজিত হইয়া আসিয়া বলেন, এই সব মিথ্যের আপনি প্রতিকার করবেন না? আমি বলি, মিথ্যে যদি থাকে ত সে প্রচার আমি করি নি, সুতরাং প্রতিকার করার দায় আমার নয়—তাঁদের। তাঁদের করতে বলগে।"

শরৎচন্দ্রের 'বিগত-জীবন' নিয়ে লোকের জল্পনা-কল্পনার অন্ত না থাকলেও, শরৎচন্দ্র কিন্তু এ বিষয়ে আদৌ বিচলিত হতেন না। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নির্বিকার। এতখানি মনের তেজ না থাকলে এবং এমনিভাবে সম্পূর্ণ নির্বিকার হতে না পারলে, যে অঞ্চলে তিনি 'একঘরে', সেই তাঁর দিদিদের গ্রাম গোবিন্দপুরের পাশে সামতাবেড়ে গিয়ে বাড়ী করে বাস করতে কখনও সাহস করতেন না।

শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে বাস করতে গেলে, সেখানকার সমাজপতিদের এতদিনের জল্পনা-কল্পনা এবার উদ্দাম হয়ে উঠল। শরৎচন্দ্র কিন্তু তবুও কিছুই গ্রাহ্য করলেন না।

এদিকে সমাজপতিরাও নীরব রইল না। তারা সুবিধা হচ্ছে না দেখে, এবার যেন কত দরদ দেখিয়ে শরৎচন্দ্রকে 'একঘরে' থেকে সমাজে নেবার প্রস্তাব করে পাঠাল এবং ঐ সঙ্গে একথাও বলে পাঠাল যে, শরৎচন্দ্র যদি স্থানীয় পানিত্রাস উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে দু শ টাকা চাঁদা দেন, তাহলে তাঁকে আর একঘরে না রেখে সমাজে নেওয়া হবে।

যারা এই প্রস্তাব নিয়ে শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়েছিল, শরৎচন্দ্র প্রস্তাব শুনেই তাদের হাঁকিয়ে দিলেন এবং বললেন—স্কুলের আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ায়, দু শ কেন দু হাজার টাকা আমি দিতে পারতাম। কিন্তু টাকা আদায়ে যেখানে এই মতলব রয়েছে, সেখানে আমি একটা পয়সাও দেব না। যান্, একঘরে তো আছিই। যা পারেন করুন গে।

সমাজপতিদের হাঁকিয়ে দেওয়ায়, তারা নিজেদের বেশ অপমানিত বোধ করল। দেশের প্রধান এবং সমাজের রক্ষাকর্তা হয়েও শরৎচন্দ্রের কিছুই করতে পারছে না,—এটা তাদের পক্ষে একটা অক্ষমতা ও লজ্জার কথা বলেই তারা মনে করতে লাগল। তাই তারা এবার মরিয়া হয়ে উঠল। শরৎচন্দ্রকে প্রকাশ্য লোক সমাজে এনে কিভাবে অপমান করা যায়, সমাজপতিরা তারই সুযোগ খুঁজতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যে তারা একটি সুযোগও পেয়ে গেল। সে সুযোগটা হ'ল এই :—

সামতাবেড়ের পাশেই সামতা গ্রামে আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় নামে একজন অবস্থাপন্ন লোক ছিল। আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ের মা মারা গেলে, সমাজপতিরা এই মাতৃদায়গ্রস্থ ব্রাহ্মণকে ডেকে বল্‌ল—তোমার মাতৃশ্রাদ্ধে পঞ্চগ্রামী অর্থাৎ পাঁচগ্রামের ব্রাহ্মণ, মেয়েপুরুষ সমস্ত খাওয়াতে হবে। তোমার অবস্থা যখন ভালই, তুমি এই কাজ করলে, তোমার মা'র আত্মা খুবই শান্তি পাবে।—এই বলে সমাজপতিরা তাকে রাজী করাল। তারপর তাকে বলে দিল—সামতাবেড়ের সমস্ত ব্রাহ্মণ বাড়ীতে নিমন্ত্রণের সঙ্গে শরৎ চাটুজ্যের বাড়ীতেও যেন মেয়েপুরুষ সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হয়। তুমি নিজে গিয়ে শরৎ চাটুজ্যেব সঙ্গে দেখা করে বলবে, সমাজপতিরাই আমাকে আপনাব বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করতে বলেছেন। তাঁরা এখন 'একঘরে' তুলে দিয়েছেন। অতএব অনুগ্রহ করে আপনাদের সকলকেই যেতে হবে।

এই মাতৃদায়গ্রস্থ ব্রাহ্মণ, শবৎচন্দ্র যে একঘরে একথা জানলেও, সমাজপতিরাই যখন আবাব নিমন্ত্রণ করার নির্দেশ দিচ্ছে, তখন সে আর কোন কথা না বলে, সকলের সঙ্গে শবৎচন্দ্রেব বাড়ীতেও নিমন্ত্রণ করল।

এদিকে সমাজপতিরা এখন মহা উল্লাসে বলাবলি করতে থাকে—এবারে একটা মস্ত চাল চালা গেছে, দেখা যাক্ শরৎ চাটুজ্যে কি করে! নিমন্ত্রণ বক্ষা করতে এলে পুংক্তি ভোজনে বসিয়ে 'একঘরে' বলে পুংক্তি থেকে তুলে দিলে অপমান করব। আর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে না এলে পঞ্চগামী ব্রাহ্মণ সমাজকে অপমান করেছে বলে, ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনব।

সমাজপতিদের এই চালে শরৎচন্দ্র একটু যে চিন্তিত না হলেন, তা নয়। নিমন্ত্রণ করার মধ্যে সমাজপতিদের যে একটা কিছু মতলব রয়েছে, শরৎচন্দ্র তা সহজেই অনুমান করে নিলেন। তাই তিনি নিজে তো গেলেনই না, এমন কি হিরণ্ময়ী দেবী, প্রকাশচন্দ্র কাউকেই নিমন্ত্রণ বাড়ীতে পাঠালেন না।

শরৎচন্দ্র নিমন্ত্রণ রক্ষা না করে পঞ্চগ্রামী ব্রাহ্মণ সমাজকে অপমান করেছেন বলে, এবার সমাজপতিরা খুব হৈ-চৈ আরম্ভ করল। শরৎচন্দ্র কিন্তু সে সব কিছুই গ্রাহ্য করলেন না।

সমাজপতিরা শরৎচন্দ্রকে ঐভাবেও জব্দ করতে না পেরে আবার এক মতলব স্থির করল। এবার তারা অন্যান্য গ্রামের লোকদেরও সহজেই স্বপক্ষে আনতে সক্ষম হল। তখন তারা, শরৎচন্দ্র একটা বাঁধ কাটিয়ে অনেকের মাঠের ধান নষ্ট করে দিয়েছেন বলে, তাঁর নামে কোর্টে নালিশ করল। সেই মামলার ব্যাপারটা যা দাঁড়িয়েছিল, তা হচ্ছে এই :—

শরৎচন্দ্রের গ্রাম সামতাবেড় এবং তার সংলগ্ন সামতা, গোবিন্দপুর প্রভৃতি গ্রামগুলো ঠিক রূপনারায়ণের তীরেই অবস্থিত। রূপনারায়ণ এক সময় এই সব গ্রামের দিকেরই কূল ভেঙে বয়ে যেত। এই গ্রামগুলোর পাশে রূপনারায়ণের তীর দিয়ে গবর্ণমেণ্টের যে বাঁধ গিয়েছিল, রূপনারায়ণের ভাঙন ক্রমে তার কাছে এসে গেলে, গবর্ণমেণ্ট তখন ঐ বাঁধ ছেড়ে দিয়ে একটু দূরে সরে এসে আবার নদীর পাশ দিয়ে বরাবর এক উঁচু বাঁধ তৈরি করাল।

গবর্ণমেণ্টের ঐ যে সাবেক বাঁধ, যার অধিকাংশই ক্রমে নদীগত হয়ে যায়, ঐ বাঁধ কাটিয়ে দিয়ে শরৎচন্দ্র একটি মাঠের ক্ষতি করেছেন বলে তাঁর গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের কয়েকজন মিলে তাঁর নামে কোর্টে নালিশ করে।

এই মিথ্যা মামলায় পড়ে শরৎচন্দ্র একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন। তখন তিনি তাঁর বন্ধু বিখ্যাত আইনবিদ্ বরদাপ্রসন্ন পাইনকে তাঁর উকিল নিযুক্ত করলেন।

শরৎচন্দ্র মামলার সমস্ত তদ্বির করলেও, শরৎচন্দ্রের ভগ্নীপতি পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাহায্যে একটা সালিশি করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পঞ্চাননবাবুর আগ্রহে শেষ পর্যন্ত সালিশিই হ'ল এবং শরৎচন্দ্র সালিশিতে নির্দোষ প্রমাণিত হলেন। শরৎচন্দ্র অবশ্য পরে আর ঐ অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা বা অন্য কোনরূপ প্রতিশোধ-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি। তিনি তাঁদের ক্ষমা করেছিলেন।

এই মামলার সময় শরৎচন্দ্র সমস্ত কথা জানিয়ে তাঁর উকিল বরদাবাবুকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। চিঠিটি তাড়াতাড়িতে লেখা। চিঠিটি এই :—

(১) সাবেক বাঁধ (গভর্ণমেণ্ট) সরকার হইতে বাতিল হইবার পরে ইহার অধিকাংশই নদীগত হইয়াছে। স্থানে স্থানে ইহার সামান্য চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট আছে।

(২) বাঁধ 'এ্যাবান্‌ডান্‌ড' হইবার পর সাধারণ প্রজার সম্পত্তিভুক্ত হইয়াছে। এইভাবে গ্রামের উত্তরদিকের হানা দফাদার শ্রীনিবারণ ঘোষালের সম্পত্তি। অতএব আমি ইচ্ছা করিলেও এই স্থান কাটাইতে পারি না। নিবারণ ঘোষাল মহাশয় তাহাতে আপত্তি করিতেন। তিনি বাদীদিগের পক্ষভুক্ত না থাকায় ইহা মিথ্যা।

(৩) এই গ্রামের মধ্যে আমার জমি বাদীদিগের অপেক্ষা বেশী, সুতরাং নদীর জল প্রবেশ করাইয়া কোন প্রকার ক্ষতিকর কার্য করিলে, আমার নিজের ক্ষতি সর্বাপেক্ষা অধিক হইত। সুতরাং এরূপ কার্য আমি কোন মতেই করিতে পারি না।

(৪) বাদীদিগের কতকগুলি স্বাক্ষরকারী এ গ্রামের লোক নহে। গ্রামের ক্ষতিবৃদ্ধিতে তাহাদের কোন লাভ লোকসান নাই। এবং কতকগুলি লোক একই বাড়ীরই লোক। সুতরাং দুই একজন লোক বিদ্বেষ বশতঃ অনেকগুলি স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়া এই আবেদন করিয়াছে, আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত ও নিরর্থক কষ্ট দিবার জন্য।

(৫) এই বাঁধ পরিত্যক্ত হইবার পরে ৬০।৭০ বৎসর সরকার হইতে ইহার মেরামত হয় নাই। নদীর প্রবল স্রোত ও ঢেউয়ের জন্য অপরাপর স্থানে স্থানে যেমন ভাঙিয়া গিয়াছে, এই দুই স্থানে তেমনি ভাঙিয়াছে। আমার কোন প্রকার অপরাধের জন্য নহে।

(৬) এই দুই হানার নিকটেই অধুনা শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয়ের বাটী। তিনি ও প্রধান শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দত্ত মহাশয় সমস্ত গ্রামের ভক্তি ও বিশ্বাসেব পাত্র। ইঁহারা মধ্যস্থ হইয়া যেরূপ বিচার করিয়া দিবেন—ইত্যাদি।

প্রিয় বরদাবাবু,

তাড়াতাড়িতে আর লেখা হইল না। মুখুয্যে মশাই অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। বোধ হয় সালিশি মানাই ঠিক।...

আপনি ২।১টা 'পয়েন্ট' যা হয় 'এ্যাড্‌' করে দিন। আপনার সংশ্রব আছে জানলেও· ·।

আপনার

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সামতাবেড়ে ও কলকাতায়

শরৎচন্দ্র ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলায় তাঁর জড়িত হওয়ার কথা উল্লেখ করে ১৩৩৬ সালের ২৫শে কার্তিক তারিখে সামতাবেড় থেকে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে চিঠিটি দিয়েছিলেন, তাতে তিনি শেষে এ কথাও লিখেছিলেন—"ভাব্‌চি এটা কোনমতে শেষ হলেই পালাব। শহরই মোটের উপর সুসহ।"

শরৎচন্দ্র গ্রামে বাস করতে গিয়ে গ্রামের দলাদলি, ঝগড়াঝাটি প্রভৃতি দেখে মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে যেতেন। সেই কারণেই তিনি কেদারবাবুকে তখন ঐ কথা লিখেছিলেন।

সামতাবেড়ে গিয়ে এ সব ছাড়াও তাঁর সবচেয়ে বড় অসুবিধা হয়েছিল, সেখান থেকে কলকাতা যাতায়াতে। সামতাবেড় থেকে কলকাতায় আসার জন্য দেউলটি রেল স্টেশনে আসতে প্রায় মাইল দুয়ের একটা মাঠ পার হতে হয়। এই মাঠের মধ্য দিয়েই দেউলটি আসার কাঁচা রাস্তা। (বর্তমানে, এই গ্রন্থ রচনার সময়—রাস্তার খানিকটা পাকা হয়েছে, বাকিটা কাঁচাই রয়ে গেছে। এই রাস্তাটি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড শবৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে তাঁর নামানুসারে রাস্তাটির নামকরণ করে—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রোড।)

শরৎচন্দ্র গ্রামে সামতাবেড়ে গিয়ে বাড়ী করলেও অনেক সময় নানা কাজে রাজধানী কলকাতায় তাঁকে আসতেই হ'ত। তাঁব বই বিক্রি হ'ত কলকাতায় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের দোকানে। তাঁর লেখাও প্রকাশিত হ'ত প্রধানতঃ এই গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়। তাছাড়া তাঁর অধিকাংশ সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিক বন্ধু ছিলেন, এই কলকাতাতেই। এই সব বন্ধুদের আহ্বানেও তাঁকে মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেই হ'ত।

শরৎচন্দ্রের দিদিদের গ্রামে কয়েক ঘর দুলে বাস করে। এদের জীবিকা প্রধানতঃ পাল্‌কি বহা। শরৎচন্দ্র এই গরীব দুলেদের কিছু সাহায্যের উদ্দেশ্যেও বটে, আর নিজের সুবিধার জন্যও বটে, সামতাবেড় থেকে দেউলটি যাতায়াতে প্রায় সব সময়েই পাল্‌কিতেই যাতায়াত কবতেন।

শবৎচন্দ্র তাঁর এক সাহিত্য-রসিক স্নেহভাজন বন্ধু কলকাতায় বেহালার

জমিদার মণীন্দ্রনাথ রায়ের আহ্বানে একবার আসতে না পেরে, তখন তিনি মণিবাবুকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

"বৃষ্টি বাদলে রেল স্টেশনের একটি মাত্র পথ যা হয়ে আছে, তাতে যাওয়ার কল্পনা করতেও ভয় হয়। পাল্‌কি নিয়ে চলতে বেহারা আশঙ্কা করে, হয়ত পা পিছ্‌লে বাঁধ থেকে একেবারে খালে ফেলে দেবে। আচ্ছা জায়গাতেই এসে পড়েছি! এখানকার লোকের একটা সুবিধা আছে। তাদের এই বর্ষাকালে পায়ে খুর গজায়,—তাতেই দিব্যি খট্ খট্ করে হেঁটে চলে, পিছলকে ভয় করে না। আমার এখনো ওটা গজায় নি—তবে এরা ভরসা দিয়েছে, আরও দু এক বছর একাদিক্রমে বাস করলেই গজাবে! অসম্ভব নয়। কিন্তু আমি বলেছি, খুরে আমার কাজ নেই, আমি বরঞ্চ যেখানে ছিলাম, সেখানেই ফিরে যাবো।"

এই সব নানা কারণেই, শরৎচন্দ্র স্থির করেছিলেন, শহরে একটা বাড়ী করবেন। তাছাড়া তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীরও বড় ইচ্ছা হয়েছিল যে, কলকাতায় তাঁদের একটা বাড়ী হয়।

তাই শরৎচন্দ্র কলকাতায় বাড়ী করার মনস্থ করে তাঁর কলকাতার দু একজন বিশিষ্ট বন্ধুকে সুবিধামত একটা জায়গা দেখতে বলেন। বন্ধুরা বালীগঞ্জে পি ৫৬৬ মনোহরপুকুর রোডে (বর্তমানে এই অংশের নাম অশ্বিনী দত্ত রোড) ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের একটা জায়গাও দেখে দিলেন। শরৎচন্দ্র ঐ জায়গাটা কিনে কন্‌ট্রাক্টরদের বাড়ী করার ভার দিয়েছিলেন। এই বাড়ী করার সময়েই শরৎচন্দ্র তাঁর গ্রন্থের প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে সামতাবেড় থেকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

"আমার কলকাতার বাড়ীটা শেষ হয়ে এলো। এ সময়ে আপনি আমাকে হাজার পাঁচেক টাকা দিলে দুর্ভাবনা ঘোচে। যে তিনখানা নতুন বই শেষ হয়ে এলো, আশা হয় এর থেকে ওটা এক বছরেই শোধ হতে পারবে। বাড়ীটার এস্টিমেট ছিল চোদ্দ হাজার টাকা, যাঁরা তৈরি করলেন, তাঁদের সঙ্গে ব্যবস্থা ছিল অর্ধেক টাকা এ বছরে দেবো, বাকি অর্ধেক পরের বছরে দেবো। কিন্তু পাকে চক্রে খরচ বেড়ে গেল আরও হাজার তিনেক বেশী। নইলে টাকার দরকার হতো না, ধার না করে নিজেই দিতে পারতাম।

এ বাড়ীতে আজ পর্যন্ত প্রায় হাজার ষোল সতেরো নষ্ট করলুম, কলকাতার বাড়ীতেও বোধ করি হাজার তিরিশ নষ্ট হবে। এমনি করেই জীবন কাটলো।"

শরৎচন্দ্রের কলকাতার বাড়ীটি তৈরি হয়েছিল, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। বাড়ীটি দুতলা এবং দেখতে বেশ সুন্দর। তাঁর এই বাড়ীর ঠিকানা হল—২৪ নং অশ্বিনী দত্ত রোড।

শরৎচন্দ্র কলকাতায় বাড়ী করার পর মাত্র আর ৪ বছর বেঁচে ছিলেন। এই ৪ বছর তিনি কখন কলকাতায়, কখন সামতাবেড়ে এইভাবে কাটাতেন।

এই সময় শরৎচন্দ্রের সংসারে তাঁর নিজের লোক বলতে ছিল তাঁর স্ত্রী, ছোটভাই প্রকাশচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী এবং প্রকাশবাবুর এক কন্যা ও এক পুত্র। শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর মেজ দেওরের ছেলে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও এই সময় তাঁর বাড়ীতে থাকতেন। তিনি প্রকাশবাবুর ছেলেমেয়েদের সকাল সন্ধ্যায় পড়াতেন। তাছাড়া তাঁর সংসারে আর ছিল, ঠাকুর, চাকর এবং চাকরাণী। শরৎচন্দ্র কলকাতায় বাড়ী করে একটা বড় 'মরিস' মোটর গাড়ীও কিনেছিলেন। গাড়ী চালাবার জন্য একজন ড্রাইভার ছিল। সেও শরৎচন্দ্রের কলকাতার বাড়ীতেই থাকত।

শরৎচন্দ্র কলকাতায় বাড়ী করলেও গ্রামে সামতাবেড়ের বাড়ীর উপরেই তাঁর টান ছিল বেশী এবং সেখানেই তিনি থাকতে বেশী ভালবাসতেন। তাই তিনি কলকাতায় তাঁর এই বাড়ীতে থাকার সময় একবার বোমারু বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

"দেশের বাড়ী ছেড়ে আমি কোনকালেই যে শহরে উঠে আসবো অর্থাৎ পল্লীবাসীর বদলে নাগরিক, তাহলে মানতেই হবে যে, সে কার্য তোমার বিবাহের চেয়েও হবে। (বারীনবাবু ৫৩ বছর বয়সে, কয়েকটি সন্তানের জননী এক বিধবাকে বিয়ে করেছিলেন বলে, শরৎচন্দ্র এরূপ মন্তব্য করেছিলেন) এতে আমি সহজে রাজী হবো না, তা যত উৎসাহিতই মানুষ করুক। এখানে রোজ দাড়ি কামাতে হয়, এত বড় যন্ত্রণার ব্যাপার আমি কল্পনা করতে পারি নে।…

তোমার সঙ্গে বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ হয় নি, যদি পার একদিন এসো দুপুর বেলায়। লোকজনের ভীড় তখনই একটু কম থাকে। ৪।৫ দিন আরো এখানে আছি, তারপরেই পালাবো এবং হয়ত দীর্ঘদিন আর আসবো না।"

শরৎচন্দ্র কলকাতায় থাকলে তখন সকাল সন্ধ্যায় তাঁর দর্শনপ্রার্থীর আর

বিরাম থাকত না। শরৎচন্দ্র এঁদের ভীড় এড়াবার জন্যও অনেক সময় সামতাবেড়ে পালাতে চাইতেন।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে ডি, লিট্, উপাধি দেয়। শরৎচন্দ্র ঢাকায় ডি, লিট্, উপাধি নিতে গিয়ে, সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঢাকা থেকে কলকাতার বাড়ীতে ফিরে সেই সময় তাঁর দিদির সেজ দেওর পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

"প্রিয় সেজ কত্তা,

তোমার চিঠি পেয়েছি কিন্তু এমনি দুর্বল যে উঠে বসে দু ছত্র জবাব দেবো সে শক্তি নেই। একদণ্ড ইচ্ছা হয় না যে কলকাতায় থাকি, কিন্তু একলা কেউ ছেড়ে দেবে না। কতদিনে যে বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হতে পারবো, এ ভাবনা নিত্যি ভাব সেজ কত্তা।

কলকাতা আমার একেবারে ভাল লাগে না। মাঝে ঢাকায় যেতে হয়েছিল শুনে থাকবে। অসুখটা সেখান থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। নমস্কার জেনো।"

শরৎচন্দ্র কলকাতায় থাকলেও তাঁর মন পড়ে থাকত দেশের বাড়ীর জন্য। ১৩৪৪ সালে (শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর বৎসর) আশ্বিন মাসে খুব ঝড় হয়েছিল। শরৎচন্দ্র ঐ সময় কলকাতায় ছিলেন। ঝড়ে গ্রামের বাড়ীর কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা এই ভেবে তখন শরৎচন্দ্র এই পাঁচকড়িবাবুকে লিখেছিলেন—

"ঝড়েব প্রাবল্যে সর্বত্রই বিস্তর ক্ষতি হয়েছে। আমার কি ক্ষতি হয়েছে লক্ষ্মণকে একটু লিখে জানাতে বোলো।"

লক্ষ্মণ ছিলেন, শরৎচন্দ্রেব দিদি অনিলা দেবীর জ্ঞাতি ভাসুরপো। শরৎচন্দ্র যখন তাঁর বাড়ীর সকলকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসতেন, তখন এই লক্ষ্মণ সামতাবেড়ের বাড়ী দেখাশুনা করত।

সকলেই একসঙ্গে সামতাবেড় ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছেন, এমন খুব কমই হ'ত। বেশীর ভাগ সময় সকলেই একসঙ্গে সামতাবেড়েই বাস করতেন। তবে দু জায়গায় বাড়ী হওয়ায় কলকাতার বাড়ীতে থাকবার জন্য বাড়ীর কেউ কলকাতায়, আবার কেউ সামতাবেড়ে এইভাবে মাঝে মাঝে থাকতেন। বাড়ীর লোকজনদের এইভাবে দু জায়গায় থাকার খবর শরৎচন্দ্রের সেই সময়কার অনেক চিঠিপত্র থেকে জানা যায়। যেমন—

শরৎচন্দ্র ১৩৪৩ সালের ১১ই কার্তিক তারিখে তাঁর কলকাতার বাড়ী থেকে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখছেন—"কাল বাড়ী থেকে এখানে এসে তোমার চিঠি পেলুম। তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হলো, তার কারণ বড় বৌ, নিওমোনিয়ায় শয্যাগত হয়েছেন, সেখানে খবর গিয়ে পৌঁছলো। তবে বাড়াবাড়ি ব্যাপার নয়—আশা হয় শীঘ্রই সেরে উঠবেন।"

এখানে চিঠির মধ্যে 'বড় বৌ' হল্লেন শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী। আর 'বাড়ী থেকে' হ'ল সামতাবেড় থেকে।

হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী তাঁর কোন ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে শরৎচন্দ্রের কলকাতার বাড়ীতে একবার সিধা পাঠিয়েছিলেন। সিধা পাঠাবার সময় হরিদাসবাবু এক চিঠিতে লিখে দিয়েছিলেন—দাদা, আপনার বৌমা স্বর্গলাভের আশায় ঘুষ পাঠাচ্ছেন, গ্রহণ করবেন।

শরৎচন্দ্র ঐ সময় কলকাতায় ছিলেন। তিনি সিধা এবং হরিদাসবাবুর চিঠি পেয়ে, হরিদাসবাবুকে লিখেছিলেন—"ভায়া, বাড়ীতে ছেলেমেয়ে কেউ নেই, তারা গ্রামের বাড়ীতে। আছি শুধু প্রকাশ, আমি ও রামকৃষ্ণ। দুঃখ তাঁরা কেউ ঘুষের পরিমাণটা দেখতে পেলেন না। আমরা পরমানন্দে ভোজন করব।"

শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ের বাড়ী থেকে কলকাতার বাড়ীতে আসবার সময় হয় ছোটভাই প্রকাশকে, না হয় ভৃত্যকে সঙ্গে আনতেন। একাকী বড় একটা আসতেন না। কলকাতায় কোন বিশেষ জরুরী কাজকর্ম থাকলে, তবেই প্রকাশবাবুকে সঙ্গে আনতেন। তা না হলে তিনি তাঁর ভৃত্যকেই সঙ্গে নিয়ে আসতেন। ভৃত্য তাঁকে কলকাতার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে গ্রামের বাড়ীতে ফিরে যেত। কলকাতায় শরৎচন্দ্রের আর একটি হিন্দুস্থানী ভৃত্য ছিল।

ভোলা ও মনী

শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে ছিলেন, তখন সেখানে বরাবরই তাঁর বাড়ীতে ভৃত্য ছিল কিনা জানা যায় না। তবে তিনি রেঙ্গুন থেকে ফিরে হাওড়ায় বাজে শিবপুরে যখন থেকে বাস করতে আরম্ভ করেন, তখন থেকে তাঁর বাড়ীতে সকল সময়েই ভৃত্য ছিল।

শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুরে এসেই যে ভৃত্যটিকে পেয়েছিলেন, তার নাম ছিল ভোলা। এই ভোলা ছিল উড়িষ্যাবাসী। শরৎচন্দ্র হাওড়া শহরে যতদিন ছিলেন, ভোলা ততদিন শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে তো ছিলই, এমন কি তিনি সামতাবেড়ে চলে গেলে, সেখানেও সে কয়েক বছর ছিল।

অবশ্য ভোলা মাঝে মাঝে কিছুদিন করে ছুটি নিয়ে বাড়ীও যেত। দেশে তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা ছিল। ছুটি ফুরিয়ে গেলেই ভোলা আবার যথাসময়ে প্রভুর কাছে চলে আসত। ভোলার অবস্থা ভাল ছিল। দেশে তার যথেষ্ট জমি জায়গা ছিল। ভোলা একটু সৌখীন ছিল বটে, তবে সে কাজে খুব দড় ছিল। ভোলার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে শরৎচন্দ্র তার প্রাপ্য মাহিনা ছাড়াও, মাঝে মাঝে তাকে বক্‌সিশ্‌ দিতেন।

শরৎচন্দ্র, হাওড়া থেকে দূরে, এমনকি কলকাতার আশপাশে কোথাও যেতে হলে ভোলা ছাড়া যেতেই পারতেন না। এই জন্যই তিনি তাঁর দিল্লী ও বৃন্দাবন ভ্রমণ প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা 'দিন কয়েকের ভ্রমণ কাহিনী' প্রবন্ধটিতে ভোলাকে স্পষ্টভাবে তাঁর 'বাহন' বলে গেছেন।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফেরার পরে, তাঁর প্রথম জীবনের লীলাভূমি ভাগলপুরে মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতেন। তিনি ভাগলপুরে যখনই যেতেন, তখনই ভোলাকে সঙ্গে নিতেন। এমন কি তাঁর যাওয়ার ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে ভোলা অসুস্থ হয়ে পড়লে, ডাক্তার এনে তাকে ওষুধ, ইন্‌জেকশন দিয়ে চাঙ্গা করেও সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

শরৎচন্দ্রের মামার বাড়ীর জগদ্ধাত্রী পূজা ছিল খুব বিখ্যাত। প্রতি বছর ধূমধামের সহিত এই পূজা হ'ত। শরৎচন্দ্র একবার এই জগদ্ধাত্রী পূজার সময় অসুস্থ ভোলাকে সুস্থ করে সঙ্গে নিয়ে ভাগলপুরে যান। ভোলা সেখানে

পূজা বাড়ীতে খেয়ে আবার কিরূপ অসুখে পড়েছিল, সে সম্বন্ধে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের সেই সময়কার একটি চিঠিতে তা জানা যায়। শরৎচন্দ্রের চিঠিটি এই :—

ভাগলপুর
১৫ই কার্তিক, ১৩৩২

…৺জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে এখানে এসে আটকে গেছি। আমার ভোলা চাকর কালাজ্বরে শয্যাগত। বহু ইন্‌জেকশন দিয়ে আরাম করে সঙ্গে আনি। এখানে পূজো বাড়ীর খাদ্য এবং অখাদ্য খেয়ে তার জ্বর এবং পিলে এম্‌নি দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে যে সে অপ্রত্যাশিত।…

শুঃ—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র হাওড়া শহর থেকে রূপনারায়ণের তীরে তাঁর সামতাবেড়ের বাড়ীতে চলে গেলে, সেখান থেকে তিনি মাঝে মাঝে রূপনারায়ণের তপ্‌সে মাছ কিনে তাঁর কলকাতার ও হাওড়াব বন্ধুদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতেন।

ভোলা শরৎচন্দ্রের সকল বন্ধুকেই চিনত। আর শুধু চেনাই নয়, সে তার মনিবের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তাঁর বন্ধুদের অনেকের বাড়ীও জানত। তাই শরৎচন্দ্র এই ভোলার হাত দিয়েই তাঁর বন্ধুদের বাড়ীতে মাছ পাঠিয়ে দিতেন। এই ভাবে ভোলার হাত দিয়ে তপ্‌সে মাছ পাঠানোর কথা নিয়ে লেখা শরৎচন্দ্রের দুটি চিঠি এখানে উধৃত করছি। এই চিঠি দুটির প্রথমটি উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যাকে লেখা, আর দ্বিতীয়টি হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা। চিঠি দুটি এই :—

(১)

সামতাবেড়,
পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা—হাবড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

উমাপ্রসাদ, ভোলার মারফৎ তপসে মাছ কিছু পাঠালাম। সবাই তো তোমরা নিরামিষ ভোজী, তবে সুবিধে এই যে, এ মাছের আঁশ নেই।…

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(২)

সামতাবেড়,
পানিত্রাস পোঃ
জেলা—হাবড়া

ভায়া,

ভোলার মারফৎ আপনাদের বড় ও ছোট বাড়ীর জন্য কিছু তপস্বী মাছ পাঠাইলাম।··

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হরিদাসবাবুরা দু ভাই ছিলেন। দু ভাইয়ের মধ্যে হরিদাসবাবু ছিলেন বড়। এঁরা দু ভাইয়ে তখন পৃথক-অন্ন হয়ে পৃথক পৃথক বাড়ীতে বাস করছিলেন বলে, শরৎচন্দ্র এঁদের দু ভাইএর বাড়ীতেই তপ্‌সে মাছ পাঠিয়ে চিঠিতে লিখেছিলেন—'বড় ও ছোট বাড়ীর জন্য।'

শরৎচন্দ্রের এই ভোলা ভৃত্যটি সামতাবেড়েব বাড়ীতে বেশী দিন ছিল না। বড় জোর দু তিন বছব। কেন না ঐ সময় ভোলার দেশের বাড়ীতে তার অভাবে নানা অসুবিধা হতে থাকায় সে বাধ্য হয়ে চাকরি ছেড়ে দেশে চলে গিয়েছিল। ভোলা চলে যাওয়ার সময় শরৎচন্দ্র তাকে রীতিমত বক্‌শিস দিয়েছিলেন।

ভোলা চলে গেলে শরৎচন্দ্র যে ভৃত্যটি রেখেছিলেন, তাব নাম ছিল ননী। ননীর বাড়ী ছিল, গোবিন্দপুরে শরৎচন্দ্রের দিদির বাড়ীর পাশেই। অর্থাৎ তাঁর বাড়ী থেকে হেঁটে মিনিট পাঁচেক দূরে। শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে ননী রাত্রে থাকত না। সে সকালে বাড়ীতে ঘুম থেকে উঠে কাজ করতে চলে আসত এবং সারাদিন কাজ করে, কাজের শেষে রাত্রে আবার খেয়ে তবে বাড়ী যেত। ননী সারাদিন তাব মনিবের বাড়ীতে থাকলেও, কাছে বাড়ী ছিল বলে, তার নিজের বাড়ীর প্রয়োজন হলে সে মাঝে মাঝে বাড়ীতেও যেতে পারত।

শরৎচন্দ্র বাইরে কোথাও গেলে যেমন ভোলাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন, তেমনি ননীকেও বাহন হিসাবে সঙ্গে নিয়ে বেরোতেন। ননী সঙ্গে না থাকলে, তিনি বাইরে যেতেন না। বন্ধুবান্ধবদের কাছে লেখা শরৎচন্দ্রের অনেক চিঠিপত্র থেকে এই ননীকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে যাওয়ার কথাও জানা যায়। যেমন—

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে শরৎচন্দ্র একবার কটক থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে গিয়েছিলেন। যাওয়ার আগে তিনি তাঁর যাত্রাপথের অন্তরঙ্গ সঙ্গী বেহালার মণীন্দ্রনাথ রায়কে লিখেছিলেন—

"···যাওয়াই স্থির করলাম। রাত্রে ৮-২৪ ট্রেনে শুক্রবারেই রওনা হবো, আশা করি তুমিও যেতে আপত্তি করবে না। হাওড়া স্টেশনে তোমাকে প্রতীক্ষা করব। ননী সঙ্গে যাবে।"

ঐ সময় ননী তার মনিবের কাছে ছুটি নিয়ে তার শ্বশুরবাড়ী যাওয়ায়, শরৎচন্দ্র আবার মণিবাবুকে লিখেছিলেন—"আমার ননী গেছে ছুটি নিয়ে শ্বশুরবাড়ী, কাল শুক্রবারে আসবে—যদি যেতেও হয়, ওকে নইলে যাওয়া হবে না।"

ননী শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে অনেকদিন চাকবি করেছিল। এখানে চাকরি করার কালেই একদিন রাত্রে তার বাড়ীতে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে সাপে কামড়ায়। সেই সাপের কামড়েই ননীর মৃত্যু হয়েছিল। ননীকে সাপে কামড়ালে শরৎচন্দ্র তখন মহাচিন্তিত হয়ে যে ব্যবস্থা করেছিলেন, এখানে সেই ঘটনাটি বলছি :—

সেদিন রাত্রি তখন ২টা। ননীর এক প্রতিবেশী ছুটে এসে শরৎচন্দ্রকে খবর দিল, ননীকে সাপে কামড়েছে। শবৎচন্দ্র এই খবর শুনেই তখনই ননীর বাড়ীতে গেলেন। শরৎচন্দ্র ননীর বাড়ীতে গিয়ে দেখেন, ইতিমধ্যে অনেক লোক সেখানে এসে জড়ো হয়েছে। শরৎচন্দ্র দেখলেন, তাঁর দিদির সেজ দেওর পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর দিদির কয়েকজন দেওর-পো'ও এসেছেন।

শরৎচন্দ্র ননীর কাছে গেলে, বাবু আমাকে বাঁচান—বলে ননী কেঁদে উঠল। সেই সঙ্গে ননীর বাড়ীর লোকজনও কাঁদতে কাঁদতে শরৎচন্দ্রের কাছে ঐ প্রার্থনাই জানাল।

শরৎচন্দ্র ছেলেবেলায় অনেক সাপ ধরেছেন এবং সাপও ভাল রকমই চিনতেন। পরে বড় হয়ে সাপ সম্বন্ধে বই পড়ে সাপ ও সাপের বিষ-ক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক কথা জেনেছিলেন।

শরৎচন্দ্র দেখলেন, ননীর শরীরে সর্পদষ্ট স্থানটার উপরে ঘন ঘন করে

কয়েকটা শক্ত বাঁধন দেওয়া হয়েছে। তিনি দংশন স্থানটায় সাপের দাঁতের দাগ দেখে বুঝলেন যে, বিষধর সাপেই কামড়েছে।

ইতিমধ্যে ননীর এক জ্ঞাতি পাশের গ্রাম থেকে একজন সাপের ওঝা ডেকে আনায়, সে এসেই ননীর চিকিৎসা ও সেই সঙ্গে সঙ্গে সাপে কামড়ানোর মন্ত্র আওড়াতে সুরু করল।

এই সব মন্ত্র-টন্ত্রে শরৎচন্দ্রের বিশ্বাস না থাকলেও রোগীকে মানসিক বল দেওয়ার জন্যই, এ সবের বিরুদ্ধে তিনি একটি কথাও বললেন না। তবে তিনি ভোরেই দেউলটি থেকে কলকাতায় আসার যে ট্রেন ছিল, সেই ট্রেনে ননীকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবার আয়োজন করতে লাগলেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর দিদির সেজ দেওর পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুক্তি করে, পাঁচকড়িবাবুর বড় ছেলে ব্রজদুর্লভ এবং ননীর দুজন আত্মীয়কে সঙ্গে দিয়ে, ননীকে পাল্‌কীতে চাপিয়ে দেউলটি স্টেশনে পাঠিয়ে দিলেন। ননীব চিকিৎসা করবার জন্য ব্রজদুর্লভবাবুর হাতে শরৎচন্দ্র তাঁব স্নেহভাজন বন্ধু কলকাতায় ন্যাশন্যাল মেডিকেল স্কুলের (বর্তমান নাম চিত্তবঞ্জন মেডিকেল কলেজ) ডাঃ কুমুদশঙ্কর বায়ের কাছে এক চিঠি লিখে দিলেন। আর ঐ সঙ্গে ননীর চিকিৎসাব খরচেব জন্য বেশ কিছু টাকাও তিনি ব্রজদুর্লভবাবুর হাতে দিলেন।

ব্রজদুর্লভবাবু ও তাঁব সঙ্গী দুজন যথাসময়ে দেউলটিতে ট্রেন ধরে ননীকে নিয়ে সকালে হাওডা স্টেশনে এসে পৌঁছালেন। ননী ট্রেনে আসবার সময়েই বিষের ঘোরে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল। ব্রজদুর্লভবাবু ও তাঁর দুজন সঙ্গী অচৈতন্য ননীকে ট্যাক্সিতে চাপিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে ন্যাশন্যাল মেডিকেল স্কুলে নিয়ে গেলেন।

সেখানে ব্রজদুর্লভবাবু হাসপাতালের এক বারান্দায় অচৈতন্য ননীকে রেখে এবং তার কাছে তার আত্মীয় দুজনকে বসিয়ে ডাঃ কুমুদশঙ্কব রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। ব্রজদুর্লভবাবু কুমুদবাবুর হাতে শরৎচন্দ্রের চিঠিটি দিলে তিনি পড়েই, কোথায় রোগী—বলে ব্রজদুর্লভবাবুর সঙ্গে রোগীর কাছে চলে এলেন। এসে রোগীর নাড়ী টিপে দেখে বললেন—এ তো মারা গেছে! কখন এনেছেন?

ব্রজদুর্লভবাবু বললেন—এনেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে গেস্‌লাম।

—এ রকম সাড়াশব্দহীন অবস্থায় কতক্ষণ থেকে আছে?

—ট্রেনে আসবার সময় থেকেই।

—তখনই মারা গেছে।

—আমরা ভেবেছিলাম, বিষের ঘোরে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে।

—না। তখনই যদি নাড়ী দেখতেন তো বুঝতে পারতেন। আপনাদের খুব ভাগ্য ভাল যে পথে মড়া নিয়ে পুলিশের হাতে পড়েন নি। তাহলে নাকালের আর শেষ থাকত না। শরৎবাবুর এই চিঠির জন্য তাঁর কাছেও পুলিশ যেত। যাই হোক্, এখন তো আর রোগীকে বাঁচাবার কোন উপায় নেই। এখন পুলিশের হয়রানি থেকে আপনাদের ছাড় করিয়ে দিতে হবে।—এই বলে কুমুদবাবু নিজেই সমস্ত ব্যবস্থা করে মৃতদেহ পোড়াবার ছাড়পত্র করে দিলেন।

ননীর যে দুজন আত্মীয় সঙ্গে এসেছিল, তারা কলকাতায় কাজ করে তাদের এমন ক'জন আত্মীয়কে ডেকে নিয়ে এল। তারপর সকলে মিলে ননীর মৃতদেহ নিয়ে নিমতলা শ্মশানে গিয়ে দাহ করে এল।

ননীর মৃতদেহ সংকারের পর অনেক রাত্রে সামতাবেড়ে ফিরে গিয়ে ব্রজদুর্লভবাবু যখন শরৎচন্দ্রকে সমস্ত কথা শোনালেন, তখন সব শুনে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বললেন—আমি সকাল থেকে এতটা রাত পর্যন্ত তোদের পথ চেয়ে একটা ভাল খবরের আশায় বসে আছি, তা না করে তোরা একি সংবাদ আনলি!

শরৎচন্দ্র ভোরে ননীকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়ে, একটু বেলা হলে, সাপুড়েদের ডাকিয়ে এনে ননীর মাটির ঘরের মেঝে খুঁড়ে সাপটা ধরিয়েছিলেন।

ননীর ঐভাবে মৃত্যু হওয়ায় শরৎচন্দ্র খুবই আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ননীর পরিবারবর্গকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর হিরণ্ময়ী দেবীও ননীর বাড়ীতে ঐ বরাদ্দ সাহায্য দিয়ে যেতেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শরৎচন্দ্র সামতাবেড় অঞ্চলের যে সব দুঃস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য করতেন, শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর হিরণ্ময়ী দেবীও সেই সমস্ত সাহায্য বন্ধ না করে নিয়মিত দিয়ে যেতেন। হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর প্রায় ২৩ বছর বেঁচে ছিলেন। (হিরণ্ময়ী দেবীর মৃত্যু তারিখ ১৫ই ভাদ্র, ১৩৬৭।)

বাটু, বাবা ও স্বামীজী

মালয় উপদ্বীপের শুক বা টিয়া জাতীয় একরকম পাখীকে বলে 'হুরি পাখী'। এই পাখীগুলো দেখতে খুবই সুন্দর। এদের কথা বলতে শেখালে, এরা দু-একটা কথাও বলতে পারে।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থাকার সময় এইরূপ একটি হুরি পাখী কিনেছিলেন। তিনি তাঁর ঐ পাখীটির নাম রেখেছিলেন—বাটু। বাটুকে তিনি আদর করে বাটুবাবা বলে ডাকতেন। বাটুও শরৎচন্দ্রকে বাবা বলে ডাকত।

শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে কোন নতুন লোক এলে, তাকে দেখে বাটু—কে, এসো, বসো—এই কথাগুলোও বলতো।

বাটু দিনের বেলায় ঘরের বারান্দায় পিতলের দাঁড়ে শিকলে বাঁধা থাকত, আর রাত্রে তার দাঁড়েই ঘরে থাকত। বাটুর গায়ের রঙ ছিল ঘোর লাল, কিন্তু পাখা দুটি ছিল সবুজ। বাটু দেখতে এমন সুন্দর ছিল যে, তাকে দেখলেই গায়ে হাত বুলিয়ে আদব করতে ইচ্ছা হ'ত।

শরৎচন্দ্র বাটুর খাওয়ার দিকে বিশেষ নজর দিতেন। ছোট ছোট কয়েকটা বাটিতে বাটুর খাবার সব সময়েই সাজানো থাকত। যেমন—কোনটাতে পেস্তা-বাদাম, কোনটাতে আঙ্গুর কিংবা কিস্‌মিস্‌, কোনটাতে আনারসের কুঁচি ইত্যাদি।

শরৎচন্দ্র একদিন দুপুরে বাড়ীতে ছিলেন না। হিরণ্ময়ী দেবী তখন ঘরে ঘুমুচ্ছিলেন। বাড়ীর ঠিকে ঝি কাজ না থাকায় আশপাশে তখন কোথায় গিয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে একটা ছিঁচ্‌কে চোর লুকিয়ে শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে ঢুকে রান্নাঘর থেকে থালা-ঘটি চুরি করছিল। এই দেখে বাটু এমন ট্যাঁ ট্যাঁ করে চীৎকার করেছিল যে, হিরণ্ময়ী দেবী ঘুম থেকে উঠে পড়েছিলেন এবং বাড়ীর ঝিও আশপাশ থেকে ছুটে এসেছিল। সকলে এসে গেলে চোর থালাঘটি ফেলে চম্পট দিয়েছিল। এই ঘটনার পর থেকে বাড়ীতে বাটুর আদর আরও বেড়ে গিয়েছিল।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে যখন হাওড়ায় বাজে শিবপুরে চলে আসেন, তখন

আসবার সময় বাটুকেও নিয়ে আসেন। শরৎচন্দ্র হাওড়া শহরে যে দশ বৎসর ছিলেন, সেই দশ বৎসর বাটুও শরৎচন্দ্রের কাছে পুত্রস্নেহেই পালিত হয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের বাড়ীতে তাঁর ভৃত্য ভোলা একটা পিয়ারা গাছ লাগিয়েছিল। পিয়ারা গাছটি বড় হলে এবং তাতে পিয়ারা হলে, শরৎচন্দ্র বাড়ীতে নির্দেশ দিয়েছিলেন—পিয়ারা পাকলে আগে বাটু খাবে, তারপর অন্য সকলে খাবে। সেই থেকে প্রতি বছরই ঐ গাছে পিয়ারা হলে, শরৎচন্দ্রের এই নির্দেশ সকলেই মেনে চলত।

শরৎচন্দ্র হাওড়া শহর ছেড়ে যখন সামতাবেড়ে যান, তখনও বাটু বেঁচে ছিল। শরৎচন্দ্র তাঁর যে খাতার মলাটের ভিতর পিঠে কয়েকটি মৃত্যু সংবাদ লিখে রেখেছিলেন, সেখানে এই বাটুব মৃত্যু সংবাদও লেখা ছিল। সেখানে তিনি বাটুর মৃত্যু সম্বন্ধে লিখেছিলেন—

> আজ রাত্রি ১০-৪৫
> বাটুব মৃত্যু হোলো
> মঙ্গলবাব ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৩৮
> সামতাবেড, হাবড়া।
> বন্ধন থেকে সে নিজেই শুধু মুক্তি পেলে না
> আমাকেও একটা মস্ত মুক্তি দিয়ে গেল।
> প্রভাসের পাশেই সমাহিত করলাম।
> বাকি রইল কেবল আর একটা।

শরৎচন্দ্র এখানে 'বাকি বইল কেবল আর একটা' বলতে সম্ভবতঃ তাঁর তখনকার পোষা কাকাতুয়া পাখীটিব কথা বলেছেন। শরৎচন্দ্র হাওডায় বাজে শিবপুরে থাকতেই এই কাকাতুয়া পাখীটি পুষেছিলেন। কাকাতুয়াটির গায়ের রঙ ছিল সাদা, আর মাথায় ছিল হলদে ঝুঁটি।

শরৎচন্দ্রের এই পাখী পোষার প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, তিনি সামতাবেড়ে থাকবার সময় একবার এক জোড়া ময়ূর পুষেছিলেন। এই জোড়ার একটা কেনার অল্পদিন পরেই মরে যায়। আর একটা অনেকদিন বেঁচে ছিল। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তিনি কলকাতার বাড়ীতেও একটা ময়ূর কিনে পুষেছিলেন।

শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে গিয়ে যে কুকুরটি পুষেছিলেন, তার নাম রেখেছিলেন বাঘা। বাঘা ছিল লাল রঙের মস্ত দেশী কুকুর।

শরৎচন্দ্র ভেলুকে যতটা আদর যত্ন করতেন, ততটা না হলেও বাঘার আদর-যত্নের অভাব ছিল না। বাঘা সামতাবেড়ের বাড়ীতে থেকে বাড়ী পাহারা দিত।

বাঘা সব সময়েই ছাড়া থাকত। সে ছিল গ্রামের কুকুর। তাই সে এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় ঘুরেও বেড়াত। বাঘা এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে একবার সামতা গ্রাম ছাড়িয়ে ম্যাল্লকে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে ম্যাল্লকের জমিদার মোহিনী ঘোষালের বাড়ীর সামনে একটা শিয়াল দেখে তাকে তাড়া করলে, শিয়ালটা ঘুরে দাঁড়িয়ে বাঘাকে কামড়েছিল। ঐ শিয়ালটা ছিল একটা পাগলা শিয়াল।

বাঘা পাগলা শিয়ালের সঙ্গে কামড়াকামড়ি করে বাড়ী আসে। বাঘাকে যখন পাগলা শিয়ালে কামড়ায় তখন সেইখানে যারা উপস্থিত ছিল, তাদের একজন পরে একদিন শরৎচন্দ্রকে ঐ সংবাদটা দিয়েছিল। কেননা সে বাঘাকে শরৎচন্দ্রের কুকুর বলে জানত।

বাঘাকে পাগলা শিয়ালে কামড়েছে জানতে পেরেই, শরৎচন্দ্র বাঘার চিকিৎসা করিয়েছিলেন, কিন্তু বাঘাকে বাঁচাতে পারেন নি। শরৎচন্দ্র তাঁর সেই খাতার মলাটের ভিতর পিঠে বাঘার মৃত্যু সংবাদ এইরূপ লিখেছিলেন—

> আজ বাঘা মারা গেল।
> মোহিনী ঘোষালের বাড়ীর সম্মুখে কি জানি কবে তাকে
> পাগলা শিয়ালে কামড়েছিল।

এখানে দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্র বাঘার মৃত্যু তারিখ ও সময়টা লেখেন নি।

শরৎচন্দ্র তখন সামতাবেড়ে থাকেন। সেই সময় একদিন তিনি পথ দিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন, এমন সময় দেখতে পেলেন, এক জায়গায় কয়েকটি লোক মিলে একটা খাসিকে কাটবার জোগাড় করছে। লোকগুলি খাসিটা কিনে এনে কেটে মাংস ভাগ করে নেওয়ার মতলব করেছিল।

খাসিটাকে কাটবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ঐ অবস্থায় দেখে দরদী শরৎচন্দ্রের মনে খাসিটার উপর বড় মায়া হল। তাই তিনি তখন লোকগুলির কাছে

গিয়ে তাদের বললেন—তোমরা যে দামে খাসিটা কিনেছ, সেই দামের কি তার চেয়েও বেশী দাম দিচ্ছি, আমাকে খাসিটা দিয়ে দাও। ওটাকে আর কেটো না।

লোকগুলি শরৎচন্দ্রকে চিনত তো বটেই, এমন কি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তিও করত। তাই তারা আর কোন কথা না বলে, যে দামে খাসিটা কিনেছিল, শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে সেই দাম নিয়ে তাঁকে খাসিটা দিয়ে দিল।

শরৎচন্দ্র এইভাবে খাসিটাকে কিনে তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে বাড়ীতে এনে পুষেছিলেন। তিনি এই পোষা খাসিটার নাম রেখেছিলেন—স্বামীজী।

শরৎচন্দ্র স্বামীজীব খাওয়ার দিকে নজর রাখলে স্বামীজী অল্পদিনের মধ্যেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও কান্তিবিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। স্বামীজীর গায়ের রঙ ছিল গেরুয়া। সে ছাড়া থাকত বটে, কিন্তু কোন প্রতিবেশীর গাছপালায় মুখ দিত না। সে আশেপাশে যেখানেই থাকুক, শরৎচন্দ্রের একবার 'স্বামীজী' ডাক শুনলেই, তাঁর কাছে দৌড়ে এসে হাজির হ'ত।

শরৎচন্দ্র তাঁর সেই খাতার মলাটের ভিতর পিঠে এই স্বামীজীর মৃত্যু সম্বন্ধে লিখে গেছেন—

১৩ই মাঘ ১৩৩৯ (বেলা ১১-৩)
বৃহস্পতিবার—স্বামীজীর মৃত্যু
আর একটা ভাবনা ঘুচ্‌লো।
সামতাবেড, হাবড়া।

শরৎচন্দ্র বরাবরই পশুহত্যা, এমন কি পূজায়ও পশুবলি সমর্থন করতেন না। একবার তাঁর কঠিন অসুখ করলে, তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী কালীঘাটের কালীর কাছে তাঁর রোগমুক্তি কামনা করে কালীকে জোড়া পাঁঠা দেবেন বলে মানসিক করেছিলেন। শরৎচন্দ্র রোগমুক্তির পর এ কথা জানতে পেরে, তিনি দুটি পাঁঠার বদলে, দুটি পাঁঠার দাম কালীব কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র, শুধু নিজের ব্যক্তি-জীবনেই নয়, কালীপূজায় পশুবলি বন্ধ নিয়ে একটি গল্পও লিখে গেছেন। তাঁর সেই গল্পটির নাম 'লালু'।

সামতাবেড়ে সাহিত্য সাধনা

শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে বাড়ী করার সময় একতলায় রূপনারায়ণের দিকে একটা ছোট ঘর করিয়েছিলেন। ঐ ঘরটাকে তিনি লিখবার ঘর করেছিলেন। সামতাবেড়ে থাকার সময় ঐ ঘরে বসেই তিনি লিখতেন। কিন্তু সাহিত্য-রচনায় তাঁর যে চিরন্তন কুঁড়েমি, সামতাবেড়ে এসে তা আরও বেড়ে গিয়েছিল।

শরৎচন্দ্র যখন হাওড়া শহরে ছিলেন, তখন ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধর সেন শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে গিয়ে দিনের পর দিন ধর্ণা দিয়ে লেখা আদায় করে আনতেন। সেই লেখা ধাবাবাহিকভাবে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হ'ত এবং পরে ভারতবর্ষেরই কর্তৃপক্ষ তাঁদের দোকান থেকে আবার পুস্তকাকারে প্রকাশ করতেন।

শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে চলে গেলে বৃদ্ধ জলধর সেন (জলধরবাবু শরৎচন্দ্রের চেয়ে ১৮।১৯ বছরের বড ছিলেন) আব সামতাবেড়ে যেতে পারতেন না। তখন চিঠি লিখে তাগাদা দেওয়াই তাঁর একমাত্র উপায় ছিল। সাক্ষাৎ উপস্থিতি ও ধর্ণা দিয়ে অবস্থান করার মত, চিঠিব তাগাদা কিন্তু শরৎচন্দ্রের কুঁড়েমিকে তেমন টলাতে পারত না।

শরৎচন্দ্র হাওডা শহর ছেড়ে সামতাবেড়ে চলে যান ১৩৩৩ সালের মাঘ কিংবা ফাল্গুন মাসে। সেখানে গিয়ে কিছুদিন পরে তিনি 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসটি লিখতে স্থরু করেন। শেষপ্রশ্ন ভারতবর্ষে প্রথম ছাপা আরম্ভ হয় ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ মাসে এবং শেষ হয়েছিল ১৩৩৮ সালের বৈশাখে। জলধরবাবু পুনঃ পুনঃ এবং কঠোর তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র এই প্রায় ৪ বছরের মধ্যে অনেক মাসেই লেখা দিতে পারেন নি। শেষপ্রশ্নেব কপি চেয়ে এই তাগাদা দেওয়ার জন্য শরৎচন্দ্র একবার লেখা না দিতে পেরে জলধরবাবুকে লিখে ছিলেন—

"আমার লেখার ব্যাপাবে এ ত্রুটি তো ১৫ বচ্ছর দেখে আসচেন, স্থতরাং খারাপ লাগলেও আশ্চর্য যে হন নি, এ কথা নিশ্চয় জানি। আবার এমনি কোরেই অবশেষে একদিন বই শেষও হয়।"

শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসের এমনিতেই একটা তীব্র আকর্ষণ আছে। তাই

অনুরাধা ও সতী গল্প দুটি এবং 'ছেলেবেলার গল্প' বইটির ৭টি গল্পের মধ্যে ৬টি গল্প।

অনুরাধা গল্পটি ১৩৪০ সালের চৈত্র সংখ্যা ভারতবর্ষে এবং সতী গল্পটি ১৩৩৪ সালের আষাঢ় সংখ্যা বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্র 'কালি-কলম' কাগজের সম্পাদকের অনুরোধে কালি-কলম কাগজের জন্ত 'সতী' গল্পটি লিখেছিলেন এবং একদিন তিনি সতী গল্পটি পকেটে নিয়ে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের উপরে কালি-কলম অফিসে দিতেও এসেছিলেন। কিন্তু সম্পাদককে দেখতে না পেয়ে, তিনি সেখান থেকে সিধা বঙ্গবাণী অফিসে গিয়ে বঙ্গবাণীতেই সতী গল্পটি দিয়ে এসেছিলেন।

'ছেলেবেলার গল্প' বইটিতে আছে—লালু (১), ছেলেধরা, কলকাতার নতুনদা, লালু (২), বছর পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী, লালু (৩), দেওঘর স্মৃতি। এই সাতটির মধ্যে 'দেওঘব স্মৃতি'টি ঠিক গল্প নয়। এটি শরৎচন্দ্রের একটি স্মৃতিচিত্র। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে তিনি তাঁর চিকিৎসকদের উপদেশে বায়ু-পরিবর্তনের জন্য দেওঘর গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁর গ্রন্থের প্রকাশক হবিদাস চট্টোপাধ্যায়দের 'মালঞ্চ' নামক বাড়ীতে ছিলেন। সেখানে একটি পথের কুকুরকে তিনি কয়েকদিন আদর-যত্ন করেছিলেন। সেই কুকুরের কাহিনীটিই প্রধানতঃ দেওঘর স্মৃতির বিষয়বস্তু।

'কলকাতার নতুন দা' গল্পটি পূর্বে প্রকাশিত শ্রীকান্ত ১ম পর্বের ৭ম পরিচ্ছেদ থেকে উধৃত। এই গল্পটি ১৩৪৪ সালে 'গল্পের মণিমেলা' নামক একটি বার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়েছিল।

বাকি গল্পগুলির মধ্যে লালু (১) শবৎচন্দ্রের মৃত্যুব পবে ১৩৪৪ সালের চৈত্র সংখ্যা 'মৌচাকে', ছেলেধবা ১৩৪২ সালের পূজাবার্ষিকী 'ছোটদের আহরিকা'য়, লালু (২) ১৩৪৪ সালেব পূজাবার্ষিকী 'সোনার কাঠিতে, বছর পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনেব কাহিনী ১৩৪৪ সালের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা 'পাঠশালা'য় প্রকাশিত হয়েছিল।

'ছেলেবেলার গল্প' গ্রন্থের ভূমিকায় শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন,—"…মনে পড়লো এক বাল্যবন্ধুর কথা। ভাবলাম আজ তারই দু-একটা গল্প বলি। শুনে খুশি হও—ভালই।"

শরৎচন্দ্রের এই বাল্যবন্ধুটি হলেন তাঁর শ্রীকান্ত গ্রন্থের ইন্দ্রনাথ বা রাজু। এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মাতুল ও বাল্যবন্ধু সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও লিখেছেন—

"ছোট ছেলেদের জন্ত গোটাকয়েক গল্প শরৎ শেষ অসুখে পড়েও লিখে ছিলেন। তাতে নাম না দেওয়া থাকলেও, সেগুলি ইন্দ্রনাথের (রাজুর) কাহিনী ফলিয়ে সাহিত্য করে লেখা হয়েছে।"

লালুর তিনটি গল্পই রাজুর গল্প 'ফলিয়ে সাহিত্য করে লেখা'। কিন্তু 'ছেলেধরা' ও 'বছর পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী' গল্প দুটিতে শরৎচন্দ্রের নিজের জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা বা ছাপ আছে বলে মনে হয়। কেন না 'ছেলেধরা' গল্পের শেষে তিনি নিজে মন্তব্য করেছিলেন—"ঘটনাটি ছেলে ভুলানো গল্প নয়, সত্যই আমাদের ওখানে ঘটেছিল।" এরূপ মন্তব্য তিনি তাঁর আর কোন গল্প সম্বন্ধে করেন নি। 'বছর পঞ্চাশ পূর্বেব একটা দিনের কাহিনী' গল্পটি এক তো লেখকের আত্মকথারূপে লেখা, দ্বিতীয়তঃ এর পবিবেশ শহর নয় গ্রাম। রাজু গ্রামের ছেলে ছিল না, সে ছিল বরাবর ভাগলপুর শহরের ছেলে।

সামতাবেড়ে থাকার সময়েই শরৎচন্দ্রের তিনখানা নাটক ষোড়শী (দেনা-পাওনার নাট্যরূপ), রমা (পল্লীসমাজের নাট্যরূপ) এবং বিজয়া (দত্তার নাট্যরূপ) যথাক্রমে ১৩-৮-২৭, ৪-৮-২৮ ও ২৪-১২-৩৪ তারিখে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া ১ -৪-২৯ তারিখে তাঁর 'তরুণেব বিদ্রোহ' এবং ১৯৩৭ এর আগস্ট মাসে 'স্বদেশ ও সাহিত্য' প্রকাশিত হয়।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইস্টারেব ছুটিতে রংপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্বে যে বঙ্গীয় যুব সম্মিলনীর অধিবেশন হয়েছিল, তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন শরৎচন্দ্র। সেই সভায় তিনি যে লিখিত প্রবন্ধটি পড়েছিলেন, সেই প্রবন্ধটিকে নিয়ে সরস্বতী লাইব্রেবী প্রথমে 'তরুণের বিদ্রোহ' নাম দিয়ে পুস্তিকাকাবে প্রকাশ কবেছিল। সরস্বতী লাইব্রেরী কর্তৃক এই পুস্তিকা প্রকাশের ৩ বছর পরে ২৩-৮-৩২ তারিখে আর্য পাবলিশিং কোং পরিবর্ধিত আকারে এব নতুন সংস্করণ বার করেছিল। এই নতুন সংস্করণে ১৩২৮ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের 'নারায়ণে' প্রকাশিত 'সত্য ও মিথ্যা' প্রবন্ধটি সন্নিবিষ্ট হয়।

'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থটিও আর্য পাবলিশিং কোং প্রকাশ করে। এই গ্রন্থেব অন্তর্গত প্রবন্ধ বা রচনাগুলির বিবরণ নিয়ে দেওয়া গেল—

স্বদেশ :

আমার কথা (১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির

সভাপতির পদত্যাগকালে পঠিত অভিভাষণ)—'প্রবর্তক', শ্রাবণ ১৩২৯।

স্বরাজ সাধনায় নারী (১৩২৮ সালের পৌষ মাসে শিবপুর ইনস্টিটিউটে পঠিত অভিভাষণ)—'নব্যভারত', পৌষ ১৩২৮।

'শিক্ষার বিরোধ (১৩২৮ সালে 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যা আয়তনে' পঠিত)—'নারায়ণ', অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২৮।

স্মৃতিকথা—'দেশবন্ধু স্মৃতিসংখ্যা', 'মাসিক বসুমতী', আষাঢ় ১৩৩২।

অভিনন্দন (১৩২৮ সালের জুন মাসে, দেশবন্ধুর কারামুক্তির পর শ্রদ্ধানন্দ পার্কে দেশবাসীর পক্ষ থেকে প্রদত্ত অভিনন্দন)।

সাহিত্য :

ভবিষ্যৎ বঙ্গ সাহিত্য (১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বরিশাল শাখার প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে বক্তৃতার সারাংশ)।

গুরু-শিষ্য সংবাদ—'যমুনা', ফাল্গুন ১৩২০।

সাহিত্য ও নীতি (১৩৩১ সালের ১০ই আশ্বিন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ)—'বঙ্গবাণী', পৌষ ১৩৩১।

সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি (১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখাব সভাপতির অভিভাষণ)—'মাসিক বসুমতী', চৈত্র ১৩৩১।

ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীত—'ভারতবর্ষ', ফাল্গুন ১৩৩১।

আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ (১৩৩০ সালের ১৬ই আষাঢ় শিবপুর ইন্‌স্টিটিউটে সাহিত্য-সভায় পঠিত সভাপতির অভিভাষণ)—'বঙ্গবাণী', শ্রাবণ ১৩৩০।

সাহিত্যের রীতি ও নীতি—'বঙ্গবাণী', আশ্বিন ১৩৩৪।

অভিভাষণ (১৩৩৫ সালের ভাদ্র মাসে ৫৩তম বাৎসরিক জন্মদিন উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে দেশবাসীব প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তর)—'কালি-কলম', আশ্বিন ১৩৩৫।

অভিভাষণ (৫৫তম বাৎসরিক জন্মতিথিতে প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে পঠিত)—'বাতায়ন', ২৯ আশ্বিন ১৩৩৮।

যতীন্দ্র সংবর্ধনা—(কবি যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চির সংবর্ধনা উপলক্ষে লিখিত)।

শেষপ্রশ্ন (সুমঙ্গল ভবনের শ্রীমতী····· সেনকে লিখিত পত্র)—'বিজলী', ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা।

রবীন্দ্রনাথ (১৩৩৮ সালে 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উপলক্ষে পঠিত)—'জয়ন্তী-উৎসর্গ', পৌষ ১৩৩৮।

শরৎচন্দ্র তাঁর এই 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থখানির সর্বস্বত্ব আর্য পাবলিশিং কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী অশ্বিনীকুমার বর্মণকে দান করেছিলেন।

এই সময় তিনি 'সাহিত্যে রীতি ও নীতি', 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা', 'বাল্যস্মৃতি' 'নতুন প্রোগ্রাম' নামে কয়েকটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন।

১৩৩৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যা বিচিত্রা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য ধর্ম' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কবির ঐ প্রবন্ধটি নিয়ে 'বিচিত্রা' ও 'শনিবারের চিঠি'তে তখন রীতিমত আলোচনা চলেছিল। শনিবারের চিঠিতে সম্পাদক সজনীকান্ত দাস আলোচনাকালে তাঁর নিজের মন্তব্যের সঙ্গে শরৎচন্দ্রেরও নাম জুড়ে দেওয়ায়, শরৎচন্দ্র তখন বাধ্য হয়ে ঐ প্রসঙ্গে 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' নামে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধটি তখন ১৩৩৪ সালের আশ্বিন সংখ্যা বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৩৩৩ সালে (ইং ১৯২৬) কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়। দাঙ্গায় উভয় সম্প্রদায়েরই বহু লোক হতাহত হয়। সেই সময়েই শরৎচন্দ্র 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধটি ১৩৩৩ সালের ১৯শে আশ্বিন তারিখে 'হিন্দু-সংঘ' কাগজে প্রকাশিত হয়। হিন্দু-সংঘের ঐ সংখ্যায় সজনীকান্ত দাসেরও একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। প্রধানতঃ এই প্রবন্ধ দুটি প্রকাশ করার জন্যই হিন্দু-সংঘ সম্পাদক ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

১৩৪০ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'জয়শ্রী' পত্রিকায় নিরুপমা দেবী 'পুরাতন কথার আলোচনা' নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে প্রসঙ্গক্রমে শরৎচন্দ্রের কথাও কিছু কিছু ছিল। সেই কারণেই ঐ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র 'বাল্য-স্মৃতি' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধটি ১৩৪৫ সালের আশ্বিন মাসে 'ছোটদের মাধুকরী'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে গুড ফ্রাইডের ছুটিতে রংপুরে বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীর সভায়

শরৎচন্দ্র যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই নিয়ে পরে কেউ কেউ তাঁর বিরুদ্ধ-সমালোচনা করেছিলেন। তারই উত্তরে শরৎচন্দ্র তখন 'নতুন প্রোগ্রাম' নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। শরৎচন্দ্র 'শ্রীপরশুরাম' এই ছদ্মনামে এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। প্রবন্ধটি ১৩৩৬ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'বেণু'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

এগুলি ছাড়া 'বেতার-সংগীত', 'বর্তমান রাজনৈতিক প্রসঙ্গ', 'শরৎচন্দ্রের উভয় সংকট' ও 'মহাত্মার পদত্যাগ' নামে কয়েকটি ছোট ছোট রচনাও এই সময় লিখেছিলেন।

সামতাবেড়ের বাড়ীতে বসে বেতারের গান শোনা নিয়ে লেখা 'বেতার সংগীত' এই ছোট্ট রচনাটি নরেন্দ্র দেবের 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে প্রথম মুদ্রিত হয়।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নিয়ে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে এবং তারই ফলে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কংগ্রেস ত্যাগ করে 'ন্যাশনালিস্ট পার্টি' গঠন করলে, তখন শরৎচন্দ্র 'বর্তমান রাজনৈতিক প্রসঙ্গ' নাম দিয়ে এই ক্ষুদ্র রচনাটি লিখেছিলেন। এটি তখন ১৩৪১ সালের শারদীয়া 'নাগরিক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র ঢাকায় গিয়ে কয়েকটা সভায় বলেছিলেন, মুসলমান সমাজ নিয়ে তিনি এবার উপন্যাস লিখবেন। এই কথা ঘোষণা করায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই অনেকে তাঁকে ও কাজ করতে নিষেধ করেছিলেন। 'শরৎচন্দ্রের উভয়-সংকট' এই প্রসঙ্গ নিয়েই লেখা। লেখাটি ১৩৪৩ সালের ৯ই আশ্বিনের 'বাতায়নে' প্রকাশিত হয়।

মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃত্ব পরিত্যাগ করলে, সেই সময় ঐ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র তাঁর এই 'মহাত্মার পদত্যাগ' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধটি তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে ১৩৪৪ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'কিশলয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এছাড়া এই সময় তিনি পত্রাকারেও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। যেমন—(১) দেশের কাজে ছাত্রদের যোগ দেওয়া নিয়ে 'বেণু' পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাদিগের লেখা। এই লেখাটি ১৩৩৬ সালের বৈশাখ মাসের বেণু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। (২) ১৩৪০ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'পরিচয়ে' দিলীপকুমার

রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র 'সাহিত্যের মাত্রা' প্রকাশিত হলে সে সম্বন্ধে প্রচারক-সম্পাদক অতুলানন্দ রায়কে লেখা। এই লেখাটি তখন 'প্রচারক' কাগজেও প্রকাশিত হয়েছিল। (৩) বাঙ্গলা নাটক নিয়ে পশুপতি চট্টোপাধ্যায়কে লেখা। এই লেখাটি ১৩৪১ সালের ২৫শে আশ্বিনের 'নাচঘর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। (৪) ১৩৩৩ সালের ৩০শে ভাদ্রের 'আত্মশক্তি' কাগজে মুসাফির লিখিত 'সাহিত্যের মামলা' পড়ে আত্মশক্তি-সম্পাদককে লেখা। এই লেখাটি ১৩৪৪ সালের ১৩ই আশ্বিন তারিখে আত্মশক্তিতে প্রকাশিত হয়। (৫) 'শেষপ্রশ্ন উপন্যাস নিয়ে সুমন্দ ভবনের শ্রীমতী…সেনকে লেখা। এই লেখাটি 'বিজলী' পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষের ১৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র, ১৩৩৮ সালের পৌষ মাসে (বড়দিনের ছুটিতে) রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উপলক্ষে এবং ১৩৪১ সালের ২রা ভাদ্র নিখিলবঙ্গ জলধর-সংবর্ধনা উপলক্ষে দুটি মানপত্র রচনা করে দেন। এই মানপত্র দুটিও রীতিমত সাহিত্য হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথেব উদ্দেশ্যে লেখা সেই অপূর্ব মানপত্রটি এখানে উধৃত করা গেল—

কবিগুরু,

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদেব বিস্ময়ের সীমা নাই।

তোমার সপ্ততিতম বর্ষশেষে একান্তমনে প্রার্থনা করি—জীবন বিধাতা তোমাকে শতায়ু দান করুন, আজিকার এই জয়ন্তী-উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হউক।

বাণীর দেউল আজি গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত না সেবক ইহার নির্মাণকল্পে দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ববর্তী সেই সকল সাহিত্যাচার্যগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয়-চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃত-কৃতার্থ হইয়াছি।

হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

হে সার্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্ত মনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি নতশিরে বারম্বার নমস্কার করি। —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১১ই পৌষ, ১৩৩৮।

শরৎচন্দ্র এই সময় 'ভালমন্দ' নামে একটি বারোয়ারী উপন্যাসের সূচনা অংশও লিখেছিলেন। ঐ লেখাটি ১৩৪৪ সালের ১৫ই আশ্বিন তারিখের বাতায়নে প্রকাশিত হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র সামতাবেড় যাওয়ার কয়েক মাস পরে ১৩৩৩ সালের ১৮ই আশ্বিন তারিখে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—'ভারতলক্ষ্মী অর্থাৎ নূতন একখানা মাসিকের সম্পাদক হতে রাজী হয়েছি।'

শেষ পর্যন্ত কিন্তু শরৎচন্দ্র এই কাগজের সম্পাদক হন নি। তবে তিনি হাওড়া শহরে থাকাকালে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের সহযোগে 'রূপ ও রঙ্গ' নামে একটি সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র অল্প কিছুদিন সম্পাদনা করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র এই সময় অনেকগুলি সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। কয়েকটি সভায় তিনি তাঁর লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন। তার মধ্যে কয়েকটি অভিভাষণ রীতিমত উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ।

কবিগুরু,

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।

তোমার সপ্ততিতম বর্ষশেষে একান্ত মনে প্রার্থনা করি জীবন-বিধাতা তোমাকে শতায়ুঃ দান করুন; আজিকার এই জয়ন্তী-উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হউক।

বাণীর দেউল আজি গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত না সেবক ইহার নির্মাণকল্পে দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ববর্তী সেই সকল সাহিত্যাচার্য্যগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা কল্যাণ ও ঐশ্বর্য্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয় চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃত-কৃতার্থ হইয়াছি।

হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

হে সার্ব্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে সাদরে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি নতশিরে বারম্বার নমস্কার করি। ইতি

শ্রীজগদীশ চন্দ্র বসু

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনপত্র।

বিভিন্ন সভায়

শরৎচন্দ্র অত্যন্ত সভা-ভীরু মানুষ ছিলেন। সভায় যেতে হবে এবং সেখানে গিয়ে বক্তৃতা করতে হবে, শুনলেই তিনি সর্বদা পাশ কাটাবার চেষ্টা করতেন।

তিনি সভা-ভীরু হলেও লোকে কিন্তু তাঁকে সভায় দেখবার জন্য, তাঁর মুখের বাণী শুনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। তাই তারা বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তাঁকে ডাকাডাকি করত।

শরৎচন্দ্র একান্ত যেখানে যেখানে এড়াতে পারতেন না, অনিচ্ছাসত্ত্বেই সেই সেই সভায় যোগ দিতেন। তিনি বলতেন—বক্তৃতা দিতে হবে মনে হলেই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়াটাকে শরৎচন্দ্র যে কিরূপ ভয় করতেন, এখানে সে সম্পর্কে একটি কাহিনী বলছি। কাহিনীটি এই :—

শরৎচন্দ্র একবার বাধ্য হয়ে সামতাবেড় থেকে কলকাতায় এসে এক সভায় যোগ দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র গ্রাম থেকে কলকাতায় আসার সময় সাধারণতঃ একজনকে সঙ্গে নিয়ে আসতেন। তাঁর দিদি অনিলা দেবীর ছোট জায়ের ভাই তুলসীদাস চট্টোপাধ্যায়ই অধিকাংশ সময় শরৎচন্দ্রের সঙ্গী হতেন। এই জন্য লোকে তুলসীবাবুকে শরৎ-বাহন বলত।

এইদিন শরৎচন্দ্র কলকাতায় আসার সময় এই শরৎ-বাহন ছাড়া তাঁদের দলে আর একজন লোক ছিলেন। তিনি সাহিত্যিক মনোজ বসু। মনোজ-বাবু সেদিন সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে এঁদেরই সঙ্গে কলকাতায় ফিরে আসছিলেন।

আগে মনোজবাবু, মধ্যে শরৎচন্দ্র, পিছনে শরৎ-বাহন তুলসীদাস চট্টোপাধ্যায়—এইভাবেই এঁরা বাড়ী থেকে রওনা হলেন।

বাড়ীর সীমানা ছেড়ে মাত্র কয়েক হাত এসেছেন, এমন সময় শরৎচন্দ্রের এক প্রতিবেশী পিছন থেকে ডেকে উঠল—দাদাঠাকুর! এই না আপনার শরীর খারাপ, আবার আজ কলকাতায় যাচ্ছেন?

এই পিছনে ডাক শুনেই তুলসীবাবু সভয়ে বলে উঠলেন—সর্বনাশ! বেরোতে না বেরোতেই পিছনে ডাক! পথে কোন বিপদ আপদ না ঘটলে বাঁচি!

তুলসীবাবুর কথা শুনে শরৎচন্দ্র বললেন—বিপদ আর ঘটবে কি? ঘটেই তো গেছে! আজকের সভায় সভাপতি যখন করেছে, তখন কিছু বক্তৃতা না করিয়ে কি ছাড়বে!

শরৎচন্দ্রের এই কথা শুনে মনোজবাবু ও তুলসীবাবু উভয়েই হেসে উঠলেন।

শরৎচন্দ্র সভায় যেতে ভয় করলেও, একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন সভা-সমিতি থেকে তাঁর ডাকের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। তিনি একজন কংগ্রেস কর্মী এবং অনেক বৎসর হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন বলে, কখন কখন দেশের বিভিন্ন স্থানের রাজনৈতিক সভাতেও যোগদানের জন্য তাঁর ডাক আসত। অনেক সময় বাধ্য হয়েই তাঁকে ছোট বড় বহু সভাতে যোগ দিতেও হয়েছিল। বড় বড় সভায় তিনি তাঁর অভিভাষণ লিখে নিয়ে গিয়ে পড়তেন। আর ছোট ছোট সভায় তিনি সাধারণতঃ কোন রকমে মুখেই কিছু বলতেন। তবে সে যা বলা, তাকে আদৌ বক্তৃতা বলা যায় না। মনে হ'ত পাশে উপবিষ্ট কোন লোকের সঙ্গে তিনি যেন গল্প করছেন বা কথা কইছেন।

শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে চলে আসার ৪।৫ মাস পরেই ১৩৩৩ সালের আষাঢ় মাসে তাঁকে আসামে সুরমা উপত্যকা ছাত্র-সম্মিলনের ৩য় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে যেতে হয়েছিল। এই বছর আশ্বিনের শেষ দিক নাগাদ হাওড়া টাউন হলের এক সভায়ও তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের (১৩৩৫ সালে) ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শরৎচন্দ্র ঢাকা জেলার মালিকান্দায় 'অভয় আশ্রমে' পশ্চিম বিক্রমপুর যুবক ও ছাত্র সম্মিলনীর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সেখানে তিনি যে লিখিত অভিভাষণটি পাঠ করেছিলেন, পরে ১৯২৯ এর ২৪শে মার্চ তারিখে 'সত্যাশ্রয়ী' নাম দিয়ে পুস্তিকাকারে প্রকাশিতও হয়েছিল।

ঐ বছর ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে গুড্ফ্রাইডের ৪ দিন ছুটির মধ্যে হাওড়া জেলার মাজু গ্রামে যে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন এবং রংপুরে যে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলন হয়েছিল, তাতে উভয় স্থানেই শরৎচন্দ্র মাজুতে সাহিত্য শাখার এবং

রংপুরে যুব-সম্মিলনীর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। রংপুরে সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলন হওয়ার আগে বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীর অধিবেশন হয়েছিল। শরৎচন্দ্র ভেবেছিলেন ৩০শে মার্চ রংপুরে যুব-সম্মিলনীর কাজ শেষ করে, সেই দিনই সেখান থেকে যাত্রা করে ৩১শে তারিখে দুপুরে মাজুতে এসে উপস্থিত হতে পারবেন। কিন্তু রংপুরের লোকেরা যুব-সম্মিলনীর পরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনেও যোগ দেওয়ার জন্য তাঁকে আটকে রাখলেন। কিছুতেই আসতে দিলেন না। অবশেষে শরৎচন্দ্র তাঁর আটকে পড়ার খবর জানিয়ে মাজুতে 'তার' পাঠিয়ে দিলেন। মাজুতে সেদিন সাহিত্য শাখার সভায় একটি প্রবন্ধ পড়বার জন্য সাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গিয়েছিলেন। শেষে শরৎচন্দ্রের স্থানে তাঁকেই সাহিত্য শাখার সভাপতি করা হয় এবং তাঁর সেই প্রবন্ধটিকেই সভাপতির অভিভাষণ হিসাবে চালিয়ে দেওয়া হয়।

শরৎচন্দ্র ১৩৩৮ সালের বৈশাখ মাসে কুমিল্লায় যুব-সম্মিলনে এবং ১৩৪০ সালের ১৩ই মাঘ তাবিখে ফবিদপুব সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন। এই ১৩৪০ সালেব মাঘ মাসেবই শেষদিকে দিলীপকুমার রায়ের কয়েকজন বন্ধু দিলীপবাবুর 'অনামী' বইটি নিয়ে কলকাতায় এক আলোচনা সভা করেছিলেন। সেই সভায় সভাপতি হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র।

১৩৪১ সালের পৌষ মাসে কলকাতায় টাউন হলে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের শেষ দিন (৩০শে ডিসেম্বব) দুপুরে, প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের অন্যতম কবি অতুলপ্রসাদ সেনেব অকাল মৃত্যুতে যে শোক সভার অনুষ্ঠান হয়েছিল, তাতে সভাপতি হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র এই প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সাহিত্য শাখার অধিবেশনের দিনও সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সভায় কিছু বলেওছিলেন। তবে সে সভায় তিনি সভাপতি ছিলেন না। এই ১৩৪১ সালের ভাদ্র মাসে অনুষ্ঠিত জলধর সেনের সংবর্ধনা সভায়ও তিনি উপস্থিত ছিলেন। জলধর-সংবর্ধনা কমিটির তিনি ছিলেন সভাপতি।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় অক্সফোর্ড মিশন হোস্টেলে এক ছাত্র সভায় শরৎচন্দ্র গিয়েছিলেন। সেই সভায় তিনি ছিলেন সভাপতি, আর সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রধান অতিথি।

১৩৪২ সালের আশ্বিন মাসে হুগলী জেলার কোন্নগরে সেখানকার পাঠ-

চক্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় এবং ঐ বছরই ফাল্গুন মাসে কলকাতায় আশুতোষ কলেজের বাঙলা সাহিত্য সম্মিলনে শরৎচন্দ্র সভাপতি ছিলেন।

এই ধরণের আরও অনেকগুলি ছোট ছোট সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন। যেমন—চন্দননগরের হরিহর শেঠের আহ্বানে সেখানে এক সাহিত্য সভায়, বালী পাবলিক লাইব্রেরীর এক সভায়, উত্তরপাড়ার হরিনারায়ণ স্মৃতি পাঠাগারের সভায়, বরাহনগরে এক সাহিত্য সভায়, তাঁর সামতাবেড়ের বাড়ীর নিকটে মুগকল্যাণ গ্রামে এক কোজাগরী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত পূর্ণিমা সম্মিলনের সভায়, ইত্যাদি।

এইগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি বড় বড় সভায়ও শরৎচন্দ্র সভাপতি অথবা উদ্বোধক হয়েছিলেন। যেমন—১৩৪৩ সালের ২৫শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার শান্তিপুর সাহিত্য সম্মিলনের ১২শ অধিবেশনে শরৎচন্দ্র মূল সভাপতি হয়েছিলেন। এই ১৩৪৩ সালেই শ্রাবণ মাসে শরৎচন্দ্র ঢাকা ইউনিভার্সিটি কর্তৃক প্রদত্ত ডি, লিট্ উপাধি নিতে গিয়ে ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের দশম বার্ষিক অধিবেশনেও সভাপতিত্ব করেছিলেন।

১৩৩৮ সালের পৌষ মাসে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উপলক্ষে কলকাতায় টাউন হলে যে বিরাট সভা হয়েছিল, তাতে রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্মেলনে শরৎচন্দ্র সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় তিনি 'রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই (১৩৪৩ সালে) তারিখে কলকাতায় টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে যে বিরাট জনসভা হয়েছিল, তাতে উদ্বোধন-বক্তৃতা দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। এই সভার কয়েকদিন পরেই এলবার্ট হলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আবার যে প্রতিবাদ সভা হয়েছিল, তাতেও শরৎচন্দ্র সভাপতি হয়েছিলেন।

বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা শরৎচন্দ্রের কয়েকটি চিঠিপত্র থেকে তাঁর পাটনা, কটক, কালিয়া, বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে যাওয়ার কথা জানা যায়। শরৎচন্দ্র সম্ভবতঃ ঐ সব স্থানের কোন না কোন সভায় সভাপতিত্ব করতেও গিয়েছিলেন। অবশ্য আবার হয়ত এমনও হতে পারে যে, ঐ সব স্থানের কোথাও কোন সভা তাঁকে সংবর্ধনা জানাবার জন্যই হয়েছিল। কেননা ঐ সময় নানা স্থানে শরৎচন্দ্রকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল।

নানাস্থানের সংবর্ধনা

শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে যাওয়ার কিছুদিন পরে ১৩৩৩ সালের আষাঢ় মাসে সুরমা উপত্যকা ছাত্র-সম্মিলনের ৩য় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে গেলে, সেখানকার শিলচর ছাত্রসংঘ তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়ে এক মানপত্র দিয়েছিল।

১৩৩৪ সালের ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্রের ৫২তম জন্মদিবসে হাওড়ার 'শিবপুর সাহিত্য সংসদ, শিবপুরে ৪৯ নং কালীকুমার মুখার্জী লেনে এক সভায় শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানায়। ঐ সভায় সভাপতি হয়েছিলেন সাহিত্যিক বিজয়চন্দ্র মজুমদার। এই উপলক্ষে শিবপুর সাহিত্য সংসদ শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বাঙ্গলার কয়েকজন লেখক-লেখিকার রচনা নিয়ে একটি পুস্তক সম্পাদনা ক'রে সেদিন সেই পুস্তকখানি শরৎচন্দ্রকে উপহার দিয়েছিল।

১৩৩৫ সালের ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্রের ৫৩তম জন্মদিবসে দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁকে কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে এক মহতী সভায় সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল। ঐ সভায় সভাপতি ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের ঐ সম্মাননা সভায় একটি বাণী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কবির সেই বাণীটি এই :—

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্মাননা সভায় বাঙ্গলা দেশের সকল পাঠকের অভিনন্দনের সঙ্গে আমার অভিনন্দন বাক্যকে আমি সম্মিলিত করি। আজও সশরীরে পৃথিবীতে আছি, সেটাতে সময় লঙ্ঘনের অপরাধ প্রত্যহই প্রবল হচ্ছে, সে কথা স্মরণ করাবার নানা উপলক্ষ সর্বদাই ঘটে, আজ সভায় সশরীরে উপস্থিত থেকে সকলের আনন্দে যোগদান করতে পারলুম না, এও তারি মধ্যে একটা। বস্তুতঃ আমি আজ অতীতের প্রান্তে এসে উত্তীর্ণ—এখানকার প্রদোষান্ধকার থেকে ক্ষীণ কর প্রসারিত করে তাঁকে আমার আশীর্বাদ দিয়ে যাই, যিনি বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের উদয় শিখরে আপন প্রতিভা জ্যোতি বিকীর্ণ করচেন। ইতি—২৯শে ভাদ্র, ১৩৩৫

১৩৩৭ সালের আষাঢ় মাসে শরৎচন্দ্র একবার লাহোর গেলে, সেখানকার

প্রবাসী বাঙ্গালীরা তাঁকে এক সভায় অভিনন্দন জানান। এই বৎসর চন্দননগরের প্রবর্ত্তক সংঘও অক্ষয় তৃতীয়ার দিন শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানায়।

শরৎচন্দ্র লাহোর-প্রবাসী বাঙ্গালীদের অভিনন্দনের উত্তরে সেদিন যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা কাশী থেকে প্রকাশিত ১৩৩৭ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'উত্তরা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। আর প্রবর্তক সংঘের অভিনন্দনের উত্তরে যা বলেছিলেন, তা ১৩৩৭ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'প্রবর্ত্তকে' প্রকাশিত হয়েছিল।

১৩৩৯ সালের ২রা আশ্বিন তারিখে শরৎচন্দ্রের ৫৭তম জন্মোৎসব উপলক্ষে দেশের জনসাধারণ ও সাহিত্যিকগণের পক্ষ থেকে তাঁকে কলকাতার টাউন হলে এক বিরাট জনসভায় বিশেষভাবে সংবর্ধিত করা হয়। টাউন হলে অনুষ্ঠিত শরৎচন্দ্রের এই ৫৭তম জন্মোৎসব ৩১শে ভাদ্র হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বাঙ্গলা দেশের তৎকালীন এক রাজনৈতিক দলাদলির কারণে, সেদিনের শরৎ-জন্মোৎসব সভা পণ্ড হয়ে যাওয়ায়, পরে ২রা আশ্বিন তারিখে হয়েছিল।

সেই সময় বাঙ্গলা দেশের রাজনীতিতে দুটি দল ছিল। একটি ছিল 'অ্যাডভান্সের দল, আর একটি ছিল 'ফরওয়ার্ডে'র দল। প্রথমটির নেতা ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত আর শেষোক্ত দলের নেতা ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি সুভাষচন্দ্রের দলভুক্ত ছিলেন।

সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র সকল রাজনৈতিক দলাদলির উর্ধ্বে একথা ঘোষণা করা সত্ত্বেও, শরৎচন্দ্রের এই দিনকার সংবর্ধনা সভার যাঁরা ব্যবস্থা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ফরওয়ার্ড দলের প্রাধান্য থাকায়, অপর পক্ষ একে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পারেন নি। তাই তাঁরা অন্যের এই আয়োজনকে পণ্ড করবার জন্য ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। একটা সুযোগও মিলে গেল—ঐদিন ৩১শে ভাদ্র হিজলী জেলের বন্দী সন্তোষকুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্তর মৃত্যুদিবস ছিল। তাঁরা ঐদিন ঐ টাউন হলেই হিজলী জেলের ঐ দুজন শহীদের স্মৃতিদিবস পালন করবার ব্যবস্থা করলেন।

একই সময়ে একই স্থানে দু দলের দুটি ভিন্ন ধরণের সভার আয়োজন হওয়ায় একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হ'ল। শরৎচন্দ্র সভার দ্বার পর্যন্ত এসে ফিরে গেলেন। অবশেষে শরৎ-বন্দনা সভা মুলতুবী রাখা হ'ল।

শরৎ-জয়ন্তীর ঠিক কয়েকদিন আগে, মহাত্মা গান্ধী সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আমরণ অনশন করবার সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন।

শিবপুরে শরৎচন্দ্রের প্রথম সম্বর্ধনা

মহাত্মা গান্ধী এই সংকল্প করায়, কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচি, কালিদাস রায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন সাহিত্যিক তখন শরৎ-জয়ন্তী বন্ধ করে দেবার জন্য কাগজে এক বিবৃতি দিয়েছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী যারবেদা জেলে অবস্থান কালে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে ১৩৩৯ সালের ৪ঠা আশ্বিন অনশন আরম্ভ করেছিলেন।

সজনীকান্ত দাসও তখন তাঁর 'শনিবারের চিঠি'তে এই শরৎ-জয়ন্তীর আয়োজনের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন।

যাই হোক, শরৎ-সংবর্ধনা উপলক্ষে সেই সময় বাঙলাদেশের শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকাদের লেখা নিয়ে 'শরৎ-বন্দনা' নামে যে একটি বড় বই প্রকাশ করা হয়েছিল, সেই বইটি ২রা আশ্বিনের শরৎ-জয়ন্তী সভায় শরৎচন্দ্রকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়া তাঁকে সোনার দোয়াত কলম, গরদের জোড়, চন্দনকাঠের খড়ম এবং কয়েকটি মানপত্রও দেওয়া হয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের এই সম্মাননা সভায় সভাপতিত্ব করার কথা ছিল রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথ ঐ সময় সাংসারিক বিশেষ দুর্যোগবশতঃ আসতে না পারায় একটি লিখিত বাণী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সেই বাণীটি সভায় পড়া হয়েছিল। কবির সেই বাণীটি এখানে সম্পূর্ণ উধৃত করা গেল—

ওঁ

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

শরৎচন্দ্র, বিশেষ উদ্বেগজনক সাংসারিক ঘটনায় তোমার জন্মদিনের উৎসবে সম্মাননা সভায় উপস্থিত থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হোলো। অগত্যা আমার আন্তরিক শুভ কামনা এই উপলক্ষে পত্রযোগে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিই।

তোমার বয়স অধিক নয়, তোমার সৃষ্টির ক্ষেত্র এখনো সম্মুখে দীর্ঘ প্রসারিত, তোমার জয়যাত্রার বিরাম হয় নি। সেই অসমাপ্ত যাত্রাপথের মাঝখানে অকস্মাৎ তোমাকে দাঁড় করিয়ে অর্ঘ্য দেওয়া আমার কাছে মনে হয় অসাময়িক। এখনো স্তব্ধ হবার অবকাশ নেই তোমার, ফলশস্যবহুল দূর ভবিষ্যৎ এখনো তোমাকে সম্মুখে আহ্বান করচে।

সত্তর বছর উত্তীর্ণ করে কর্মসাধনের অন্তিম পর্বে আমি পৌঁচেছি। কর্তব্যের চক্ররথ প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করার পরেও এখনো যদি আমাকে চলতে হয় সেটা পুনরাবর্তন মাত্র। এই কারণেই অল্পদিন হোলো আমার দেশ আমার জীবনের শেষ প্রাপ্য সমারোহ করে চুকিয়ে দিয়েছে।' সাধারণের কাছে আমার পরিচয় সমাপ্ত হয়ে গেছে বলেই এই শেষকৃত্য সম্ভবপর হয়েছে। আকাশ থেকে শ্রাবণের মেঘ তার দান যখন নিঃশেষ করে দেয় তখনি ধরাতলে প্রস্তুত হয় শরতের পুষ্পাঞ্জলি। তারপরেও মেঘ যদি সম্পূর্ণ বিশ্রাম না করে সেটা হয় বর্ষার পুনরুক্তিমাত্র, সেটা বাহুল্য।

সেই দাঁড়িটানা সময় তোমার নয়, এখনো তুমি দেশকে প্রতিদিন নব নব রচনা বিস্ময়ে নব নব আনন্দ দান করবে এবং সেই উল্লাসে দেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ তোমার জয়ধ্বনি করতে থাকবে। পথে পথে পদে পদে তুমি পাবে প্রীতি, তুমি পাবে সমাদর। পথের দুই পাশে যেসব নবীন ফুল ঋতুতে ঋতুতে ফুটে উঠবে তারা তোমার, অবশেষে দিনের পশ্চিমকালে সর্বজন হস্তে রচিত হবে তোমার মুকুটের জন্য শেষ বরমাল্য। সেদিন বহুদূরে থাক। আজ দেশের লোক তোমার পথের সঙ্গী, দিনে দিনে তারা তোমার কাছ থেকে পাথেয় দাবী করবে, তাদের সেই নিরন্তর প্রত্যাশা পূর্ণ করতে থাকো, পথের চরম প্রান্তবর্তী আমি সেই কামনা করি। জনসাধারণ সম্মানের যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে তার মধ্যে সমাপ্তির শান্তিবাচন থাকে, তোমার পক্ষে সেটা সঙ্গত নয়, একথা নিশ্চিত মনে রেখো।

তোমার জন্মদিন উপলক্ষে 'কালের যাত্রা' নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি এ দান তোমার অযোগ্য হয়নি। বিষয়টি এই—রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে মহাকালের রথ অচল। মানব সমাজের সকলের চেয়ে বড়ো দুর্গতি কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ-বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে। তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।

কালের রথযাত্রার বাধা দূর করবার মহাস্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক, এই আশীর্বাদসহ তোমার দীর্ঘজীবন কামনা করি। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই বাণী ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবেও শরৎচন্দ্রকে ঐদিন আর একটি পত্র দিয়েছিলেন। সেই পত্রটি এই—

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

সম্প্রতি সাংসারিক বিশেষ দুর্যোগ না থাকলে আমি নিশ্চয়ই তোমার অভিনন্দন সভায় যোগ দিতুম, এমন কি শারীরিক অস্বাস্থ্য ও দুর্বলতাও বাধা ঘটাত না।।

প্রাচীনকালে আর্যদের ঘরে অগ্নিগৃহ থাকত—সেখানে পবিত্র অগ্নিকে যত্ন করে জ্বালিয়ে রাখা হোত, নিবতে দিত না। সাহিত্যে যাঁরা কীর্তিশালী দেশেব চিত্তভবনে সেই পুণ্য অগ্নি অনির্বাণ রাখার কাজ তাঁদেরই। তোমার প্রতিভার দ্বাবা দেশের হৃদয়কে তুমি জয় কবেচ। দেশের গভীর অন্তরে তোমার প্রবেশাধিকার, তোমার লেখনী বাঙালীর চিত্তভন্তকে হাসি ও অশ্রুর নবতর ও গভীরতর ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত করে তুলেছে। যেখানে তার মনোমন্দিরে চিরন্তনের পুণ্য বেদিকা, সেইখানে তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যপ্রদীপ বাংলা সাহিত্যেব জ্যোতিঃশিখায় দীর্ঘ আয়ুঃসঞ্চার করবার জন্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে, এই কথা জেনে আমার কর্মাবসানের পশ্চিম দ্বার থেকে তোমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় গ্রহণ কবি। ইতি—৩১শে ভাদ্র ১৩৩৯

তোমাদের—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এইদিন সভায় শরৎচন্দ্রেব গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসিগণ তাঁকে যে মানপত্র দিয়েছিলেন, সেই মানপত্রটিও এখানে উধৃত করা গেল—

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের

করকমলে—

হে বঙ্গবাণীর বরপুত্র !

তোমার সপ্তপঞ্চাশৎ জন্মদিবসে সমবেত স্বদেশবাসীর বন্দনা গ্রহণ কর। আমরা আজ আমাদের হৃদয়ের পাত্রে যে প্রগাঢ় প্রীতির অর্ঘ্য বহন করিয়া আনিয়াছি, তোমার নিরভিমান স্নেহসিঞ্চিত প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে তাহা সার্থক কর।

বঙ্গসাহিত্যে তোমার আবির্ভাব শরতের পূর্ণচন্দ্রের মতই পরিপূর্ণ ও প্রভা-সুদীপ্ত। তোমার প্রথম উদয়ক্ষণে বাঙ্গালীহৃদয় চন্দ্রাকর্ষিত সমুদ্রের মতই উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে আমরা সেদিন দেখিয়াছিলাম, তুমি তোমার জ্যোতির্ময় প্রতিভার দ্যুতিতে অন্তরের সুনিবিড় অনুভূতিকে জাগ্রত করিয়া দুঃখের মিলন মূর্তিকে ভাস্বর করিয়া তুলিলে। ইহা তোমারই পক্ষে সম্ভব, যেহেতু তুমি সত্যের সাধনায় বহু অন্ধকার রাত্রি অতন্দ্র থাকিয়া দুঃখের সমগ্র রূপকে ধ্যাননেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছ।

হে দুঃখ বেদনার রহস্যবিৎ! বঞ্চিত-স্নেহ এবং উপেক্ষিত-প্রেমের নির্দয় আঘাতে বিপর্যস্তা বঙ্গনারীর সংযত ধৈর্যের মহিমাকে তুমি বিনম্র শ্রদ্ধার অজিনাসনে বসাইয়া মহীয়সী করিয়াছ। পৌরুষহীন সমাজের অচেতন মনকে তুমি তার বিগত গৌরবের মূঢ় মোহ হইতে জাগ্রত করিয়াছে। আমাদের জীবনের যত কিছু সঞ্চিত লজ্জা, অপমান ও উৎপীড়নের ব্যথাকে তুমি কেবল ভাষা দাও নাই, আশা দিয়াছ। তোমার প্রতিভার আলোকে বাঙ্গালী নিজের পরিচয় পাইয়াছে।

হে ঐন্দ্রজালিক শিল্পি! অতি সাধারণ বাঙ্গালী-জীবনের বিক্ষিপ্ত ও অকিঞ্চিৎকর উপকরণ লইয়াই তুমি স্বকীয় মৌলিকতায় স্বতন্ত্র, অনাস্বাদিতপূর্ব ভাবরস-সমৃদ্ধ যে কথা-সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছ,—কেবলমাত্র বাঙ্গালীরই নহে তাহা সর্ব দেশেব, সর্ব কালের অক্ষয় সম্পদরূপে অভিনন্দিত হইবে। মানব মহত্বের তুমি মহীয়ান উদ্গাতা, তোমার দুর্লভ দান কেবল প্রসাদলুব্ধ লঘু চিত্তের শূন্য অহঙ্কারের জন্য উৎসর্গিত নয়, ইহাকে শুধু অবসরের বিলাসবস্তু রূপে ব্যবহার কবিলে আত্মবঞ্চনাই হইবে। অতএব তোমার সৃষ্টির যথার্থ মাহাত্ম্য উপলব্ধির দ্বারা আমরা যেন বল লাভ করি, ফল লাভ করি—এই আশীর্বাদ করিয়া হে শক্তিমান স্রষ্টা! তুমি তোমার স্বদেশবাসীব প্রীতি-উৎসারিত বন্দনা গ্রহণ কর।

শরৎ-বন্দনা সমিতি — তোমার গুণমুগ্ধ

৩১শে ভাদ্র, ১৩৩৯ — স্বদেশবাসিগণ

এইদিনকার সভার এক বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, শরৎচন্দ্র নারী-দরদী ছিলেন বলে বাঙলা দেশের নারীরা পৃথকভাবে তাঁকে এক মানপত্র দিয়েছিলেন। তাঁদের সেই মানপত্রটি এই :—

বাঙ্গলার বরেণ্য কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের

করকমলে—

বাঙ্গলার সাহিত্যাকাশ যেদিন ধরণীর সর্বোজ্জল রবিকরে সুপ্রদীপ্ত সেই অদ্বিতীয় আদিত্যের অপূর্ব কিরণচ্ছটায় সকল গ্রহ নক্ষত্রের আলোকরেখা যেদিন পরিম্লান—সেদিনের সেই রবিকরোদ্ভাসিত জ্যোতির্ময় যুগে বঙ্গবাণীর দিক্‌চক্রবালে যাঁহার অপূর্ব প্রতিভার অপরাজেয় দীপ্তি আপনার দিব্য মহিমায় সকলজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, হে শুভ্রসুন্দর শরৎচন্দ্র! তুমিই সেই জ্যোতিষ্মান্, আমরা তোমার বন্দনা করি॥

শরতের পূর্ণচন্দ্রের অফুরন্ত জ্যোৎস্না-প্লাবনেরই মত তোমার কথা-সাহিত্যের কনক-কৌমুদী এদেশের নরনারীর মর্মে সুগভীর আনন্দ-বেদনায় বিচিত্র তরঙ্গ তুলিয়াছে; তোমার প্রাণবন্ত সৃষ্টি তাহাদের দীর্ঘ তন্দ্রাহত অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছে, স্পন্দিত করিয়াছে, সঞ্জীবিত করিয়াছে। হে বাঙ্গলার কথা-সাহিত্যের অসামান্য শিল্পি! আমরা তোমার বন্দনা করি॥

পরাধীন বাঙ্গলার অধঃপতিত সমাজের অসহায়া অন্তঃপুরচারিণীদের অন্তরের মূক আনন্দবেদনাকে তুমি ভাষায় মূর্ত করিয়া ধরিয়াছ। তাহাদের দুর্গত জীবনের সকল সুখদুঃখের অনুভূতিগুলিকে নিবিড় সহানুভূতির পরম রসরাগে সাহিত্যে বাস্তবরূপে সত্য করিয়া তুলিয়াছ। তোমার অনাবিষ্ট দৃষ্টি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, সুগভীর উপলব্ধি শক্তি, বিচিত্র মানব চরিত্রের অতুল অভিজ্ঞতা—নিখিল নারীচিত্তের নিগূঢ় প্রকৃতির গোপনতম সন্ধান লাভ করিয়াছে। হে নারী-চরিত্রের নিবিড়-রহস্য জ্ঞাতা! আমরা তোমায় বন্দনা করি॥

সর্ববিধ আত্মাবমাননা, সর্ববিধ হীনতার অবস্থার মধ্যেও নারীর সহজ প্রকৃতিজাত যে বৈশিষ্ট্যগুলি সকল দেশের সকল কালের সকল সমাজে বর্তমান, তুমি তাহার অকৃত্রিম রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছ, তাহার সত্য প্রকৃতি অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহার মৌন ভাষা বুঝিতে পারিয়াছ। হে সকল নারীর অন্তর্যামি! আমরা তোমার বন্দনা করি॥

আজ তোমার এই সপ্তপঞ্চাশৎ-জন্মোৎসবের অভিনন্দন বাসরে আমরা আমাদের অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতে আসিয়াছি। আমাদের মনের ভাব সুস্পষ্ট ও সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়া বলিতে শিখি নাই; তবুও আজিকার এই বিশেষ দিনে তোমাকে আমরা কেবল এই কথাই জানাইতে

বঙ্গসাহিত্যে তোমার আবির্ভাব শরতের পূর্ণচন্দ্রের মতই পরিপূর্ণ ও প্রভা-সুদীপ্ত। তোমার প্রথম উদয়ক্ষণে বাঙ্গালীহৃদয় চন্দ্রাকর্ষিত সমুদ্রের মতই উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে আমরা সেদিন দেখিয়াছিলাম, তুমি তোমার জ্যোতির্ময় প্রতিভার দ্যুতিতে অন্তরের সুনিবিড় অনুভূতিকে জাগ্রত করিয়া দুঃখের মিলন মূর্তিকে ভাস্বর করিয়া তুলিলে। ইহা তোমারই পক্ষে সম্ভব, যেহেতু তুমি সত্যের সাধনায় বহু অন্ধকার রাত্রি অতন্দ্র থাকিয়া দুঃখের সমগ্র রূপকে ধ্যাননেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছ।

হে দুঃখ বেদনার রহস্যবিৎ! বঞ্চিত-স্নেহ এবং উপেক্ষিত-প্রেমের নির্দয় আঘাতে বিপর্যস্তা বঙ্গনারীর সংযত ধৈর্যের মহিমাকে তুমি বিনম্র শ্রদ্ধার অজিনাসনে বসাইয়া মহীয়সী করিয়াছ। পৌরুষহীন সমাজের অচেতন মনকে তুমি তার বিগত গৌরবের মূঢ় মোহ হইতে জাগ্রত করিয়াছে। আমাদের জীবনের যত কিছু সঞ্চিত লজ্জা, অপমান ও উৎপীড়নের ব্যথাকে তুমি কেবল ভাষা দাও নাই, আশা দিয়াছ। তোমার প্রতিভার আলোকে বাঙ্গালী নিজের পরিচয় পাইয়াছে।

হে ঐন্দ্রজালিক শিল্পি! অতি সাধারণ বাঙ্গালী-জীবনের বিক্ষিপ্ত ও অকিঞ্চিৎকর উপকরণ লইয়াই তুমি স্বকীয় মৌলিকতায় স্বতন্ত্র, অনাস্বাদিতপূর্ব ভাবরস-সমৃদ্ধ যে কথা-সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছ,—কেবলমাত্র বাঙ্গালীরই নহে তাহা সর্ব দেশের, সর্ব কালের অক্ষয় সম্পদরূপে অভিনন্দিত হইবে। মানব মহত্ত্বের তুমি মহীয়ান উদ্গাতা, তোমার দুর্লভ দান কেবল প্রসাদলুব্ধ লঘু চিত্তের শূন্য অহঙ্কারের জন্য উৎসর্গিত নয়, ইহাকে শুধু অবসরের বিলাসবস্তু রূপে ব্যবহার করিলে আত্মবঞ্চনাই হইবে। অতএব তোমার সৃষ্টির যথার্থ মাহাত্ম্য উপলব্ধির দ্বারা আমরা যেন বল লাভ করি, ফল লাভ করি—এই আশীর্বাদ করিয়া হে শক্তিমান স্রষ্টা! তুমি তোমার স্বদেশবাসীর প্রীতি-উৎসারিত বন্দনা গ্রহণ কর।

শরৎ-বন্দনা সমিতি — তোমার গুণমুগ্ধ
৩১শে ভাদ্র, ১৩৩৯ — স্বদেশবাসিগণ

এইদিনকার সভার এক বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, শরৎচন্দ্র নারী-দরদী ছিলেন বলে বাঙলা দেশের নারীরা পৃথকভাবে তাঁকে এক মানপত্র দিয়েছিলেন। তাঁদের সেই মানপত্রটি এই :—

বাঙ্গলার বরেণ্য কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের

করকমলে—

বাঙ্গলার সাহিত্যাকাশ যেদিন ধরণীর সর্বোজ্জল রবিকরে সুপ্রদীপ্ত সেই অদ্বিতীয় আদিত্যের অপূর্ব কিরণচ্ছটায় সকল গ্রহ নক্ষত্রের আলোকরেখা যেদিন পরিম্লান—সেদিনের সেই রবিকরোদ্ভাসিত জ্যোতির্ময় যুগে বঙ্গবাণীর দিক্‌চক্রবালে যাঁহার অপূর্ব প্রতিভার অপরাজেয় দীপ্তি আপনার দিব্য মহিমায় সকলজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, হে শুভ্রসুন্দর শরৎচন্দ্র! তুমিই সেই জ্যোতিষ্মান্, আমরা তোমার বন্দনা করি ॥

শরতের পূর্ণচন্দ্রের অফুরন্ত জ্যোৎস্না-প্লাবনেরই মত তোমার কথা-সাহিত্যের কনক-কৌমুদী এদেশের নরনারীর মর্মে সুগভীর আনন্দ-বেদনায় বিচিত্র তরঙ্গ তুলিয়াছে; তোমার প্রাণবন্ত সৃষ্টি তাহাদের দীর্ঘ তন্দ্রাহত অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছে, স্পন্দিত করিয়াছে, সঞ্জীবিত করিয়াছে। হে বাঙ্গলার কথা-সাহিত্যের অসামান্য শিল্পি! আমরা তোমার বন্দনা করি ॥

পরাধীন বাঙ্গলার অধঃপতিত সমাজের অসহায়া অন্তঃপুরচারিণীদের অন্তরের মূক আনন্দবেদনাকে তুমি ভাষায় মূর্ত করিয়া ধরিয়াছ। তাহাদের দুর্গত জীবনের সকল সুখদুঃখের অনুভূতিগুলিকে নিবিড় সহানুভূতির পরম রসরাগে সাহিত্যে বাস্তবরূপে সত্য করিয়া তুলিয়াছ। তোমার অনাবিষ্ট দৃষ্টি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, সুগভীর উপলব্ধি শক্তি, বিচিত্র মানব চরিত্রের অতুল অভিজ্ঞতা—নিখিল নারীচিত্তের নিগূঢ় প্রকৃতির গোপনতম সন্ধান লাভ করিয়াছে। হে নারী-চরিত্রের নিবিড়-রহস্য জ্ঞাতা! আমরা তোমায় বন্দনা করি ॥

সর্ববিধ আত্মাবমাননা, সর্ববিধ হীনতার অবস্থার মধ্যেও নারীর সহজ প্রকৃতিজাত যে বৈশিষ্ট্যগুলি সকল দেশের সকল কালের সকল সমাজে বর্তমান, তুমি তাহার অকৃত্রিম রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছ, তাহার সত্য প্রকৃতি অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহার মৌন ভাষা বুঝিতে পারিয়াছ। হে সকল নারীর অন্তর্যামি! আমরা তোমার বন্দনা করি ॥

আজ তোমার এই সপ্তপঞ্চাশৎ৽৽জন্মোৎসবের অভিনন্দন বাসরে আমরা আমাদের অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতে আসিয়াছি। আমাদের মনের ভাব সুস্পষ্ট ও সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়া বলিতে শিখি নাই; তবুও আজিকার এই বিশেষ দিনে তোমাকে আমরা কেবল এই কথাই জানাইতে

আসিয়াছি—তোমার প্রতিভাকে আমরা বরণ করি, তোমাকে আমরা শ্রদ্ধা করি, তোমাকে আমরা ভালবাসি। তোমাকে আমরা আমাদের একান্ত আপনজন বলিয়াই জানি। হে নারীর পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু! আমরা তোমার বন্দনা করি॥

তুমি আমাদের সকৃতজ্ঞ প্রণিপাত গ্রহণ কর। তুমি আমাদের আন্তরিক আশীর্বাদ গ্রহণ কর। আমাদের পরম প্রিয় তুমি, পরম আত্মীয় তুমি, তোমার এই শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠান বাঙ্গলার গৃহে গৃহে বর্ষে বর্ষে যোগ্য সমারোহে প্রতিপালিত হউক।

তোমার যশঃ ও আয়ু উত্তরোত্তর বর্ধিত হউক। তোমার সুখ ও স্বাস্থ্য চির অব্যাহত থাকুক। তোমার জীবন আনন্দ ও ঐশ্বর্যে হেমবিমণ্ডিত হউক—অন্তরের এই ঐকান্তিক কামনা লইয়া হে নারী হৃদয়ের মরমী ঋষি! আমরা তোমার বন্দনা করি॥

তোমার
স্বদেশবাসিনিগণ

শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর অন্য দেশেও কোন লেখককে তাঁর দেশের নারীরা এইভাবে অভিনন্দন জানিয়েছেন বলে কই শোনা যায় না।

এই সময় দেশের দিকে দিকে যেমন শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি প্রতিপালিত হতে থাকে, তেমনি দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও তাঁকে উপাধি প্রভৃতি দানের দ্বারাও অভিনন্দিত করতে থাকে। ইতিপূর্বে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী স্বর্ণ পদক দান করেছিলেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শরৎচন্দ্রকে পরিষদের 'বিশিষ্ট সদস্য' করে নিলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি, লিট্, উপাধিতে ভূষিত করলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন তিনটি 'হল' বা ছাত্রাবাস ছিল। ঐ তিনটি 'হলের' নাম—জগন্নাথ হল, ঢাকা হল ও মুসলিম হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রকেই ঐ তিনটি হলের যে কোন একটি হলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে হ'ত। তিনটি হলে তিনটি পৃথক ছাত্র-ইউনিয়ন ছিল। এই তিনটি ছাত্র-ইউনিয়ন ছাড়া সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও একটি ইউনিয়ন ছিল। তার নাম—ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন। শরৎচন্দ্র ডি, লিট্ নিতে

ঢাকায় গেলে ঐ চারটি ছাত্র-ইউনিয়নই পৃথক পৃথক ভাবে তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়েছিল।

এছাড়া ঢাকা রূপলাল হাউসে ঢাকার 'শান্তি' পত্রিকার পক্ষ থেকেও তাঁকে সেই সময় সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র যখন ডি, লিট্, উপাধি পান, সেই সময় কলকাতায় 'রসচক্র' নামে সাহিত্যিক ও শিল্পীদের একটি মিলন সংঘ ছিল। শরৎচন্দ্রের কলকাতার বাড়ীর অদূরে রাজা বসন্ত রায় রোডে কবি কালিদাস রায়ের তৎকালীন ভাড়া বাড়ীতে প্রথমে এই রসচক্রের আসর বসত। কালিদাসবাবু এর সম্পাদক ছিলেন। পরে তাঁর ভাই রাধেশ রায় সম্পাদক হয়েছিলেন। রসচক্রের সভ্যরা শরৎচন্দ্রকে এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি করেছিলেন। শরৎচন্দ্র কলকাতার বাড়ীতে থাকার সময় প্রায়ই রসচক্রের বৈঠকে যোগ দিতেন। প্রতি রবিবারে রসচক্রের বৈঠক হত এবং বৈঠকে সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা হত।

শরৎচন্দ্র ডি, লিট্, উপাধি পেলে এই রসচক্রের সভ্যরা আনন্দ প্রকাশের জন্য শিল্পী অর্ধেন্দু গাঙ্গুলীর বন-হুগলীস্থ বাগান বাড়ীতে এক উদ্যান সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাতে শরৎচন্দ্রও উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে একটি লিখিত অভিনন্দন পাঠ করে তাঁকে অভিনন্দিত করা হয়েছিল। সেই লেখাটির শেষাংশে এই কথা ক টি ছিল :—

"আমরা কোন ঘটা সমারোহের ব্যবস্থা করি নাই। আমরা কোন মামুলি বচন-বিন্যাসের আড়ম্বর করি নাই, আমরা সভাপতি ভাড়া করিয়া আনি নাই—আমরা অভিনন্দন পত্র রচনা করি নাই—আমরা ফুলের মালা পর্যন্ত পরাই নাই—আমরা আমাদের প্রাণের দাদাকে আমাদের অন্তরের গভীর আনন্দটুকু জানাইতেছি। রসস্রষ্টা হইতে পারা বহুজন্মের সাধনার ফল—রসস্রষ্টা হইতে না পারি, যেন রসের পরিপূর্ণ মর্ম উপলব্ধি করিয়া রসচক্রের নাম সার্থক করিতে পারি—এই আশীর্বাদ তাঁহার কাছে চাই।"

১৩৪২ সালের ১১ই আশ্বিন তারিখে ৫০ জন সদস্য-বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিল্পী সংস্থা 'রবিবাসর'ও শরৎচন্দ্রকে তাঁর মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জামাতা সুশীল মুখোপাধ্যায়ের দমদমস্থ 'অলকা' ভবনে সংবর্ধনা জানিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধর সেন

রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন বলে, এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের একটা হৃদ্যতা ছিল। তাই শরৎচন্দ্রের কলকাতার বাড়ীতে একবার (৩রা শ্রাবণ, ১৩৪৩) রবিবাসরের অধিবেশনও হয়েছিল। সেই অধিবেশনে সর্বাধ্যক্ষ জলধর সেন এবং স্বয়ং শরৎচন্দ্রের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হয়েছিলেন।

১৩৪২ সালে মহালয়ার দিন কলকাতায় 'হোটেল ম্যাজেস্টিকে' বাঙলার পি, ই, এন, ক্লাব শরৎচন্দ্রকে সংবর্ধনা জানিয়েছিল। এই সময় পাইকপাড়ার রাজবাড়ীতেও এক সভায় শরৎচন্দ্রকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের শেষ বয়সে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে প্রতি বৎসর ৩১শে ভাদ্র তারিখে তাঁর জন্মদিবস উপলক্ষে 'শরৎ-শর্বরী' নামে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হ'ত। উদ্যোক্তাদের আগ্রহে কখনো কখনো শরৎচন্দ্রকেও ঐ অনুষ্ঠানে যেতে হত। তখন রেডিও অফিস ছিল ডালহৌসীতে ১নং গার্স্টিন প্লেসে। রেডিওর তৎকালীন স্টেশন-ডিরেক্টর মিঃ স্টেপলটন সাহেবের শরৎচন্দ্রের সংবর্ধনায় বিশেষ সমর্থন ও সম্মতি ছিল।

১৩৪৪ সালে ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্রের ৬২তম জন্মদিবসে বেতার কেন্দ্রে যে আনন্দ আসব হয়েছিল, তাতে অভিনন্দনের উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—

"বাষট্টি বৎসর বয়সে পা দিয়ে আমার জন্মতিথি উপলক্ষে সকলের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে নেবার পূর্বে আমার গুরুদেব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, যিনি আজ রোগশয্যায়, তাঁকে প্রণাম করি। এ জগতে সাহিত্য-সাধনায় তাঁর আশীর্বাদ এটি শুধু আমার নয়, প্রতি সাহিত্যিকের পরম সম্পদ। সেই আশীর্বাদ আজকের দিনে চেয়ে নিলাম।

নিজের সাহিত্য-সাধনার ব্যাপার নিজের মুখে কিছু বলা যায় না। শুধু এইটুকু ইঙ্গিতে বলতে পারি যে অনেক দুঃখের মধ্য দিয়ে এই সাধনায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছি।...

আমি আপনাদের মাঝে বেশীদিন থাকি বা না থাকি, আমার এ কথাটা হয়ত আপনাদের মাঝে মাঝে মনে পড়বে যে, অনেক দুঃখের মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্য-সাধনা ধীরে ধীরে বাধা ঠেলে চলেছিল।"

শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীতে রেডিও ছিল। সেই নির্জন গ্রামে বসে তিনি রেডিওর গান শুনতে ভালবাসতেন। এ সম্পর্কে একবার তিনি লিখেছিলেন—

"শহর হইতে দূরে গ্রামের মধ্যে আমার বাস। অতীতের নানা প্রকার আমোদ ও আনন্দের প্রাত্যহিক আয়োজন গ্রামে আর নেই, পল্লী এখন নির্জীব নিরানন্দ। কর্মক্লান্ত দিনের কত সন্ধ্যায় এই নিঃসঙ্গ পল্লীভবনে বেতারের জন্য উৎসুক আগ্রহে অপেক্ষা করিয়াছি। শ্রাবণের ঘন মেঘে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া আসে, কর্দমাক্ত জনহীন গ্রাম্যপথ নিতান্ত দুর্গম, নিবিড় অন্ধকার ভারের মত বুকের পরে চাপিয়া বসে, তখন বেতার-বাহিত গানের পালায় মনে হয় যেন দূরে থাকিয়াও আসরের ভাগ পাইতেছি।

আবার কোনদিন ক্ষান্তবর্ষণ আকাশে লঘু মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো দেখা দেয়, বর্ষার সুবিস্তীর্ণ নদীজলে মলিন জ্যোৎস্না ছড়াইয়া পড়ে, আমি তখন প্রাঙ্গণের একান্তে নদীতটে আরাম কেদারায় চোখ বুজিয়া বসি, তামাকের ধুঁয়ার সঙ্গে মিশিয়া বেতারে বাঁশীর সুর যেন মায়াজাল রচনা করে। দু একজন করিয়া প্রতিবেশী জুটিতে থাকে, ঘাটে বাঁধা নৌকায় দূরের যাত্রী, কৌতূহলী দাঁড়ি মাঝির দল নিঃশব্দে আসিয়া ঘিরিয়া বসে, আবার শেষ হইলে পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া যে যাহার আলয়ে চলিয়া যায়। এই আনন্দের অংশ আমি পাই।"

কলকতায় প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতিও ঐ সময় প্রতি বৎসর ৩১শে ভাদ্র তারিখে শরৎ-জন্মোৎসব পালন করত। ছাত্রদের আহ্বানে শরৎচন্দ্রকে কয়েকবার ঐ বঙ্কিম-শরৎ সমিতির সভায় যেতে হয়েছিল এবং তাদের অনুরোধে শরৎচন্দ্রকে কিছু না কিছু বলতেও হয়েছিল। যেমন—

১৩৩৫ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতির উদ্যোগে শরৎচন্দ্রের যে ৫৩তম জন্মোৎসব হয়েছিল, তাতে শরৎচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। সেদিন তিনি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন—

"আমার শক্তি কম, তবু নিজের দেশটিকে আমি বাস্তবিক ভালবাসিয়াছি। এ কথার মধ্যে কোন প্রবঞ্চনা নেই। যথার্থ ভালবাসিয়াছি। ইহার ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ, ইহার জলবায়ু, ইহার দোষগুণ, ত্রুটি, দলাদলি—যা কিছু বলো সব নিয়েই বাস্তবিক আমি ভালবাসিয়াছি।

...অনেকে বলেন, 'যাহারা সমাজের নিম্নস্তরে পড়িয়া আছে, তাহাদের উপর আমার সহানুভূতি বেশী। সত্যই তাই।"

কয়েকটি আক্রমণ

১৩৩৭ সালের ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্রের ৫৫তম জন্মতিথিতে প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতি শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানায়। সমিতি সেবার শরৎচন্দ্র সম্বন্ধীয় কয়েকটি রচনা নিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিল। উদ্যোক্তাদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথও তখন 'শরৎচন্দ্র' নামে একটি লেখা দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ঐ লেখাটিতে সংক্ষেপে বাঙলা কথা-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের একটি ইতিহাস ছিল। ঐ ইতিহাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস সম্বন্ধেও দু-একটি কথা বলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ঐ লেখাটি সেদিন শরৎচন্দ্রের সংবর্ধনা সভায় পড়া হয়েছিল। তাছাড়া কবির ঐ লেখাটির একটি ইংরাজী অনুবাদ ঐদিন 'লিবার্টি' নামক দৈনিক ইংরাজী পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্র সেদিন সভায় আসার আগে সকালে লিবার্টিতে কবির লেখার ইংরাজী অনুবাদটি পড়েছিলেন। তাই তিনি সভায় এসে অভিনন্দনের উত্তরে কবির আনন্দমঠের উপর অভিমতকেই তাঁর বক্তব্যের মূল ভিত্তি করে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর আনন্দমঠ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলেছিলেন। যথা—

"কবি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের উল্লেখ করে বলেছেন, বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলের তুলনায় এর সাহিত্যিক মূল্য সামান্যই। এর মূল্য স্বদেশ-হিতৈষণায়, মাতৃভূমির দুঃখ দুর্দশার বিবরণে, তার প্রতিকারের উপায় প্রচারে, তার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি আকর্ষণে। অর্থাৎ আনন্দমঠে সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের সিংহাসন জুড়ে বসেছে প্রচারক ও শিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র।···

বছর কয়েক পূর্বে কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম-সাহিত্য সভায় একবার উপস্থিত হতে পেরেছিলাম। দেখলাম, তাঁর মৃত্যুর দিন স্মরণ করে বহু মণীষী, বহু পণ্ডিত, বহু সাহিত্য-রসিক বহু স্থান থেকে সভায় সমাগত হয়েছেন। বক্তার পরে বক্তা—সকলের মুখেই ঐ এক কথা, বঙ্কিম 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ঋষি, বঙ্কিম মুক্তি-যজ্ঞের প্রথম পুরোহিত। সকলের শ্রদ্ধাঞ্জলি গিয়ে পড়ল আনন্দমঠের 'পরে। দেবী চৌধুরাণী, কৃষ্ণ চরিত্রের উল্লেখ কেউ কেউ করলেন

বটে, কিন্তু কেউ নাম করলেন না বিষবৃক্ষের, কেউ স্মরণও করলেন না কৃষ্ণকান্তের উইলকে।...

বঙ্কিমের ন্যায় অতবড় সাহিত্যিক প্রতিভা যিনি তখনকার দিনেও বাঙলা ভাষার নব রূপ, নব কলেবর সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল—বঙ্গ সাহিত্যের মহামূল্য সম্পদ দুটি যিনি বাঙালীকে দান করতে পেরেছিলেন, কিসের জন্য তিনি পরিণত বয়সে কথা-সাহিত্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করে আবার আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম লিখতে গেলেন? কোন্ প্রয়োজন তাঁর হয়েছিল?"

শরৎচন্দ্র ইতিপূর্বেও দু-একটি সভায় সভাপতি হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন। তিনি সেই সব সভায় বলেছিলেন—গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর প্রণয় আকাঙ্ক্ষাকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে সহানুভূতির সহিতই অঙ্কিত করেছিলেন, কিন্তু শেষে তিনি হিন্দুধর্মের সুনীতির আদর্শেই বিধবা রোহিণী প্রেমের অধিকারী নয় বলে, তাকে বিশ্বাসঘাতিনী করে অকারণ, অহেতুক জবরদস্তিতে তার অপমৃত্যু ঘটিয়েছেন।

কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিণী সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের এই মতকে কিন্তু অনেকেই স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসে যেভাবে চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেছেন ও ঘটনা বিন্যাস করেছেন, তাতে চরিত্রের ও ঘটনার পরিণতি হিসাবে গোবিন্দলালের গুলিতে রোহিণীর মৃত্যু মোটেই অস্বাভাবিক হয় নি। রোহিণীর মৃত্যু যদি পাপের শাস্তিই হয়, তাহলে নিষ্পাপ ভ্রমরের ভাগ্যেও শেষ পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড হল কেন? তাই বঙ্কিমচন্দ্র কেবল পাপের শাস্তি ও সুনীতি প্রচারের জন্যই রোহিণীর মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন, একথা ঠিক নয়।

শরৎচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁর সংবর্ধনা সভায় কবির কথা উদ্ধৃত করে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ সম্বন্ধে ঐরূপ মন্তব্য করলে, সেই সময় 'শনিবারের চিঠি' তাঁকে এবং ঐ সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকেও আক্রমণ করেছিল। শনিবারের চিঠি লিখেছিল—

"লেখার মধ্যে লেখকের যদি কোনও উদ্দেশ্য প্রকাশ পায় এবং সেই কারণে যদি রসসৃষ্টি হতে সেই লেখাকে বরখাস্ত করতে হয়, তাহলে শরৎচন্দ্র এবং তস্যগুরু রবীন্দ্রনাথের কোন্ লেখাটা টেকে শুনি? পল্লীসমাজ লেখার

মধ্যে শরৎবাবুর কোনই উদ্দেশ্য ছিল না? সত্তার গূঢ় উদ্দেশ্য অত্যন্ত পরিষ্কার। বামুনের মেয়ে যদি উদ্দেশ্যমূলক না হয়, তাহলে উদ্দেশ্যমূলক আর কি হতে পারে জানি নে।...

আর যদিই বা ধরে নেওয়া যায় যে আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম প্রভৃতি বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলের পরের লেখা এবং নিম্নস্তরের লেখা তাতেই বা কি এসে যায়?... শ্রীকান্ত, বিরাজ বৌ এর শরৎচন্দ্র যদি 'শেষপ্রশ্ন' নামক আস্তাকুঁড়ের জন্মদাতা হতে পারেন, তাহলে বিষবৃক্ষের লেখক আনন্দমঠ লিখলে অপরাধ হয় না।" (শনিবারের চিঠি—আশ্বিন,১৩৩৮)

ইতিপূর্বে ১৩৩৪ সালের কার্তিক সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে সম্পাদক সজনীকান্ত দাস 'সাহিত্য ধর্ম প্রসঙ্গ' নামে এক লেখায় শরৎচন্দ্রকে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন। 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধের প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র 'বঙ্গবাণী'তে 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' নামে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তারই উপর ছিল সজনীবাবুর ঐ আক্রমণ।

১৩৩৮ সালের বৈশাখ মাসে শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। শেষপ্রশ্ন পুস্তকাকারে প্রকাশ হওয়ার আগে বছর চারেক ধরে ধারাবাহিকভাবে (অবশ্য মাঝে মাঝে বাদ যেত) 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বইটি ভারতবর্ষে প্রকাশিত হওয়ার সময় থেকেই এক শ্রেণীর পাঠক এইরূপ বই লেখার জন্য শরৎচন্দ্রের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। তারপর শেষপ্রশ্ন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে, তখন কাগজে কাগজে শরৎচন্দ্রকে আক্রমণের আর সীমা রইল না। পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা নানা রকমের কার্টুন ছবি এঁকে এবং 'শেষশ্রাদ্ধ' নামে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে শনিবারের চিঠি শরৎচন্দ্রকে তীব্র আক্রমণ করল। 'পরিচয়' প্রভৃতি কাগজেও শেষপ্রশ্নের খুব বিরূপ সমালোচনা বেরোল।

এই সব আক্রমণের মুখে পড়ে, শরৎচন্দ্র কিন্তু আদৌ টললেন না। অবশ্য ঐ সময় তাঁর উপন্যাসের কয়েকজন পাঠক-পাঠিকা শেষপ্রশ্ন লেখা যে তাঁর অন্যায় হয় নি, বরং ঠিকই হয়েছে, এ কথা জানিয়েও ছিলেন। যেমন—একটি মেয়ে শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন, 'তাঁর যথেষ্ট টাকা থাকলে এই বই ছাপিয়ে বিনামূল্যে বাইবেলের মত বিতরণ করতেন।'

তাই শরৎচন্দ্র সেই সময় তাঁর গ্রন্থের প্রকাশক, ভারতবর্ষ পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

"গালি গালাজের বহর দেখে হয়ত আপনি ভয় পেয়েও থাকতে পারেন, কিন্তু এমনিই একটা পণ্ডিত সমাজ বইটাকে নির্বিচারেই ভালো বলে যেমন, ওরাও নির্বিচারে মন্দ বলে। ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছিল বলে, আপনি কিছুমাত্র লজ্জিত হবেন না। এই অনুরোধ। সকল ব্যাপারেই দু পক্ষ থাকে। তারাই যে প্রবল পক্ষ, এ নাও হতে পারে। এবং কালের বিচারে তারাই যে সত্য, এ-ও না হতে পারে।"

শেষপ্রশ্ন নিয়ে যখন কাগজে কাগজে তীব্র সমালোচনা চলছিল, তখন শরৎচন্দ্রের লেখার কয়েকজন ভক্ত পাঠক-পাঠিকা ঐসব সমালোচনা পড়ে রেগে গিয়ে, ঐসব সমালোচনার প্রতিবাদ করবার জন্য শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলেন। শরৎচন্দ্র কিন্তু তাঁদের অনুরোধে কান না দিয়ে, তাঁদের অন্যভাবে বুঝিয়ে শান্ত করেছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁর একজন অজ্ঞাত ভক্ত পাঠিকাকে (সুমন্দ ভবনের শ্রীমতী···সেন) তখন যেভাবে বুঝিয়ে একটি চিঠি দিয়েছিলেন, সেই চিঠিটির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করছি—

"হাঁ, 'শেষপ্রশ্ন' নিয়ে আন্দোলনের ঢেউ আমার কানে এসে পৌঁচেছে। অন্ততঃ, যেগুলি অতিশয় তীব্র এবং কটু সেগুলি যেন না দৈবাৎ আমার চোখ কান এড়িয়ে যায়, যাঁরা অত্যন্ত শুভানুধ্যায়ী তাঁদের সেদিকে প্রখর দৃষ্টি। লেখাগুলি সযত্নে সংগ্রহ ক'রে লাল-নীল-সবুজ-বেগ্‌নী নানা রঙের পেন্সিলে দাগ দিয়ে, তাঁরা ডাকের মাশুল দিয়ে অত্যন্ত সাবধানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এবং পরে আলাদা চিঠি লিখে খবর নিয়েছেন পৌঁছল কিনা। তাঁদের আগ্রহ, ক্রোধ ও সমবেদনা হৃদয় স্পর্শ করে।

নিজে তুমি কাগজ পাঠাও নি বটে, কিন্তু তাই বলে রাগও কম করোনি। সমালোচকের চরিত্র, রুচি, এমন কি পারিবারিক জীবনকেও কটাক্ষ করেছো। একবার ভেবে দেখো নি যে শক্ত কথা বলতে পারাটাই সংসারে শক্ত কাজ নয়! মানুষকে অপমান করায় নিজের মর্যাদাই আহত হয় সর্বচেয়ে বেশী। জীবনে এ যারা ভোলে তারা একটা বড় কথাই ভুলে থাকে। তা ছাড়া এমন তো হতে পারে 'পথের দাবী' এবং 'শেষ প্রশ্ন' এর সত্যিই খুব খারাপ লেগেছে। পৃথিবীতে সব বই সকলের জন্য নয়,—সকলেরই ভাল লাগবে এবং

প্রশংসা করতে হবে, এমন তো কোন বাঁধা নিয়ম নেই। তবে, সেই কথাটা প্রকাশ করার ভঙ্গীটা ভালো হয়নি, এ আমি মানি। ভাষা অহেতুক রূঢ় এবং হিংস্র হয়ে উঠেছে, কিন্তু এইটেই তো রচনা রীতির বড় সাধনা। মনের মধ্যে ক্ষোভ ও উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ থাকা সত্বেও যে, ভদ্র ব্যক্তির অসংযত ভাষা ব্যবহার করা চলে না, এই কথাটাই অনেক দিনে অনেক দুঃখে আয়ত্ত করতে হয়। তোমার চিঠির মধ্যে এ ভুল তুমি তাঁর চেয়েও করেছো। এত বড় আত্ম-অবমাননা আর নেই।

ভাবে বোধ হয় তুমি অল্প দিনই কলেজ ছেড়েচো। লিখেচো তোমার সখীদেরও এম্‌নি মনোভাব। যদি হয় সে দুঃখের কথা। এ লেখা যদি তোমার হাতে পড়ে তাঁদের দেখিয়ো। শীলতা মেয়েদের বড় ভূষণ, এ সম্পদ কারো জন্যে, কোন কিছুর জন্যই তোমাদের ক্ষোয়ানো চলে না।

জানতে চেয়েছো আমি এ সকলের জবাব দিই না কেন? এর উত্তর—আমার ইচ্ছে করে না, কারণ ও আমার কাজ নয়—আত্মরক্ষার ছলেও মানুষের অসম্মান করা আমার ধাতে পোষায় না।…"

১৩৪০ সালের চৈত্র সংখ্যা ভারতবর্ষে শরৎচন্দ্রের 'অনুরাধা' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়। অনুরাধা গল্পটি প্রকাশিত হলে 'শনিবারের চিঠি' তখন তাঁকে 'কার্টুন' ছবি এঁকে তীব্র আক্রমণ করেছিল।

১৩৪২ সালের মাঝামাঝি সময়ে এক ঘরোয়া সভায় শরৎচন্দ্র দরিদ্র লেখকদের পক্ষ নিয়ে কিছু বলেছিলেন। তাঁর সেই কথাগুলি 'ভাগ্য-বিড়ম্বিত লেখক সম্প্রদায়' নামে তখন একটি পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছিল। ঐ 'ভাগ্য-বিড়ম্বিত লেখক সম্প্রদায়' প্রকাশিত হলে, তখন ১৩৪২ সালের কার্তিক সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি' শরৎচন্দ্রকে আক্রমণ করেছিল।

১৩৪৩ সালে শরৎচন্দ্র ঢাকায় ডি, লিট্, উপাধি নিতে গিয়ে সেখানে কোন সভায় বলেছিলেন, মুসলমান সমাজ নিয়ে উপন্যাস লিখবেন। এই কথা বলার জন্যও তখন শনিবারের চিঠি তাঁকে আক্রমণ করেছিল।

শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাস বার বার শরৎচন্দ্রকে আক্রমণ করেছিলেন। এই জন্যই সজনীবাবু পরে অনুতপ্ত হয়ে তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে লিখে গেছেন—"প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি, তাঁহার মৃত্যুর পর একাধিক বার।"

প্রবোধ সান্যালের আক্রমণ ও অনুতাপ

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে ছাত্র-ছাত্রীদের মুখপত্র 'শ্রীহর্ষ' পত্রিকায় পর পর দুটি প্রবন্ধ লিখে সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল শুধু শরৎ-সাহিত্যেরই তীব্র সমালোচনা নয়, শরৎচন্দ্রকে ব্যক্তিগতভাবেও আক্রমণ করেছিলেন।

শ্রীহর্ষের তৎকালীন প্রধান কর্মকর্তা বিজয় চট্টোপাধ্যায় (বর্তমানে এই গ্রন্থ লেখার সময়—ইনি কলকাতা হাইকোর্টের একজন প্রবীণ অ্যাড্‌ভোকেট) বলেন—প্রবোধবাবু তাঁর লেখাটি নিয়ে ছাপবার জন্য আমাকে বললে, আমি তখন শ্রীহর্ষের দু সংখ্যায় ছাপি।

বিজয়বাবু আরও বলেন—শরৎচন্দ্র আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন। আমি ঐ প্রবন্ধটি ছাপায় মনে হয়, তিনি তখন আমার উপর একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। যাই হোক্, অল্পদিন পরেই শরৎচন্দ্রের মৃত্যু হলে আমি শ্রীহর্ষের দল নিয়ে গিয়ে তাঁর শব বহন করে ও শোকযাত্রা পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে এবং শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর কিছুদিন পরে শ্রীহর্ষ অফিস থেকে 'শরৎচন্দ্র ও ছাত্রসমাজ' নামে গ্রন্থ প্রকাশ করে আমার কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলাম।

ছাত্র-ছাত্রীদের মুখপত্র শ্রীহর্ষ পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রবোধবাবুর ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে, তখন অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই শ্রীহর্ষের তৎকালীন পরিচালক মণ্ডলীর নিন্দা করেছিলেন।

তখন শুধু ছাত্র-ছাত্রী সমাজই নয়, প্রবোধবাবুর ন্যায় একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে, সাহিত্যিক মহলেও বেশ একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। শরৎচন্দ্রের অনেক ভক্ত তো প্রবন্ধ পড়ে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং তাঁরা এর প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদগুলি বেরোয় 'খেয়ালী' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায়। প্রবোধবাবুর সমর্থনে কেউ কেউ আবার এঁদের প্রতিবাদেরও প্রতিবাদ করেন। এই নিয়ে তখন কিছুদিন ধরে খেয়ালীর পাতায় বাদানুবাদ চলতে থাকে। কয়েকটি বাদানুবাদ এই :—

প্রবোধবাবুর প্রবন্ধের প্রতিবাদে সাহিত্যিক গোপাল ভৌমিক তখন খেয়ালীতে লিখেছিলেন—

" 'শ্রীহর্ষ' পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে প্রবোধকুমার সান্যালের ঈর্ষা প্রণোদিত প্রবন্ধটি যখন পড়লাম, তখন মনে করলাম যে, এর প্রতিবাদ করব।···'খেয়ালী'তে যখন এ বিষয় নিয়ে আলোচনা উঠেছে, তখন দু একটা কথা না বলে স্থির থাকতে পারলুম না।···লেখাটি মোটে শরৎ-সাহিত্যের নিরপেক্ষ সমালোচনা হয় নি। স্পষ্ট বোঝা যায় যে শরৎচন্দ্রকে নিন্দা করার উদ্দেশ্যেই প্রবোধকুমার কোমর বেঁধে নেমেছেন।···

শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে প্রবোধ সান্যাল বলেছেন—'· তাঁর মুখের সঙ্গে মনের মিল নেই, কথার সঙ্গে কাজের ঐক্য নেই, তাঁর চরিত্রের সঙ্গে আচরণের সামঞ্জস্য নেই।' আমার মনে হয় সান্যাল মহাশয়ের নিজের সম্বন্ধে এই কথাগুলো যতটা খাটে, আর কারও সম্বন্ধে ততটা নয়। পাঁচ বৎসর পূর্বে যে প্রবোধ সান্যাল 'শরৎ-বন্দনা'য় শরৎ-প্রশস্তি লিখলেন, তিনিই কিনা আজ এমন নির্লজ্জ উক্তি করছেন, একি সম্ভব।· ·শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে প্রবোধ সান্যালের আর একটা নির্লজ্জ উক্তি এই যে, শরৎচন্দ্র 'দিলীপকুমার রায়ের বই 'দাগ দিয়ে' পড়ে শেখেন ইউরোপীয় ভাবধারা।' এমন নির্লজ্জ উক্তি প্রবোধকুমার কি করে করলেন? তিনি কি শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' বইটা পড়েছেন? পড়ে দেখবেন ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের প্রত্যক্ষ পরিচয় কত গভীর।"

শ্রীমতী নীলিমা বিশ্বাস লিখেছিলেন—

"প্রবোধকুমার বলেছেন যে, নরনারীর যৌন-জীবন বিশ্লেষণ করাই তাঁর সাহিত্য-ধর্ম। এ কথা স্বীকার করি না। তিনি নিজে কিছুদিন আগে 'বাতায়ন' পত্রিকায় লিখেছেন—'দুর্নীতির অক্লান্ত প্রশ্রয়দাতা বলে যাঁরা শরৎচন্দ্রকে কলঙ্কিত করেন, তাঁরা বাতুল। আমার মনে হয় প্রেম ও সতীত্বের এত বড় প্রচারক বাঙলা দেশে অতি বিরল।' তবে তিনি কি সেই বাতুলতার প্রমাণ করছেন। প্রথম উক্তির মধ্যে সত্যের আভাষ না থাকলেও দ্বিতীয়টির মধ্যে নিশ্চয়ই আছে। কেবল মাত্র যৌন-লালসার আগুনে দীপ্ত শরৎ-সাহিত্য নয়। শরৎ-সাহিত্যে যারা ভোগ-লালসাকে প্রশ্রয় দিয়েছে, তাদের একজন কিরণময়ী, অপর জন সুরেশ। কিরণময়ী ছিল বিদ্রোহী—সে সমাজ মানে নি, সংস্কার মানে নি, সর্বোপরি নীতি মানে নি। দেহের পিপাসা তার ছিল

অসীম। স্বামীর মৃত্যুর পর সে নিজের দেহ বিলিয়ে দিয়েছে পর পুরুষের কাছে। আর সুরেশ—দেহের ইন্ধনরূপে জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছে অচলাকে তার নির্বিঘ্ন কামনার তৃপ্তির জন্য। কিন্তু অপর কোন চরিত্রের মধ্যে এ ভাব দেখি না।"

অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য লিখেছিলেন—

"শরৎ-সাহিত্যে মহৎ জ্ঞান ও গভীর চিন্তার পরিচয় কোথাও নেই—কথাটা অবশ্য এই প্রথম শুনলাম।· সমাজ-সংস্কার, স্বদেশ প্রেম, মানসিক ঔদার্য, সৎসাহস, সত্যনিষ্ঠা, সচ্চরিত্রতা, আত্মপ্রত্যয়, বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি প্রভৃতি যদি মহৎ গুণ হয়, তো তার অভাব নেই শরৎ-সাহিত্যে একথা জোর দিয়েই বলা চলে। বরঞ্চ প্রচুর পরিমাণেই আছে।…"

প্রবোধবাবুর সমর্থনে আবার এঁদের প্রতিবাদের যে প্রতিবাদ বেরোয়, সেইরূপ একটি প্রতিবাদের আরম্ভটি ছিল এই :—

"প্রবোধ সান্যালের শরৎ-সমালোচনা যে ভীমরুল-চক্রে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিবে ইহা ধারণার অতীত। আঘাতপ্রাপ্ত বৃদ্ধ বয়সের দুরবস্থার স্বভাবগত সমবেদনা-জ্ঞাপক শরৎ-স্তাবকদিগের কর্ণভেদী কলরবে 'খেয়ালী'র নিস্তব্ধ নিষ্কম্প বক্ষ যে আলোড়িত হইয়া উঠিবে, কিছুদিন পূর্বে কেহ বা তাহা আশা করিয়াছিল। প্রবোধচন্দ্রের সুযুক্তিপূর্ণ যথার্থ সমালোচনার অংশটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে সুধীগণের অভাব হইবে না বলিয়াই ইতিপূর্বে আমরা এ আলোচনায় অবতরণ করিতে অভিলাষ করি নাই। স্কন্ধ হইতে অপদেবতা অপসারণের চেষ্টায় মন্ত্রোচ্চারণকালে ভূতাবিষ্ট লোকের অস্বাভাবিক অসংলগ্ন প্রলাপ ও কার্যকলাপ যেরূপ অদ্ভুত হয়, প্রবোধ-প্রবন্ধের সেইরূপ অপরূপ প্রত্যুত্তরে এবং শরৎ-সাহিত্য-মনোভাবাপন্ন গোঁড়া স্তাবকদলের একঘেয়ে কাঁদুনীতে বাঙ্গলা দেশের বৈশিষ্ট্য মনে পড়িল। বুঝিলাম, বঙ্গসাহিত্য শরৎচন্দ্র কর্তৃক রাহুগ্রস্ত—বিপুল উনিশ-এডিশনী সাহিত্য কর্তৃক বঙ্গভাষা আরব্যোপন্যাসের নাবিক সিন্দবাদের ন্যায় বিধ্বস্ত—শ্বাসরুদ্ধ।

যে শরৎচন্দ্র চাঁদে চাঁদমুখের সন্ধান পান নাই, মেঘে কেশের সন্ধান পান নাই, আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া নয়ন অন্ধ করিলেও কোনও আঁখিযুগলের সন্ধান পান নাই (শ্রীকান্ত) ; এ হেন বাস্তববাদী শরৎচন্দ্র ভ্রমক্রমে অমানিশায় কালীমূর্তি দেখিলেও (শ্রীকান্ত) তিনি যে রিয়্যালিজমের প্রতিষ্ঠাতা পথ-

প্রদর্শক এবং সাহিত্যে বাস্তবতার সর্বপ্রথম আমদানীকারক তাহা তাঁহার গোঁড়া ভক্তেরা দিকে দিকে বিঘোষিত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি, বাস্তবতার নামে কি বিভৎস-নগ্নতা ও আধুনিক শ্লীলতাবর্জিত উগ্রপন্থী তরুণ সাহিত্যিকদিগের অগ্রদূত, চিরবিগলিত তারুণ্যের সবুজ পতাকাবাহী এই শরৎচন্দ্রকে বঙ্গভাষার পবিত্র অঙ্গন প্রথমে কলুষিত করিবার সাহস ও ক্ষমতা দিল কে?

পূর্বে বঙ্গসাহিত্যে এইরূপ আগুন নিয়ে খেলা আর কেহ করিয়াছেন, বলিয়া জানা যায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র-মাইকেল-রবীন্দ্র সেবিত বঙ্গভাষার পূত অঙ্গে বর্মা-পালানো ভবঘুরে শরৎচন্দ্রের লেখনীর খোঁচায় যে দুষ্ট ব্রণ জন্মলাভ করিয়াছিল, আজ তাহা ব্যাপকভাবে সারাদেহ গলিত করিতে চলিয়াছে। এই অপরিণামদর্শী উদ্দেশ্যবিহীন তামসিক সাহিত্যের আব্দার রক্ষার্থেই বঙ্গভাষার বর্তমান নিদারুণ অবস্থা। আধুনিক সাহিত্যের যাহা কিছু কু, যাহা কিছু অশিব, যাহা কিছু ব্যভিচারের ন্যাক্কার তাহার জন্য সর্বতোভাবে প্রথমে দায়ী যে শরৎচন্দ্রের এই উত্তেজনাপূর্ণ, দুর্নীতিপূর্ণ, বীভৎস সাহিত্য তাহা অন্তরে অন্তরে অস্বীকার করিবার উপায় কাহারও নাই।…"

এই লেখাটির তলায় লেখক হিসাবে নাম ছিল মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সাহিত্যিক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ লেখার তলায় নিজের নাম দেখে মহা বিস্মিত হয়ে গেলেন। তিনি ঘুণাক্ষরেও এর কিছুই জানতেন না। নিজের নাম আছে বলে মণিবাবু খোঁজ নিতেই জানতে পারলেন যে, প্রবোধবাবুর একজন সমর্থক নিজের নামে না লিখে এটি মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামে ছাপিয়েছেন। মণিবাবু পরে চেষ্টা করে আসল লেখকের নামও জানতে পেরেছিলেন। সেই লেখক শরৎচন্দ্রের একজন স্নেহভাজন বন্ধুই ছিলেন।

পরে মণিবাবু ঐ লেখাটি নিয়ে সত্য ঘটনাটা জানাবার জন্য তখন একদিন শরৎচন্দ্রের কাছেও গিয়েছিলেন। সেদিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মণিবাবুর যে সব কথা হয়েছিল সে সম্বন্ধে মণিবাবু নিজেই লিখেছেন—

"…'খেয়ালী'র কাগজখানার নির্দিষ্ট অংশটি খুলিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলাম। কুণ্ঠিতভাবেই সেই সঙ্গে বলিতে হইল—এটা দেখেছেন নিশ্চয়ই।

একটু হাসিয়া বলিলেন—ও! প্রবোধ আমার যে শ্রাদ্ধটা পাকিয়েছিল! কিন্তু খানিক দূর গড়াবার পর তার ত নিষ্পত্তি হয়ে গেছে।

বলিলাম—তা গেছে! খেয়ালীর সম্পাদক শেষে শান্তিজল ছড়িয়েছেন। কিন্তু এই শ্রাদ্ধটাতে যাঁরা যাঁরা যোগ দিয়েছেন, মন্তর পড়িয়েছেন, খোলামুচি কেটেছেন, পিণ্ডি মেখেছেন, বিরাট পড়েছেন, তাঁদের ভেতরে আমাকেও জোর করে বসানো হয়েছে যে।

বলিলেন—তাতে কি হয়েছে, সকলকেই যে আমার লেখার প্রশংসা করতে হবে, এমন-তো কোন কথা নেই। যার যা খুশি, সে তাই বলতে পারে, আর বলছেও। কিন্তু আমার তাতে কোন দুঃখ নেই।

বলিলাম—সে কথা আলাদা। কিন্তু আমার কথাটা শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন যে, এ সম্বন্ধে আমার দুঃখ করবার যথেষ্ট কারণ আছে।

দুই চক্ষুর দৃষ্টি প্রখর করিয়া তিনি আমার দিকে চাহিলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন—কেন বলুন তো?

আমার দুঃখের কারণটুকু তখন তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইল। আমি যে খেয়ালীর চ্যালেঞ্জের কথা শুনি নাই, প্রবোধবাবুর ওকালতী করিবার জন্য কোন পক্ষ হইতে আহ্বান পাই নাই, এমন কি খেয়ালীর সম্পাদক বা তাহার লেখক প্রবোধবাবুর সহিত আমার আলাপ পরিচয়ও নাই এবং আমার জ্ঞাতসারে আমার লেখনী দিয়া এইরূপ গরল বাহির হইতে পারে না, অথচ ইহার তলায় স্পষ্টাক্ষরে আমার নাম ছাপা হইয়াছে—এ সমস্তই তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম।

তিনি নীরবে সমস্তই শুনিলেন এবং আমার বক্তব্য শেষ হইতে একটু হাসিলেন। সে হাসি আমার ভাল লাগিল না। প্রশ্ন করিলাম—আপনি বোধ হয় বিশ্বাস করছেন না।

এবার সোজা হইয়া বসিয়া তিনি দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলেন—খুব করছি।

বলিলাম—সে যাই হোক্, আমি এর প্রতিবাদ পাঠাবো ঐ কাগজে।

শরৎবাবু ঈষৎ উত্তেজিতভাবেই বলিলেন—এমন কাজটি করবেন না। তাতে শ্রাদ্ধ আবার পাকিয়ে উঠবে। তা ছাড়া আমার মন এখন এমনই অবসন্ন হয়ে পড়েছে যে, আমাকে নিয়ে কোন লেখালেখি করলে আমার পক্ষে সেটা বরদাস্ত হবে না। কেননা নিজের সম্বন্ধে কাগজে কিছু বেরোলে আমি নিজে উপেক্ষা করলেও, আর পঞ্চাশ জন আমার বাড়ী বয়ে এসে সেটা পড়ে শুনিয়ে যাবে। এখন ও সব সহ্য করবার মত শক্তি আমার নেই।

জিজ্ঞাসা করিলাম—তাহলে কি করতে বলেন?

উত্তর দিলেন—একেবারে চেপে যান। এ নিয়ে কোন রকম ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না। অবশ্য যদি আমার পরামর্শ শোনেন।

শেষ প্রশ্ন করিলাম—কিন্তু যাঁরা যাঁরা লেখাটা পড়েছেন, তাঁদের সকলেরই মনে এই ধারণাই তো দৃঢ় হয়ে থাকবে যে, এর লেখক সত্যই আমি এবং আপনার সম্বন্ধে এই মত আমার!

বুঝিলাম, কি একটা যন্ত্রণা তাঁহাকে আর্ত করিয়া তুলিয়াছে এবং তিনি যেন তাহার প্রভাব কাটাইবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছেন। সেই অবস্থায় শেষ উত্তর দিলেন—সত্য কখনো চাপা থাকে না মণিবাবু, প্রকাশ তার আছেই।"

শরৎচন্দ্রকে নিয়ে 'শ্রীহর্ষে' প্রবোধবাবুর আক্রমণ এবং তারই ফলে 'খেয়ালী'র পাতায় বাদ প্রতিবাদ চলতে থাকলেও, শরৎচন্দ্র নিজে কিন্তু কোন প্রতিবাদ করেন নি বা তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে কাকেও কিছু লিখতেও বলেন নি। বরং প্রতিবাদ করবেন বলে, কেউ তাঁর মত জানতে গেলে, তিনি তাঁকে নিষেধই করেছেন। যেমন, এখানে দেখা যাচ্ছে, মণিবাবুকে প্রতিবাদ করতে বারণ করেছেন। এইরূপ আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি :—

প্রবোধবাবুর প্রবন্ধে, শরৎচন্দ্র কালিদাস রায়ের কাছে ব্যাকরণ শেখেন, এইরূপ কথা থাকায় কালিদাসবাবু নিজেও তখন প্রবোধবাবুর ঐ উক্তি যে মিথ্যা, এই কথাসহ প্রবোধবাবুর প্রবন্ধের একটি প্রতিবাদ লিখেছিলেন। কালিদাসবাবু তাঁর ঐ প্রতিবাদ প্রবন্ধটি লিখে সেটি হাতে নিয়ে একদিন শরৎচন্দ্রের কলকাতার বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। কালিদাসবাবু যখন যান, শরৎচন্দ্র তখন বৈঠকখানায় বসে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন। কালিদাসবাবু গিয়ে তাঁর লেখা প্রবন্ধটি পড়ে শরৎচন্দ্রকে শোনালেন।

শরৎচন্দ্র তামাক টানতে টানতে শুনে বললেন—বাঃ তুমি তো বেশ লেখ কালিদাস! দেখি তোমার লেখাটা!

কালিদাসবাবু লেখা কাগজটি শরৎচন্দ্রের হাতে দিলে, শরৎচন্দ্র তখনই সেটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে কলকের মাথায় ফেলে দিলেন। কলকের আগুনে লেখাটি পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

শরৎচন্দ্র সেদিন শেষে কালিদাসবাবুকে বলেছিলেন—

'যুবক লেখকদের লেখার তীব্র বিরুদ্ধ সমালোচনা হলে কিছু ফল হতে পারে। তাদের আঘাত সইবার ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি আছে—ভুল করলে

শোধরাবারও বয়স আছে। আমার মত মৃত্যুপথ যাত্রীকে এ আক্রমণ কেন? আক্রমণ করে দুদিন পরেই তো অনুতাপ করতে হবে। এরা মহাকালের বিচারের উপর নির্ভর করতে পারে না, এদের তরও সয় না। এরা ভাবে আমরাই তাড়াতাড়ি একটা বিচার করে দিই, সেই বিচারটা মহাকাল স্বীকার করে নিতে বাধ্য। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, যাবার আগে কারো সঙ্গে বিরোধ করতে চাই না। যে যা বলে বলুক, তোমরাও কোন প্রতিবাদ করো না।'

কালিদাসবাবু একদিন আমার কাছে বলেছিলেন, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সত্যকার পরিচয় হয় 'রসচক্রে'র বৈঠকে।

শরৎচন্দ্র মৃত্যুর তিন চার বছর আগে কলকাতায় বাড়ী করে, যখন কলকাতার বাড়ীতে থাকতেন, তখন তিনি মাঝে মাঝে এই রসচক্রের বৈঠকে যেতেন। ঐ সময় তিনি তাঁর সাহিত্য-জীবন শেষ করে এনে, লেখা একরূপ ছেড়েই দিয়েছিলেন। অতএব কালিদাস রায়ের কাছে শরৎচন্দ্র ব্যাকরণ শিখতেন, এ কথা হতেই পারে না।

প্রবোধকুমার সান্যালকে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আপনি শরৎচন্দ্রকে যে হঠাৎ এমনিভাবে আক্রমণ করলেন, তার কারণটা কি ছিল?

উত্তরে প্রবোধবাবু সেদিন বলেছিলেন—আমরা কাশীতে কয়েকদিন ধরে এক পণ্ডিত সমাজে শরৎ-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করে দেখেছিলাম যে, শরৎচন্দ্রের লেখার বা বলার ভঙ্গীটি ছাড়া তাঁর সাহিত্যে ভাবী কালের জন্য তেমন কিছুই নেই। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, ৬টি প্রবন্ধ লিখে শরৎ-সাহিত্যের স্বরূপ দেখিয়ে দোব। কিন্তু লেখার সুরুতেই মহা হৈ হৈ পড়ে গেল। তাই আর সব দেখানো হল না। আমি এ-ও লিখেছিলাম যে, শরৎচন্দ্র দিলীপ রায়ের বই পড়ে ইউরোপীয় ভাবধারা শেখেন এবং কালিদাস রায়ের কাছে ব্যাকরণ ও কিরণশঙ্কর রায়ের কাছে রাজনীতি শেখেন।

'শ্রীহর্ষে' প্রবোধবাবুর লেখা যা দেখেছি সত্যই তা পড়ে হৈ হৈ করবার মতই বটে। যাই হোক, প্রবোধবাবুর এই কথাগুলি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে:—

কাশীতে প্রবোধবাবুরা যে বুঝেছিলেন, শরৎ-সাহিত্যে ভাবীকালের জন্ত কিছু নেই ; এ বিষয়ে ভাবীকালই তার জবাব দিয়েছে। কেননা প্রবোধ-বাবুদের ঐ বুঝবার সময় থেকে এই প্রসঙ্গ লেখার সময় পর্যন্ত পঁচিশ ছাব্বিশ বছর পার হয়ে গেছে। এখনও শরৎ-সাহিত্যের আদর এতটুকুও কমে নি। বরং বেড়েই চলেছে।

শরৎচন্দ্র এক রেঙ্গুনেই ইউরোপীয় ভাবধারা সম্বন্ধে যে কিরূপ গভীরভাবে পড়াশুনা করেছিলেন, তা ইতিপূর্বে এই গ্রন্থে 'রেঙ্গুনে পড়াশুনা ও সাহিত্য-সাধনা' অধ্যায়ে আমি আলোচনা করেছি। শরৎচন্দ্রের সেই রেঙ্গুন-জীবনের বহু বৎসর পরে তাঁর সঙ্গে দিলীপকুমার রায়ের পরিচয় হয়েছিল।

প্রবোধবাবু লিখেছিলেন—'শরৎচন্দ্রের লেখা অযথা অবান্তর কথায় ফেনানো', কিন্তু শরৎচন্দ্রের রচনা যে অবান্তর ফেনানো নয়, এ সম্বন্ধেও এই গ্রন্থে 'সাহিত্যে খ্যাতি ও সম্মান' অধ্যায়ে আলোচনা করে দেখিয়েছি।

প্রবোধবাবু বলেছিলেন, শরৎচন্দ্র কিরণশঙ্কর রায়ের কাছে রাজনীতি শিখতেন।

এই গ্রন্থে 'কংগ্রেসে যোগদান' অধ্যায়ে আমি পরিষ্কারভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছি যে, শরৎচন্দ্র রাজনীতিতে যোগ দিয়ে দেশবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ীই কাজ করতেন। তবে অন্ধের মতন নয়, প্রয়োজন হলে দেশবন্ধুর মতেরও বিরোধিতা করতেন। আর দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর স্নেহভাজন সুভাষচন্দ্রের দলভুক্ত ছিলেন। কিরণশঙ্কর রায়ের কাছে রাজনীতি শিখতে তিনি কোন দিনই যান নি।

প্রবোধবাবু যে সময়ে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে ঐ কথা বলেছিলেন, তার ক'মাস আগে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ নিয়ে শরৎচন্দ্রের জীবনের একটা রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখ করছি। তাতে গান্ধীজীর পুণা চুক্তির জন্য কিরণশঙ্করবাবু কেন, দেশের অনেক কংগ্রেস নেতাই অনুপস্থিত ছিলেন। আর থাকলেও নেপথ্যে ছিলেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র ছিলেন পুরোভাগে। সে ঘটনাটি ছিল এই :—

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল থেকে ভারতে নতুন শাসনতন্ত্র চালু হওয়ার জন্য ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যে ভারত শাসন আইন পাস হয়, তাতে বাঙলা দেশের হিন্দুদের স্বার্থ ও সংস্কৃতি বিশেষরূপে বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।

তাই ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে মুসলমান-প্রধান বাঙলা দেশের শাসন ব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বাঙলার হিন্দু জনগণ এক দীর্ঘ আবেদন বা মেমোরিয়াল বিলাতে ভারত সচিবের কাছে পাঠিয়েছিলেন। ঐ আবেদনের প্রথমেই নাম ছিল রবীন্দ্রনাথের। এতে শরৎচন্দ্রেরও স্বাক্ষর ছিল। আবেদনে জানানো হয়েছিল—

(১) বাঙলা দেশে হিন্দুরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, অন্যান্য প্রদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার্থে যে সকল বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে, বাঙলার হিন্দুদের জন্যও সেই সকল ব্যবস্থা হোক।

(২) হিন্দুরা যৌথ বা সম্মিলিত নির্বাচনে বিশ্বাসী। পৃথক নির্বাচন প্রথা আত্মকর্তৃত্বশীল শাসনতন্ত্রের বিরোধী, গণতন্ত্র ও রাজনীতির ইতিহাসে পৃথক পৃথক নির্বাচন প্রথার নজির নাই।

(৩) যাঁরা আসন সংরক্ষণের পক্ষপাতী তাঁরা সংখ্যালঘুদের জন্যই তার সমর্থন করেন। যদি আসন সংরক্ষণ করিতেই হয়, তবে সংখ্যালঘু হিন্দুদের জন্যই করা উচিত, সংখ্যাগরিষ্ঠদের জন্য নয়।

(৪) হিন্দুদের দাবী সম্পর্কে যতদিন পর্যন্ত একটা সিদ্ধান্ত না হয়, ততদিন যেন বর্তমান ব্যবস্থাপক সভায় বাঙলার হিন্দুদের সদস্য সংখ্যার অনুপাতেই ভবিষ্যতে তাদের আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়, ইত্যাদি।

এই মেমোরিয়ালের উত্তরে বিলাতের ভারত সচিব ২৫, ৬, ৩৬, তারিখে ভারতে বড়লাটকে জানিয়ে দেন যে, ১৯৩৫ সালের যে অ্যাক্ট পাস হয়েছে, তার কিছুই পরিবর্তন হবে না।

ভারত সচিবের এই উত্তরের প্রত্যুত্তরের জন্য ঐ বছর ১৫ই জুলাই তারিখে কলকাতায় টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বাঙলার হিন্দু জনগণের এক বিশাল সভা হয়েছিল। ঐ সভায় শরৎচন্দ্র উদ্বোধক ছিলেন। সভার আগে শরৎচন্দ্র কয়েকজন সহ শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি ঠিক করে এসেছিলেন।

টাউন হলের সভায় শরৎচন্দ্র তাঁর ভাষণের প্রথমেই বলেছিলেন—'বাঙলার হিন্দু জনগণের আজকের এই সম্মিলনী যাঁরা আহ্বান করেছেন, আমি তাঁদের একজন।'

টাউন হলের সভার কয়েকদিন পরেই আবার এ সম্পর্কে কলকাতায়

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অভিনন্দন

একবার লক্ষ্ণৌ সাহিত্য-সম্মিলনে শরৎচন্দ্রের সভাপতি হয়ে যাওয়ার কথা হলে, তখন রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন—"এবারে যদি তোমার লক্ষ্ণৌ সাহিত্য-সম্মিলনে যাওয়া হয় তো অভিভাষণের বদলে একটা গল্প লিখে নিয়ে যেও।..."

শরৎচন্দ্র যে গল্প রচনায় সিদ্ধহস্ত, রবীন্দ্রনাথ একথা ভালভাবেই জানতেন। তাই তিনি শরৎচন্দ্রকে সভায় বক্তৃতা দেওয়া অপেক্ষা গল্প লিখে নিয়ে গিয়ে পড়তে বলেছিলেন। কারণ তাতে শ্রোতারা শরৎচন্দ্রের অভিভাষণ শোনার চেয়ে গল্প শুনে আনন্দ পেত বেশী।

শরৎচন্দ্র শুধু যে সুন্দর গল্প রচনাতেই সিদ্ধহস্ত এই নয়, তিনি যে একজন সত্যকার নারীদরদী লেখক, এ কথাও রবীন্দ্রনাথ বিশেষরূপেই জানতেন। তাই তিনি এই কথা নিয়েই 'সাধারণ মেয়ে' নামে একটি বিখ্যাত কবিতাও রচনা করেছিলেন। ঐ কবিতায় কবিতার নায়িকা মালতী, তাকে নিয়ে একটি গল্প লিখবার জন্য শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করছে। কবির সেই বিখ্যাত কবিতাটির প্রথমাংশের কিছুটা এইরূপ :—

"আমি অন্তঃপুরের মেয়ে
চিনবে না আমাকে।
তোমার শেষ গল্পের বইটি পড়েছি শরৎবাবু,
'বাসি ফুলের মালা'।
তোমার নায়িকা এলোকেশীর মরণদশা ধরেছিল
পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে।
পঁচিশ বছর বয়সের সঙ্গে ছিল তার রেশারেশি
দেখলেম, তুমি মহদাশয় বটে,
জিতিয়ে দিলে তাকে।

নিজের কথা বলি।
বয়স আমার অল্প।

একজনের মন ছুঁয়েছিল
আমার এই কাঁচা বয়সের মায়া।
তাই জেনে পুলক লাগত আমার দেহে—
ভুলে গিয়েছিলাম, অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে আমি—
আমার মতো এমন আছে হাজার হাজার মেয়ে
অল্প বয়সের মন্ত্র তাদের যৌবনে।

তোমাকে দোহাই দিই,
একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি।
বড়ো দুঃখ তার।
... .
পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি শরৎবাবু
নিতান্ত সাধারণ মেয়ের গল্প,
যে দুর্ভাগিনীকে দূরের থেকে পাল্লা দিতে হয়
অন্তত পাঁচ-সাতজন অসামান্যার সঙ্গে,
অর্থাৎ সপ্তরথিনীর মার।
বুঝে নিয়েছি, আমার কপাল ভেঙেছে,
হার হয়েছে আমার।
কিন্তু তুমি যার কথা লিখবে
তাকে জিতিয়ে দিয়ো আমার হয়ে—
পড়তে পড়তে বুক যেন ওঠে ফুলে।
ফুলচন্দন পড়ুক তোমার কলমের মুখে।"

শরৎচন্দ্রের 'বাসি ফুলের মালা' নামে যদিও কোন বই নেই, তবুও এই কবিতার 'শরৎবাবু' যে আমাদের 'অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র' তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এই কবিতাটি লিখে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছেন।

এছাড়া রবীন্দ্রনাথ আরও একটি সভায় প্রকাশ্যভাবে প্রাণ খুলে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক শরৎচন্দ্রের সেই অভিনন্দনের ইতিহাসটি এই :—

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর তারিখে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে শরৎচন্দ্রকে এক পত্রে লিখেছিলেন—

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

আগামী রবিবার তোমার প্রৌঢ় বয়সের প্রারম্ভকে অভিনন্দিত করব বলে সঙ্কল্প করেছি। উক্ত দিনে আশুতোষ কলেজ হলে ভবানীপুরে একটি নাট্যগীতি অভিনয়ের আয়োজন করা গেছে, সেইখানেই তোমার সম্মাননার অভিপ্রায় আছে। আর কোথাও আর কোনো সময়ে সুযোগ করে উঠতে পারলুম না।

আমি কাল বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে কলকাতায় পৌঁছব। সেখানে যদি তোমার কাছ থেকে সম্মতি পাই, তাহলে কথাটা পাকা হোতে পারবে। ইতি—৭।১০।৩৬

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শরৎচন্দ্রের সম্মতিতে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত আশুতোষ কলেজ হলের শরৎ-সম্মাননার ঐ সভাটিই রবিবাসরের উদ্যোগে বেলেঘাটায় 'প্রফুল্ল-কাননে' অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

রবিবাসরের উদ্যোগে হওয়ার কারণ এই যে, ১১ই আশ্বিন (১৩৪৩) তারিখে 'রবিবাসর' দমদমে 'অলকা ভবনে' শরৎচন্দ্রকে যে সংবর্ধনা জানিয়েছিল, সেই সভায় সভাপতিত্ব করবার জন্য উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তখন পত্রে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। তিনি উপেনবাবুর চিঠি পেয়ে তাঁকে যা লিখেছিলেন, তা মোটামুটি ছিল এই—

আজ ৯ই আশ্বিন তোমার চিঠি পেলাম। পরশু ১১ই আশ্বিন তোমাদের অনুষ্ঠান। তাই আগে থেকে না জানানোয়, পরশু যাওয়া সম্ভব হবে না। তবে আগামী ২৫শে আশ্বিন যদি তোমাদের সভা হয়, আমি যেতে পারি।

রবিবাসরের ১১ই আশ্বিন তারিখের আয়োজিত শরৎ-সংবর্ধনা সভা যথারীতি হয়েছিল। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের ২৫শে তারিখে আসার সম্মতি পেয়ে, রবিবাসর ঐ তারিখেও শরৎ-সংবর্ধনায় উদ্যোগী হয়েছিল। রবিবাসরের অন্যতম সদস্য উদয়ন-সম্পাদক অনিলকুমার দে সাহিত্যবন্ধুর বেলেঘাটার

বাগানবাড়ীতে ঐ সংবর্ধনা সভা হয়েছিল। সেখানে কবি যে অভিনন্দন বাণীটি পাঠ করেছিলেন, তা এই :—

কল্যাণীয় শরৎচন্দ্র,

তুমি জীবনের নির্দিষ্ট পথের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উত্তীর্ণ হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে তোমাকে অভিনন্দিত করবার জন্য তোমার বন্ধুবর্গের এই আমন্ত্রণ সভা।

বয়স বাড়ে, আয়ুর সঞ্চয় ক্ষয় হয়, তা নিয়ে আনন্দ করবার কারণ নেই। আনন্দ করি যখন দেখি জীবনের পরিণতির সঙ্গে জীবনের দানের পরিমাণ ক্ষয় হয়নি। তোমার সাহিত্য-রসসত্রের নিমন্ত্রণ আজও রয়েছে উন্মুক্ত, অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ভরে উঠবে তোমার পরিবেশন পাত্র, তাই জয়ধ্বনি করতে এসেছে, তোমার দেশের লোক তোমার দ্বারে।

সাহিত্যের দান যারা গ্রহণ করতে আসে তারা নির্মম। তারা কাল যা পেয়েছে, তার মূল্য প্রভূত হলেও আজকের মুঠোয় কিছু কম পড়লেই ভ্রূকুটি করতে কুণ্ঠিত হয় না। পূর্বে যা ভোগ করেছে, তার কৃতজ্ঞতার দেয় থেকে দাম কেটে নেয়, আজ যেটুকু কম পড়েছে তার হিসাব করে। তারা লোভী, তাই ভুলে যায় রস-তৃপ্তির প্রমাণ ভরা পেট দিয়ে নয়, আনন্দিত রসনা দিয়ে। নতুন মাল বোঝাই দিয়ে নয়, সুখস্বাদের চিরন্তনত্ব দিয়ে, তারা মানতে চায় না রসের ভোজে স্বল্প যা তাও বেশী, এক যা তাও অনেক।

এটা জানা কথা যে, পাঠকের চোখের সামনে সর্বদা নিজেকে জানান্ না দিলে, পুরোনো ফটোগ্রাফের মত জানার রেখা হলদে হয়ে মিলিয়ে আসে। অবকাশের ছেদটা একটু লম্বা হলেই লোকে সন্দেহ করে যেটা পেয়েছিল সেটাই ফাঁকি, যেটা পায়নি সেটাই খাঁটি সত্য। একবার আলো জ্বলেছিল, তারপর তেল ফুরিয়েছে, অনেক লেখকের পক্ষে এইটেই সবচেয়ে বড়ো ট্রাজেডি। কেননা, আলো জ্বলাটাকে মানুষ অশ্রদ্ধা করতে থাকে তেল ফুরোনোর নালিশ নিয়ে।

তাই বলি, মানুষের মাঝ বয়স যখন পেরিয়ে গেছে, তখনো যারা তার অভিনন্দন করে, তারা কেবল অতীতের প্রাপ্তি স্বীকার করে না, তারা অনাগতের পরেও প্রত্যাশা জানায়। তারা শরতের আউস ধান ঘরে বোঝাই করেও সেই সঙ্গে হেমন্তের আমন ধানের 'পরেও আগাম দাবী রাখে। খুশি হয়ে বলে, মানুষটা এক-ফস্‌লা নয়।

আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনের মূল্য এই যে, দেশের লোক কেবল যে তাঁর দানের মনোহারিতা ভোগ করেছে তা নয়, তার অক্ষয়তাও মেনে নিয়েছে। ইতস্তত যদি কিছু প্রতিবাদ থাকে তো ভালই, না থাকলেই ভাববার কারণ। এই সহজ কথাটা লেখকেরা অনেক সময়ে মনের খেদে ভুলে যায়। ভালো লাগতে স্বভাবতই ভালো লাগে না, এমন লোককে সৃষ্টিকর্তা যে সৃজন করছেন। সেলাম করে তাদেরও তো মেনে নিতে হবে—তাদের সংখ্যাও তো কম নয়। তাদের কাজও আছে নিশ্চয়ই। কেননা রচনার উপরে তাদের খর কটাক্ষ যদি না পড়ে, তবে সেটাকে ভাগ্যের অনাদর বলেই ধরে নিতে হবে। নিন্দায় কুগ্রহ যাকে পাশ কাটিয়ে যায়, জানব তার প্রশংসার দাম বেশী নয়। আমাদের দেশে যমের দৃষ্টি এড়াবার জন্য বাপ মা ছেলের নাম রাখে এককড়ি, দুকড়ি। সাহিত্যেও এককড়ি, দুকড়ি যারা, তারা নিরাপদ। যে লেখায় প্রাণ আছে, প্রতিপক্ষতার দ্বারা তার যশের মূল্য বাড়িয়ে তোলে তার বাস্তবতার মূল্য। এই বিরোধের কাজটা যাদের তারা বিপরীত পন্থার ভক্ত। রামের ভয়ঙ্কর ভক্ত যেমন রাবণ।

জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মিসমবায়ে গড়া, নানা কক্ষপথে নানা বেগে আবর্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয়-রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন, বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরান আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশি হয়েছে, এমন আর কারো লেখায় তারা হয় নি। অন্য লেখকেরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায়নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন, তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।

আজ শরতের অভিনন্দনে বিশেষ গর্ব অনুভব করতে পারতুম, যদি তাঁকে বলতে পারতুম, তিনি একান্ত আমারি আবিষ্কার। কিন্তু তিনি কারো স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞান পত্রের জন্যে অপেক্ষা করেন নি। আজ তাঁর অভিনন্দন বাংলা দেশের ঘরে ঘরে স্বতঃ উচ্ছ্বসিত। শুধু কথাসাহিত্যের পথে নয় নাট্যাভিনয়ে, চিত্রাভিনয়ে তাঁর প্রতিভার সংস্রবে আসবার জন্যে বাঙালীর ঔৎসুক্য বেড়ে চলেছে। তিনি বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র

সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে। চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয়, কল্পনাশক্তির পূর্ণ দৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্যদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই স্রষ্টা সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি। তিনি শতায়ু হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করুন,—তাঁর পাঠকের দৃষ্টিকে শিক্ষা দিন মানুষকে সত্য করে দেখতে, স্পষ্ট করে মানুষকে প্রকাশ করুন তার দোষে গুণে, ভালোয় মন্দয়,—চমৎকারজনক শিক্ষাজনক কোনো দৃষ্টান্তকে নয়, মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত করুন তাঁর স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায়। ২৫শে আশ্বিন, ১৩৪৩।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শরৎচন্দ্র অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাঁর 'ষোড়শী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ গান লিখে দেন নি, এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁর 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত করলে তার প্রতিবাদ করেন নি—এই দুটি কারণে রবীন্দ্রনাথের উপর শরৎচন্দ্রের একটা ক্ষোভ ছিল। এমন কি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কালের যাত্রা' নাটিকাটি শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করলে, কবির এই দানকে অতি ক্ষুদ্র দান বলেও তিনি মনে করেছিলেন।

কিন্তু সেদিন অভিনন্দন সভায় কবির আন্তরিক অভিনন্দনবাণী শুনে শরৎচন্দ্রের মনে কবির উপর যে সামান্য ক্ষোভ ছিল, তা ধুয়ে মুছে গিয়েছিল, এবং তিনি যারপর নাই আনন্দিত হয়েছিলেন।

এ সম্বন্ধে কবিশেখর কালিদাস রায় একদিন আমাকে বলেছিলেন—"বেলেঘাটায় শরৎদার সংবর্ধনা সভার পর শরৎদা আমার বাড়ীতে এসে অত্যন্ত আনন্দসহকারে আমাকে বলেছিলেন, কালিদাস, কবির উপর কোন ক্ষোভই আমার আর নেই। আজ সত্যই আমি ধন্য!"

রোগাক্রান্ত ও মৃত্যু

শরৎচন্দ্রের জীবনের শেষ ক'বছর শরীর আদৌ ভাল যাচ্ছিল না। অর্শের পীড়া তো তাঁর অনেকদিনের ছিলই, তার উপর লিভার ও কীড্‌নির দোষ, জ্বর, বাত, ফোস্‌া রোগ, উদরাময়, মাথার যন্ত্রণা প্রভৃতি একটা না একটা লেগেই ছিল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকটায় তিনি কিছুদিন জ্বরে ভুগলেন। জ্বর ছাড়লে ডাক্তাররা তাঁকে বায়ু পরিবর্তনের উপদেশ দিলেন।

শরৎচন্দ্র নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডাক্তারদের উপদেশ এবং বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধেই এবার দেওঘরে বেড়াতে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁর বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায়দের "মালঞ্চ" নামক বাড়ীতে কয়েক মাস থেকে এলেন। সেখানে তিনি দেওঘর-নিবাসী তাঁর অন্যতম মাতুল ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (ইনি সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) চিকিৎসাধীনে ছিলেন।

দেওঘর থেকে এসে কিছুদিন সুস্থ থাকার পর, শরৎচন্দ্র সেপ্টেম্বর মাসে আবার অসুখে পড়লেন। এবার তাঁর পাকাশয়ের পীড়া দেখা দিল এবং দেখতে দেখতে রোগ ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। যা খান আদৌ হজম হয় না। তার উপর পেটেও যন্ত্রণা দেখা দিল।

শরৎচন্দ্র এই সময় সামতাবেড়ে তাঁর গ্রামের বাড়ীতে থাকতেন। চিকিৎসা করাবার জন্য তিনি তাঁর কলকাতার বাড়ীতে এলেন। শরৎচন্দ্র তাঁর এই শারীরিক অসুস্থতার সময় বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখে-ছিলেন—"......আমি ভাল নই। এ দেহটা সত্যিই ভাঙলো—একটা না একটা লেগে আছেই। কতদিন যে এইভাবে কাটবে, তার মনে মনে হিসেব করি। আশা আছে দীর্ঘদিন নয়। বৈরাগীর জীবন যত শীঘ্রই যায়, ততই মঙ্গল।"

কলকাতায় এলে ডাক্তাররা এক্স-রে করে দেখলেন যে, শরৎচন্দ্রের যকৃতে ক্যানসার তো হয়েইছে, অধিকন্তু এই ব্যাধি তাঁর পাকস্থলীকেও আক্রমণ করেছে।

এই সময় শরৎচন্দ্র উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা (উমাপ্রসাদবাবু কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট ছিলেন) একটি উইল করেন। তিনি উইলে তাঁর যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকে জীবনসত্বে দান করেন। হিরণ্ময়ী দেবীর মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্রের একমাত্র পুত্র অমলকুমার চট্টোপাধ্যায় সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হবেন, উইলে এ কথাও লেখা হয়।

কলকাতার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় প্রভৃতি শরৎচন্দ্রকে দেখে স্থির করলেন যে, শরৎচন্দ্রের পেটে অস্ত্রোপচার ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

এই সময় ডাঃ ম্যাকে সাহেবের সুপারিশে শরৎচন্দ্রের চিকিৎসার জন্য তাঁকে বাড়ী থেকে দক্ষিণ কলকাতার হাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীটের একটি ইউরোপীয় নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

এখানে শরৎচন্দ্রকে তাঁর নেশার জিনিস আফিং ও সিগারেট খেতে না দেওয়ায় তিনি কষ্ট বোধ করতে লাগলেন। (শরৎচন্দ্র আগে দু একবার আফিং ছাড়বার চেষ্টা করলেও তিনি তাঁর জীবনের শেষ সময় পর্যন্তই এই নেশা ছাড়তে পারেন নি।)

এই নার্সিং হোমে সকালে ও বিকালে দেখা করবার নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সময় কাকেও শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে দিত না। তাছাড়া ইউরোপীয় নার্সরা এদেশীয় লোক বলে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে নাকি ভাল ব্যবহার করতেন না। এই সব কারণে শরৎচন্দ্র পরদিনই সেখান থেকে চলে এসে তাঁর দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় ডাঃ সুশীল চ্যাটার্জীর ৪নং ভিক্টোরিয়া টেরাসে অবস্থিত 'পার্ক নার্সিং হোমে' ভর্তি হলেন।

শরৎচন্দ্রের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সংবাদ শুনে রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁকে এক পত্রে লিখেছিলেন—

কল্যাণীয়েষু,

শরৎ, রুগ্ন দেহ নিয়ে তোমাকে হাসপাতালের আশ্রয় নিতে হয়েছে শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলুম। তোমার আরোগ্য লাভের প্রত্যাশায় বাংলা দেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকবে। ইতি ১৩।১২।৩৭

নার্সিং হোমে এসে শরৎচন্দ্রের অবস্থা ক্রমে খারাপের দিকেই যেতে

লাগল। শেষে অবস্থা এমন হ'ল যে কণ্ঠনলীর মধ্য দিয়ে কোনও খাদ্যবস্তু গ্রহণ করাও তাঁর পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ল। কিছু পেটে গেলেই উঠে আসতে লাগল।

এই সময় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় একদিন পার্ক নার্সিং হোমে গিয়ে শরৎচন্দ্রকে দেখে বললেন—শরৎবাবুর অপারেশন না হলে, পরন্ত মারা যাবেন। অপারেশন করা চাই।

অপারেশনের আগে শরৎচন্দ্র, অপারেশনের সমস্ত দায়িত্ব নিজের উপর নিয়ে ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়কে তাঁর উপ্পর অপারেশন করতে লিখে দিলেন।

কুমুদবাবু অপারেশন করতে সাহস না পেয়ে তিনি সেই সময়কার বিখ্যাত সার্জন ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপারেশন করবার জন্য আহ্বান করলেন।

ললিতবাবু অপারেশন করতে হাজার টাকা চেয়েছিলেন। বিধানবাবু বলে দিলে তিনি চার শ টাকা নিয়ে শরৎচন্দ্রের পেটে অপারেশন করলেন।

অপারেশন করলে দেখা গেল যে, শরৎচন্দ্রের যকৃতটা একেবারে পচে গেছে। সাময়িকভাবে কাজ চালাবার জন্য একটা রবারের নল বসিয়ে দিয়ে, তার সাহায্যে কমলা নেবুর রস, গ্লুকোজ প্রভৃতি তরল খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল।

এই সময় শরৎচন্দ্রের শরীরে রক্তের অভাব হওয়ায়, তাঁর ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্র দাদার শরীরে নিজের রক্ত দিলেন। এই সবের ফলে শরৎচন্দ্রের অবস্থা একটু ভালর দিকে এল। তখন ডাঃ ললিতবাবু শরৎচন্দ্রের আত্মীয়-স্বজনদের বললেন, এবার শরৎবাবুকে বাড়ী নিয়ে যেতে পারেন। বাড়ীতে রেখে চিকিৎসা করালেও চলবে। অহেতুক নার্সিং হোমে রেখে টাকা খরচের প্রয়োজন নেই।

অস্ত্রোপচারের পর এইভাবে যখন শরৎচন্দ্রের জীবনের কিছুটা আশা দেখা গেল, তখন তিনি নিষেধসত্ত্বেও এমন একটা কাণ্ড করলেন, যাতে করে তিনি নিজেই নিজের জীবন দীপ নির্বাপিত করলেন। এ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের এই অসুখের সময়কার পরিচর্যাকারী তাঁর মাতুল ও বাল্যবন্ধু সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎ পরিচয়' গ্রন্থে যা লিখেছেন, এখানে তা উদ্ধৃত করছি :—

"ললিতবাবু বললেন—বৃথা নার্সিং হোমে রেখে টাকা খরচের প্রয়োজন কি? বাড়ী নিয়ে যান। অস্ত্রের পর ললিতবাবু আর ফি নেন নি।

বাড়ীতে তাঁকে নীচের হল ঘরে রাখার ব্যবস্থা হ'ল। ললিতবাবু রাত নটা দশটার সময় এসে দেখে বললেন—কাল ভোর ছটার সময় অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এসে আমি বাড়ী পৌঁছে দেবো।

সব ঠিক হল, সন্ধ্যের কিছু আগে আমি বাড়ীতে খেতে যাবার সময় শরৎকে বললাম—কাল সকালে তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাব। একটি কথা মনে রেখো; মুখ দিয়ে কিছু খাবে না।

শরৎ বললেন—দেখ, তুমি আমাকে খুব চেন। কারণ না বললে আমি কোন আদেশ উপদেশ মানি না, বুঝিয়ে দাও কেন খাব না।

—মুখ দিয়ে খেলে তোমাব নিশ্চয় বমি হবে। যদি বমি হয় তো পেটের সব বাঁধন কেটে গেলে আর রক্ষা করা যাবে না, এতো অতি সহজ কথা।…

শরৎ আদর করে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন—এবার তুমি আমাকে খাইয়ে দিয়ে যাও।

খাওয়ান মানে টিউবে করে—আঙুরের রস খাইয়ে দিয়ে বললুম—খেতে যাচ্ছি। নটা দশটা নাগাদ ফিরব।

শরৎ বললেন—কেন কষ্ট করে আসবে?

—বাঃ সকালে ললিতবাবু এসে তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাবেন, ঠিক হয়ে গেছে। আজ তোমার খাট, বিছানা বাইরের ঘরে আনা হয়েছে। এখানে থেকে মিছে খরচপত্র হচ্ছে। তুমি একটু সারলে তোমাকে কুমুদবাবু ইউরোপে নিয়ে গিয়ে উচিত ব্যবস্থা করে ফিরিয়ে আনবেন।

বাড়ী এলাম। বড়মাকে বললাম—তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে আজ। কাল সকালে শরৎকে বাড়ী আনতে হবে।

খেতে বসলে ছোটমা (প্রকাশচন্দ্রের স্ত্রী) এসে বসে বললেন—তাঁকে সঙ্গে আনলেন না কেন?

—আসার সময় তাঁকে দেখতে পাইনি। আমি হেঁটে এসেছি। এক্ষুনি খেয়েই ফিরব।

এমন সময় প্রকাশ এসে বললেন—দাদা বলে দিলেন, আপনি সকালে যাবেন। আমি গাড়ী ছেড়ে দিলাম।

—বেশ, আমি হেঁটেই যাব।

—কি দরকার? প্রকাশ বললেন।

উত্তরে বললাম—শেষ রক্ষা দরকার, হেঁটেই যাব।

হেঁটে যাবার সময় দুই বৌ আমার যাওয়ায় বাধা দিতে লাগলেন।

খোকা মানুষ তো—তাঁদের তুষ্ট করলাম।

তখন রাত দুটো হবে। ফোন বেজে উঠল।

—কে?

—রয়টার।

ইংরাজীতে প্রশ্ন হল—ডাঃ চ্যাটার্জি কেমন?

—ভালই।

—কোথা থেকে বলছ?

—বাড়ী থেকে।

ফোন স্তব্ধ হল।

বড়মা দৌড়ে এলেন।—কি মামা?

—কিছু না। কাগজওয়ালারা জানতে চাচ্ছে।

শুনে মনে হ'ল, কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। রয়টার জানতে চায় কেন?

নার্সিং হোমে ফোন করতেই জবাব এল—ডাঃ চ্যাটার্জি বমি করছেন।

সর্বনাশ!

উঠে পড়লাম। ছুটে পায়খানায় যাচ্ছি, বড়মা বেরিয়ে বললেন—কি হয়েছে মামা?

—আমাকে যেতে হবে।

—চা করে দিই।—বলে স্টোভ জ্বাললেন।

চা খেয়ে, তখনও বেশ অন্ধকার। ছুট দিলাম।

পৌঁছে দেখি শরৎচন্দ্র বমি করছেন এবং মৃত্যুঞ্জয় (মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় নামে শরৎচন্দ্রের স্নেহভাজন এক ব্যক্তি) পাশে দাঁড়িয়ে। ঘরে ঢুকতেই তিনি অদৃশ্য হলেন।

—একি শরৎ?

—আমি মুখ দিয়ে আফিং-এর জল খেয়ে—

চারিদিকে অন্ধকার দেখলাম।

ডাঃ সুশীলকে ডাকতে তিনি এলেন।

তিনি ফোন করলেন কুমুদবাবুকে। তিনি এলেন।

বমির পর বমি।

অবশেষে শরৎচন্দ্রের জ্ঞান লোপ হ'ল। আমাদের সকল প্রচেষ্টার শেষ হ'ল।

ললিতববাবু এলেন।

ফিরে গেলেন।

এইখানেই শরৎচন্দ্রের জীবনের বিয়োগান্ত নাটকের শেষ।"

শরৎচন্দ্র ভোরের দিকে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। সকাল থেকেই তাঁকে অক্সিজেন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। ডাক্তারেরা অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না।

এই দিনটা ছিল রবিবার, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী (বাঙ্গলা ১৩৪৪ সালের ২রা মাঘ)। এই দিনই বেলা দশটার সময় শ.ৎচন্দ্র সকলের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

এইভাবে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে ৬১ বৎসর ৪ মাস বয়সে কলকাতার পার্ক নার্সিং হোমে বাঙ্গলার অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েব জীবনাবসান হয়।

শবৎচন্দ্রের মৃত্যুর ৭ মিনিট পরে পার্ক নার্সিং হোম থেকে টেলিফোনযোগে তাঁর মৃত্যু সংবাদ সংবাদপত্রের অফিসে, রেডিও অফিসে ও অন্যান্য স্থানে জানিয়ে দেওয়া হয়। রেডিও অফিস এই সংবাদ পেয়ে তখনই রেডিওর সাহায্যে ভারতের সর্বত্র এবং পৃথিবীর সর্বত্র এই দুঃসংবাদ প্রচার করে।

কলকাতার সংবাদপত্র অফিসে শরৎচন্দ্রেব মৃত্যু সংবাদ পৌঁছবার দু ঘণ্টার মধ্যেই কলকাতাব কয়েকটি ইংরাজী ও বাঙ্গলা দৈনিক 'বিশেষ শবৎ-সংখ্যা' বার করল।

এদিকে শরৎচন্দ্রের মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি তাঁর যে ক'জন বন্ধু উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা ইতিমধ্যে শরৎচন্দ্রের মৃতদেহ গাড়ীতে করে বালীগঞ্জে তাঁর ২৪ নং অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়ীতে নিয়ে এলেন। মৃতদেহ এনে বাড়ীতে রাস্তার দিকে সামনের দালানে একটি পালঙ্কের উপর শুভ্র শয্যায় শুইয়ে রাখলেন।

দেখতে দেখতে চারিদিক থেকে অগণিত লোক এসে মৃত শরৎচন্দ্রের প্রতি তাঁদের শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে যেতে লাগলেন। এঁদের অনেকে নিজ নিজ পক্ষ থেকে, আবার অনেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও শবাধারে পুষ্পমাল্য দিয়ে গেলেন।

বেলা ৩-১৫ মিনিটের সময় অসংখ্য পুষ্পমাল্য ও পুষ্পস্তবকে শোভিত শবাধার নিয়ে শোকযাত্রা বেরোয়। এই শোকযাত্রা পরিচালনা করবার ভার নিয়েছিল, দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটি। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি ও শরৎচন্দ্রের জয়ধ্বনি করতে করতে হাজার হাজার নরনারী শবাধারের আগে পিছে চলেছিল। শোকযাত্রা অশ্বিনী দত্ত রোড, মনোহরপুকুর রোড, ল্যান্সডাউন রোড, এলগিন রোড ও আশুতোষ মুখার্জী রোড হয়ে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ দিয়ে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে গিয়ে পৌঁছেছিল। এলগিন রোডে সুভাষচন্দ্র বসুর বাড়ীর সামনে এবং আশুতোষ মুখার্জী রোডে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর সামনে শবাধার থামিয়ে এই দুই বাড়ীর পক্ষ থেকে শবাধারে মাল্যদান করা হয়েছিল।

কেওড়াতলা মহাশ্মশানে ৫-১৫ মিনিটের সময় শরৎচন্দ্রের চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল। মুখাগ্নি করেছিলেন শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠভ্রাতা প্রকাশচন্দ্র।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সাহিত্যিক শেষশ্রদ্ধা জানাবার জন্য শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে অথবা শ্মশানে গিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন—কলকাতার তৎকালীন মেয়র সনৎকুমার রায়চৌধুরী, অনারেবল সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, শরৎচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর রায়, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, জ্যোতির্ময়ী দেবী, জে. সি. গুপ্ত, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, মিঃ কে. আমেদ, মিঃ ও মিসেস মুকুল দে, রায় বাহাদুর জলধর সেন, যতীন্দ্রমোহন বাগচি, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল প্রভৃতি।

শোকাঞ্জলি ও শোকসভা

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে তখন যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি ও দেশবাসীর প্রতি শোকবাণী প্রেরণ করেছিলেন, এখানে সেই সব শোকবাণীর কয়েকটি উদ্ধৃত করছি :—

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর দিনেই ১৬ই জানুয়ারী তারিখে শান্তিনিকেতনে ইউনাইটেড প্রেসের জনৈক প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ শোনালে, কবি এই সংবাদ শুনে অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। তারপর তিনি ইউনাইটেড প্রেসের ঐ প্রতিনিধির নিকট বলেন—

যিনি বাঙ্গালীর জীবনের আনন্দ ও বেদনাকে একান্ত সহানুভূতির দ্বারা চিত্রিত করেছেন, আধুনিক কালের সেই প্রিয়তম লেখকের মহাপ্রয়াণে দেশবাসীর সঙ্গে আমি গভীর মর্মবেদনা অনুভব করছি।

ইউনাইটেড প্রেসের ঐ প্রতিনিধি কবির এই কথাগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দিলে, পরদিন ১৭ই জানুয়ারী তারিখের সংবাদপত্রে কবির ঐ শোকবার্তাটি প্রকাশিত হয়।

এর কয়েকদিন পরে ১২ই মাঘ তারিখে কবি আবার শরৎচন্দ্রের মৃত্যু সম্পর্কে এই কবিতাটি লিখেছিলেন—

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার ১৩৪৪ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র দু সংখ্যাই পর পর শরৎ-সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই দু সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে রচনা সংগ্রহ করার এবং ঐ সংগৃহীত রচনাগুলি সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন প্রবোধকুমার সান্যাল।

প্রবোধবাবু ঐ সময় ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে

কিছু লিখতে অনুরোধ করলে, কবি প্রবোধবাবুকে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন, তার কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করছি—

"...আমার কাছ থেকে শরতের যে প্রশস্তি পাওনা ছিল, নিতান্ত অবিবেচকের মতো শরতের মৃত্যুর পূর্বেই তা অকৃপণ লেখনীতেই সেরে রেখেছি। আমার মৃত্যুর পরে শরৎ এই কথাটি সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবেন, বোধ করি এই লুব্ধ আশা মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। আমার ভাগ্যে উল্‌টোটাই ঘটে, তাই আমার জীবিতকালে অকারণে অসহিষ্ণু হয়ে আমার প্রতি শরৎ অবিচারই করেছেন—যদি ঠিক সময় মতো মরতে পারতুম, তাহলে নিঃসন্দেহই যথোচিতভাবে সেই গ্লানিটা মার্জনা করে যেতেন।...

...আধুনিকের সঙ্গে তাঁর যেমন নৈকট্য ঘটেছে, তাঁর পূর্ববর্তীদের আর কারো তেমন ঘটে নি। তিনি সম্পূর্ণভাবেই নিজের দেশের এবং কালের।...

বলা-কওয়া নেই, শরৎ হঠাৎ এসে পৌঁছলেন বাংলা সাহিত্যমণ্ডলীতে। অপরিচয় থেকে পরিচয়ে উত্তীর্ণ হোতে দেরি হোলো না। চেনা শোনা হবার পূর্ব থেকেই তিনি চেনা মানুষ হয়ে এসেছেন। দ্বারী তাঁকে আটক করে নি।...

সেই সময়টাতে কর্মের টানে এবং বয়সের ভেদে আমি দূরে পড়ে গেছি। ছেড়েই দিয়েছি কলকাতায় বাস।...এই সময়েই শরতের অভ্যুদয়। শান্তির জন্যে যে নিভৃত কোণ আশ্রয় ক'রে আপন কর্মের বেষ্টনে গা-ঢাকা দিয়ে ছিলুম, সেখান থেকে শরতের সঙ্গে কাছাকাছি মেলবার কোনো সুযোগ হোলো না।

কোনো কোনো মানুষ আছে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের চেয়ে পরোক্ষ পরিচয়েই যারা বেশি সুগম। শুনেছি শরৎ সে জগতের লোক ছিলেন না, তাঁর কাছে গেলে তাঁকে কাছেই পাওয়া যেত। তাই আমার ক্ষতি রয়ে গেল। তবু তাঁর সঙ্গে আমার দেখা শোনা কথাবার্তা হয় নি যে তা নয়, কিন্তু পরিচয় ঘটতে পারল না। শুধু দেখাশোনা নয়, যদি চেনাশোনা হোত তবে ভাল হোত। সমসাময়িকতার সুযোগটা সার্থক হোত। হয়নি, কিন্তু সেই সময়টাতেই বিস্মিত আনন্দে দূরের থেকে আমি পড়ে নিয়েছি তাঁর বিন্দুর ছেলে, বিরাজ বৌ, রামের সুমতি, বড়দিদি। মনে হয়েছে কাছের মানুষ পাওয়া গেল। মানুষকে ভালবাসার পক্ষে এই যথেষ্ট।"

বাঙলার তৎকালীন গবর্ণর লর্ড ব্রেবোর্ণ-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী শরৎচন্দ্রের মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে জানিয়েছিলেন—

বরেণ্য সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে মাননীয় গবর্ণর লর্ড ব্রেবোর্ণ মর্মাহত হয়েছেন। তাঁর মৃতুতে দেশের ও সাহিত্যের সমূহ ক্ষতি হ'ল। গবর্ণর বাহাদুরের নির্দেশে আমি আপনাকে এই বার্তা জানালাম।

সুভাষচন্দ্র বসু (পরে নেতাজী) বলেছিলেন—

করাচীতে অবতরণ করবামাত্রই আমি ভারতবর্ষের উপন্যাস সম্রাট শরৎচন্দ্রের স্বর্গারোহণের শোক সংবাদ পেলাম।···কেবলমাত্র অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে হারিয়েই যে আমরা শোকাভিভূত হয়েছি তা নয়, শোক প্রকাশের অপর কারণ—তিনি ছিলেন কংগ্রেসের একটি শক্তি স্তম্ভ।···তাঁর সঙ্গে আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। আমার বেদনা আজ অতি গভীর।

সুভাষচন্দ্র পরে আরো বলেছিলেন—

একাধারে শরৎচন্দ্র ছিলেন একজন আদর্শ লেখক, আদর্শ দেশপ্রেমিক ও আদর্শ মানব।

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখেছিলেন—

বঙ্গ-সাহিত্য তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে হারাল। আধুনিক লেখকগণের মধ্যে তাঁর পাঠকমহল ছিল সকলের অপেক্ষা বিস্তৃত। কংগ্রেসের ব্যাপারে তিনি অংশ গ্রহণ করতেন এবং তাঁর মৃত্যুতে বাঙ্গলার কংগ্রেস একজন প্রধান সমর্থনকারীকেও হারাল। বাঙ্গলার সাহিত্যিকগণের এবং তাঁর পরিবারবর্গের এই শোকে আমরা সকলেই শোকার্ত।

মিঃ সি, এফ, এণ্ড্রুজ লিখেছিলেন —

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো একজন মহিমাময় সাহিত্যিকের মৃত্যুতে সমগ্র বাঙ্গলার যে বেদনা ফুটে উঠেছে, আমার সমবেদনা তার সহিত যুক্ত করলাম। সমগ্র ভারতবর্ষ বাঙ্গলার দুঃখে দুঃখিত।

মাদ্রাজের মন্ত্রী শ্রীবি, গোপাল রেড্ডী বলেছিলেন—

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে শুধু বাঙ্গলা দেশের বিরাট ক্ষতি হয় নি। সাহিত্য জগতেরও ক্ষতি হয়েছে। শরৎচন্দ্র বাঙ্গলার তথা ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঔপন্যাসিক।···

শরৎচন্দ্র বসু বলেছিলেন—

বাঙলা মায়ের নয়নের মণি হারিয়ে গেল। তিনি ছিলেন উদার, কোমল হৃদয় ও আবেগময়, তাঁর হৃদয়ে ছিল সর্বপ্রকার অত্যাচারের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা।...

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন—

যতদিন বাঙলা ভাষা বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন বাঙালীর সুখ দুঃখের সাথী শরৎচন্দ্রকে কেহ ভুলিবে না। সাহিত্য জগতে শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয় কল্পকথার মতই বিস্ময়কর। বিশ বৎসর পূর্বে বাঙালী তাঁহার পরিচয় জানিত না। অতি সহসা কিন্তু সহজভাবেই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও অপরাজেয় কথাশিল্পীরূপে বাঙালীর হৃদয় অধিকার করিলেন।...মানুষ হিসাবে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যে আসিয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে ও চিরদিনের মত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে।...

বাঙলা সরকারের তৎকালীন অর্থসচিব নলিনীরঞ্জন সরকার বলেছিলেন—

শরৎচন্দ্রের তিরোধানে আজ বাঙলা দেশ শোকে মুহ্যমান।...একবার জেনেভায় লীগ অব্ নেশন কার্যালয়ে জনৈক বাঙালী বন্ধুর নিকট আমি দুঃখের সহিত বলেছিলাম যে, এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া পাশ্চাত্ত্য দেশে আর কোন বাঙালীর নাম শুনা যায় না। এই কথায় নিকটে উপবিষ্টা এক বিদেশিনী মহিলা এগিয়ে এসে বললেন—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে একজন বাঙালী লেখকও তো পাশ্চাত্ত্য দেশের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। তাঁর দু-একখানা বই নাটকরূপে রূপান্তরিত হয়ে ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং বিদেশীয় রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছে।—বলা বাহুল্য সুদূর পাশ্চাত্ত্য দেশে এই সংবাদে আমি বাঙালী হিসাবে গর্ববোধ করেছিলাম। এইরূপ বাঙালীর মহাপ্রয়াণে আজ বাঙালী জাতি যে শোকে মুহ্যমান হবে, তাতে আর বিচিত্র কি!

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর কিছুদিন ধরে শুধু বাঙলা দেশের সর্বত্রই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানেও শোকসভা প্রতিপালিত হয়। তাঁর মৃত্যুর তিনদিন পরে কলকাতা কর্পোরেশনের সভায় শোক প্রকাশ করে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানানো হয়েছিল। ২৪শে জানুয়ারী (১৯৩৮)

তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (আপার হাউস) শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনে শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে শুধু দেশের স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহই নয়, নানা ধরণের অসংখ্য প্রতিষ্ঠানও শোক প্রকাশ করেছিল। যেমন—

বহরমপুর বন্দীনিবাস, হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্স, কলকাতার ইভ্‌নিং রিক্রিয়েশন ক্লাব, রেন্‌বো ক্লাব, সলিসিটর সমিতি, বাঁকুড়া প্রচার সমিতি, ঢাকা বার এসোসিয়েশন, নোয়াখালি ক্রিমিন্যাল বার এসোসিয়েশন, শ্রীহট্ট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, মেদিনীপুর সম্মিলনী, মেদিনীপুর জেলা বৈদ্য প্রতিনিধি মণ্ডল, মোটর ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, ইস্টার্ন হ্যারিকেন কোম্পানী, ন্যাশনাল রেডিও, ব্রতচারী ক্যাম্প, দক্ষিণ কলিকাতা সার্বজনীন পূজা পরিষদ, টালিগঞ্জ হোপলেস ক্লাব, পশ্চিম মাদারীপুর সংস্কার সংঘ, শান্তিপুরের নিখিল ভারত জ্যোতিষ পরিষদ, রংপুরের মুসলিম ইউথস প্রোগ্রেসিভ পার্টি, সোনামুখী টাউন ক্লাব ও সোনামুখী মিউনিসিপ্যালিটি, বেঙ্গল বাস সিণ্ডিকেট, খিদিরপুর দুর্গাদাস ব্যায়াম সমিতি, পাটনা প্রভাতী সংঘ, ফিল্ম কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি।

এই সময় কলকাতার জনসাধারণের এক বিশাল শোকসভা এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিরও একটি বড় শোকসভা হয়েছিল। তাছাড়া এই বছর গুজরাটের হরিপুরায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে ৫১তম অধিবেশন হয়, তাতে ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সন্ধ্যায় কংগ্রেসের প্রথম দিনের প্রকাশ্য অধিবেশনে কয়েকজন রাষ্ট্রনেতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতেও শোক প্রকাশ করে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। সকলে দাঁড়িয়ে ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন।

সেবার হরিপুরা কংগ্রেসে নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি তাঁর সভাপতির অভিভাষণে শরৎচন্দ্রের মৃতুতে শোক প্রকাশ করে বলেছিলেন—

"সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে ভারতের সাহিত্য-গগন হ'তে একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসে পড়ল। যদিও বহুবর্ষ তাঁর নাম বাঙ্গলার ঘরে ঘরেই শুধু পরিচিত ছিল, তথাপি তিনি ভারতের সাহিত্য জগতেও কম পরিচিত ছিলেন না। সাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্র বড় ছিলেন বটে, কিন্তু দেশপ্রেমিক হিসাবে তিনি ছিলেন আরও বড়।"

কয়েকটি টুকরো ঘটনা

সমাজচ্যুত

ভাগলপুরের আদমপুর পল্লীর রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একবার বিলাত যাওয়ায় ভাগলপুরের রক্ষণশীল বাঙ্গালী সমাজ তাঁকে 'একঘরে' করেছিল।

রাজা শিবচন্দ্রের দলে প্রগতিপন্থী কিছু লোক থাকলেও, তাঁরা রক্ষণশীল দলের তুলনায় সংখ্যায় অনেক কম ছিলেন।

যাই হোক্, এই নিয়ে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভাগলপুরের বাঙ্গালী সমাজে বেশ একটা ঘোরতর দলাদলি ছিল।

রাজা শিবচন্দ্রের দলীয় তাঁর দূর সম্পর্কের এক শ্যালক কান্তিচন্দ্র ভাগলপুরের বাঙ্গলা স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। শরৎচন্দ্র বাঙ্গলা স্কুলে পড়ার সময় ঐ পণ্ডিত মশায়ের কাছে পড়েছিলেন।

কান্তি পণ্ডিত মশায়ের মৃত্যু হ'লে শরৎচন্দ্র তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মৃতদেহ দাহ করতে গিয়েছিলেন।

বে-দলস্থ লোকের মৃতদেহ দাহ করতে যাওয়ায় রক্ষণশীল দলের নেতারা তখন শরৎচন্দ্রের উপর খুব ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।

সে বছর শরৎচন্দ্রের মামাদের জগদ্ধাত্রী পূজায় ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় শরৎচন্দ্র চ্যাঙারি নিয়ে লুচি দিতে গেলে, পুংক্তির মধ্য থেকে এক দলপতি হৈ হৈ করে উঠলেন।

শরৎচন্দ্রের মাতামহের তৃতীয় ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ নিকটেই ছিলেন, তিনি ছুটে এসে হাত জোড় করে বললেন—কি হয়েছে দাদা?

দলপতি ক্ষিপ্ত হয়েই বললেন—কি হয়েছে? কি হয়নি শুনি? ঐ শরতা হারামজাদা কান্তিকে পুড়িয়েছিল! ও এসেছে আমাদের জাত মারতে, পাজি হারামজাদা!

পুংক্তির সকলে এই কথা শুনেই হৈ হৈ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল—ও পরিবেশন করলে আমরা কেউ খাব না।

মহেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে বললেন—তোমার পরিবেশন করা চলবে না শরৎ।

পরিবেশনের পাত্র মাটিতে রেখে শরৎচন্দ্র মর্মাহত হয়ে বাইরে চলে গেলেন। তখন রাগে ও দুঃখে তাঁর দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

গৃহদাহ

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিক। শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুনে কাঠের তৈরি একটা দুতলা ফ্ল্যাট বাড়ীতে স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকে নিয়ে বাস করছেন। সেই সময় একদিন অনেকটা রাত্রে তাঁর ফ্ল্যাটে আগুন লাগে। আগুনটা প্রথমে লেগেছিল, নীচের তলায় এক ধোপার ঘরে। সেই আগুন অল্প সময়ের মধ্যেই বিস্তারলাভ করে শরৎচন্দ্রের ফ্ল্যাটে চলে আসে।

ধোপার ঘরে যখন আগুন লাগে, তখন শরৎচন্দ্র ও হিরণ্ময়ী দেবী উভয়েই গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। প্রতিবেশীদের আর্তনাদে শরৎচন্দ্রের ঘুম ভেঙ্গে যায়। বিছানা ছেড়ে উঠেই দেখেন, আগুন নীচে থেকে উপরে প্রায় এসে গেছে এবং সিঁড়ি জ্বলতে সুরু করেছে।

শরৎচন্দ্র তখন তাড়াতাড়ি করে স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকে এবং পোষা মুরী পাখী 'বাটু'কে নীচে রেখে এলেন। তারপর বিদ্যুৎগতিতে আবার উপরে গিয়ে যা পারলেন কিছু প্রয়োজনীয় ও দামী জিনিসপত্র নিয়ে সেই জ্বলন্ত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর 'চরিত্রহীন' ও 'নারীর ইতিহাস' বই দুটার পাণ্ডুলিপি এবং তাঁর আঁকা কয়েকটা 'অয়েল পেন্টিং' বাঁচাবার জন্যই প্রধানতঃ আবার উপরে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সেগুলি বাঁচাতে পারেন নি। তিনি উপরে ওঠার আগেই আগুন সেগুলিকে গ্রাস করেছিল।

যাই হোক্, শরৎচন্দ্র উপর থেকে নীচে এসেই শুনলেন যে, যে ধোপার ফ্ল্যাটে প্রথমে আগুন লেগেছিল, সেই ধোপা ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় গাধাটাকে খুলে নিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু প্রাণের ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে পালিয়ে আসবার সময়, তার ঘরের কোণে যে ছাগলছানাটা বাঁধা ছিল, সেটা আনতে ভুলে গেছে।

শরৎচন্দ্র এই কথা শুনে তখনই নিজের জীবন বিপন্ন করে ছাগল ছানাটাকে উদ্ধার করবার জন্য ধোপার সেই জ্বলন্ত ঘরের মধ্যে ছুটে গেলেন এবং আগুন ও ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে সেই অগ্নিস্পৃষ্ট ছাগলটাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। ঠিক পর মুহূর্তেই দুতলার জ্বলন্ত ফ্ল্যাটটা হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ল।

মাছধরা

শরৎচন্দ্র ছেলেবেলায় ছিপ নিয়ে যেমন মাছ ধরতে ভালবাসতেন, শেষ বয়সেও তেমনি সামতাবেড়ে পুকুর কাটিয়ে ছিপ দিয়ে খুব মাছ ধরতেন। এমন কি ব্রহ্মদেশে থাকার সময় সেখানেও তিনি বন্ধুদের সঙ্গে নানাস্থানে মাছ ধরতে যেতেন।

রেঙ্গুনে মাছ ধরার সরঞ্জাম পাঠিয়ে দেবার জন্য ২৫-২-১৫ তারিখে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—"৪।৫ জোড়া গায়ে গাঁথা বঁড়শি—বড় সাইজের ২।৩ জোড়া, মাঝারি সাইজের ২।৩ জোড়া এবং কিছু ছিপ-বাঁধা কড়া ও হাতে ভাঙ্গা মুগার সুতা—ভাই নিশ্চয় দিও।"

বর্মায় শরৎচন্দ্রের একদিনের মাছধরার একটা কাহিনী এখানে বলছি :—

শরৎচন্দ্র তখন পেগুতে। সেই সময় একদিন তিনি তাঁর রেঙ্গুনের বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে পেগুর একটা বড় পুকুরে মাছ ধরতে যান।

শরৎচন্দ্র ও গিরীনবাবু পুকুর ঘাটে গিয়ে দেখেন, সেখানে আগে থেকেই এক ইংরাজ ভদ্রলোক এসে মাছ ধবতে বসে গেছেন।

শরৎচন্দ্র দেখলেন, সাহেবের বিলাতী ছিপ্ তো বটেই, তাছাড়া তাঁর সঙ্গে একজন বয়, একটি বন্দুক, একটি সুটকেশ, ওয়াটার প্রুফ কোট, টিফিন বাক্স, হুইস্কির বোতল প্রভৃতি নানা সরঞ্জাম।

শরৎচন্দ্র ও গিরীনবাবু সেই ঘাটেরই আর এক পাশে গিয়ে ছিপ নিয়ে বসলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই শরৎচন্দ্র প্রায় দশ সের ওজনের একটা বড় মাছও ধরে ফেললেন।

এই দেখে সাহেব সুন্দর বাঙ্গলায় নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে শরৎচন্দ্রের অদৃষ্টের প্রশংসা করতে লাগলেন।

সুদূর পেগুতে সাহেবের মুখে বাঙ্গলা শুনে শরৎচন্দ্র বিস্মিত হয়ে সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি এমন সুন্দর বাঙ্গলা শিখলেন কি করে?

সাহেব বললেন—আমি অনেকদিন কলকাতায় ছিলাম। তখনই শিখি।

ক্রমে সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তায় শরৎচন্দ্র জানতে পারলেন, সাহেবের নাম চার্লস কোন্‌স। তিনি রেঙ্গুনে থাকেন এবং বর্মা চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারী। রেঙ্গুন থেকে সকালে ট্রেনে এই ৪৫ মাইল দূরে পেগুতে মাছ ধরতে এসেছেন।

সাহেব শরৎচন্দ্রকে বললেন—আজ যদি আমি বাড়ীতে মাছ নিয়ে না যাই, তাহলে মেম সাহেব আমাকে বাড়ী ঢুকতে দেবে না।

—কেন, ব্যাপার কি?

—এতদূরে টাকা খরচ করে আসতে মেম সাহেব মানা করেছিল। আমি বলে এসেছি আজ নিশ্চয়ই একটা মাছ ধরে আনব।

—আপনি কিছু মনে করবেন না, আমার মাছটি নিয়ে যান।

—অত বড় মাছটা অমনি দিয়ে দেবেন?

—তা হোক্!

সাহেব একটু ইতস্তত করলেও মেম সাহেবের কাছে নিজের মান বাঁচাবার জন্যই শেষ পর্যন্ত মাছটি নিলেন।

সাহেব বললেন—মাছধরা আমার নেশা। মেম সাহেব বলেন, আমি পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই জেলে ছিলাম।

পরে এই কোন্‌স সাহেবের সঙ্গে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে প্রায়ই মাছ ধরতে যেতেন।

বর্মা-পল্লীতে

বঙ্গোপসাগর থেকে রেঙ্গুন বন্দরে প্রবেশের পথে ইরাবতী নদীর মোহনায় তিনদিকে তিনটি কেল্লা। প্রথমটি সিরিয়াম পয়েণ্ট, দ্বিতীয়টি চৌকি পয়েণ্ট এবং তৃতীয়টি কিংস পয়েণ্ট।

শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকার কয়েক বছর এই কেল্লাগুলিতে কন্‌ট্রাক্টরের কাজ করেছিলেন। গিরীনবাবুর একটি ছোট শামপান (ব্রহ্মদেশীয় নৌকা) ছিল। তিনি ঐ শামপানে করে জলপথে কেল্লায় তাঁর কাজে যেতেন।

গিরীনবাবুর তখন সিরিয়াম পয়েণ্ট কেল্লায় কাজ হচ্ছিল। সেই সময় শরৎচন্দ্র একদিন বন্ধু গিরীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঐ কেল্লা দেখতে গিয়েছিলেন।

সেদিন গিরীনবাবু নিজের শামপানে না গিয়ে, শরৎচন্দ্রকে নিয়ে কেল্লার এক সাহেব ইঞ্জিনিয়ারের লঞ্চে করে কেল্লায় গিয়েছিলেন।

গিরীনবাবু ফেরার সময় দেখেন, সাহেব ভুল করে তাঁদের ফেলে লঞ্চ নিয়ে চলে গেছেন। সাহেব হয়ত ভেবেছিলেন—গিরীনবাবুর শামপান আছে, তাতেই ফিরবেন।

এই অবস্থা দেখে শরৎচন্দ্র বললেন—তাই তো হে, এখন ফিরবো কি করে ?

গিরীনবাবু বললেন—এখান থেকে ৪ মাইল হেঁটে টাঞ্জিনে যেতে হবে। সেখানে গেলে শামপান পাওয়া যাবে। তাছাড়া ফেরার কোন পথ নেই।

শরৎচন্দ্র বললেন—তাই চল হাঁটা যাক্।

তখন দুজনে টাঞ্জিনের পথে হাঁটতে হাঁটতে বহু মাইলব্যাপী বর্মা অয়েল কোম্পানীর কারখানা দেখতে দেখতে এগোতে লাগলেন। পথে শরৎচন্দ্রের পিপাসা লাগায় দুজনেই একটা বর্মা-পল্লীতে ঢুকে জলের খোঁজ করতে লাগলেন।

এমন সময় একটি কুটীরের কাছে গেলে, সেই কুটীরের ভিতর থেকে একটি নারীর যন্ত্রণা-সূচক কান্নার স্বর শুনে শরৎচন্দ্র চম্‌কে উঠলেন।

বর্মার পল্লী অঞ্চলে একটা প্রাচীন প্রথা ছিল—প্রসূতির প্রসব বেদনা ওঠার পর সন্তান প্রসবে দেরী হলে, পল্লীর আনাড়ী দাই তাকে মাটিতে শুইয়ে আস্তে

আস্তে তার পেটের উপর উঠে দাঁড়িয়ে পা দিয়ে পেট টিপতে থাকত। প্রসূতিকে ঐ নিষ্ঠুর নির্যাতন সহ্য করতে হত।

শরৎচন্দ্র নারীকণ্ঠে যন্ত্রণা-সূচক কান্নার স্বর শুনে, খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, ঐ কুটীরে একটি আসন্ন-প্রসবা যুবতীর প্রসব বেদনা ওঠায় তার উপর ঐ ব্যবস্থা চলছে।

শরৎচন্দ্র ঐ অমানুষিক কাণ্ডের কথা শুনে ভয়ে বিহ্বল হয়ে উঠলেন। তিনি চীৎকার করে গিরীনবাবুকে বললেন—গিরীন, তুমি লোকজন ডাক, প্রাণপণে এ নিষ্ঠুর কাজে বাধা দাও, কথা না শোনে মারধর কর, ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দাও।

শরৎচন্দ্রের চীৎকারে এবং তাঁকে উন্মত্তের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখে সঙ্গে সঙ্গেই পাড়ার অনেক লোক এসে জুটে গেল। একজন বিদেশী পথিকের এই অপ্রত্যাশিত সহানুভূতির কথা, ওদিকে অশিক্ষিতা ধাত্রীর কানে পৌঁছলে, সে তার নিষ্ঠুর কাজ থেকে নিবৃত্ত হ'ল।

ধাত্রীর নিবৃত্ত হওয়ার কথা শুনেও শরৎচন্দ্র আরও কিছুক্ষণ সেখানে রইলেন। তার কারণ, তাঁরা চলে এলে পাছে ধাত্রী আবার তার নিষ্ঠুর প্রথা প্রয়োগ করে।

কিছুপরে ভালভাবেই মেয়েটির সন্তান প্রসব হলে, সে কথা শুনে তবে শরৎচন্দ্র সেখান থেকে উঠলেন।

ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে—বর্মা প্যাগোডা (বৌদ্ধ মন্দির), ফুঙ্গী (ব্রহ্মদেশীয় সন্ন্যাসী) ও পল্লী-কুকুরের জন্য বিখ্যাত। বাস্তবিকই এখানকার অসংখ্য প্যাগোডা, ফুঙ্গী ও পল্লী-কুকুর দেখলে, প্রবাদটির সত্যতা উপলব্ধি হয়।

শরৎচন্দ্র এবং গিরীনবাবু বর্মা-পল্লী থেকে ফিরবার সময় তাঁদের বিদেশী পোষাক দেখে প্রায় শ খানেক পল্লী-কুকুর তাঁদের তাড়া করল। বর্মা-পল্লীতে ঢুকবার সময় কিভাবে তাঁরা কুকুরের চোখ এড়িয়ে গেসলেন। এখন তাঁরা লুজি বা গ্রাম-প্রধানের সাহায্যে কোন রকমে পল্লী থেকে বেরিয়ে এলেন ও রক্ষা পেলেন।

জলপথে ভাগলপুর থেকে কলকাতা

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে হাওড়া শহরে থাকার সময় মাঝে মাঝে তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতি-বিজড়িত ভাগলপুরে বেড়াতে যেতেন। ভাগলপুরে গিয়ে তিনি মামাদের বাড়ীতেই থাকতেন।

শরৎচন্দ্রের এই হাওড়া শহরে থাকার সময়েই তাঁর মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একবার এ প্রসঙ্গে 'কল্লোল' পত্রিকায় লিখেছিলেন—

"এখনও সে বিনা আহ্বানে—কেবলমাত্র প্রাণের টানে এক একবার ভাগলপুরে ছুটিয়া আসে। এখন বয়স হইয়াছে, তবুও সেই পাথর ঘাটের ভগ্নস্তূপের চূড়া হইতে ঝাঁপ খাইয়া জলে পড়িয়া সাঁতার দিবার ইচ্ছা তাহার তরুণ বয়সের মতই আছে। গঙ্গার ওপারের ঝাউ বনের ডাক আজিও তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া এখনও তাহাকে বলিতে শুনি—ওঃ বড় ভাল·জায়গা, এই ভাগলপুর!"

শরৎচন্দ্র এইরূপ একবার পূজার ছুটির সময় ভাগলপুরে গেলে, তাঁর এই মাতুল সুরেনবাবু ও সুবেনবাবুব ভাই গিরীনবাবু, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুর-চাকর নিয়ে স্টীমাবে করে বেডাতে বেরিয়েছিলেন। গিরীনবাবু ১৩৩৫ সালের 'কালি-কলম' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে তাঁদের সেই স্টীমার ট্রিপের কথা উল্লেখ করেছিলেন। পরে সুবেনবাবু ঐ বছরেরই 'কালি-কলমে' এক দীর্ঘ প্রবন্ধে অতি বিস্তৃতভাবে তাঁদের সেই স্টীমার ট্রিপটি লিখেছিলেন। সুরেনবাবু পরে তাঁর ঐ প্রবন্ধটিকে তাঁর 'শরৎচন্দ্রেব·জীবনের একদিক' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন। ঐ বই-এ সুরেনবাবুর ঐ প্রবন্ধটি ৪২ পৃষ্ঠাব্যাপী। এখানে সংক্ষেপিত আকারে সেই স্টীমার ট্রিপেব কাহিনীটি দেওয়া গেল:—

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর দু তিনটা ঘোড়ার গাড়ীর উপর পর্বত প্রমাণ জিনিসপত্র চাপিয়ে সকলে মিলে ভাগলপুর স্টীমার ঘাটে গিয়ে পৌঁছলেন। ঘাটে গিয়ে স্থির করলেন—যে দিকের স্টীমার আগে পাওয়া যাবে, তাতেই চড়ে তার শেষ গন্তব্য স্থান পর্যন্ত যাওয়া যাবে।

ঐ সময় পাটনা থেকে কলকাতা পর্যন্ত একটা স্টীমার সার্ভিস ছিল। স্টীমার পাটনা থেকে ছেড়ে ভাগলপুর হয়ে শেষে পদ্মায় পড়ে গোয়ালন্দে আসত। তারপর সুন্দরবন হয়ে ডায়মণ্ডহারবার দিয়ে কলকাতায় খিদিরপুরে আসত। আবার ঠিক এমনি বিপরীতভাবেই কলকাতা থেকে পাটনায় যেত।

শরৎচন্দ্র ও তাঁর দুই মাতুল স্টীমার-ঘাটে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখলেন, স্টীমার কলকাতা যাওয়ার জন্য আসছে। স্টীমারের নাম 'ভেনাস'। ভেনাস ঘাটে এলে, সকলে মিলে মোটঘাট নিয়ে ভেনাসে গিয়ে উঠলেন। স্টীমারের একতলায় মালপত্র ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা থাকত। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা দুতলায় কেবিনে যেত। শরৎচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীরা সকলেই প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনে কেবিনে গিয়ে বসলেন।

ভেনাস ছেড়ে দিলে শরৎচন্দ্র ভৃত্যকে তামাক সেজে দিতে বললেন। ভৃত্য তামাক সেজে দিলে শরৎচন্দ্র কেবিনের ইজিচেয়ারে শুয়ে গড়গড়ায় তামাক টানতে লাগলেন।

কেবিনের কাছেই ছিল সারেঙ-এর ঘর। শরৎচন্দ্র স্টীমারে তামাক খাচ্ছেন শুনে সারেঙ স্টীমারের বয়কে দিয়ে শরৎচন্দ্রকে তামাক খেতে নিষেধ করে পাঠালেন। বৃদ্ধ বয় এসে সারেঙ-এর নাম করে শরৎচন্দ্রকে তামাক খেতে নিষেধ করল। শরৎচন্দ্র কিন্তু তার কথায় আদৌ কান দিলেন না। তখন সারেঙ নিজে এলেন। সাহেব এসেই শরৎচন্দ্রের গড়গড়ার দিকে চেয়ে বললেন—গডগড়া টানা বন্ধ করতে হবে।

—কেন ?

—এটা অত্যন্ত কুৎসিৎ দেখতে। একটা অসভ্য···

—আমি এটাকে সুশ্রী মনে করি। এটাতে সভ্যতার অধিক পরিচয় আছে।

—এর বিশ্রী শব্দ অন্য যাত্রীর পক্ষে অস্বস্তিকর হতে পারে।

—স্টীমারের শব্দটাও মানুষের কানেব পক্ষে মোটেই প্রীতিকর নয়। কেবল নেসেসারি ইভল্ বলে সহ্য করতে হচ্ছে।

—এটা কিন্তু নেসেসারি নয়।

—বটে! আপনি বুঝি ধূমপান করেন না।

—সিগার কি সিগারেটে আপত্তি নেই।

—তাতে তো আর কারো আপত্তি হতে পারে।

—কোন ইউরোপীয়ানের আপত্তি হয় না।

—এটা ইউরোপ নয়।

এইভাবে সারেঙ-এর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বাক্‌যুদ্ধ হতে লাগল। সাহেব বাক্‌যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে শেষে যাবার সময় বলে গেলেন—কোন ইউরোপীয়ান এলে তখন কিন্তু এটা বন্ধ করবেন, আমার অনুরোধ।

শরৎচন্দ্র কোন উত্তর না দিয়ে তামাক টানতে লাগলেন।

কিছু পরে ভেনাস কাহালগাঁয়ে এসে পৌছল। কাহালগাঁ একটা স্টীমার স্টেশন। এখানে স্টীমার কিছুক্ষণের জন্য থামে। তাই শরৎচন্দ্র স্টীমার থেকে নেমে গেলেন।

এদিকে স্টীমার ছাড়বার সময় হয়ে গেল, তবুও শরৎচন্দ্র আসছেন না দেখে, তাঁর মামারা তাকে খুঁজতে গেলেন। তাঁরা গিয়ে দেখেন, স্টীমার-ঘাটের অদূরে যাত্রীদের নিকট বিক্রয়ের জন্য যে ছোট দোকানটি আছে, তার সামনের মাঠে শরৎচন্দ্র বসে আসেন। তাঁর চারদিকে পনের-কুড়িটি কুকুর 'দহি-চুড়ার' ভোজে রত। একটি বছর বার-তের বয়সের ছেলে শরৎচন্দ্রের পাশে দাঁড়িয়ে—তার দুহাতে দই, চিঁড়ে ও ভুরা মাখা। ঐ ছেলেটিই পরিবেশক।

সুরেনবাবু বললেন—একি? স্টীমার যে ওদিকে ছাড়ে।

—না, সেদিকে আমার হুঁস আছে। এখনও ভোঁ দেয় নি তো?

শরৎচন্দ্র এবার উঠে দোকানীকে টাকা দিলেন।

ছেলেটির মজুরি দিয়েও, কিছু খুচরা পয়সা দোকানীর কাছ থেকে তাঁর পাওনা হ'ল।

দোকানী সেই পয়সা ফেরৎ দিতে এলে, শরৎচন্দ্র মৃদু হেসে বললেন—দেনে নেহি হোগা, উহা তুমহারা নাফামে গিয়া।

শুনে দোকানী প্রগাঢ় বিস্ময়ে শরৎচন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

শরৎচন্দ্র ভেনাসে ফিরে এসে বললেন—স্টীমার-ঘাটে নেমে দেখি, একদল কুকুর ছুটে আসছে। দেখে মনে হল, তারা যেন কতদিন খেতে পায় নি। ইচ্ছা হল, ঐ কুকুরগুলোকে কিছু খাওয়াই। দেখলাম, দোকানে দই চিঁড়ে আছে, তাই লেগে গেলাম।

পরের দিন সকালে এক গ্রামের ঘাটে গিয়ে ভেনাস নোঙর করল। ঐ

গ্রামের ঘাটে দুধ, মাছ, তরকারি পাওয়া যায়। ঐ সব সংগ্রহ করার জন্যই ওখানে নোঙর করা। ঐ ঘাট থেকে স্টীমার ছেড়ে দিয়েছে, এমন সময় দেখা গেল, পাড়ের উপর একটা লোক উর্ধ্বশ্বাসে স্টীমারের সঙ্গে ছুটছে। সে স্টীমারের দিকে চেয়ে জোড়হাতে কি যেন বলছে আর প্রাণপণে ছুটছে।

শরৎচন্দ্র লোকটিকে দেখতে পেয়েই, সারেঙকে স্টীমার থামাতে অনুরোধ করলেন!

সারেঙ বল্‌ল—বাবুজি, এই রকম দয়া দেখাতে গেলে দশ দিনেও গোয়ালন্দ পৌছান যাবে না।

শেষে, শরৎচন্দ্রের বিশেষ অনুরোধে সারেঙ স্টীমার তীরে ভেড়ালে লোকটি স্টীমারে উঠেই কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

পরে তার জ্ঞান ফিরে এলে সকলে শুনলেন—তার মেয়ের মরণাপন্ন অসুখ শুনে সে স্টীমার ধরবার জন্য প্রাণপণে ছুটে আসছিল।

সেদিন বেলা দশটা আন্দাজ প্রেমতলীতে ভেনাস নোঙর করল। প্রেমতলীতে তখন বৈষ্ণবদের মেলা চলছিল। চারদিক থেকে অসংখ্য বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী এই মেলায় আসে। আর স্থানীয় লোকের তো কথাই নেই। এখানে স্টীমার আধ ঘণ্টা থামে।

শরৎচন্দ্র তাঁর মাতুলদের বললেন—ও আধ ঘণ্টার কাজ নয়। আমি প্রেমতলীর মেলা না দেখে যাব না।

অগত্যা ভেনাস থেকে মালপত্র নামিয়ে তাকে ছেড়ে দিয়ে সকলে প্রেমতলীতে নেমে পড়লেন। তারপর পদ্মাতীরের কাঁটা-জঙ্গল ভেঙ্গে লটবহর নিয়ে প্রেমতলীর একটা কাছারি বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন।

এই কাছারি বাড়ীতে যাওয়ার কথায় সুরেনবাবু লিখেছেন—

"জমিদারের কাছারিতে গিয়া বুঝা গেল যে, সেখানেও স্বস্তির আশা সম্পূর্ণ দুরাশা। তিলক-কাটা নর-নারীর গাঁদি লাগিয়াছে সেখানেও।

আমাদের মোটঘাট দেখিয়া প্রথমে তাহারা অবাক হইল। তাহার পর সামাল সামাল করিয়া একদিকে সরিয়া যাইতে লাগিল।···

কলিমদ্দিবিনিন্দিত শ্মশ্রুগুচ্ছ, গায়ে সবুজ চেকদার র‍্যাপারে সজ্জিত এক নবাগতকে দেখিয়া সেখানকার ভক্ত নরনারীবৃন্দ আর্তনাদ করিয়া উঠিল

শরৎচন্দ্রকে তাহারা মুসলমান মনে করিয়াছিল।

সে বারান্দায় উঠিবার উপক্রম করিতেই সমস্বরে নরনারীগণ চীৎকার করিয়া উঠিল।

—দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমাদের শ্যামসুন্দর আছেন, আমাদের রাধিকারমণ আছেন—সর্বনাশ করলে—ওগো রান্না চড়ে গেছে যে…আর জাতজন্ম থাকলো না আজ!

বৈষ্ণবীর দল নাকে কান্না জুড়িয়া দিল।

—রাধে রাধে, একি করলে মদনমোহন!

শরৎ একেবারে বিস্ময়-বিমূঢ়।

অবশেষে অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি বলিলেন—ওগো শুনছো তোমরা! আমি বামুন গো, বামুন।

তাহারা বক্রহাস্য করিয়া বলিল—তা বেশ বাবা! কিন্তু তোমার দাড়িতে…

—না গো না। আমার পৈতে আছে। ভয় নেই, আমি বামুন।

একজন বিজ্ঞগোছের বৈষ্ণব বলিল—তা বাবা শুনেছি, ঐ ওনারাও নাকি পৈতে নিচ্ছে আজকাল…।

আমরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।”

কাছারি বাড়ীতে পৌঁছে শরৎচন্দ্র একাই মেলা দেখতে বেরিয়ে পড়লেন। অনেক বেলা হয়ে গেল, তবুও ফিরছেন না দেখে, সুরেনবাবু ও গিরীনবাবু দুজনে মিলে তাঁকে খুঁজতে বেরুলেন।

এঁরা মেলায় গিয়ে দেখেন, একটা প্রকাণ্ড গাছের নীচে খুব ভীড় জমেছে। একদল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বাউল এক গৌরাঙ্গিনীকে ঘিরে নাচছে ও কীর্তন করছে। শরৎচন্দ্র তাদের পাশে বসে তন্ময় হয়ে কীর্তন শুনছেন।

শরৎচন্দ্রের মাতুলরা গিয়ে তাঁকে ডাকলে, তিনি বললেন—আরে, রোজই তো নাই-খাই! শোন না, দেখ কি ভক্তি এদের!

মাতুলদের ডাকাডাকিতে শরৎচন্দ্রকে শেষ পর্যন্ত উঠতেই হল।

খেতে বসে শরৎচন্দ্র বললেন—আজকের দিনটা এখানে থাকতে হবে। শুনেছি এখানে বৈষ্ণবী-গ্রহণ ব্যাপারটা খুব ইন্‌টারেস্টিং।

সুরেনবাবু বললেন—কি রকম শুনি?

শরৎচন্দ্র বললেন— একটা আখড়া আছে। সেখানে পাঁচসিকে জমা দিয়ে নাম লেখায় বোষ্টমীরা এসে। আর যে সব বৈাষ্টম বোষ্টমী চায়, তাদেরও পাঁচসিকে জমা দিতে হয়। তার পরের ব্যাপারটা ভারি মজার। একখানা বড় চাদর চাপা দিয়ে বোষ্টমীদের কেবল পায়ের কড়ে আঙ্গুলটি বার করে রাখা হয়, আর কিছু দেখতে পাবে না। সেই আঙ্গুল ধরে যার কপালে যে উঠল। এক বছর এক সঙ্গে ঘর করতেই হবে।

শুনে সুরেনবাবু ও গিরীনবাবু হেসে বললেন—যত সব উদ্ভট খবর তোমার।

—থাকলে দেখতে পাবে। বাজে কথা নয়।

—আচ্ছা দেখাই যাক।

খাওয়ার পর শরৎচন্দ্র গিরীনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আবার মেলা দেখতে গেলেন। সুরেনবাবু কাছারিতেই রইলেন।

সন্ধ্যা নাগাদ শরৎচন্দ্র ও গিরীনবাবু কাছারিতে ফিরলে, সুরেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—বৈষ্ণবী সংগ্রহের খোঁজ পেলে?

—সে প্রথা উঠে গেছে শুনছি।

—সে যাক্, কিন্তু রাত্রের কি ব্যবস্থা হবে? শুনছি এখানে ভয়ঙ্কর মশা।

এই শুনেই শরৎচন্দ্র বললেন—মশা! ম্যালেরিয়া ধরবে! তাহলে এখানে আর নয়। এখনি চল নৌকায় করে রাজসাহী যাই।

নৌকায় লটবহর চাপিয়ে সকলে আবার রাজসাহী অভিমুখে চললেন। যেতে যেতে দেখলেন, গোয়ালন্দের পথে 'মার্স' নামে আর একটা স্টীমার আসছে। সেই স্টীমার থামিয়ে মালপত্র স্টীমারের খোলে তুলে নিজেরাও স্টীমারে উঠে পড়লেন। এখন মার্সে চেপে গোয়ালন্দ চললেন। সারাদিনের ধকলের পর রাত্রে মার্সে সকলেরই ভাল ঘুম হল।

পরের দিন বেলা তিনটার সময় মার্স পাবনায় গিয়ে নোঙর করল! সেখানে মিনিট পনের স্টীমার থামে। শরৎচন্দ্র তাঁর মামাদের বললেন—চল এখানে আমার এক জমিদার বন্ধুর বাড়ী থেকে চা খেয়ে আসি।

এই অল্প সময়ের মধ্যে যাওয়া-আসা অসম্ভব। তবুও শরৎচন্দ্র বললেন—আমরা না এলে স্টীমার ছাড়বে না, চল চল বেরিয়ে পড়া যাক।

প্রায় মিনিট পনের হেঁটে সকলে জমিদারের বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছলেন। গিয়ে চাকরের মুখে শুনলেন, জমিদারবাবু দিবানিদ্রায় মগ্ন।

এমন সময় ওদিকে স্টীমারের হুইসেল শোনা গেল। হুইসেল শুনে তখন সকলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে স্টীমার ধরবার জন্য ছুটলেন।

স্টীমার তাঁদের অপেক্ষাতেই ছিল। তাঁরা স্টীমারে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই স্টীমার ছেড়ে দিল।

শরৎচন্দ্র উপরে উঠে এসে বললেন—বৈকুণ্ঠ (সঙ্গে আনা ঠাকুর) তবে চা তৈরি করুক।

তখন বৈকুণ্ঠের ডাক পড়ল। দেখা গেল, বৈকুণ্ঠ স্টীমারে নেই। তবে গেল কোথায়? এমন সময় বাইরে চাইতে চোখে পড়ল, পদ্মার পাড়ে সে প্রাণপণে ছুটে আসছে।

শরৎচন্দ্রের অনুরোধে সারেঙ দুজন খালাসীকে জালিবোট খুলে বৈকুণ্ঠকে আনতে বললেন।

বৈকুণ্ঠ এলে সারেঙ তাকে বললেন—তুম্ জাহাজকা সিটি নেহি শুনা?

বৈকুণ্ঠ বল্‌লে, একটু টাটকা দুধের জন্য সে গ্রামে গিয়েছিল।

যাই হোক্, বৈকুণ্ঠ চা তৈরি করলে সকলেই চা খেলেন।

শরৎচন্দ্রের নির্দেশে পরের দিন সকাল ন'টার মধ্যেই বৈকুণ্ঠ রান্না-বান্না মিটিয়ে ফেলল। তখন সকলেই মালপত্রের গোছগাছ করে খেয়ে নিলেন। কেননা গোয়ালন্দ আসতে আর বেশী দেরী নেই।

বেলা বারোটা নাগাদ মার্স গোয়ালন্দে এল। শরৎচন্দ্রের আর দেরী সয় না। তিনি বললেন—স্টীমারে আর নয়। গোয়ালন্দে ট্রেনে চেপে একেবারে সিধা কলকাতা।

কিন্তু ট্রেনের খোঁজ নিয়ে শুনলেন, তখন কোন ট্রেন নেই। ট্রেন সেই দু'টায়।

তাড়া নেই ভেবে, সুরেনবাবু ও গিরীনবাবু গোয়ালন্দে স্টীমার ঘাটের উপর যে বাজার বসেছে, তা দেখতে গেলেন। আধ ঘণ্টা পরে তাঁরা স্টীমারে ফিরে এসে দেখেন, সেখানে শরৎচন্দ্র নেই, এমন কি ঠাকুর চাকর সায় মালপত্র কোন কিছুরই চিহ্ন নেই।

সুরেনবাবু ভাবলেন—শরৎচন্দ্র আর ধৈর্য ধরতে না পেরে, নিশ্চয়ই সব নিয়ে ট্রেন ধরবার জন্য স্টেশনে গিয়ে বসে আছেন।

এই ভেবে তাঁরা দুই ভাই স্টেশনে গেলেন। স্টেশনে গিয়ে কিন্তু কারুরই দেখা পেলেন না।

আবার স্টীমার ঘাটে ফিরে এলেন। এমন সময় 'মার্সে'র একজন খালাসীর সঙ্গে দেখা হলে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—বাবু কোথায় জান?

সে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল—বাবু ঐ 'মহাদেব' জাহাজে চলে গেছেন।

মার্সের পিছনেই 'মহাদেব' জাহাজ দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ছাড়ছিল। সুরেনবাবু ও গিরীনবাবু সেদিকে চাইতেই দেখতে পেলেন—শরৎচন্দ্র রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন।

সুরেনবাবু ও গিরীনবাবু কাছে গেলে শরৎচন্দ্র বললেন—মার্স একদিন পরে ছাড়বে। মহাদেব এখনি ছাড়ছে। আসাম থেকে মহাদেব চা বোঝাই হয়ে ডায়মণ্ডহারবারের পথে কলকাতায় পৌঁছবে। যেতে ৫।৬ দিন লাগবে। চল সুন্দরবন দেখে যাওয়া যাবে। সুন্দরবনের জঙ্গলে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, নদীতে হাঙ্গর কুমীর, সুঁদরি গাছের ডালে বিচিত্র বর্ণের পাখী, সব দেখা যাবে। এমনও দেখা যেতে পারে, হয়ত একটা অতিকায় অজগর সাপ গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে একটা আস্ত মোষকে গিলে খাচ্ছে।

শরৎচন্দ্রের বর্ণনার মোহে আকৃষ্ট হয়ে, তাছাড়া শরৎচন্দ্রের কাছে নিরুপায় হয়েও সুরেনবাবু ও গিরীনবাবু অগত্যা ট্রেন ছেড়ে মহাদেবেই চললেন।

সুরেনবাবু লিখেছেন—"মহাদেব চলিয়াছে প্রমত্ত অধৈর্যে। কোথাও থামে না, যাত্রীর তোয়াক্কা নেই। শুধু ছোটা—উল্কাগতিতে ছুটিয়া চলাই তাহার একমাত্র কাজ।

আবার কয়েকদিনের জন্য বন্দী আমরা।...

শুধু জলের হাঙ্গর, কুমীর আর স্থলের রয়েল বেঙ্গলের আশায় দিন কাটিয়া যায়।...কিন্তু আমাদের ভাগ্যে একটি কাঠ বিড়ালীর ল্যাজও চোখে পড়িল না।"

সুরেনবাবু তাঁদের এই ভ্রমণ পথে তাঁর এসরাজটি সঙ্গে এনেছিলেন। সুন্দরবনের পথে জাহাজের একঘেয়েমির মধ্যে তিনি একদিন তাঁর এসরাজটি বাজাতে বসলে, শরৎচন্দ্র বললেন—একটি নিবেদন করব। যদি না শোন, আমাদের পথ খোলা, আমরা স্থির করেছি স্টীমার থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করব। তোমার এসরাজ থামাও।

যাই হোক্‌, এদিকে যথাসময়ে একদিন মহাদেব ডায়মণ্ডহারবারে এসে পৌছল। ডায়মণ্ডহারবার দেখে তখন যেন সকলের ধড়ে প্রাণ এল। ভাবলেন, খিদিরপুর যেতে আর দেরী নেই।

এই সময় গিরীনবাবু তাঁর সুটকেশ খুলতে গিয়ে দেখেন, সুটকেশ ভেঙে কখন কে তাঁর সমস্ত টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে। অথচ গিরীনবাবুই পথে এ বিষয়ে সবচেয়ে সতর্ক ছিলেন।

শরৎচন্দ্র শুনে বললেন—যাক্‌গে, ক্ষতিটা সমানভাবে ভাগ করে নিলে কারুর গায়ে লাগবে না। কি বল গিরীন? আনন্দের ভাগ যেমন সবাই নিয়েছি, তেমনি···

খিদিরপুর ডকে এসে মহাদেব কিছুক্ষণ বিশ্রাম করল। কারণ আরও আগে যেতে তার নতুন পরোয়ানার দরকার।

এই সময় সুরেনবাবু ও গিরীনবাবু জিনিষপত্র গুছাতে লাগলেন। জিনিষপত্র গোছগাছ করে দেখলেন—শরৎচন্দ্র নেই।

বৈকুণ্ঠ বল্‌ল—বাবু ট্রামে চলে গেছেন।

সুরেনবাবু বুঝলেন—শরৎচন্দ্রের শেষরক্ষার ধৈয আর কুলায় না। সুরেনবাবু ও গিরীনবাবু, ঠাকুর চাকর এবং মালপত্র নিয়ে বিকাল নাগাদ শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের বাড়ীতে এলেন। এসে দেখেন, শরৎচন্দ্র ইজিচেয়ারে শুয়ে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন, যেন কোনদিন ঘর ছেড়ে বাইরে যান নি।

সুরেনবাবু বললেন—একটু বলে এলেই পারতে!

উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন—তা হলে কি আর আসতে দিতে?—নাও এখন বিশ্রাম করে খাও-দাও।

মনোমোহন থিয়েটারে

শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে তাঁর ষোড়শী, রমা ও বিজয়া নাটক ক'টি ছাড়া তাঁর বিরাজ বৌ, চরিত্রহীন, গৃহদাহ প্রভৃতি উপন্যাসগুলিরও নাট্যরূপ মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল।

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর প্রযোজনায় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর নাট্যমন্দির থিয়েটারে 'ষোড়শী' নাটকের অভিনয় এবং এই নাটকে জীবানন্দের ভূমিকায় স্বয়ং শিশিরবাবুর অভিনয়, এমন সাফল্যমণ্ডিত ও দর্শনীয় হয়েছিল যে, তখন এই নাট্যাভিনয় বাঙ্গলা দেশে এক প্রবল সাড়া এনে দিয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের জীবন-কালে তাঁর উপন্যাসের নাট্যরূপ শুধু মঞ্চেই নয়, তাঁর অনেকগুলি উপন্যাস ছায়াচিত্রেও রূপায়িত হয়েছিল। ঐ সব থিয়েটার ও সিনেমার মালিকদের অনুরোধে অনেক সময় শরৎচন্দ্রকে তাঁর বই-এর নাট্যাভিনয় ও চিত্রাভিনয় দেখতে যেতেও হ'ত।

সিনেমার প্রথমে ছিল নির্বাক ছবির যুগ। তারপর আসে সবাক ছবির যুগ। সেই নির্বাক ছবির যুগেও শরৎচন্দ্রের আঁধারে আলো, চন্দ্রনাথ, দেবদাস, শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, স্বামী চিত্রে রূপায়িত হয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো'ই সর্বপ্রথম ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়। এর চিত্ররূপ দিয়েছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। এই ছবি তখন প্রথম দেখানো হয়েছিল ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে মনোমোহন থিয়েটারে। সেই সময়কারই শরৎচন্দ্রের জীবনের একটা দিনের ঘটনা বলছি। শরৎচন্দ্র তখন হাওড়ায় বাজে শিবপুরে থাকতেন।

মনোমোহন থিয়েটারে শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো' চলবার সময় শিশির বাবু এবং মনোমোহন থিয়েটারের তৎকালীন মালিক অনাদিনাথ বসু একদিন শরৎচন্দ্রকে আমন্ত্রণ করে 'আঁধারে আলো' দেখাতে নিয়ে আসেন।

সিনেমা হলে বক্সের উপর বিছানা পেতে শরৎচন্দ্রের বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শরৎচন্দ্র পা তুলে বেশ আরাম করে বসে সিনেমা দেখতে লাগলেন।

সিনেমা শেষ হ'লে শরৎচন্দ্র উঠে দেখেন, তাঁর এক পাটি জুতো পাওয়া যাচ্ছে না। মাত্র দুদিন আগে শখ করে সেই শুঁড়তোলা তালতলার চটিজোড়াটি তিনি কিনেছিলেন। আর সেই নতুন চটি পায়ে দিয়েই সেদিন সিনেমা দেখতে এসেছিলেন।

জুতো পাওয়া যাচ্ছে না শুনে মনোমোহন থিয়েটারের মালিক অনাদিবাবু স্বয়ং এবং তাঁর কর্মচারীরা সকলে মিলে কত খোঁজাখুঁজি করলেন, কিন্তু কোথাও পেলেন না। হতাশ হয়ে সকলে বলাবলি করতে লাগলেন—তাই তো, এ তো বড় আশ্চর্যের ব্যাপার!

অনাদিবাবু তখন শরৎচন্দ্রকে বললেন—চলুন, এক জোড়া নতুন জুতো আপনাকে কিনে দিই।

শরৎচন্দ্র বললেন—তোমরা আবার কিনে দিতে যাবে কেন? কিনতে হয়, আমি কি আর পারব না?

—আমাদের এখান থেকে যখন খোয়া গেল, তখন এ কর্তব্য আমাদেরই।

শরৎচন্দ্র বললেন—চুরি করেছে চোরে, তাতে তোমরা আর কি করবে বলো। থাক্, এখন তাহলে চলি। আর হ্যাঁ, এই জুতোর পাটিটা সঙ্গে নিয়ে যাই।

এ কথা শুনে অনাদিবাবু বললেন—শরৎদা, ওটা নিয়ে আর কি করবেন? এক পাটিতে আপনার কি কাজ হবে?

শরৎচন্দ্র বললেন—তোমরা বোঝ না ভায়া! যে চোর এক পাটি চটি চুরি করেছে, সে আশেপাশে কোথাও রয়েছে। এক পাটিতে তো তারও কোনো কাজ হবে না। সে নিতে এসেছিল দু পাটিই, তাড়াতাড়িতে সুবিধে করতে পারে নি, একপাটি নিয়েই সরে পড়েছে। ভাবছে, একপাটি যখন পেয়েছি, অপর পাটিটা আপনা হতেই পাব। বাবু কি আর এক পাটি চটি পায়ে দিয়ে যাবেন! আমি কিন্তু তা হতে দিচ্ছিনে! চোরকে ঐ এক পাটি জুতো দিয়েই জব্দ করতে হবে। অপর পাটিটা আমি হাতে করে নিয়ে যাচ্ছি। এখান থেকে সিধে তো বাজে শিবপুরের বাড়িতেই ফিরব, যাবার পথে ওটাকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে যাব।

শরৎচন্দ্রের এই কথায় সকলে হাসলেন বটে, কিন্তু তিনি সত্য সত্যই ঐ চটিটা বগলে করে বাড়ি ফিরবার পথে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে গেলেন।

পরের দিন সকালে শরৎচন্দ্র বাড়ীতে বৈঠকখানায় বসে তামাক টানছেন, এমন সময় একটি লোক এসে জিজ্ঞাসা করল—এটা কি শরৎবাবুর বাড়ী ?

—হ্যাঁ, আমারই নাম শরৎ।

শুনেই লোকটি নমস্কার করে একটি চিঠি শরৎচন্দ্রের হাতে দিল। শরৎচন্দ্র পড়ে দেখলেন, মনোমোহন থিয়েটারের মালিক অনাদিবাবু লিখেছেন—

শরৎদা, গতকাল আমাদের এখানে এসে আপনার জুতো চুরি যাওয়ায় মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়। সত্য কথা বলতে কি, এই কারণে কাল ভালো করে ঘুমোতে পারি নি। তাই আজ সকালে উঠেই সিনেমা হল-এ গিয়ে সব তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখি। যে বক্সটায় আপনি বসেছিলেন, সেটি সরিয়ে দেখি এক কোণায় সেই হারানো চটিটা পড়ে রয়েছে, কাল রাত্রে কোন প্রকারে ঐখানে ঢুকে পড়েছিল। যাক্, আপনার জুতো যে শেষ পর্যন্ত আমাদের এখান থেকে চুরি যায় নি—এই কথা ভেবে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাচ্ছি। আশা করি কাল এখান থেকে ফিরবার সময় অপর পাটিটা আপনি সত্য সত্যই গঙ্গায় ফেলে যান নি। সেই ভরসায় হারানো পাটিটা পত্রবাহকের হাতে পাঠিয়ে দিলাম।

শরৎচন্দ্র চিঠি পড়া শেষ করলে, লোকটি মোড়ক খুলে শরৎচন্দ্রের সামনে সেই চটির পাটিটা রাখল। সেই শুঁড়তোলা তালতলার চটি! দেখে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল শরৎচন্দ্রের। মনে মনে ভাবলেন, খেয়ালের মাথায় চটিটা গঙ্গায় না ফেললেই হ'ত! চোরকে জব্দ করতে গিয়ে নিজেই জব্দ হলাম।

মুখে লোকটিকে বললেন—এ আর তো কোন কাজে লাগবে না বাপু! আর এক পাটি তো কাল গঙ্গায় ফেলে এসেছি। এ আর কি হবে! তুমি ফিরতি পথে এটাকে গঙ্গায় ফেলে দিও।

একটি মামলায় সাক্ষী

দেশবন্ধু মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে অনুভব করেন যে, বাঙ্গলা দেশকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হলে, সর্বাগ্রে বাঙ্গলার গ্রামগুলির সংস্কার প্রয়োজন। তাই পল্লী-বাঙ্গলার শিক্ষা, কুটির-শিল্প, দেব-দেউল প্রভৃতির সংস্কার ও উন্নতি বিধানের জন্য তিনি অগ্রণী হয়ে একটি অর্থভাণ্ডার খোলেন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই এই ভাণ্ডারে তিন লক্ষ টাকা সংগ্রহ করতেও সক্ষম হন। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যু ঘটায়, তিনি আর তাঁর এই পল্লী-সংস্কারের পরিকল্পনাকে কাজে রূপ দিয়ে যেতে পারলেন না।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁর সহকর্মীরা উক্ত অর্থে 'দেশবন্ধু পল্লী-সংস্কার সমিতি' গঠন করে কাজে অগ্রসর হলেন। নলিনীরঞ্জন সরকার সমিতির সম্পাদক এবং জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী সমিতির প্রধান সংগঠক নিযুক্ত হলেন।

জ্ঞানাঞ্জনবাবু ইতিপূর্বেই বিভিন্ন বিষয়ে ল্যাণ্টার্ণ লেকচার বা ছায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতা দিয়ে বেশ নাম করেছিলেন। এবার তিনি দেশবন্ধু পল্লী-সংস্কার সমিতির প্রধান সংগঠক হয়ে বহু কর্মীকে ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা দেওয়া শেখালেন। এই সব কর্মী সারা বাঙ্গলায় ছড়িয়ে পড়ে ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা করে বেড়াতে লাগলেন।

কর্মীদের সকলেরই বক্তৃতা যাতে এক রকমের হয়, সেজন্য জ্ঞানাঞ্জনবাবু বিভিন্ন বিষয়ক বক্তৃতাগুলিকে একত্র ছাপিয়ে একটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের নাম দেওয়া হয় 'দেশের ডাক'। সমিতির অর্থ-ভাণ্ডারের জন্য 'দেশের ডাক' তখন পুস্তক হিসাবেও বিক্রি করা হ'ত। দাম ছিল মাত্র চার আনা। অল্পদিনের মধ্যেই এই বই তখন কয়েক লাখ বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। পরে অবশ্য বাঙ্গলা সরকার এবং বাঙ্গলার সংলগ্ন আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা সরকার এই পুস্তক প্রচার নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিল। সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ার হেতু ছিল এই যে, ঐ বইয়ের বক্তৃতামালার মধ্যে কোন কোন বক্তৃতায় সরকারের বিরুদ্ধ কথাও ছিল। যেমন—ইংরাজ এদেশে রাজত্ব করে বাঙ্গলার কুটীর শিল্পকে—বিশেষ করে তাঁত-শিল্পকে কিভাবে

ধ্বংস করেছে তার বিস্তৃত বিবরণ ছিল। ভারতের বাজারে বিলাতী কাপড় চালু করবার জন্য, আমাদের দেশের তাঁতীরা যাতে তাঁত বুনতে না পারে, সেজন্য ইংরাজ এদেশের তাঁতীদের হাতের বুড়ো আঙ্গুল কেটে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে নি। বক্তৃতার মধ্যে এই সব কথাও ছিল।

বক্তারা পল্লী-উন্নয়নমূলক বক্তৃতাদানের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের এই অত্যাচারের কাহিনীও বলে যেতেন। তাই সরকারের পুলিশ বিভাগের কর্মচারীরা জানতে পারলেই দেশবন্ধু পল্লী-সংস্কার সমিতির কর্মীদের সভায় বক্তৃতা শুনতে যেতেন এবং আপত্তিকর কিছু শুনলেই তাঁদের বিরুদ্ধে অমনি সরকারী অভিযোগ আনতেন।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় 'ইণ্টালী একাডেমী'তে এমনি এক 'দেশের ডাকে'র বক্তৃতায় অভিযুক্ত হলেন স্বয়ং জ্ঞানাঞ্জনবাবু। জ্ঞানাঞ্জনবাবু সেদিন তাঁর বক্তৃতায় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এক একটা অন্যায় ও অত্যাচারের কাহিনী উল্লেখ করে, শ্রোতাদের বারে বারে বলেছিলেন—এই সব অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিকারে চাই—বিপ্লব।

সভায় সরকারের পুলিশ বিভাগের যেসব লোক ছিলেন, তাঁরা জ্ঞানাঞ্জন-বাবুর সরকার-বিরোধী উক্তিগুলির সহিত এই 'বিপ্লব' শব্দটিও ভীষণ রাজদ্রোহ-মূলক এবং এই শব্দের মধ্যে সশস্ত্র বিপ্লবের ইঙ্গিত রয়েছে, এই বলে জ্ঞানাঞ্জনবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন।

জ্ঞানাঞ্জনবাবু অভিযুক্ত হয়ে জামিনে খালাস লাভ করলেন। তারপর চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গের এজলাসে তাঁর মামলা যখন চলতে লাগল, তখন তিনি সরকারকে বোঝাতে চাইলেন যে, সাধারণ আন্দোলন বা বিদ্রোহ অর্থেই তিনি 'বিপ্লব' শব্দের ব্যবহার করেছেন। এই শব্দের দ্বারা তিনি কোন সশস্ত্র বা সহিংস বিপ্লব প্রচারের চেষ্টা করেন নি।

সরকার পক্ষ জ্ঞানাঞ্জনবাবুর কথা শুনতে চাইলেন না। তাঁরা বিপ্লব শব্দের অর্থ করে বললেন—বিপ্লব শব্দই হচ্ছে হিংসাত্মক। এই শব্দের মধ্যেই সশস্ত্র বিদ্রোহের ইঙ্গিত রয়েছে।

এই শুনে জ্ঞানাঞ্জনবাবু বললেন—আমি তাহলে সরকারকে অনুরোধ করছি, তাঁরা 'বিপ্লব' শব্দের প্রকৃত অর্থ বর্তমান বাঙ্গলার দুই সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে জেনে নিন। এই দুই সাহিত্যরথী যদি

বলেন যে, বিপ্লব শব্দ হিংসাত্মক এবং সশস্ত্র বিদ্রোহমূলক, তাহলে আমি তখন আপনাদের কথা মেনে নেব।

সরকার পক্ষ বললেন—আমাদের জানবার গরজ নেই; তবে আপনি যদি জানবার প্রয়োজন মনে করেন, তাঁদের মতামত আদালতকে জানাতে পারেন।

সরকারের এই কথার পর জ্ঞানাঞ্জনবাবু 'বিপ্লব' শব্দের অর্থ জানাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে সাক্ষী মানবেন স্থির করলেন।

রবীন্দ্রনাথকে এ কথা জানানো হলে, তিনি তখন অসুস্থতাবশতঃ আদালতে আসতে পারবেন না বলে জানালেন। আর শরৎচন্দ্রকে জানানো হলে, তিনি সাক্ষ্য দেবেন বলে মত দিলেন।

শরৎচন্দ্র সেই সময় সামতাবেড়ে থাকতেন। যথাসময়ে সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের নামে কোর্ট থেকে সমন গিয়ে হাজির হল। মামলার দিনে নির্দিষ্ট সময়ে শরৎচন্দ্র সামতাবেড় থেকে কোর্টে এসে হাজিরা দিলেম।

তখন পাব্লিক প্রসিকিউটর ছিলেন স্যার তারকনাথ সাধু। শরৎচন্দ্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অসীম। ইতিপূর্বে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' প্রকাশিত হলে তারকবাবু গ্রন্থকার ও প্রকাশককে অব্যাহতি দিয়ে শুধু 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত করারই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র এখন আবার সাক্ষ্য দিতে এলে, তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করাটাকেই তারকবাবু যেন নিজের পক্ষে লজ্জাকর ও অপমানজনক বোধ করতে লাগলেন। তাই তিনি জ্ঞানাঞ্জনবাবুকে অনুরোধ করলেন, শরৎচন্দ্রকে সাক্ষী হিসাবে যেন না তোলা হয়। তারকবাবু জ্ঞানাঞ্জনবাবুকে বুঝিয়ে বললেন—দেখুন, আপনি বিপ্লবের অর্থ হিংসাত্মক বা সশস্ত্রমূলক নয়, এরূপ প্রমাণ করলেও, আপনার বিরুদ্ধে আরও যেসব অভিযোগ রয়েছে, তাতে করেও আপনি অব্যাহতি পেতে পারেন না। কয়েক মাসের জন্য জেলে আপনাকে যেতেই হবে। অতএব শুধু শুধু শরৎবাবুকে কাঠগড়ায় তুলে হয়রাণ করবেন। আর সত্যি কথা বলতে কি, তাঁকে কাঠগড়ায় তুলে প্রশ্ন করতেও আমি একটু ইতস্ততঃ বোধ করছি। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি, শরৎবাবুকে আর সাক্ষী হিসাবে তুলবেন না।

তারকবাবুর অনুরোধে জ্ঞানাঞ্জনবাবু শরৎচন্দ্রকে আর কাঠগড়ায় তুললেন না।

নির্ভীকতা

শরৎচন্দ্র যখন তাঁর সামতাবেড়ের বাড়ীতে বাস করতেন, সেই সময় তাঁর এক বিশিষ্ট বন্ধু হাওড়ায় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন।

সেই সময়ের একদিনের একটি ঘটনা।

হাওড়ার অন্যতম মহকুমা উলুবেড়িয়ার এস, ডি, ও, ঊর্ধ্বতন অফিসার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে মাঝে মাঝে যেমন দেখা করতে আসেন, সেদিন শনিবারও তেমনি এসেছেন। কাজ মিটে গেলে ম্যাজিস্ট্রেট এস, ডি, ও,-কে বললেন—আপনার উলুবেড়িয়ার কাছেই তো সামতাবেড়। আর কাল রবিবারও আছে। তা আপনি আমার একটা কাজ করুন না। আমার একটা চিঠি আপনার কোন লোককে দিয়ে কাল সকালেই সামতাবেড়ে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে পৌঁছে দিন না! যদি পারেন তো বড় ভাল হয়। বিশেষ জরুরী চিঠি।

এস, ডি, ও, শুনে বললেন—লোক কেন, আমি নিজেই যাবো অখন। আপনার চিঠিটা নিয়ে গেলে শরৎবাবুর সঙ্গে তবু আমার একটা আলাপ করার সুযোগ হবে। শরৎবাবুকে আমি আজও পর্যন্ত চোখেই দেখি নি। অথচ আমি তাঁর সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—তা বেশ তো! আপনি গেলে তো ভালই হয়। তবে কালই কিন্তু যাওয়া চাই।

এস, ডি, ও, বললেন—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কাল সকালেই আমি আপনার চিঠি পৌঁছে দেব।

পরদিন সকালে এস, ডি, ও, চাপরাশীকে সঙ্গে নিয়ে সামতাবেড় রওনা হলেন। এস, ডি, ও, সামতাবেড়েয় ঢুকলে গ্রামের লোকরা একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। কারণ ঐ সময়টায় কংগ্রেস-কর্মীদের ব্যাপক ধর্-পাকড় চলছিল। তবে এস, ডি, ও, কেবলমাত্র চাপরাশীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন দেখে, লোকে কৌতূহলবশে এস, ডি, ও,-র পিছনে পিছনে যেতে লাগল। এস, ডি, ও, শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে এলে, তাঁর সঙ্গে পথের অনেক লোকও শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে এসে হাজির হ'ল।

সেদিন তখন ঐ অঞ্চলের দফাদার নিবারণ ঘোষাল মাঠে কাজে গিয়েছিল। এস, ডি, ও, এসেছেন, লোকমুখে এই কথা শুনেই সে সমস্ত কাজকর্ম ফেলে হস্তদন্ত হয়ে সাহেবের কাছে হাজিরা দিতে ছুটল। এস, ডি, ও, শরৎচন্দ্রের বাড়ীর উঠানে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিবারণ ঘোষালও হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হাজির হ'ল।

শরৎচন্দ্র ঐ সময় দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। এঁদের দেখে তিনি নীচে নেমে এলেন।

নিবারণ ঘোষাল ছুটে আসার জন্য তখনও হাঁফাচ্ছে। এস, ডি, ও, তাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠলেন—ওরে নিবারণ, পা ধোয়ার জল নিয়ে আয় তো। পথে যা ধুলো!

নিবারণ ঘোষাল ছিল শরৎচন্দ্রের নিকট প্রতিবেশী। কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান। অভাবের জন্য বেশী লেখাপড়া শিখতে পারে নি বলে, দফাদারীর এই সরকারী চাকরিটা নিয়েছিল। অনেকদিন ধরেই এই চাকরিটা করে আসছে। নিবারণের এখন বয়স এস, ডি, ও,-র বয়সের প্রায় দ্বিগুণ। এত লোকের মাঝখানে অব্রাহ্মণ এস, ডি, ও, বৃদ্ধ নিবারণ ঘোষালকে পা ধোয়ার জল আনতে বলায় সে জল আনতে যেতে যেন একটু ইতস্ততঃ করতে লাগল।

নিবারণ ঘোষাল শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশী তো ছিলই, তার ওপর তার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বেশ হৃদ্যতাও ছিল। নিবারণ প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে চা খেতে আসত। শরৎচন্দ্র একে খুড়ো বলে ডাকতেন।

অপরদিকে শরৎচন্দ্র এই এস, ডি, ও,-কে কংগ্রেসকর্মীদের একজন বড় শত্রু বলে জানতেন। কেন না, পদোন্নতির আশায় কারণে-অকারণে কংগ্রেস-কর্মীদের শাস্তি দেওয়া তাঁর যেন একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হিসাবে এটা বেশ লক্ষ্য করেছিলেন।

এস, ডি, ও, নিবারণ ঘোষালকে পা ধোয়ার জল আনতে বলায়, কথাটা শুনেই শরৎচন্দ্র এস, ডি, ও,-র উপর ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি নিবারণ ঘোষালকে বললেন—খুড়ো থাম। তোমাকে জল আনতে হবে না। দরকার হলে আমিই জল আনাচ্ছি।

নিবারণ ঘোষালকে এই কথা বলে, শরৎচন্দ্র এমন ক্রোধভরে এস, ডি, ও,-র দিকে একবার তাকালেন যে, এস, ডি, ও, যেন একেবারে সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন।

এস, ডি, ও,-র পায়ে জুতো-মোজা এবং পরণে হাফ্‌প্যান্ট ছিল। শরৎচন্দ্র এস, ডি, ও,কে বলতে লাগলেন—মশায়, দেখছি তো মোজা পরে আছেন। ধুলো যা লাগার সে তো আপনার ঐ জুতো-মোজার উপরেই লেগেছে। আর তা ছাড়া আপনি যে কোন কারণেই হোক্‌, আমার বাড়ীতে এসেছেন। আমার অতিথি। আপনার জলের প্রয়োজন হয়, আমাকে জানান। আমার চাকর-বাকর আছে, তাদের পাঠাই। তা না করে আপনি বাড়ী ঢুকেই—'নিবারণ! পা ধোয়ার জল নিয়ে আয়।' দেখছেন তো আপনি এসেছেন শুনে ও-বেচারা বুড়ো মানুষ কোথা থেকে হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে আসছে। আর না আসতে আসতেই,—'ওরে জল নিয়ে আয়'। দেখুন, আপনিও সরকারের চাকর, আর ও ও সরকারের চাকর। আপনি না হয় বড় চাকর, আর ও না হয় ছোট চাকর। তাই বলে ও আপনার পা ধোয়ার জল আনতে যাবে কেন? আপনি যান্‌ মশায়! আমার বাড়ী থেকে এখনি চলে যান্‌। বেরিয়ে যান্‌। আর আপনি যা পারেন, আমার বিরুদ্ধে করুন গিয়ে।

বেশ দুঁদে এবং প্রতাপশালী বলে এস, ডি, ও,র খুব নামডাক ছিল। গ্রামের লোকজন যারা এস, ডি, ও, এসেছেন বলে, কৌতূহলবশে এস, ডি, ও,র সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বাড়ী পর্যন্ত এসেছিল, শরৎচন্দ্রের এই ধরণের কথায় পাছে কিছু হাঙ্গামা ঘটে, এই ভয়ে তারা শঙ্কিত হয়ে উঠল।

এদিকে অত প্রতাপশালী এস, ডি, ও, শরৎচন্দ্রের এই শাসানিতে একেবারে যেন কেঁচো হয়ে গেলেন। কোন কথা বলতে পারলেন না। শুধু বললেন—না না, আমি তেমন কিছু ভেবে বলি নি।

শরৎচন্দ্র বললেন—আপনার কথার অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার। ওর মধ্যে আর তেমন-টেমন নেই। যান, বললাম তো, আপনি এখনি আমার বাড়ী থেকে চলে যান, বলেই শরৎচন্দ্র উঠান থেকে উপরে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন।

এস, ডি, ও, তখন আর কোন কথা না খুঁজে পেয়ে শুধু বললেন—আপনার একটা চিঠি আছে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট দিয়েছেন। সেই চিঠিটা এই।

শরৎচন্দ্র ফিরে হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিলেন। তারপর আর কোনও কথা না বলে সিধা উপরে উঠে গেলেন।

এস, ডি, ও, এবং উপস্থিত লোকজন সকলেই স্তম্ভিত। কারও মুখ দিয়ে আর একটাও কথা বেরোল না।

শেসে এস, ডি, ও, মাথা হেঁট করে শরৎচন্দ্রের বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

উভয়সঙ্কট (১)

হাওড়া জেলায় মৃগকল্যাণ একটা বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এক সময় এই গ্রামের যুবকরা প্রতি বছর কোজাগরী পূর্ণিমার দিন 'পূর্ণিমা সম্মেলন' করত। সেবার ১৩৩৮ সালের সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন শরৎচন্দ্র।

শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ী থেকে মৃগকল্যাণ প্রায় দশ মাইল পথ। শরৎচন্দ্র দেউলটিতে কটক রোড পর্যন্ত তিন মাইল পথ পাল্কীতে গিয়ে, তারপর মোটরে কটক রোড ধরে বাগনান হয়ে মৃগকল্যাণ যান।

সভা স্থরু হয়েছিল বিকালে, কিন্তু শেষ হল রাত্রি ন টার পর। শরৎচন্দ্র মোটরে দেউলটিতে যখন ফিরে এলেন, তখন রাত্রি দশটা বেজে গেছে। এখানে আগের পাল্কীটাই অপেক্ষা করছিল, তাতে চড়ে বাড়ী রওনা হলেন।

কটক রোড থেকে সামতাবেড়ের গা পর্যন্ত সমস্তটাই একটা মাঠ। এই মাঠের উপর দিয়েই পথ। এই মেঠো পথের মাঝামাঝি নাগাদ এসে শরৎচন্দ্রের উড়িয়া বাহকদের একজন হঠাৎ 'বাপলো মালো' করে চীৎকার করে পাল্কী ছেড়ে দিতেই, অপর বেহারারাও তখনি পাল্কী নামাল।

হঠাৎ ঐ রকম আর্তকণ্ঠ শুনে শরৎচন্দ্র ব্যস্ত হয়ে পাল্কী থেকে বেরিয়ে এলেন।

যে লোকটা চীৎকার করছিল, সে এবার শরৎচন্দ্রকে বলল—বাবু! আমাকে সাপে কামড়েছে—বলেই সে হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিল।

সাপে কামড়ানোর কথা শুনে অপর বেহারারাও হাউমাউ করতে আরম্ভ করল। শরৎচন্দ্র খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। ভাবলেন, বিষধর সাপে যদি কামড়ায় তাহলে তো আর রক্ষে নেই। এত রাত্রে এই মাঠের মাঝখানে একে নিয়ে এখন কি করা যায়!

বেহারাদের সঙ্গে হ্যারিকেন ছিল। শরৎচন্দ্র হ্যারিকেনটা নিয়ে দেখলেন, বেহারাটার পায়ে কিসে কামড়েছে বটে, তবে সাপের কামড় বলে মনে হল না। জিজ্ঞাসা করলেন—সাপ দেখেছিলি?

সে বলল—না বাবু, সাপ দেখতে পাইনি। তবে সাপে যে কামড়েছে, তাতে আর সন্দেহ নেই। লাফিয়ে উঠে কামড় দিয়েছে।

সাপ দেখে নি শুনে শরৎচন্দ্র অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। তাছাড়া তার শরীরে তখনো কোনরূপ বিষের ক্রিয়া দেখা যাচ্ছিল না। তাই শরৎচন্দ্র বুঝিয়ে বলতে গেলেন—সাপে কামড়ায় নি রে! কোন পোকা-মাকড়ে কামড়েছে হয়তো। ভয় নেই।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। বেহারারা সকলেই এক সঙ্গে চেঁচায়, আর বলে—বাবু বাঁচান! বাবু বাঁচান!

শরৎচন্দ্র তো মহা মুস্কিলেই পড়ে গেলেন। বেশ বুঝছেন যে, সাপে কামড়ায় নি, অথচ এ কথাটা আর বেহারাদের কিছুতেই বোঝাতে পারছেন না।

অবশেষে শরৎচন্দ্র এক মতলব ফাঁদলেন। মুখ গম্ভীর করে বিজ্ঞের ভাব দেখিয়ে হঠাৎ তাদের জিজ্ঞাসা করলেন—আজ তিথিটা কি বলতো রে?

তারা সকলেই একবাক্যে বলল—বাবু, আজি তো পূর্ণিমা তিথি অছি। আজি কোজাগরী পূর্ণিমা।

শরৎচন্দ্র এবার মুখে খুব খুশীর ভাব দেখিয়ে বললেন—তাহলে তো আর কোন ভয়ই নেই রে! পূর্ণিমা তিথিতে বিষধর সাপে কামড়ালেও বিষ ওঠে না।

বেহারারা সকলেই এবার তাদের হাউমাউ থামিয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে শরৎচন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর তারা বলল—সত্যি বিষ হয় না বাবু?

শরৎচন্দ্র বললেন—আরে এ কথাটা তো শিশুরাও জানে, আর তোরা জানিস্ নে? অমাবস্যা আর পূর্ণিমা এই দুই তিথিতে সাপের বিষ থাকে না। যত বড় বিষধর সাপই হোক না কেন, এই দুদিন সকলেই নির্বিষ। নে, পাল্কী তোল।

বেহারারা তবু প্রশ্ন করে—ঠিক জানেন তো বাবু?

এবার শরৎচন্দ্র বললেন—আরে আমি বামুন মানুষ। বই লিখে খাই। জীবনভোর পাঁজিপুঁথি নিয়েই কারবার। আর আমি জানি নে!

এতক্ষণ পরে 'আঃ বাঁচালেন বাবু!' বলে বেহারারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পাল্কী কাঁধে তুলল।

পাল্কীর ভিতরে শরৎচন্দ্র কিন্তু তখন মুচকি হাসছেন।

উভয়সঙ্কট (২)

কলকাতার এক ছাপাখানার মালিক এক সময় বাঙ্গলার বিখ্যাত বিখ্যাত লোকদের বাণী নিয়ে 'পূজার কার্ড' ছাপিয়ে বাজারে বিক্রি করতেন।

ঐ ছাপাখানার মালিক প্রথম বছরের কার্ডে রবীন্দ্রনাথের বাণী দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বছরে তিনি শরৎচন্দ্রের বাণী দেবেন ঠিক করলেন। একা শরৎচন্দ্রের কাছে গেলে, পাছে তিনি অনুরোধ না রাখেন, এই ভেবে তিনি সুপারিশ হিসাবে শরৎচন্দ্রের মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে একদিন শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে গেলেন।

উপেনবাবু, তাঁদের আগমনের হেতুটা যে কি, একথা শরৎচন্দ্রকে শোনালে, শরৎচন্দ্র বললেন—হবে না, হবে না। এ তো দেখ্ছি, ইংরেজদের হুবহু নকল করছ। ওরা যেমন খ্রীষ্টমাস ডে, নিউইয়ার্স ডেতে কার্ড ছাপায়, এও তোমাদের তাই। ঐ নকলের মধ্যে আমি নেই।

উপেনবাবু ও সেই ছাপাখানার মালিক উভয়েই শরৎচন্দ্রকে কত অনুরোধ করলেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র কিছুতেই কিছু লিখতে রাজী হলেন না।

শেষে উপেনবাবু কিছুটা বিরক্ত হয়েই তাঁর সঙ্গীকে বললেন—আপনার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নাম নিয়ে দরকার তো! ঠিক আছে, চলুন। কিছুদিন হল বাঙ্গলা সাহিত্যে আর একজন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেখা দিয়েছেন। তিনি 'গল্প-লহরী' কাগজের সম্পাদক এবং 'চাঁদ মুখ', 'হীরের ফুল', প্রভৃতি নামে ক খানা বইও লিখেছেন। চলুন আমরা তাঁর কাছে যাই। তাঁর বাণী নিয়েই কার্ড ছাপবেন। এতে আপনি তো আর কিছু বে-আইনী করছেন না। অথচ আপনার কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে। আপনি যে-শরৎ চাটুজ্জেকে দিয়েই লেখান, লোকে কিন্তু এই শরৎ চাটুজ্জেকেই ভাববে। আর লেখা যদি ভাল না হয় তো শরৎই ডুববে। তাতে আপনার আর কি! আপনার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নাম নিয়ে দরকার। উঠুন, তাহলে সেখানেই যাওয়া যাক।

উপেনবাবুর কথা শুনে শরৎচন্দ্র একটু চিন্তিত হলেন। শেষে বললেন—আর পারি নে। যত সব! বলে কাগজ কলম নিয়ে লিখতে সুরু করলেন।

এদিকে উপেনবাবু ও ললিতবাবুর মুখে তখন সাফল্যের হাসি।

পাখী শিকার

শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে থাকার সময় একটা দুনলা বড় বন্দুক কিনেছিলেন। বন্দুক কেনার আসল উদ্দেশ্য ছিল, বাড়ীতে বন্দুক আছে শুনলে চোর ডাকাত আসবে না।

প্রধানতঃ চোর ডাকাতের ভয়েই বন্দুক কিনলেও, তিনি মাঝে মাঝে রূপনারায়ণের চড়ায় পাখী শিকারেও বেরোতেন। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থাকার সময়ও সেখানে তাঁর বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতির সঙ্গে মাঝে মাঝে পাখী শিকার করতে যেতেন।

রূপনারায়ণের চড়ায় একবার পাখী শিকার করতে গিয়ে এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল, যার ফলে সেই থেকে তিনি শুধু বন্দুক ধরা ছেড়ে দেওয়াই নয়, বন্দুকও একেবারে বিদায় করে দিয়েছিলেন। সে ঘটনাটি এই :—

শরৎচন্দ্রের দিদির দেওর-পো'রা শরৎচন্দ্রের খুবই অনুগত ও ভক্ত ছিল। তারা তখন স্কুলের উপর ক্লাসে পড়ত।

শরৎচন্দ্র সেই সময় একদিন রবিবার সকালে তাঁর এই ভক্ত ভাগ্নের দলকে বললেন—চল্, আজ সব নৌকায় করে পাখী শিকার করতে বেরোব। একটা নৌকা ভাড়া করে নেব। আর নৌকাতেই সকলের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করব।

তারা তো এই কথা শুনে মহা খুশী। বাড়ীতে গিয়ে তারা যে যার বাপ-মায়ের কাছে বলল—বড় মামার সঙ্গে নৌকায় করে আজ পাখী শিকার করতে যাচ্ছি। নৌকাতেই বড় মামা আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। রূপনারায়ণেই স্নান করব। শুধু যে যার গামছা নিয়ে গেলেই হবে।

ছেলেরা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বেড়াতে যাবে শুনে, তাদের বাপ-মায়েরা বাধা দিলেন না। সানন্দেই অনুমতি দিলেন।

যথাসময়ে খাওয়ার জিনিষপত্র, উনুন, কাঠ, হাঁড়ি, কড়া প্রভৃতি নৌকায় চাপিয়ে, এক রাঁধুনী ঠাকুর ও এই ভাগ্নের দল সঙ্গে নিয়ে শরৎচন্দ্র পাখী শিকারে তথা নৌকা ভ্রমণে বেরোলেন।

পাখী মারার জন্যই নৌকা প্রশস্ত রূপনারায়ণের মাঝখান দিয়ে না গিয়ে

চরের ধার দিয়েই চলেছিল। ঠাকুর রান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ছেলেদের কেউ কেউ যারা একটু আধটু নৌকা বাইতে জানত, তারা উৎসাহের চোটে পালা করে মাঝিকে বিশ্রাম দিয়ে নিজেরাই হাল ধরছিল। আর শরৎচন্দ্র বন্দুকে টোটা ভরে পাখীর আশায় কখন রূপনারায়ণের বিস্তৃত চরের উপর, কখন বা উপরে আকাশের দিকে চেয়ে দেখছিলেন।

এইভাবে কিছুক্ষণ কাটলে, শরৎচন্দ্র হঠাৎ দেখতে পেলেন তাঁদের মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক বেলে-হাঁস উড়ে যাচ্ছে। এই দেখেই শরৎচন্দ্র তাঁর দিদির সেজ দেওরের বড় ছেলে ব্রজদুর্লভকে ডেকে বললেন—বেজা যা, গোটা কয়েক ঐ উড়ন্ত বেলে-হাঁসই মেরে দিচ্ছি, কুড়িয়ে নিয়ে আয়।

এই বলেই শরৎচন্দ্র বন্দুকের মুখটা আকাশের দিকে তুলতে যাবেন কি, অমনি কিভাবে বন্দুকের ঘোড়ায় হাত লেগে যেতেই গডাম্ করে শব্দ হল এবং বন্দুকের গুলি সামনে বসা 'বেজা'র কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'বেজা' হাল ছেড়ে দিয়ে ভয়ে চীৎকার করে উঠল। নৌকার সকলে এবং শরৎচন্দ্রও ভয়ে পাথরের মত হয়ে গেলেন।

পরে শরৎচন্দ্র নৌকার খোলের উপর বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে 'বেজা'কে বললেন—আয়, এদিকে উঠে আয়।

'বেজা' কাছে এলে বললেন—আজ তোকেও মেরেছিলাম, আর আমিও মরতাম। তোকে মেরে, মরাদেহ নিয়ে গিয়ে তোর মা-কে তো আর দিতে পারতাম না। তাই তোর মৃত্যুর পরে আমাকেও এই বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করতে হত। পাখী শিকার আমার এই পর্যন্তই শেষ। জীবনে আর এ নাম মুখে আনব না।

এরপর তিনি মাঝিকে বললেন—মাঝি নাও, এইখানেই নৌকা নোঙর কর।

আর ঠাকুরকে বললেন—ঠাকুর, রান্নার আর কত বাকি? রান্না হয়ে গেলে এদের খাওয়ার জায়গা কর। এরা ততক্ষণে স্নান করে নিক্।

সকলে যখন বাড়ী ফিরলেন, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে।

শরৎচন্দ্রের এই-ই শেষ পাখী শিকার করতে যাওয়া। এরপর তিনি বন্দুক বিদায় করে দিয়েছিলেন।

বিপ্লবীদের অর্থ-সাহায্য

গ্রেপ্তারী পরোয়ানা থাকায় বিপ্লবী বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় তখন সামতাবেড়ের অদূরে এক চাষীর বাড়ীতে কিছুদিন আত্মগোপন করে ছিলেন।

বিপিনবাবু সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মামা হতেন। তিনি ঐ সময় গোপনে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন এবং প্রয়োজন মত তাঁদের দলের জন্য শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে অর্থ সাহায্যও নিয়ে যেতেন।

একদিনের ঘটনা। সেদিন সকালে বিপিনবাবুর এক চর সামতাবেড়ে এসে শরৎচন্দ্রকে খবর দিয়ে গেলেন—ঠিক দুপুরের সময় আলুর ঝাঁকা মাথায় করে 'আলু চাই, আলু চাই' হাঁক দিয়ে বিপিনবাবু আপনার বাড়ীর পাশ দিয়েই যাবেন। তাঁর হাঁক শুনে আলু কেনার নাম করে তাঁকে বাড়ীর ভিতর ডেকে আনবেন। বাড়ীতে এসে তাঁর যা প্রয়োজন তিনি আপনাকে বলবেন।

দুপুরে শরৎচন্দ্র কান খাড়া করে বসে রইলেন। খানিক পরে সত্যই 'আলু চাই, আলু চাই' হাঁক শুনতে পেলেন। তখন তিনি মতলব করে তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকে ডেকে বললেন—বড়বৌ, কে যেন আলু আলু করে ডাকছে নয়? আলু নেবে নাকি?

হিরণ্ময়ী দেবী বললেন—এখন আবার আলু কি হবে? ঘরে তো রয়েছে।

—আহা, বেচারা এই রোদে শুধু শুধুই আলু আলু করে চেঁচিয়ে ঘুরে যাবে? তুমি ওর কিছু কেনো! আলু তো আর খারাপ হবার নয়।

ভৃত্য ননী আলুওয়ালাকে ডেকে আনলে হিরণ্ময়ী দেবী কিছু আলু কিনলেন। শরৎচন্দ্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। শেষে মতলব করে আলু-ওয়ালাকে বললেন—ওহে দুপুর তো হয়ে গেল, তোমার খাওয়াদাওয়া হয়েছে?

—না বাবু, কি করে আর হবে? আলু বেচে সেই সন্ধ্যায় গিয়ে খাব।

—এই ভর দুপুরে বামুন বাড়ীতে এসে না খেয়ে যাবে, চাট্টি খেয়ে যাও।

—তা বাবু, বামুন বাড়ীর পেসাদ হলে তো আমার ভাগ্য!

হিরণ্ময়ী দেবী অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা করতে রান্নাঘরের দিকে গেলেন। সেই সুযোগে শরৎচন্দ্র আলুওয়ালাবেশী বিপিনবাবুকে কাছে ডেকে তাঁর বক্তব্য শুনে নিলেন এবং এক ফাঁকে কিছু অর্থও তাঁকে দিয়ে দিলেন।

চরিত্রের কয়েকটি দিক

শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাস পড়ে তাঁর পাঠক-পাঠিকাদের মনে তাঁর সম্বন্ধে যে কথাটা সবচেয়ে বড় করে দেখা দেয়, সেটা হল—তিনি হলেন নারী-দরদী লেখক।

বাস্তবিক শুধু সাহিত্যেই নয়, শরৎচন্দ্র তাঁর ব্যক্তিজীবনেও সমাজ-পরিত্যক্তা, লাঞ্ছিতা ও অসহায়া নারীদের কতভাবেই না সাহায্য করতেন। এই গ্রন্থের 'সামতাবেড়ে বাস' অধ্যায়ে শরৎচন্দ্রের এই ধরণের কয়েকটি সাহায্যের উদাহরণ দিয়েছি। তিনি আত্মগোপন করে কিভাবে যে অসহায় নারীদের সাহায্য করতেন, এখানে তার আরও দুটি কাহিনী বলছি :—

শরৎচন্দ্র একবার কাশী বেড়াতে যান। সেখানে দৈবক্রমে একদিন একটি দুঃস্থা বৃদ্ধা বিধবার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এই বৃদ্ধাটি সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে ও বধূ ছিলেন এবং অতি অল্পবয়সে বিধবা হয়েছিলেন। বৃদ্ধার সঙ্গে পরিচয় হলে, বৃদ্ধা শরৎচন্দ্রকে 'ছেলে' বলে সম্বোধন করতে থাকেন। শরৎচন্দ্র বৃদ্ধাকে 'বুড়ি মা' বলে ডাকতেন। তিনি এই বৃদ্ধার দুরবস্থা দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি কিছু অর্থ সাহায্য করতে চাইলে, বৃদ্ধা নিতে চান নি ; অথচ এই বৃদ্ধার অর্থের প্রয়োজন বিশেষভাবেই ছিল। তখন শরৎচন্দ্র গোপনে কাশীর হরিদাস শাস্ত্রীর হাত দিয়ে এই বৃদ্ধার কাছে অর্থ সাহায্য পাঠিয়ে দিতেন। এ যে শরৎচন্দ্রের টাকা, বৃদ্ধা এর আদৌ কিছু জানতেন না। শরৎচন্দ্র গোপনে কি ভাবে বৃদ্ধাকে টাকা পাঠাতেন, এখানে শরৎচন্দ্রের একটি চিঠি উদ্ধৃত করে সে সম্বন্ধে দেখান গেল—

"মা, তোমার চিঠি পেয়েছি।···তুমি বাসা বদল করে ভালই করেছ। এ ঘর কি তোমার পছন্দ মত হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে ত, হয়ত ২।১ টাকা ভাড়া বেশী দিলে অপেক্ষাকৃত ভাল ঘর পাওয়া যেতে পারে। তোমার বাড়ী ভাড়ার জন্যে চিন্তা করার আবশ্যক নেই। কারণ সে টাকা হরিদাস দেবে। তোমার কাছে তারা বাড়ী ভাড়া চাইবেও না।"

শরৎচন্দ্র এই চিঠিতে 'সে টাকা হরিদাস দেবে' বলে যে কথা বলেছেন, সে টাকা কিন্তু তিনি নিজেই দিতেন, তবে টাকাটা হরিদাসের হাত দিয়েই বৃদ্ধার

কাছে পাঠিয়ে দিতেন। এই চিঠির কথা উল্লেখ করে কাশীর এই হরিদাস শাস্ত্রী নিজেই একবার এক জায়গায় বলেছিলেন—"কি ভাবে নিজেকে গোপন রাখিয়া তিনি সাহায্য দান করিতেন, তার একটি প্রমাণ এর মধ্যে আছে। চিঠিতে লিখিতেছেন, বাড়ী ভাড়া যা কিছু হরিদাস দিবে, উহা আত্মগোপনের প্রকার মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে টাকা তিনি আমার কাছে পাঠাইতেন, আমি বুড়ি মাকে দিতাম।" (সাহানা—১৩৪৬)

শরৎচন্দ্র যখন বাজে শিবপুরে থাকতেন, তখন তাঁর বাড়ীর খানদুয়েক বাড়ীর পরেই বিরাজ-বৌ নামে এক বিধবা মুড়িওয়ালী থাকত। বিধবার ছেলেপুলে ছিল না, একাই থাকত। সে মুড়ি ভেজে এবং সেই মুড়ি পাড়ায় পাড়ায় বেচে, কোন রকমে দিন চালাত। ঐ বিধবার আত্মসম্মান-জ্ঞান ছিল প্রবল। সে মুখ বুজে নিজের অভাব ও দুঃখ দারিদ্র্য সহ্য করতে জানত। সে সহজে কারও সাহায্য নিতে চাইত না।

শরৎচন্দ্র বিরাজ-বৌ এর অভাবের কথা জানতে পেরে, প্রধানতঃ তাকে গোপনে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই, স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন—প্রতিদিনই যেন বিরাজ-বৌ এর কাছ থেকে কিছু পয়সার মুড়ি কেনা হয়। গরম মুড়ি খেতে আমার বেশ ভাল লাগে, আমি তো খাবই, তোমরাও খাবে।

রোজ মুড়ি কেনা হয় কিনা, এটা পরীক্ষা করবার জন্য শরৎচন্দ্র তখন সাধারণতঃ মুড়ি না খেলেও, চা খাবার সময় মাঝে মাঝে হিরণ্ময়ী দেবীকে বলতেন—বড় বৌ আজ যে মুড়ি কিনেছ, সেই টাট্‌কা মুড়ি একটা বাটিতে করে মুঠো খানেক দিয়ে যাও তো।

হিরণ্ময়ী দেবী মুড়ি দিলে, শরৎচন্দ্র কিছু খেতেন। বাকিটা হয়ত ভেলু কুকুরকে দিয়ে দিতেন।

শরৎচন্দ্র বিরাজ-বৌকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করবার জন্যই যে মুড়ি কেনার ব্যবস্থা করেছিলেন, একথা বিরাজ-বৌ জানত না। এমন কি শরৎচন্দ্রের নিজের বাড়ীর লোকেরাও জানতেন না।

দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'ঘরের কথা ও যুগ-সাহিত্য' গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের কথা-প্রসঙ্গে এক জায়গায় লিখে গেছেন যে, তাঁর বেহালার বাড়ীতে একদিন

এক ব্যক্তি কোন এক চা বাগানে মেয়েদের উপর নির্যাতনের একটা কাহিনী বলছিলেন। সেদিন তখন শরৎচন্দ্রও দীনেশবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। শরৎচন্দ্র ঐ নারী-নির্যাতনের কাহিনীর কিছুটা শুনেই কাঁদতে কাঁদতে বক্তাকে বললেন—আর শোনাবেন না! দয়া করে চুপ করুন! আমি আর সহ্য করতে পারছি না!

নারীজাতির প্রতি শরৎচন্দ্রের এমনি ছিল দরদ!

নারীর প্রতিই শরৎচন্দ্রের দরদ বেশী করে দেখা দিলেও, দেশের সকল দুঃস্থ ও অভাবী মানুষের কথাও তিনি আদৌ ভোলেন নি। তিনি তাঁর সাহিত্যে এদের কথাও তুলেছেন। কিন্তু সাহিত্যের এই ক্ষুদ্রতম গণ্ডী ছাড়াও এই মানুষটি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে যে কতখানি হৃদয়বান, পরদুঃখকাতর, পরোপকারী ও বিপন্নের আশ্রয়স্থল ছিলেন, মনে হয় তার তুলনা নাই। যখনই প্রয়োজন হয়েছে, তখনই তিনি এই সব দুঃস্থ, রুগ্ন ও অভাবী মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

অভাব ও দারিদ্র্যের যন্ত্রণাকে তিনি বহুদিন ধরে আপন জীবনের মধ্যে নিবিড়ভাবে ভোগ করেছিলেন বলেই হয়ত, তিনি দেশের দরিদ্র ও অতিসাধারণ মানুষদের এমনি একজন প্রকৃত দরদীবন্ধু হতে পেরেছিলেন।

শরৎচন্দ্র দুঃখী মানুষের এই সেবার দীক্ষা নিয়েছিলেন একেবারে বাল্য বয়সেই। তিনি কি ছেলেবেলায়, কি যৌবনে—যখনই যেখানে থেকেছেন, তখনই সেখানকার দুঃস্থ প্রতিবেশীদের মধ্যে গিয়ে তাদের আর্থিক সাহায্য করেছেন, রোগীর সেবা করেছেন, আবার মৃতদেহেরও সৎকার করে এসেছেন। ছেলেবেলায় যখন তিনি নিজেই অভাবের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতেন, সেই সময়ও তিনি ভাগলপুরের বন্ধু রাজুর সঙ্গে গিয়ে জেলেদের মাছ চুরি করে, সেই মাছ বেচে গরীব মানুষদের সাহায্য করতেন।

শরৎচন্দ্র অনেকদিন দরিদ্র বস্তীবাসীদের মধ্যে কাটিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি তাঁর এই দুঃস্থ প্রতিবেশীদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। অসুখ হলে তাদের অনেকেরই ডাক্তার ডাকার সাধ্য নেই দেখে, শরৎচন্দ্র তখন হোমিওপ্যাথি বই কিনে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন এবং নিজেই তাদের চিকিৎসা করতেন। তিনি তখন তাদের সঙ্গে মিশে তাদেরই এমন একজন প্রিয়বন্ধু ও উপদেষ্টা হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাদের কাজে-কর্মে এই 'দাদাঠাকুর'টি না হলে তাদের আদৌ চলত না।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন ছেড়ে যখন স্বদেশে ফিরে এলেন, তখন সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর কিছুটা নামও হয়েছে, আর বই থেকেও কিছু কিছু আয় হতে সুরু হয়েছে। সেই সময় শরৎচন্দ্রের আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল না হলেও, তখন থেকেই তিনি তাঁর দরিদ্র আত্মীয় স্বজনদের কিছু কিছু করে আর্থিক সাহায্য করতে থাকেন। একবার তাঁর সমস্ত পুঁজি যে ব্যাঙ্কে ছিল, সেই ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে যাওয়ায়, তিনি তখন নিজের কথা চিন্তা না করে, এই দরিদ্র আত্মীয়দের সংসার কি করে চালাবেন, সেই ভেবেই অধীর হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময় এই ব্যাঙ্ক ফেলের কথা উল্লেখ করে তাঁর সাহিত্য-শিষ্যা লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন—

"...কয়েকদিন হইল আমার একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। এ্যালায়েন্স ব্যাঙ্কে যথাসর্বস্ব ছিল, ব্যাঙ্ক হঠাৎ ফেল হওয়ায় সমস্তই বোধ হয় গেল।...অনেকে আমার মারফৎ তাহাদের যথাসর্বস্ব আমার ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়াছিল, এই বিশ্বাসে যে আমি কখনও ফাঁকি দিব না। এখন এইগুলি কড়ায়-গণ্ডায় আমাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। অনেকগুলি পরিবারের ভার আমার কাঁধেই ছিল, কি যে তাহাদের বলিব ভাবিয়া পাই না। অথচ একথা নিশ্চয় যে আমি বন্ধ করিলে তাহাদের হাঁড়ি বন্ধ হইবে। ভগবান যদি দেন ত সে আলাদা কথা। অনেক সময় তিনি দেন না, মানুষকে অনাহারে অর্ধাহারে মরিতে হয়।...আত্মীয়দের সংসার লইয়াই যত ভাবনা।"

দরিদ্র আত্মীয়দের ছাড়া দুঃস্থ ও বিপন্ন অনাত্মীয় ও অজ্ঞাত ব্যক্তিদেরও তিনি যে কতভাবে সাহায্য করতেন, ইতিপূর্বে এই গ্রন্থের মধ্যে তার কিছু কিছু উদাহরণ দিয়েছি।

একবার রাস্তায় পরিত্যক্ত একটি সদ্যজাত অবৈধ শিশুকে দেখে তাঁর দরদী হৃদয় কিভাবে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, এখন তারই একটি করুণ কাহিনী বলছি :—

১৩৪১ কি ১৩৪২ সালের বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাস। একদিন বেলা দশটা নাগাদ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কলকাতায় রাসবিহারী এভিনিউ ধরে বাড়ি ফিরছিলেন। পণ্ডিতিয়া রোড আর রাসবিহারী এভিনিউর সংযোগস্থলে এসে হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল রাস্তার ধারে শরৎচন্দ্র দাঁড়িয়ে। হাতে ছাতা, মাথায় রোদ্দুর লাগছে, কিন্তু ছাতা খোলেন নি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন।

সুনীতিবাবু শরৎচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। এক পাড়াতেই দুজনের বাড়ী। সুনীতিবাবু নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করলেন—এত বেলায় এই রোদে রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে?

শরৎচন্দ্র বললেন—কাল রাত্রে এদিকে একটা দোকান থেকে টেলিফোন করেছিলাম, তার পয়সা তখন দেওয়া হয় নি। তারা পয়সা হয়তো নেবেও না, কিন্তু আমার তো দেওয়া উচিত। তাই দিতে বেরিয়েছি।

বাড়ীতে ফোন থাকতে শরৎচন্দ্র দোকানে এসে ফোন করেছেন—একথা শুনে সুনীতিবাবু একটু বিস্মিত হলেন। তাছাড়া, রাত্রেই বা কি দরকার পড়ল!

শরৎচন্দ্র বললেন—কাল রাত্রে এখানে একটা ব্যাপার হয়ে গেছে। সন্ধ্যের সময় নরেন দেবের বাড়ীতে গিয়েছিলাম, গল্প করতে করতে অনেকটা রাত হয়ে গেল। ফেরার সময় তাই নরেন আর তার স্ত্রী আমাকে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে সঙ্গে আসছিল। তিনজনে এই অবধি যখন এসেছি, দেখতে পেলাম, ঐখানে ঐ গাছতলায় জন চারেক লোক জটলা করছে। অনেক রাত হয়েছে, রাস্তায় লোক চলাচল কম, দেখে কৌতূহল হল। ভাবছি কি করি, এমন সময় ওদেরই একজন আমাদের ডেকে বললে—আপনারা এদিকে একটু আসুন তো!

আমরা এগিয়ে যেতেই পথের ধারে একটা কাপড়ের পুঁটলি দেখিয়ে তারা বললে—এর মধ্যে সদ্যজাত এক শিশু রয়েছে। এইমাত্র কারা যেন ফেলে দিয়ে গেছে। শিশুটি এখনো কাঁদছে। আমরা এ পথ দিয়ে যেতে যেতে শিশুর কান্না শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছি। কি করবো ভেবে পাচ্ছি না।

শিশুটিকে দেখে আমার বড্ড মায়া হল।

ঐ বন্ধ পুঁটলির মধ্যে শিশুটি তালগোল পাকিয়ে রয়েছে, এ আমার সহ্য হচ্ছিল না। একজনকে তাড়াতাড়ি খুলে ফেলতে বললাম। খুললে পর রাস্তার আলোয় দেখা গেল, দিব্যি ফুটফুটে গোলগাল একটি শিশু। খোলা হাওয়া পেয়ে তার কান্না যেন একটু কমলো। রাস্তায় এমন জায়গায় তাকে ফেলেছিল যে, এরই মধ্যে তার গা বেয়ে সারি সারি লাল পিঁপড়ের আক্রমণ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল।

বুঝলাম বাঁচাতে হলে একে অবিলম্বে হাসপাতালে পাঠানো দরকার। এত রাত, দোকানপাট সব বন্ধ, এখন ফোন করা যায় কোথা থেকে? নরেন খুঁজে খুঁজে এক দোকান বার করে সেখান থেকে ফোন করল।

হাসপাতাল থেকে বললে—এ-ধরণের রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে তারা নিতে পারে না, পুলিশে খবর দিতে হবে।

তখন পুলিশে ফোন করা হল। তারাও আসতে চায় না। শেষে নরেন আমার নাম বলায় পুলিশ বললে—আচ্ছা, লোক পাঠাচ্ছি।

পুলিশ না আসা অবধি শিশুটিকে কি করে বাঁচিয়ে রাখা যায়, তখন সেই হল আমাদের চিন্তা। নরেনের স্ত্রীকে বললাম—তুমি শিগগির বাড়ী যাও। বাড়ী গিয়ে কিছু মধু আর দুধ জোগাড় করে পাঠিয়ে দাও। দেখি ছেলেটিকে খাওয়ান যায় কিনা।

সে বাড়ী গিয়ে তখুনি মধু আর পাতলা কাপড়ের সলতে পাকিয়ে পাঠিয়ে দিল। দুধও এল।

সলতেয় মধু লাগিয়ে ছেলেটার মুখে ধরলাম। সে দিব্যি চক্‌চক্ করে খেতে লাগল। তবে দুধ আর ওকে ও রকম করে খাওয়ানো গেল না।

এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। নরেন, আমি আর সেই লোকগুলো বাচ্ছাটাকে নিয়ে পুলিশের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

পুলিশের লোক যখন এল রাত্রি তখন প্রায় একটা। তাদের মধ্যে একজন হিন্দুস্থানী রাইটার কনস্টেবল। প্রবীণ লোক, মানুষটা মনে হল মন্দ না। তাঁর কথায় বেশ একটা দুঃখ এবং ক্ষোভের ভাব লক্ষ্য করলাম। একটু শ্লেষের সঙ্গে তিনি আমাদের বললেন—আপনারা বাঙালী ভদ্রলোক, যেভাবে মেয়েদের আজকাল শিক্ষা দিচ্ছেন, তাতে এ জিনিস না হয়ে যায় না। প্রতি সপ্তাহে, কলকাতার মেইন ড্রেনের মধ্যে, এ ধরণের সদ্যজাত শিশুর মৃতদেহ দুটি-পাঁচটি হরদম পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া, পাড়ায় পাড়ায় রাস্তাঘাটে দু-চারটে করে যে প্রায়ই পাওয়া না যায়, তাও নয়। ইংরেজি শিখিয়ে সাবেক চাল, ঘর-সংসার, ধর্মপথে থাকা, এসব তো আপনারা মেয়েদের মন থেকে দূর করে দিচ্ছেন। তাই তারা না বিগড়িয়ে আর যায় কোথায়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুপ করে শোনা ছাড়া উপায় ছিল না। ছেলেটিকে নিয়ে তারা চলে গেল।

শরৎচন্দ্র শেষে সুনীতিবাবুকে বললেন—দেখ, কাল থেকে কেবলই ভাবছি, স্কুল-কলেজে যে আধুনিক শিক্ষা আমরা মেয়েদের দিচ্ছি, তার জন্যেই কি এত সব দুর্নীতি, এই সব হৃদয়হীনতা? তবে কি আমরা ভুল পথে চলেছি? আজ আবার এই জায়গাটায় এসে গত রাত্রের সমস্ত ঘটনা, আর

পুলিশের সেই কথাগুলো বারেবারেই মনে পড়ছিল। তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম। তোমাকেও জিগ্‌গেস করি সুনীতি, মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে আমরা কি তবে ভুল পথে চলেছি?

সুনীতিবাবু বললেন—আধুনিক শিক্ষাকে এর জন্যে দায়ী করা হয়তো ঠিক হবে না। আমার বিশ্বাস, এর পিছনে রয়েছে আমাদের অর্থনৈতিক অবনতি। যার ফলে, সমাজে বিবাহযোগ্য বয়সের অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে।

সুনীতিবাবুর কথা শুনে শরৎচন্দ্র ধীরে ধীরে বললেন—যা বলছ, হয়তো তাই ঠিক। তবুও না ভেবে পারি না, আমরা কি ভুল পথে চলেছি?

শুধু মানুষের উপরেই নয়, মূক জীবজন্তুর উপরেও শরৎচন্দ্রের দরদের সীমা ছিল না। জীবজন্তুর মধ্যে পথে-ঘোরা কুকুরকে কেউ খেতে দেয় না, কেউ আদর করে না বলে, এই পথের কুকুরের উপবেই তাঁর দরদেব টানটা ছিল একটু বেশী। এই পথের কুকুর নিয়ে তাঁর জীবনে অনেক ঘটনা আছে। এখানে তার কয়েকটি ঘটনা বলছি—

শরৎচন্দ্র তখন বাজে শিবপুরে বাস করছেন। সেই সময় শীতকালে একদিন বেলা ৯টা ১০টা নাগাদ তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে সামনে বড় রাস্তা বাজে শিবপুর রোডে এসে দাঁড়িয়েছেন। এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেলেন—অদূরে রাস্তার একপাশে গোটা চারেক কুকুর-ছানা পড়ে পড়ে কুঁই কুঁই করছে। কুকুর-ছানাগুলোর তখনও ভাল পা হয় নি, তাই তারা চলতে না পেরে এক জায়গায় জটলা করে পড়ে রয়েছে।

বড় রাস্তা দিয়ে কত লোক যাচ্ছে আসছে। কুকুর-ছানাগুলোর কুঁই কুঁই শব্দ শুনে কেউ হয়ত একবার তাকাচ্ছে, কেউ বা চোখও ফেরাচ্ছে না। যে যার কাজে চলে যাচ্ছে। কেবল তিনটি কৌতূহলী ছোট ছেলে কুকুর-ছানাগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছে।

শরৎচন্দ্র অল্পক্ষণ পরেই এগিয়ে গিয়ে ছেলে তিনটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—কিরে এদের মা কোথায় গেল?

ছেলে তিনটির মধ্যে যেটি বড়, সে বলল—তাকে অনেকক্ষণ থেকে দেখছি না। শুধু এরাই পড়ে আছে।

শরৎচন্দ্র ভাবলেন—পথের কুকুর, তাই হয়ত ক্ষুধার জ্বালায় কোথাও খেতে

গিয়ে নিশ্চয়ই সে বিপদে পড়েছে, তা না হলে সদ্যজাত বাচ্ছাগুলোকে ছেড়ে সে এতক্ষণ থাকবে কেন ?

তিনি ছেলে তিনটিকে বললেন—এদের মাকে তোরা চিনিস্ ?

—হাঁ, আমরা চিনি। সেটা দেখতে কাল রঙের।

—তোরা তাহলে পাড়ার আশেপাশে খুঁজে দেখ দেখি, তাকে দেখতে পাস্ কিনা। আমি ততক্ষণ এখানে দাঁড়াই। তোরা যা। পাড়ায় খুঁজে এখানে এসে আমাকে খবর দিবি।

ছেলে তিনটি কুকুরের খোঁজে চলে গেলে, শরৎচন্দ্র একা সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে ছেলেরা ফিরে এসে তাঁকে জানাল—তারা পাড়ায় অনেক খুঁজেও সেই কুকুরের সন্ধান পেল না।

এই কথা শুনে শরৎচন্দ্র মহা ভাবনায় পড়লেন। তিনি আপন মনেই বলতে লাগলেন—তাই তো রে, এদের মা না এলে, এরা বাঁচবে কি করে ?

এই বলে তিনি ছু হাতে ছুটি কুকুর-ছানাকে বুকের কাছে তুলে নিয়ে, বড় ছেলে ছুটিকে বললেন—নে, তোরা দুজনে একটা করে নিয়ে আমার সঙ্গে আয়।

বাড়ীতে এসেই শরৎচন্দ্র তাঁর ভৃত্য ভোলাকে ডেকে বললেন—ভোলা, একটা বড় দেখে চটের থলে নিয়ে আয় শিগ্গির।

ভোলা থলে নিয়ে এলে তার উপর কুকুর-ছানাগুলোকে শুইয়ে ভোলাকে বললেন—বাড়ীতে যা দুধ আছে, সেটা গরম করে নিয়ে আয়। পরে গোয়ালার কাছ থেকে এদের জন্যে আলাদা দুধের ব্যবস্থা করলে হবে।

এদিকে শরৎচন্দ্রের নিজের কুকুর ভেলু, হঠাৎ বাড়ীতে তার স্বজাতীয় কয়েকটি বাচ্ছাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। শরৎচন্দ্র শুধু মোটা গলায় 'ভেলু' বলে শাসাতেই সে চুপ করে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ভোলা দুধ গরম করে আনলে, শরৎচন্দ্র নিজেই একটা চামচে করে সেই দুধ কুকুর-ছানাগুলোকে খাইয়ে দিলেন।

রাস্তার ছেলে তিনটি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। শরৎচন্দ্র তাদের বললেন—তোরা তো এদের মাকে চিনিস্, তোরা সময় মত পাড়ায় তাকে খুঁজে দেখিস্। দেখতে পেলে তাকে এখানে নিয়ে আসবি, না পারলে আমায় খবর দিবি, বুঝলি ?

ছেলে তিনটি সম্মতি জানিয়ে চলে গেল।

এরপর শরৎচন্দ্র একদিকে যেমন ঐ মাতৃহারা অসহায় কুকুর-ছানাগুলোকে বাঁচাবার জন্য ঘড়ি ধরে সময়ে সময়ে তাদের খাইয়ে যেতে লাগলেন, অপর দিকে তেমনি নিজে তো বটেই, ভৃত্য ভোলা এবং প্রতিবেশী স্নেহভাজন যুবক অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার—তিনজনে মিলে ঐ কুকুর ছানাগুলোর মাকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন।

দু-তিন দিন ধরে সকাল, দুপুর, সন্ধ্যায় পাড়ায় পাড়ায় খোঁজ করে বেড়ালেন, কিন্তু কোথাও সে কুকুরের সন্ধান পেলেন না। সেই ছেলে তিনটিও এসে শরৎচন্দ্রকে বলে গেল যে, তারাও কোথাও তাকে দেখতে পায়নি।

শরৎচন্দ্র ভাবলেন, হয় তাকে কেউ ধরে রেখেছে, না হয় সে গাড়ী চাপা পড়ে মরেছে।

যাই হোক্, তবুও তিনি তার খোঁজ করতে ছাড়লেন না।

দু-তিন দিন পরে একদিন সকালে স্নান করে দেশবন্ধুর দেওয়া রাধাকৃষ্ণের পূজা করে শরৎচন্দ্র তসরের কাপড়-পরা এবং কপালে চন্দনের ফোঁটা অবস্থাতেই প্রতিবেশী অমরবাবুকে ডেকে বললেন—খাঁদু (অমরবাবুর ডাক নাম), আজ আমার মনে হচ্ছে কুকুরটাকে ঠিক পাওয়া যাবে। চল দেখি একবার খুঁজতে বেরোই। এই বলে শরৎচন্দ্র সেই অবস্থাতেই অমরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে কুকুর খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন।

শরৎচন্দ্রের বাড়ীর অদূরে একটা পোড়ো বাড়ী ছিল। বাড়ীটায় কোন লোকজন না থাকায় বাড়ীটা বনজঙ্গলে ভর্তি হয়েছিল। শরৎচন্দ্র কিছুটা গিয়ে অমরবাবুকে বললেন—খাঁদু, অনেক জায়গায় ঘুরে দেখেছি, কিন্তু ঐ পোড়ো বাড়ীটায় যাওয়া হয় নি। চল, একবার ওখানটা দেখি।

এই বলে দুজনেই বন ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পোড়ো বাড়ীটার উঠানে গেলেন। উঠানের এক পাশে একটা পাতকুয়া ছিল। সেই পাতকুয়া দেখে শরৎচন্দ্র এগিয়ে গিয়ে পাতকুয়ার ভিতরে উঁকি দিলেন। উঁকি দিয়েই তিনি দেখতে পেলেন, অগভীর শুকনো পাতকুয়ার মধ্যে কাল রঙের কুকুরের মত কি যেন একটা শুয়ে রয়েছে। শরৎচন্দ্র এই দেখেই বলে উঠলেন—দেখ, দেখ খাঁদু, মনে হচ্ছে যেন এই সেই কুকুর!

অমরবাবু দেখে বললেন—ঐটাই আমারও মনে হচ্ছে।

শরৎচন্দ্র বললেন—খাবারের সন্ধানে এসে, নিশ্চয়ই এই কুয়ার মধ্যে পড়ে গেছে। মনে হচ্ছে এখনও মরে নি। ক্ষুধায় নির্জীব হয়ে পড়ে আছে।

—না মরে নি। ঐ যে নড়ছে দেখা যাচ্ছে।

—খাঁদু, তুমি এক কাজ কর, এখনি বাড়ীতে গিয়ে ভোলাকে বলে এস, সে যেন দোকান থেকে কিছু কাতাদড়ি, সন্দেশ ও গোটাকয়েক পাঁউরুটি কিনে, একটা বড় ঝোড়া সঙ্গে নিয়ে এখনি এখানে চলে আসে।

অমরবাবু তখনি ভোলাকে খবর দিতে গেলেন। খবর দিয়েই আবার শরৎচন্দ্রের কাছে ফিরে এলেন।

ভোলা সব নিয়ে এলে, শরৎচন্দ্র ভোলাকে বললেন—তুই খাঁদুকে নিয়ে দড়িটা খুলে ছ-তিন ফেরতা কর। তারপর সমান সমান ব্যবধানে ঝোড়াটার চার জায়গায় বেঁধে, ওটাকে একটা ঝোলার মত কর।

বাঁধা হলে শরৎচন্দ্র এবার নিজে কয়েকটা সন্দেশ এবং কয়েকটা পাঁউরুটিকে বড় বড় টুকরো করে ঝোড়ার মধ্যে দিয়ে দড়ি বাঁধা ঝোড়াটাকে পাতকূয়ার মধ্যে নামিয়ে বসিয়ে দিলেন।

ক্ষুধার্ত দুর্বল কুকুরটা ক'দিন পরে খাবারের গন্ধ পেয়ে কোন রকমে ঝোড়ার মধ্যে উঠে পাঁউরুটি ও সন্দেশ খেতে সুরু করল। তখন শরৎচন্দ্র কুকুর সমেত সেই ঝোড়াটা টেনে উপরে নিয়ে এলেন। উপরে যে পাঁউরুটি ও সন্দেশ ছিল, সেগুলোও ঝোড়ার মধ্যে দিয়ে দিলেন।

কুকুরটা এক তো সদ্য প্রসবের পর দুর্বল ছিলই, তার উপর কদিন খেতে না পেয়ে একেবারে মরার মত হয়ে গেছল। সে নড়তে পারছিল না, ঝোড়ার মধ্যে শুয়ে শুয়েই খাচ্ছিল।

এবার শরৎচন্দ্র, অমরবাবু ও ভোলার সাহায্যে ঝোড়া সমেত কুকুরটাকে বাড়ীতে নিয়ে এলেন। এনে তাকে তার বাচ্ছাদের কাছে ছেড়ে দিলেন।

নিজের সন্তানদের পেয়ে কুকুরটার মাতৃহৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। চোখে মুখে তার কি খুশীর ভাব। সে তার সন্তানদের স্তন্যদান করতে করতে অসীম বিস্ময়ে শরৎচন্দ্রের দিকে চেয়ে রইল। মানুষের মত কুকুরেরও মন বলে যদি কিছু থাকে, তাহলে হয়ত সে তখন ভাবছিল—লোকটা মানুষ না দেবতা!

ওদিকে দাওয়ার উপর ভেলু বাড়ীতে আর একটা কুকুর এল দেখে ঘেউ ঘেউ সুরু করে দিয়েছিল।

শরৎচন্দ্র ভেলুর দিকে চেয়ে শুধু গম্ভীর হয়ে বললেন—এই ভেলু!

অমনি ভেলু ঘেউ ঘেউ বন্ধ করে নিজের তক্তপোষের উপর লাফিয়ে উঠে অভিমান ভরে কিছুক্ষণ ধরে গোঁ গোঁ করতে লাগল।

১৩৪৪ সালের বৈশাখ মাসে শরৎচন্দ্র স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য দেওঘরে একবার বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি দেওঘরের রাস্তা থেকে একটা বেওয়ারিশ কুকুরকে নিয়ে গিয়ে খুব খাওয়াতেন এবং আদর যত্ন করতেন। শরৎচন্দ্র যতদিন দেওঘরে ছিলেন, এই কুকুরটি ততদিন তাঁর কাছে ছিল। তিনি কুকুরটির নাম দিয়েছিলেন—অতিথ। দেওঘর থেকে চলে আসবার দিন শরৎচন্দ্র এই অতিথকে উদ্দেশ করে লিখেছিলেন—

গেটের বাইরে সার সার গাড়ী এসে দাঁড়ালো। মালপত্র বোঝাই দেওয়া চললো। অতিথ মহাব্যস্ত, কুলিদের সঙ্গে ক্রমাগত ছুটোছুটি করে খবরদারি করতে লাগলো কোথাও যেন কিছু খোয়া না যায়। তাব উৎসাহই সব চেয়ে বেশি।

একে একে গাড়ীগুলো ছেড়ে দিলে, আমার গাড়ীটাও চলতে সুরু করলে। স্টেশন দূরে নয়, সেখানে পৌঁছে নাবতে গিয়ে দেখি অতিথ দাঁড়িয়ে। কিরে, এখানেও এসেছিস্? সে ল্যাজ নেড়ে তার জবাব দিলে—কি জানি মানে তাব কি।

টিকিট কেনা হলো, মালপত্র তোলা হলো, বন্ধু এসে খবর দিলেন ট্রেন ছাড়তে আর এক মিনিট দেরি। সঙ্গে যারা তুলে দিতে এসেছিল, তারা বক্‌সিস পেলে সবাই, পেলে না কেবল অতিথ। গবম বাতাসে ধুলো উড়িয়ে সামনেটা আচ্ছন্ন করেছে, যাবার আগে তারই মধ্য দিয়ে ঝাপসা দেখতে পেলাম, স্টেশনের ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে অতিথ। ট্রেন ছেড়ে দিলে।

বাড়ী ফিরে যাবার আগ্রহ মনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না। কেবলি মনে হতে লাগলো অতিথ আজ ফিরে গিয়ে দেখবে বাড়ীর লোহার গেট বন্ধ—ঢোকবার যো নেই। হয়ত পথে দাঁড়িয়ে দিন দুই তার কাটবে, হয়ত নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের কোন ফাঁকে লুকিয়ে উপরে উঠে খুঁজে দেখবে আমার ঘরটা—তারপরে পথের কুকুর পথেই আশ্রয় নেবে।

হয়ত, ওর চেয়ে তুচ্ছ জীব সহরে আর নেই, তবুও দেওঘর বাসের কটা দিনের স্মৃতি ওকে মনে করেই লিখে রেখে গেলাম।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৩০শে বৈশাখ, ১৩৪৪

শরৎচন্দ্র একবার কাশীতে উত্তরা-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ীতে গিয়ে কিছুদিন ছিলেন। সেই সময় সুরেশবাবুদের পাড়ায় অনেকগুলো কুকুর ছিল, যেগুলো কেবল পথে পথে ঘুরে বেড়াত। তাদের কোন মনিব বা প্রভু ছিল না। তারা একরূপ খেতেই পেত না। সেই সব পথের কুকুরকে ডেকে কেউ খেতে দিত না। তাই তাদের খাওয়ার কষ্ট দেখে, শরৎচন্দ্র একদিন একটা দোকানে গিয়ে তাদের জন্য অনেক টাকার লুচি, পুরি, কচুরি, সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি কেনেন। তারপর একটা মুটের মাথায় ঐ সব চাপিয়ে সুরেশবাবুদের বাড়ীর যে রকটা বড় রাস্তার দিকে ছিল, সেখানে নিয়ে আসেন। সেখানে বসে শরৎচন্দ্র পাড়ার ঐ পথের কুকুরগুলোকে ডেকে ডেকে পেট পুরে লুচি মোণ্ডা খাওয়ালেন।

শরৎচন্দ্রের এই ব্যাপার দেখে পথচারী ভদ্র-অভদ্র উপস্থিত সকলে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল। শরৎচন্দ্র কাকেও কিছু না বলে, শুধু সুরেশবাবুকে বললেন—দেখ সুরেশ, পথের কুকুরগুলোকে দেখলেই আমার যেন কেমন কষ্ট হয়। এদের দেখবার কেউ নেই। কেউ এদের আদর করে কোন দিনই খেতে দেয়নি। বরং দেখতে পেলে অনেকেই এদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। বেচারাদের জীবন সত্যিই বড় দুঃখের। আমার যদি টাকা থাকত, তাহলে আমি এদের জন্য একটা অন্নসত্র খুলে দিতাম।

শুধু কুকুরই নয়, ছাগল, গরু, পাখী প্রভৃতি মূক জীবজন্তুর উপরও শরৎচন্দ্রের একটা গভীর দরদ ছিল।

গরুর উপর শরৎচন্দ্রের যে কি দরদ ছিল তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর মহেশ গল্পে। এই গল্পে একটি গরুর যে করুণ চিত্র তিনি এঁকেছেন, পৃথিবীর সাহিত্যে মূক প্রাণীকে নিয়ে এত ভাল গল্প বোধ করি খুব কমই রচিত হয়েছে।

পশুপক্ষীর উপরে শরৎচন্দ্রের এতখানি দরদ ছিল বলেই তিনি নিজে পশুক্লেশ-নিবারণী সমিতির সদস্যও হয়েছিলেন। তিনি অনেকদিন ধরে পশুক্লেশ-নিবারণী সমিতির (সি-এস-পি-সি-এ বা ক্যালকাটা সোসাইটি ফর প্রিভেনসন্ অব্ ক্রুয়েলটি টু এনিমেলস্) হাওড়া শাখার সভাপতি ছিলেন। এই সমিতিকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। সমিতির হাওড়া শাখার সভাপতি থাকাকালে, একবার ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে গাড়োয়ানরা এই পশুক্লেশ-

নিবারণী সমিতির কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করে এবং এই নিয়ে কলকাতা ও হাওড়ায় এক ভীষণ হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। ঠিক এই সময়টায় হাঙ্গামার কথা কিছু না জেনেই তিনি ঢাকা যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং সেজন্য তিনি ঢাকার পথে রওনাও হয়েছিলেন। কিন্তু পথে যখন শুনলেন যে, গাড়োয়ানরা পশুক্লেশ-নিবারণী সমিতির বিরুদ্ধে ধর্মঘট সুরু করে দিয়েছে এবং এই নিয়ে হাঙ্গামাও আরম্ভ হয়েছে, তখনই তিনি ঢাকা যাওয়া বন্ধ করে মাঝপথ থেকেই ফিরে এসেছিলেন। এ কথার উল্লেখ করে তিনি সেদিন ঢাকায় তাঁর আমন্ত্রণকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাঁর বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন—

"ভাই চারু,

আজ ঢাকার জন্যে রওনা হয়েও বাড়ী ফিরে যা'চ্ছি। আজ কলকাতায় গাড়োয়ানের দল ধর্মঘট এবং সত্যাগ্রহ করায় অর্থাৎ সি-এস-পি-সি-এ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করার ফলে একটা মহামারী ব্যাপার ঘটে, সার্জেণ্টদের সঙ্গে পেটাপেটি হয়—কেল্লা থেকে গোরা এসে গু'লি চালায়। শুনা'চ ৪ জন মরেছে।

ও ত গেল কলকাতার কথা। কিন্তু হাবড়া শহরেও সি-এস-পি-সি-এ আছে এবং আমি তার চেয়ারম্যান। এও একটা বড় ডিপার্টমেণ্ট ; আজ হাবড়ার ম্যাজিস্ট্রেট এবং এস-পি কোনমতে হাবড়ার দাঙ্গা বাঁচিয়েছে, কিন্তু কাল কি ঘটে বলা যায় না। অথচ, এই ডিপার্টমেণ্টের কর্তা হয়ে আমার এ সময়ে দেশ ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলে না, এই জন্যেই মাঝপথ থেকে ফিরে যাচ্চি। কাল সকালেই আবার ফিবে আসতে হবে।

জানি তুমি অতিশয় দুঃখিত হবে, কিন্তু এই না যাওয়াটা আমার নিতান্তই দৈবের ব্যাপার। ..."

এবার পাখীর প্রতি শরৎচন্দ্রের একটি দরদের কাহিনী এখানে বলছি। সে কাহিনীটি এই :—

শরৎচন্দ্র একদিন কলকাতায় কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট দিয়ে হেঁটে শ্যামবাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ এক বড়লোকের বাড়ীর ভিতরে একটা পাখীর আর্ত চীৎকার শুনতে পেলেন। পাখীর এই করুণ কণ্ঠস্বর শুনেই শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সেই সম্পূর্ণ অপরিচিত বড়লোকের বাড়ীর ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। গিয়ে দেখেন, উঠানে একটা কাকাতুয়া পাখী তার

দাঁড়ে ঘুরতে ঘুরতে কিভাবে লম্বা চেনে তার গলা জড়িয়ে ফেলেছে এবং জড়ানো ফাঁস থেকে উদ্ধার পাবার জন্যই সে ঐভাবে কাতরকণ্ঠে চীৎকার করছে।

শরৎচন্দ্র তখনই পাখীটির কাছে গিয়ে তার গলার ফাঁস খুলে দিলেন।

এই সময় বাড়ীর মালিক এসে গেলে, শরৎচন্দ্র তাঁকে বললেন—এ পাখী আপনার? জীবজন্তু পুষতে হলে অন্তরে মমতা থাকা চাই, বুঝলেন! পাখীটা কতক্ষণ ধরে যন্ত্রণায় চেঁচাচ্ছে, সেদিকে কারুরই হুঁস নেই।

গৃহকর্তা প্রথমে শরৎচন্দ্রকে চিনতে পারেন নি। তারপর চিনতে পেরেই হাতজোড় করে শরৎচন্দ্রের কাছে ক্ষমা চেয়ে বললেন—এভাবে যখন এসে পড়েছেন গরীবের বাড়ীতে, তখন···

শরৎচন্দ্রের গলার স্বর তখনই বদলে গেল। তিনি একান্ত পরিচিতের মত হয়ে বললেন—না হে না, বিশেষ দরকারে বেরিয়েছি। তাই হয়ত দেরী হয়ে গেল, যাই '—বলে বেরিয়ে এলেন।

মানুষের কালশত্রু বিষধর সাপের উপর পর্যন্তও শরৎচন্দ্রের স্নেহ ছিল। শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীর আশেপাশে অনেক বিষধর সাপ ছিল। তিনি সেই সব সাপকে মারতেন না, এমন কি তাড়া পর্যন্তও দিতেন না। বরং অপরে তাড়া দিতে গেলে তিনি তাদেব বিশেষভাবে বাধা দিতেন।

এ সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎ-পরিচয়' গ্রন্থে এক জায়গায় লিখেছেন—

"শরতের সাপের উপর আজীবন ভালবাসা ছিল। সামতার বাড়ীতে শীতের দুপুরে সামনের বাগানের ঘাসের উপর বড় বড় সাপ রোদ পোয়াত। শরৎ পাহারা দিচ্ছেন, ছেলেমেয়েদের মানা করছেন, 'ওরে তোরা ওদিকে যাস্ নে! আহা! ওরা একটু রোদ পোয়াচ্ছে, তোরা গেলে যে পালিয়ে যাবে।' "

মানুষের ভীষণ শত্রু সাপের উপরও শরৎচন্দ্রের এমনি দরদ ছিল।

খেয়ালী

শরৎচন্দ্র খুবই খেয়ালী মানুষ ছিলেন। তিনি সব সময়েই নিজের খেয়ালে চলতেন। কি নিজের বেশভূষায়, কি আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে লৌকিকতা নিয়ে, কি সভা-সমিতিতে গিয়ে, তিনি কখন কখন খেয়ালের চূড়ান্ত করে ছাড়তেন।

নিজের পোষাক-আসাকে খেয়াল চালালে, অপরের তেমন অসুবিধা হতে না পারে, কিন্তু অন্যত্র খেয়ালে চললে অপরকে যে অসুবিধায় পড়তে হয়, এ খেয়াল তিনি রাখতেন না। তাঁর এইরূপ খেয়ালী স্বভাবের কয়েকটি কাহিনী এখানে বলছি :—

প্রথমে তাঁর বেশভূষার কথাই বলি।

তিনি বাড়ীতে প্রায়•সকল সময়ই খালি গায়ে থাকতেন এবং লোকে দেখা করতে এলেও তিনি খালি গায়েই দেখা করতেন।

শরৎচন্দ্র বাড়ীতে কখনো কখনো কাপড়কে দুভাঁজ করে লুঙ্গির মতন করে পরতেন এবং পৈতাকে মালার মত কবে গলায় ঝুলিয়ে রাখতেন। আবার সাধারণভাবে কাপড় পরে কাঁধে বা কোমরেও পৈতা রাখতেন।

শরৎচন্দ্র বাড়ীতে যখন জামা গায়ে দিয়ে থাকতেন, তখন তিনি সাধারণতঃ 'মির্জাই' পরতেন। বাইরে বেরোবার সময় তিনি পাঞ্জাবী অথবা কোট পরতেন। তাঁর কোট ছিল কলারহীন, বোতামওয়ালা গলাবন্ধ। কোটের ঝুলটা ছিল সাধারণের চেয়ে একটু বেশী। কোটেব ধরণটা ছিল অনেকটা চাইনীজ কোটের মত।

শরৎচন্দ্র ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত অনেকদিন জামা (পাঞ্জাবী), ধুতি, চাদর সবই সিল্কের পরতেন। এই সময় তিনি এমনই বিলাসী ছিলেন যে, রূপার থালা, গেলাস, বাটিও ব্যবহার করতেন।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হলে, শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর আহ্বানে কংগ্রেসে যোগদান করেন। কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ঐ সময়কার বিলাসী শরৎচন্দ্র

একদিনেই সিল্কের সমস্ত পোষাক পরিত্যাগ করে, কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী মোটা খদ্দর ধরেন। এই সময় তিনি রূপার থালা গেলাস ব্যবহার করাও ছেড়ে দেন।

অনেকদিন তিনি নিষ্ঠার সহিতই খদ্দর পরেছিলেন। ঐ সময় তিনি কংগ্রেসের নির্দেশ মত চরকায় সুতাও কাটতেন এবং ভাল সুতাই কাটতে পারতেন। পরে তিনি খদ্দর পরা ছেড়ে দেন। খদ্দর ছেড়ে দিয়ে তিনি আর সিল্ক ধরলেন না, মিলের জামা কাপড়ই পরতে লাগলেন। বাড়ীতে পূজা-আরাধনা করবার সময় তিনি তসরের ধুতি পবতেন।

শরৎচন্দ্র বাইরে বেরোবার সময় একটা উড়ুনি, না হয় একটা চাদর কাঁধে নিতেন। উড়ুনি বা চাদর সব সময়েই তাঁর কাঁধে থাকত। এমন কি যখন মোটা খদ্দর পরতেন, তখনও একটা খদ্দরের চাদর কাঁধে নিতে ভুলতেন না।

শরৎচন্দ্র বাইরে বেরোবাব সময় যেমন উড়ুনি বা চাদর নিতেন, তেমনি কোথাও যাওয়ার সময় হাতে একটা ছড়ি অথবা লাঠি নিতেন। তাঁর অনেক রকমের ছড়ি ছিল এবং সব ছড়িই ছিল খুব দামী। তাঁব কোন কোন ছড়ির ভিতরে 'গুপ্তি ও ছিল। শেষ বয়সে তিনি ছড়ি ছেড়ে দিয়ে মোটা বেতের লাঠি ব্যবহার করতেন। তিনি যে ছাতি ব্যবহার করতেন সেও ছিল বেশ সৌখীন ও দামী। তাঁর রকমারি চশমাও ছিল। রীমলেশ সোনার চশমাও তিনি পবতেন।

শরৎচন্দ্রের জুতো ছিল হরেক রকমের। ক্যাম্বিসের জুতো থেকে আরম্ভ করে তখনকার দিনের হোয়াইটওয়ের ৩২॥• টাকা দামের রেক্স-স্যু পর্যন্ত। তালতলার শুঁড়তোলা চটি তাঁর প্রিয় ছিল। এই চটিই তিনি সাধারণতঃ বাড়ীতে পবতেন। খেয়াল হলে বাইরেও আবার এই চটি পরেও যেতেন।

রেঙ্গুনে থাকাব সময় শরৎচন্দ্র দাড়ি রেখেছিলেন। রেঙ্গুন থেকে ফিরে আসার পরেও কয়েক বছর পর্যন্ত তাঁর দাড়ি ছিল। তারপর তিনি গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে ফেলেন এবং আর কখনো গোঁফ-দাড়ি রাখেন নি।

শরৎচন্দ্রেব যখন দাড়ি ছিল, তখন যারা তাঁকে না জানতো, তারা সকলেই তাঁকে মুসলমান ভাবতো। লোকে অনবরত তাঁকে মুসলমান ভাবার জন্যই শেষ পর্যন্ত নাকি তিনি দাড়ি ফেলে দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রকে লোকে কি রকম মুসলমান ভাবতো, এখানে তারই দু-একটা ঘটনা বলছি।

শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের প্রতিবেশী সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে তাঁর 'শরৎ-স্মরণে' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন—

"শরৎবাবু বাজে শিবপুরে আসিয়া বাস করেন। এত স্থান থাকিতে বাজে শিবপুরেই কেন আসিলেন, সে কথা তাঁহার মুখে শুনি নাই। নিকটেই তাঁহার এক আত্মীয়ের বাড়ী, বোধ হয় সেই আকর্ষণেই আসিয়া থাকিবেন। মাথায় এক রাশ চুল, চিবুকে অনতিদীর্ঘ দাড়ি, আসিয়াই যখন মুদি শরৎচন্দ্র শীটের দোকানে প্রবেশ করিলেন, তখন কোনও মুসলমান খরিদ্দার মনে করিয়া সে বলিল—কি চান?

—সরু চাল আছে?

—দাদখানি?

—না, অন্য দেশী চাল হইলেই চলিবে।

—মহাশয়ের নাম?

—শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

—প্রণাম, বসুন। তামাক খান কি?

—খুব…" (মাসিক বসুমতী—মাঘ, ১৩৪৪)।

কংগ্রেসকর্মী হেমন্তকুমার সবকার লিখেছেন—

"হাওড়ায় দাঙ্গা হওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেট শরৎচন্দ্রকে তলব করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নাকি মুসলমান মনে করায় তিনি ৪০ বৎসরের পোষা দাড়ি কামাইয়া ফেলিযাছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটকে শবৎদা নাকি বলেন—হুজুর, হাওড়ায় মুসলমানের অভাব কি? আপনার যত ইচ্ছা গ্রেপ্তার করিতে পারেন, কিন্তু এ ব্রাহ্মণ সন্তানকে লইয়া টানাটানি কেন?" (বাতায়ন—শরৎ-স্মৃতি সংখ্যা, ১৩৪৪)

শরৎচন্দ্র ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও এক সময় এ সম্পর্কে পরিহাস করে বলেছিলেন—একবার তিনি দিদির বাড়ী বেড়াতে গিয়ে তাঁর বাজে শিবপুরের বাড়ীতে ফিরে আসছিলেন। ট্রেনে একজন মুসলমান তাঁর পাশেই বসেছিল, সে শরৎচন্দ্রের দাড়ি দেখে তাঁকে মুসলমান ভাবে। এই ভেবে সে শরৎচন্দ্রকে আর কিছু না বলেই—ভাই সাহেব পান নিন—বলে এক খিলি পান দিতে যায়। এই ঘটনার পর তিনি বাড়ী ফিরেই দাড়ি কামিয়ে ফেলেছিলেন।

শরৎচন্দ্র গায়ে বা মাথায় তেল মাখতেন না। মাথায় তেল না মাখার ফলে তাঁর চুল সব সময়েই উস্কো-খুস্কো হয়ে থাকতো।

শরৎচন্দ্রকে বিভিন্ন অবস্থায় দেখে যাঁরা কোথাও কোথাও তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন, এখানে এখন তারই কিছু কিছু উদ্ধৃত করছি—

শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বন্ধু সতীশচন্দ্র দাস তাঁর 'শরৎ-প্রতিভা' গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের বেশভূষার কথা-প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"তাঁর বেশভূষা ছিল সরু পাড়ের সাধারণ ধুতি কাপড়, সাধারণ জামা, চটি জুতো, গায়ে চাদর ও একটা লাঠি। রেঙ্গুনে অবস্থানকালে তাঁর গোঁফ-দাড়িও ছিল। সদাসর্বদাই বৃদ্ধোচিত সাজপোষাক পরিয়াই চলিতেন, কেহ কোন কথা বলিলে তিনি বলিতেন, বৃদ্ধই তো হয়েছি!"

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যিক যামিনীকান্ত সোম একদিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বাজে শিবপুরের বাসায় দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেদিনকার কথার উল্লেখ করে যামিনীবাবু তাঁর 'শরৎ-স্মৃতি' প্রবন্ধে লিখেছেন—

"একদিন গেলুম শরৎবাবুর কাছে। দেখলুম তিনি তসরের ধুতি, জামা, উড়ুনি, চপ্পল এই সব পরে তৈরি হয়েছেন—যাবেন কোথাও। আমায় দেখেই বললেন—ওহে এসো, এসো। আমায় যেতে হবে এক জায়গায়। বেরুচ্ছি।

তিনি চললেন। আমিও তাঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতে খানিকটা গিয়ে বাড়ী ফিরলাম।" (নবারুণ—২য় বর্ষ, শ্রীপঞ্চমী সংখ্যা, ১৩৫৯)

বেশভূষার মধ্যেও তাঁর খেয়ালও আবার অনেক সময় লক্ষণীয় ছিল। কখনো তিনি অত্যন্ত সাধারণ জামা জুতো পরতেন, আবার কখনো বা এসব ব্যাপারে তিনি বিলাসিতার চরম করতেন। লোকে তাঁকে ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতো পরে বাইরে বেড়াতেও দেখেছে। আবার দু-একদিনের জন্য মাত্র কোথাও বেড়াতে গিয়ে সঙ্গে দশ বারো জোড়া রকমারি ধরণের জুতো নিয়ে গেছেন, এও লোকে দেখেছে। যেমন—

শরৎচন্দ্র একবার কাশী যান। সেই সময় সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাশীতে থাকতেন। শরৎচন্দ্র একদিন বেড়াতে বেরিয়েছেন, এমন সময় পথে কাশীর সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর মারফৎ শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কেদার বাবুর পরিচয় হ'ল। সেদিনকার কথা-প্রসঙ্গে কেদারবাবু তাঁর 'স্মরণে' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন—

"...চলুন—চলতে চলতে কথা হোক্।

পায় পায় উত্তরমুখো।

নানা কথা চলতে লাগল।—আমার লক্ষ্য কিন্তু মানুষটির উপর। খুব সাদাসিধে চাল—ক্যাম্বিসের জুতো—তাও পুরো নয়—গোড়ালি নেই! টুইল সার্ট—তাও পুরো নয়—দু-একটা বোতাম নেই। দাড়ি—তাও পুরো নয়—বাদসাদ দেওয়া। এই ভাব।

বললুম—আপনাকে বড় কাহিল দেখছি। সম্প্রতি অসুখ থেকে উঠেছেন বুঝি?

—না আমি বরাবরই এই রকম। একবার ভাগলপুরের গঙ্গায় পড়ে এই শরীরেই কাহালগাঁয়ে গিয়ে উঠি।" ('জন্মদিনের উপহার'—'শিবপুর সাহিত্য-সংসদ'এর উদ্যোগে ১৩৩৪ সালের ৩১শে ভাদ্র তারিখে শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা।)

আর একটি উদাহরণ—

শরৎচন্দ্র তখন হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। সেই সময় তিনি দেশবন্ধুর সঙ্গে দিল্লীতে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে যান। দিল্লীতে গিয়ে শরৎচন্দ্র কংগ্রেস ক্যাম্পে না উঠে, তাঁর পরিচিত এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়ে উঠেন।

দিল্লীতে গিয়ে তিনি তাঁর পূর্ব পরিচিত দিল্লী-প্রবাসী সাহিত্যিক যামিনীকান্ত সোমের খোঁজ নেন। যামিনীবাবু একথা জানতে পেরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। এ প্রসঙ্গে যামিনীবাবু তাঁর 'শরৎ-স্মৃতি' প্রবন্ধে লিখেছেন—

"...দিল্লীতে হবে কংগ্রেস। দেশবন্ধু সদলে হলেন হাজির।......একজন এসে বললেন—ওহে শরৎবাবু এসেছেন। তোমার খোঁজ করছিলেন।

—তাই নাকি?

—কংগ্রেস ক্যাম্পে তিনি ওঠেন নি। রেলওয়ে-ওভারসিয়র গাঙ্গুলী মশায়ের বাসায় উঠেছেন।

গেলুম সেখানে। গিয়ে দেখলুম, গাঙ্গুলী মশায়ের বাড়ীখানা আছে, কিন্তু তিনি নেই—কেউ নেই। গেছেন ছুটিতে দেশে। শরৎবাবু, দেখলুম, এখানে দিব্যি সেজে বসে গেছেন। ঢুকেই দেখলুম, বারান্দার একধারে অন্ততঃ

দশ বারো জোড়া রকমারি ধরণের জুতো সার দিয়ে সাজানো রয়েছে। আমার নজরে পড়ল।

শরৎবাবু বললেন—আমারই হে সবগুলো।" ('নবারুণ', দ্বিতীয় বর্ষ, শ্রীপঞ্চমী সংখ্যা, ১৩৫৯)

শরৎচন্দ্রের বেশভূষা সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকের এই সব উক্তি থেকেও দেখা যাচ্ছে যে, একদিকে তিনি যেমন বিলাসী ছিলেন, অপরদিকে তেমনি আবার ঘোরতর খেয়ালীও ছিলেন। কখনো তিনি সিল্ক পরছেন, কখনো সাধারণ পোষাক পরছেন। কখনো ছেঁড়া জুতো পায়ে দিচ্ছেন, কখনো দামী জুতো পরছেন। কখনো দাড়ি রাখছেন, কখনো দাড়ি ফেলে দিচ্ছেন। শেষ বয়সে অবশ্য শরৎচন্দ্র বেশভূষার ব্যাপারে একটা আদর্শই স্থির করে নিয়েছিলেন। এই সময় তিনি ধুতি, পাঞ্জাবী, (কখনো কখনো কোট) চাদর ও জুতো যা ব্যবহার করতেন, তা সবই বেশ পরিষ্কার ও দামী জিনিসই থাকত।

১৩৩৩ সালের ১৯শে আশ্বিন তারিখে 'হিন্দু সংঘ' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের 'বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা' এবং সজনীকান্ত দাসের 'শুদ্ধি আন্দোলন' প্রবন্ধ দুটি ছাপা হলে প্রধানতঃ ঐ কারণেই সম্পাদক অম্বুজাচরণ সেনগুপ্ত গ্রেপ্তার হয়ে ৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

অম্বুজাচরণের গ্রেপ্তারের কয়েকদিন পরে হাওড়া টাউন হলে কোন সভায় শরৎচন্দ্রের সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। শরৎচন্দ্র তাঁর বাজে শিবপুরের তৎকালীন প্রতিবেশী ঐতিহাসিক ডক্টর কালিদাস নাগ মারফৎ সজনীকান্ত দাসকে ঐদিন হাওড়া টাউন হলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন।

সজনীবাবু সেদিন হাওড়া টাউন হলে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গেলে শরৎচন্দ্র খেয়ালের বশীভূত হয়ে সভায় যে কাণ্ড করেছিলেন, সে সম্বন্ধে সজনীবাবু তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে লিখেছেন—

"আমি বারান্দা ও হলের সংযোগস্থলে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছি, তিনি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সভার শালীনতা ভঙ্গ করিয়া আমাকে বেশ জোরেই নাম ধরিয়া ডাকিয়া চৌকি হইতে নামিয়া পাশের উত্তর-পূর্ব কোণের বিশ্রাম ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। সভায় বেশ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। শরৎচন্দ্র ভ্রূক্ষেপ করিলেন না।…আমি আসিতেই তিনি আমাকে প্রসন্ন হাস্যের

সঙ্গে অভ্যর্থনা করিয়া পাশের চৌকিতে বসিতে আদেশ করিলেন। হলের গুঞ্জন অনুযোগের আকারে সভার উদ্যোক্তাদের মুখে তাঁহার নিকট পৌঁছিল। তিনি বিরক্তভাবে বলিলেন—আর কাউকে বসিয়ে দাও গে। সজনীর সঙ্গে আমার জরুরী কাজ আছে।...আমি তাঁহার নিকট ঘণ্টাখানেক ছিলাম। ইহার মধ্যে তিনি আর সভামঞ্চে প্রবেশ করিলেন না।"

১৩৩৫ সালের ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্রের ৫৩তম জন্মদিবস উপলক্ষে দিল্লী-প্রবাসী বাঙ্গালীরা শরৎচন্দ্রের অনুমতি নিয়েই দিল্লীতে এক বিশেষ সভায় তাঁকে সংবর্ধনা জানাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এজন্য তাঁরা অনেক আগে থেকেই বহু আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের জন্য একটি সুন্দর ও অভিনব মানপত্রও তৈরি করেছিলেন। দিল্লীর বিখ্যাত শিল্পী সারদা উকিল ঐ অভিনন্দনপত্রের নক্সা করেছিলেন। অভিনন্দন পত্রের নক্সাটি ছিল এইরূপ :—

কারুকার্য করা মানানসই লম্বা ফালির মত একটা মোটা কাগজ। তার উপরে ও নীচে সরু কাঠের সুন্দর রুল দেওয়া। ফলে সেটাকে গোটানোও যায়, আবার ঝুলিয়ে রাখাও যায়। ঐ কাগজের তলার দিকে একটি সুদৃশ্য ধূনুচিতে ধূনো দেওয়ার ছবি আঁকা। ধূনোর ধোঁয়া দু-তিনটি মোটা রেখার মত হয়ে এঁকে বেঁকে উপরের দিকে উঠেছে। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লেখা কথাগুলি শুধু সেই ধূনোর ধোঁয়ার মধ্যেই অতি কৌশলে ও কায়দা করে অক্ষর সাজিয়ে মুদ্রিত করা হয়েছে। এক কথায় অভিনন্দন পত্রটি অভিনব তো বটেই, তাছাড়া বেশ সুদৃশ্যও হয়েছিল। আর অভিনন্দন পত্রের লেখাটিও হয়েছিল উচ্চাঙ্গের।

ঐ ১৩৩৫ সালের ৩১শে ভাদ্র তারিখে কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউটে দেশবাসীর পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রকে সংবর্ধনা জানানো হলে, তিনি তখন আর দিল্লী যেতে পারেন নি। কিন্তু কয়েকদিন পরে দিল্লী যাওয়ার জন্য তাঁকে শত অনুরোধ করলেও তিনি আর দিল্লী গেলেনই না। তখন দিল্লীর প্রবাসী বাঙ্গালীরা বিফল মনোরথ হয়ে তাঁদের সেই অভিনন্দন পত্রটিই শুধু শরৎচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

শরৎচন্দ্র তখন যশের উচ্চশিখরে। সেই সময় একবার তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরে বেড়াতে যান। শরৎচন্দ্র গেলে, সেখানকার বিশিষ্ট

ব্যক্তিরা এ কথা জানতে পেরেই, তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর সম্মতি নিয়ে, তাঁকে এক বোট-পার্টির সভায় সংবর্ধনা জানাবার ব্যবস্থা করেন। ঐ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কাশিমবাজারের মহারাজার তৎকালীন ইঞ্জিনীয়ার কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তও ছিলেন।

সভার দিন সকালে শরৎচন্দ্র যতীনবাবুর কাছে মুর্শিদাবাদ শহর দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

বহরমপুর থেকে মুর্শিদাবাদ বেশী দূরে নয়। মাত্র ছ-সাত মাইল দূরে। মোটরে গেলে ২।৩ ঘণ্টার মধ্যেই মুর্শিদাবাদ দেখে আবার বহরমপুরে ফিরে আসা যায়। সেদিন সভা ছিল বিকাল পাঁচটায়। তাই যতীনবাবু দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে শরৎচন্দ্রকে মোটরে করে মুর্শিদাবাদ দেখাতে নিয়ে গেলেন। ইচ্ছা ৪টার মধ্যেই ফিরে আসবেন।

শরৎচন্দ্র সেখানে গিয়ে ঘুরে ঘুরে মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক স্থানগুলি দেখে বেশ একটু ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তাই তিনি যতীনবাবুকে নিয়ে গঙ্গাতীরে গিয়ে এক জায়গায় বসলেন। তখন বেলা প্রায় ৩টা। শরৎচন্দ্র গঙ্গাতীরে বসে মুর্শিদাবাদের প্রাচীন প্রসঙ্গ আলোচনা করতে লাগলেন।

আধ ঘণ্টা খানেক পরে যতীনবাবু বললেন—দাদা, এবার উঠতে হবে।

—ক'টা বাজল ?

—প্রায় সাড়ে তিনটা।

শরৎচন্দ্র বললেন—মাত্র সাড়ে তিনটা। মিটিং তো সেই পাঁচটায়। চারটা বাজুক, তখন ওঠা যাবে।

শরৎচন্দ্র আবার গল্প জুড়লেন।

চারটা বেজে গেলে যতীনবাবু বললেন—দাদা, চারটা বেজে গেছে চলুন, না হলে পাঁচটায় গিয়ে পৌঁছানো যাবে না।

এবার উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন—তুমি ক'টা সভা দেখেছ যতীন, কোন সভা ঠিক সময়ে হয়? লোক কি ঠিক সময়ে আসে? আরও একটু বসো গল্প করা যাক্।

এমন সময় দেখা গেল, গঙ্গার মাঝখান দিয়ে একটা মানুষের মৃতদেহ ভেসে যাচ্ছে। ঐ দেখেই শরৎচন্দ্র কার মৃতদেহ, কিভাবে মরেছে, কেন জলে ভেসে যাচ্ছে—এই সব নিয়ে আলোচনা সুরু করে দিলেন।

এদিকে যতীনবাবু উঠবার জন্য শরৎচন্দ্রকে বারবার তাগিদ দিতে

লাগলেন। শরৎচন্দ্র উঠি উঠি করে উঠলেনই না। ক্রমে পাঁচটা বেজে গেল। যতীনবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন—ও দাদা, পাঁচটা বেজে গেল!

পাঁচটা বেজেছে শুনে শরৎচন্দ্র এবার বললেন—আমাদের তাহলে তো সেখানে পৌঁছাতে ছ'টা বেজে যাবে! তবে আর গিয়ে কাজ নেই যতীন।

—না দাদা, এখনও গেলে চলবে। তাঁরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন।

—তুমি ক্ষেপেছ যতীন! পাঁচটায় সভা, আর ছ'টা পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করে থাকবে? তাদের কি আর কোন কাজ নেই? তারা এতক্ষণে সব ভাগতে সুরু করেছে। তুমি বস বস, এই গঙ্গার তীরে বসে দুটো প্রাণের কথা কই—এই বলে শরৎচন্দ্র কিছুতেই আর উঠলেন না। সেখানে বসে সন্ধ্যা পর্যন্ত যতীনবাবুর সঙ্গে গল্প করলেন।

এদিকে বহরমপুরে শরৎচন্দ্রের সংবর্ধনা সভার জন্য লোকে লোকারণ্য হয়েছিল। তারা নির্দিষ্ট সময়ের পরেও বহুক্ষণ পযন্ত অপেক্ষা করল। শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের দেখা না পেয়ে সকলে ভগ্ন মনোরথ হয়ে যে যার বাড়ী ফিরল।

শরৎচন্দ্রের এই সংবর্ধনা সভা সম্বন্ধে তাঁর মৃত্যুর পর ১৩৪৪ সালের চৈত্র মাসে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'আমাদের শরৎদাদা' নামক প্রবন্ধে নিরুপমা দেবী লিখেছিলেন—

"তাঁহার জন্য মস্ত বোট-পার্টি সজ্জিত—মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দী (অধুনা মহারাজ) স্বয়ং অপেক্ষা করিতেছেন—সময় বহিয়া দণ্ডের পর দণ্ড অতিবাহিত হইতেছে—'উৎসব-রাজের' দেখা নাই। তখন বেশীর ভাগ ব্যক্তিই এজন্য তাঁহার বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে কে নাকি বলিয়াছিলেন—'এই ত ঠিক—কবি কি সকলের হাতধরা নিয়মে বাঁধা পুতুল হবে? সে স্বাধীন স্বতন্ত্র—তার বশেই সকলে চলবে—সে কারও বশে নয়।' বহু সাধ্য-সাধনায় সে পার্টিতে নাকি তাঁহাকে অল্পক্ষণের জন্য মাত্র উপস্থিত করিতে পারা গিয়াছিল (কিম্বা একেবারেই না কিনা সে কথা আজ আমাদের স্পষ্ট মনে পড়ে না।)।"

শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুরে থাকাকালে তাঁর দিদি অনিলা দেবীর মেজ

দেওরের বড় ছেলে জীবন এবং সেজ দেওরের বড় ছেলে ব্রজদুর্লভের এক সঙ্গে পৈতা হয়।

শরৎচন্দ্রের ভগ্নীপতি পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় ঐ সময় তাঁর ভাইদের নিয়ে এক-অন্নে বাস করতেন। তাই তিনি খুব জাঁক করেই দুই ভাইপোর পৈতা দিয়েছিলেন।

সেবার মুখুজ্জে বাড়ীর এই পৈতা-উৎসবে বহু আত্মীয়-স্বজন এসেছিলেন। শরৎচন্দ্রও নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন।

আত্মীয়রা যে যার সাধ্যমত ও ইচ্ছামত উপহার জীবন ও ব্রজদুর্লভকে দিলেন।

শরৎচন্দ্র কোন উপহার দিচ্ছেন না দেখে, তাঁর দিদি একবার তাঁকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁরে শরো (শরৎচন্দ্রকে অনিলা দেবী 'শরো' বলে ডাকতেন), তুই কি দিবি ? কিছু আনিস্ নি ? টাকা দিবি বুঝি ?

শরৎচন্দ্র দিদির কথার উত্তরে বললেন—আমি গরীব লেখক মানুষ, আমি আবার কি দোব ! মুখুজ্জেরা বড়লোক জমিদার, তাদের উৎসবে কিছু উপহার না দিলেও চলবে।

—সে কিরে ! তা কখনো হয়। তোর কত নাম, তুই ভাল কিছু না দিলে আমার মুখ থাকবে কেন ?

—আচ্ছা দেখা যাবে,—বলে শরৎচন্দ্র দিদির কাছ থেকে তখন সরে পড়লেন।

শেষে দেখা গেল, শরৎচন্দ্র জীবন ও ব্রজদুর্লভ দুজনকে একটি করে দুটি আধলা বা আধ পয়সা (তখন চালু ছিল) উপহার দিয়েছেন।

আত্মীয়রা এই নিয়ে কেউ কেউ হাসাহাসিও করতে লাগলেন। ভাইয়ের এই কাণ্ড শুনে অনিলা দেবীর তো লজ্জায় মাথা কাটা যাবার উপক্রম হল। তিনি কাজের বাড়ীতে লোকজনের ভীড়ের মধ্যেই ভাই-এর খোঁজ করতে লাগলেন।

এদিকে শরৎচন্দ্র তখন সদর বাড়ীতে তাঁর ভগ্নীপতি পঞ্চাননবাবুর সঙ্গে তাঁদের একটি খড়ের গাদা কেনার জন্য ব্যস্ত।

পঞ্চাননবাবুর সদর বাড়ীর উঠানে তাঁর দুটো বড় বড় খড়ের গাদা ছিল। শরৎচন্দ্র পঞ্চাননবাবুকে বললেন—অত খড় আপনার কি হবে ? একটা গাদা

হলেই তো আপনার গরুর খাবার হয়ে যাবে। একটা গাদা আমাকে বিক্রি করে দিন।

—তুমি খড় কিনে কি করবে?

—আমার একটা বিশেষ দরকার আছে। কত কাহন খড় হবে? মোট কত দাম তাই বলুন?

—তা এক শ টাকা দাম তো হবেই। কিন্তু তোমার কি দরকার?

—এই নিন এক শ টাকা।—বলেই শরৎচন্দ্র পঞ্চাননবাবুর হাতে এক শ টাকা গুঁজে দিলেন। দিয়েই সদর বাড়ীর অদূরে যেখানে ছুলে বা কাহারদের পাড়া, সেখানে গেলেন। গিয়ে তাদের বললেন—তোদের কারোর ঘরের চালে তো খড় নেই। মুখুজ্জে মশায়ের একটা খড়ের গাদা তোদের জন্যে কিনে দিয়েছি। তোরা গিয়ে খড়গুলো নিয়ে ভাগ করে নে।

কাহাররা শরৎচন্দ্রকে আগে থেকেই জানত। তারা এর আগেও কয়েক বার শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছে। তারা তখন দল বেঁধে পঞ্চাননবাবুর কাছে গেল।

পঞ্চাননবাবু কাহারদের বললেন—যা নিয়ে যা।

কাহারদের এই বলেই পঞ্চাননবাবু বাড়ীর ভিতরে গেলেন। গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে বললেন—শরতের কাণ্ডটা দেখলে!—বলে তিনি সমস্ত ঘটনাটা বললেন।

অনিলা দেবী শুনে হাসতে হাসতে বললেন—শরোর ঐ রকমই কাজ!

এদিকে পৈতা উৎসবে যে সব আত্মীয় এসেছিলেন এবং জীবন ও ব্রজদুর্লভকে আধলা দেওয়ায় যাঁরা হাসাহাসি করেছিলেন, তাঁরা তো শরৎচন্দ্রের এই কাণ্ড দেখে একেবারে থ'।

আত্মভোলা

শরৎচন্দ্র কোন উপযুক্ত চরিত্র বা প্লট পেলে তাকে গল্প-উপন্যাসে রূপ দেবার জন্য তখন দিবারাত্র চিন্তা করতেন। গ্রন্থ রচনার জন্য এইভাবে মগ্ন থাকায় তিনি অনেক সময় সাংসারিক এবং অন্যান্য ব্যাপারেও নানা ভুল করে বসতেন। তখন কোন কাজকে না করেই তাঁর মনে হত যে, সে কাজ তিনি করেছেন, আবার কোন কাজ করার পরেও মনে হত, হয়ত সে কাজ তিনি করেন নি।

শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুরে থাকাকালে সেখান থেকে চিঠি লিখবার সময় নিজের ঠিকানা লিখতে অনেক সময় যে ভুল করতেন, সে কথা আমি আগেই এই গ্রন্থে 'হাওড়া শহরে অবস্থান' অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এখন শরৎচন্দ্রের আরও কয়েকটি এইরূপ মানসিক ভুলের গল্প বলছি :—

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থাকার সময় একবার বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি লিখে, সেই চিঠি না পাঠিয়েই ভেবেছিলেন পাঠিয়ে দিয়েছেন। ঐ চিঠির উত্তরের আশায় কয়েকদিন থাকার পরে, তবে নিজের এই ভুলটা জানতে পারেন। নিজের এই ভুলের কথা উল্লেখ করে তখন শরৎচন্দ্র প্রমথবাবুকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন, তা হচ্ছে এই :—

প্রমথ,

আমি মনে করে আছি, তুমি চিঠি লেখ না কেন—এদিকে আমি তোমাকে যে চিঠি লিখেছিলাম তা আমার বাক্সেটেই পড়ে ছিল। মনে জানি নিশ্চয় পোস্ট করা হয়ে গেছে—এ রকম ভুল হওয়ায় বড়ই লজ্জিত হয়ে আছি, যা হোক্ এ বারের মত বেশী কিছু মনে করো না, এই অনুরোধ করি।···

—শরৎ

শরৎচন্দ্র ১৩৩৪ সালের ২৩শে ভাদ্র তারিখে সামতাবেড় থেকে এক চিঠিতে কবি রাধারাণী দেবীকে লিখেছিলেন—

রাধা, তোমার চিঠি পেলাম, এর আগের চিঠির জবাব দিই নি—হবেও বা।···দিই দিই করেই মাসখানেক কেটে যায়, তারপরে সমস্ত ভুলে যাই।···

১৩৩৭ সালের ২৩শে বৈশাখ তারিখে শরৎচন্দ্র সামতাবেড় থেকে আর এক চিঠিতে রাধারাণী দেবীকে লিখেছিলেন—

রাধু, দিন তিনেক আগে তোমাকে একখানি মস্ত বড় চিঠি লিখেছিলুম,… সে চিঠিখানি তোমাকে পাঠিয়েচি না ছিঁড়ে ফেলেচি, ঠিক মনে পড়ছে না।…

ব্রহ্মদেশে থাকার সময় শরৎচন্দ্র একদিন পথে বেরিয়ে একটা বইয়ের প্লটের কথা ভাবতে গিয়ে এক মস্ত ভুল করে বসেছিলেন। সেই ভুলটির কথাপ্রসঙ্গে গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন—

"পেগু থেকে একবার রেঙ্গুনে আসিবার সময় স্টেশনে পাশাপাশি দুইখানি ট্রেন দেখিয়া তিনি ভুলক্রমে বিপরীতগামী ট্রেনখানিতে উঠিয়া পড়েন। তিন ঘণ্টা পরে হঠাৎ তাঁহার চমক ভাঙ্গিলে দেখেন এটি নেওলবিন স্টেশন। অনেক রাত্রে আবার পেগুতেই ফিরিয়া আসিলেন। সে রাত্রের দুর্ভোগের কথা শুনিয়া সকলে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিলে তিনি বলিলেন—একটি বইয়ের প্লট তৈরি করতে এই ফ্যাসাদ ঘটেছে।"

বই ছাপাবার সময় শরৎচন্দ্র নিজেই নিজের বই-এর প্রুফ দেখতেন। একবার তিনি প্রুফে ভুল সংশোধন না করেই, পরে ভেবেছিলেন ভুল সংশোধন করেছেন। তাই বই ছাপা হয়ে গেলে তাঁর সংশোধিত ভুলকে সংশোধন করা হয়নি বলে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের প্রেসের ম্যানেজার গোবিন্দপদ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে চিঠি লিখে প্রেসের মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে নালিশ করেছিলেন। পরে অভিযুক্ত গোবিন্দবাবু শরৎচন্দ্রেরই যে ভুল সেটা দেখিয়ে দিলে, শরৎচন্দ্র হরিদাসবাবুর কাছে নিজের অভিযোগ প্রত্যাহার করেছিলেন। এ সম্পর্কে হরিদাসবাবুকে লেখা শরৎচন্দ্রের সেই দুটি চিঠিই এখানে উদ্ধৃত করছি :—

ভায়া,

ভেবেছিলাম, অন্ততঃ এই বইটা নির্ভুল করবো, কিন্তু হলো না ছাপাখানার দৌরাত্ম্যে। যে ভুল চোখ এড়িয়ে যায়, তাতে তবু সান্ত্বনা থাকে, কিন্তু যে ভুল শুধ্‌রে দিয়েছি, কিন্তু সংশোধিত হলো না, যেমনি ভুল ছিল তেমনি ছাপা হয়ে গেল, সে বড় দুঃখের।…এই ইচ্ছাকৃত ভুলের জন্য যিনি দায়ী, অন্ততঃ দায়িত্ব যাঁর পরে তাঁর দণ্ড হওয়া উচিত।…

—দাদা

ভায়া,

গোবিন্দবাবু, আমাকে সেই অভিযুক্ত প্রুফটা পাঠিয়েছেন। তাতে দেখা গেল ভুলটা কাটিয়া দিতে আমিই ভুলিয়াছি। অতএব তাঁহার দণ্ড না হওয়াই উচিত।...

—শরৎদা

সাহিত্যিক অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের বিশেষ পরিচিত ও স্নেহভাজন ছিলেন। শরৎচন্দ্র কলকাতায় আছেন জানতে পারলেই এই অসমঞ্জবাবু শরৎচন্দ্রের কলকাতার বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন।

১৩৪৩ সালের ভাদ্র মাসের এক রবিবারে অসমঞ্জবাবু এইভাবে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে এসে অনেক কথাবার্তার পর যখন বাড়ী ফিরবার জন্য উঠলেন, তখন শরৎচন্দ্র অসমঞ্জবাবুকে বললেন—আগামী রবিবার আমার বাড়ীতে তোমার মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ রইল, এসো।

অসমঞ্জবাবু সানন্দে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে বাড়ী ফিরলেন।

পরের রবিবার তিনি যথাসময়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার জন্য শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন।

অসমঞ্জবাবু এলে তাঁকে দেখে উল্লসিত হয়ে শরৎচন্দ্র বললেন—অসমঞ্জ তুমি এসে গেছ, বড় ভাল হয়েছে। এখন চল আমার সঙ্গে বোটানিক্যাল গার্ডেনে। আজ সেখানে 'পেন ক্লাবের' একটা ভাল রকমের নিমন্ত্রণ আছে। আমি তো তেমন খেতে পারি না জানোই, তবু বারবার করে বলে গেছে যেতেই হবে। তোমার কিন্তুবোধ করবার কারণ নেই। তুমি আমার 'গেস্ট' হয়ে যাবে। আমি তাদের বলেই দিয়েছি, আমি একা কোথাও যেতে পারব না। বন্ধুবান্ধব যদি কাউকে পাই, সঙ্গে নিয়ে যাব। তারা খুশী হয়ে বলে গেছে—যতজন ইচ্ছা সঙ্গে নিয়ে যাবেন। আমরা তাতে আনন্দিতই হব।

অসমঞ্জবাবু সব শুনে বুঝলেন, শরৎচন্দ্র তাঁকে যে আজ নিমন্ত্রণ করেছেন, সে কথা হয়ত তিনি ভুলেই গেছেন। তাই তিনি বললেন—দাদা, আজ তো আপনার বাড়ীতেই আমার খাওয়ার নিমন্ত্রণ। আমি বাইরে খেতে যাব না। আপনার বাড়ীতেই খাব।

তখন শরৎচন্দ্র বললেন—তাই নাকি? আজ তোমার নিমন্ত্রণ ছিল? তাহলে এখানে অল্প করে দুটি খাও। সেখানের বিরাট ভোজটাও ছেড়ে

দেওয়া তোমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। এখানে পেট ভরে খেয়ে গেলে, সেখানে গিয়ে ঠক্‌বে।

শরৎচন্দ্র এইভাবে অসমঞ্জবাবুকে বুঝিয়ে অল্প করে খাওয়ালেন, এবং নিজেও বাড়ীতে অল্প দুটি খেয়ে নিলেন। তারপর সেই দুপুরে মোটরে বোটানিক্যাল গার্ডেনে রওনা হলেন। শরৎচন্দ্র তাঁর ড্রাইভার কালীকেও পেন ক্লাবের এলাহি ব্যাপারের ভোজে খাওয়াবেন বলে, বাড়ীতে কম খেতে বলেছিলেন।

শরৎচন্দ্র বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়ে দেখলেন, কা কস্য পরিবেদনা! পেন ক্লাবের কেউই নেই। এদিকে ওদিকে কিছুক্ষণ খুঁজে কোথাও পেন ক্লাবের কারুরই দেখা পেলেন না। তখন তিনি অসমঞ্জবাবুকে বললেন—তাই তো অসমঞ্জ! নিমন্ত্রণওয়ালাদের যে পাত্তাই নেই! সব গেল কোথায়? নিশ্চয় তাহলে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। কেন না আজ তো আর পয়লা এপ্রিল নয় যে বোকা বানাবে! আচ্ছা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেই দেখা যাক্!

তিনটা পর্যন্ত বাগানে ঘুরে সকলে চা-টা খেলেন। শেষে শরৎচন্দ্র বললেন—না, আর নয়, চল এবার ফেরা যাক্।

অসমঞ্জবাবু বললেন—দাদা, ভাগ্যি চাট্টি খেয়ে এসেছিলাম। না হলে ক্ষিধের চোটে এখানে দোকানে ঢুকে পেট ভরাতে হত।

ফেরার পথে শিবপুরের এক জায়গায় এসে শরৎচন্দ্র তাঁর ড্রাইভারকে বললেন—কালী গাড়ীটা থামাও তো!

কালী মোটর থামালে, শরৎচন্দ্র বললেন—কেন থামাতে বললাম ভুলে গেছি তো। ওহো মনে পড়েছে, এক বোতল সোডাওয়াটার ঐ দোকানটা থেকে নিয়ে এস তো, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

তেষ্টা নিবারণ করে আবার চললেন। কিছুক্ষণ এসে আবার কালীকে বললেন—কালী মোটর থামিয়ে ঐ গাছ তলায় যে ভিখারীটা দাঁড়িয়ে আছে, ওকে ডেকে আন।

কালী মোটর থামিয়ে গাছতলা থেকে ভিখারীটাকে ডেকে আনলে, শরৎচন্দ্র তাকে বললেন—তুমি কি ভিখারী?

—না তো?

—তবে? আচ্ছা যাই হোক্, তুমি কিছু খাবে?

এবার অসমঞ্জবাবু বললেন—দাদা ইসবগুল কি ?

এই শুনেই শরৎচন্দ্র প্রায় লাফিয়ে বলে উঠলেন—চিঁড়ে! চিঁড়ে!

তখন শরৎচন্দ্র এক চিঁড়ের দোকানে গিয়ে সের আড়াই চিঁড়ে কিনলেন। তারপর অসমঞ্জবাবুকে সঙ্গে নিয়ে মোটরে বাড়ী ফিরে এলেন।

অসমঞ্জবাবু কিছুক্ষণ গল্প করার পর বাড়ী ফিরে গেলেন।

পরের দিন সকালে অসমঞ্জবাবু আবাব শরৎচন্দ্রের কাছে আসেন। তখন শরৎচন্দ্র বৈঠকখানায় বসে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁকে দেখেই বলে উঠলেন—তোমার কথায় কাল চিঁড়ে কিনে বাড়ীতে কি বকুনিটাই না খেলাম হে!

—তাহলে চিঁড়ে নয়? তবে কি?

—নালতে পাতা। ছেলেমেয়ে দুটোর ক্লমি হয়েছে। ওঁদেরও পিত্তি বেড়েছে। সব ভিজিয়ে দিন কতক খাবে। উঃ ওর জন্যে কাল কি কথাটাই না শুনতে হল!

—দাদা চিঁড়ের কথা আমি তো বলি নি! আমি বলেছিলাম, ইসবগুল। আমি বরং ওর কাছাকাছিই গিয়েছিলাম।

—ওঃ, চিঁড়ে তুমি তাহলে বলনি! আমিই বলে কিনেছিলাম। যাক্! সব সময় সব কথা মনেও থাকে না!—বলে গড়গড়ায় তামাক টানতে লাগলেন।

লিখন-বিলাসী

শরৎচন্দ্র তখন হাওড়ায় বাজে শিবপুরে থাকেন। সেই সময় বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একবার শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে যান। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সুনীতিবাবুর সেই প্রথম সাক্ষাৎ।

সুনীতিবাবুর মামার বাড়ী শিবপুরে। তাই শিবপুরের অনেকেই তাঁর বিশেষ পরিচিত। শিবপুর-নিবাসী উত্তরপাড়া কলেজের অধ্যক্ষ ধ্রুবকুমার পাল এবং ঐ কলেজেরই রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক পান্নালাল মুখোপাধ্যায় এঁরা সুনীতিবাবুর যেমন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন, তেমনি আবাব শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশী বলে এঁরা শরৎচন্দ্রেরও খুব স্নেহভাজন ছিলেন। সুনীতিবাবুব এই দুই বন্ধুই সেদিন তাঁকে শরৎচন্দ্রের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। সুনীতিবাবু শরৎচন্দ্রকে তাঁর প্রথম দর্শনের কথাপ্রসঙ্গে লিখেছেন—"তাঁর লেখাব খাতা দেখলুম, মুক্তোর মত ঝরঝরে লেখা; তিনি লিখন-বিলাসী ছিলেন, চমৎকার দামী রুলটানা খাতা, আর দামী ঝরণা কলম।" (শরৎ-প্রসঙ্গে—শারদীয়া দেশ পত্রিকা, ১৩৫৮)

শুধু সুনীতিবাবুই নয়, শরৎচন্দ্রের আরও অনেক সাহিত্যিক বন্ধুও তাঁর এই লিখন বিলাসের কথা উল্লেখ করেছেন। সত্যই শরৎচন্দ্রকে যাঁরা লিখতে দেখেছেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে, তিনি কিরূপ লিখন-বিলাসী ছিলেন। সুন্দর হস্তাক্ষরে পরিচ্ছন্ন ও নির্ভুলভাবে লিখবার জন্য তাঁর যেমন একটা সযত্ন চেষ্টা ছিল, তেমনি লিখবার জন্য ভাল কাগজ এবং ভাল কলমের উপরও তাঁর একটা প্রবল সখ ছিল। ভাল কাগজ ছাড়া তিনি আদৌ লিখতে পারতেন না। তাই তিনি সাধারণতঃ "নিউম্যান" থেকে ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন দামী কাগজ আনাতেন এবং সেই কাগজেই লিখতেন।

শরৎচন্দ্রের এই সখের কথা জেনে তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা মাঝে মাঝে দামী কাগজ ও কলম কিনে তাঁকে উপহার দিতেন। শরৎচন্দ্র বন্ধু-বান্ধবদের এই উপহার অত্যন্ত আনন্দের সহিত গ্রহণ করতেন। শরৎচন্দ্রের স্নেহভাজন বন্ধু বেহালার জমিদার মণীন্দ্রনাথ রায় একবার শরৎচন্দ্রকে কাগজ উপহার দিলে, শরৎচন্দ্র তখন ১৩৩৮ সালের ২৯শে ফাল্গুন তারিখে এক পত্রে তাঁকে

লিখেছিলেন—তোমার দেওয়া লেখবার কাগজগুলি চমৎকার হয়েছে। খুব আনন্দিত হয়েছি।

'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকায় শরৎচন্দ্র তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে লিখতে আরম্ভ করলে, বঙ্গবাণীর স্বত্বাধিকারী রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রকে লিখবার জন্য ভাল কাগজ ও একটি দামী ফাউণ্টেন পেন উপহার দিয়েছিলেন। রমাপ্রসাদবাবুও নিউম্যান থেকেই ভাল রুলটানা কাগজ কিনে, ঐ নিউম্যানকে দিয়েই ফুলস্কেপ সাইজ করে কাটিয়ে তার উপর শরৎচন্দ্রের মনোগ্রাম ছাপিয়ে দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের মনোগ্রাম ছিল—একটি শীষশুদ্ধ ডাব এবং সেই ডাবের মধ্যে 'শরৎ' লেখা। এই ধরণের মনোগ্রাম করার কথা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন—শরতের অর্থাৎ শরৎ ঋতুর ডাব খুব উপাদেয় এবং ঐ সময় মেলেও প্রচুর। তাই আমি যখন শরৎ, সেইজন্যে এই ডাবকেই আমার মনোগ্রাম হিসাবে নিয়েছি।

শরৎচন্দ্র অনেক সময়েই তাঁর উপন্যাস লেখার কাগজে এবং চিঠি লেখার প্যাডে এই মনোগ্রাম ব্যবহার করতেন।

বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র এবং তাঁর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি, আজও যা পাওয়া যায়, তা দেখে বেশ বোঝা যায় যে, তিনি কিরূপ দামী কাগজে লিখতেন। এগুলি আজও তার সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে।

কাগজের ন্যায় কলমের উপরও শরৎচন্দ্রের সমান সখ ছিল। শরৎচন্দ্রের প্রায় কুড়ি বাইশটা দামী দামী ফাউণ্টেন পেন ছিল। কেউ কোন নতুন ভাল ফাউণ্টেন পেনের কথা বললে, শরৎচন্দ্র তখনই তাই কিনতেন। তবে তিনি খুব সূক্ষ্ম নিব পছন্দ করতেন এবং সেই সূক্ষ্ম নিবে লিখতে ভালবাসতেন। পথের দাবী লিখবার সময় রমাপ্রসাদবাবু শরৎচন্দ্রকে যে কলমটি উপহার দিয়েছিলেন, তার নিব খুব সূক্ষ্ম হলেও শরৎচন্দ্র, রমাপ্রসাদবাবুকে তখন বলেছিলেন—নিবটা আরো সরু হ'লে ভাল হ'ত।

শরৎচন্দ্রের কথামত বঙ্গবাণীর অন্যতম কর্মকর্তা কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী একদিন যে দোকান থেকে কলমটি কেনা হয়েছিল, সেই নিউম্যানের দোকানেই আরো সূক্ষ্ম দেখে নিব আনতে যান। কুমুদবাবু গেলে, নিউম্যানের কর্তৃপক্ষ বলেন, এর চেয়ে সূক্ষ্ম নিব আর এখানে নেই, আরও সূক্ষ্ম নিব নিতে হলে আমেরিকা

থেকে আনাতে হবে। পরে রমাপ্রসাদবাবুর নির্দেশ মত কুমুদবাবু নিউম্যানকে আমেরিকা থেকেই সূক্ষ্মতম নিব আনাতে বললে, নিউম্যান কলমটা আমেরিকা পাঠিয়ে দিয়ে সেখান থেকে সূক্ষ্ম নিব এনে দেন। শরৎচন্দ্র সেই নিব পেয়ে খুব খুশী হয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের যেমন অনেকগুলি ফাউণ্টেন পেন ছিল, তেমান লিখবার সময়ও একসঙ্গে অনেকগুলি করে নিয়ে লিখতে বসতেন এবং যখন যেটা ইচ্ছা যেত, তখন সেটা ব্যবহার করতেন।

শরৎচন্দ্রের মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাস লিখবার সময় তাঁর কাছে একবার গিয়েছিলেন। সেদিনকার সেই সময়কার কথা উল্লেখ করে উপেনবাবু তাঁর 'স্মৃতি-কথা' গ্রন্থে লিখেছেন—

"দেখলাম আট দশটা ফাউণ্টেন পেন ইতস্ততঃ ছড়ানো রয়েছে। কোনটার নিব তীক্ষ্ণ, কোনটার তীক্ষ্ণতর, কোনটা বা ততোধিক তীক্ষ্ণ, কোনটায় ব্লু-ব্ল্যাক কালি, কোনটায় বেগুনে, কোনটা সবুজ রঙের।

জিজ্ঞাসা করলাম—এতগুলো কলম একসঙ্গে বার করে কি কর শরৎ?

মৃদু হেসে শরৎ বললে—ও আমার একটা শখ। যখন যেটা ভাল লাগে তখন সেটায় লিখি।

—এখন কোনটায় লিখছিলে?

একটা কলম তুলে ধরে শরৎ বললে—এইটেতে।"

শরৎচন্দ্র নিজে যেমন প্রচুর কলম কিনতেন এবং বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে কলম উপহার পেলে যেমন খুশী হতেন, তেমনি তিনিও তাঁর প্রিয়জনদের কলম উপহার দিতে খুব ভালবাসতেন। তিনি বলতেন যে, তাঁর কাছে উপহার দিতে কলমের চেয়ে ভাল জিনিস আর ছিল না। এই কলম উপহার দেওয়ার প্রসঙ্গে তিনি রেঙ্গুন থেকে ১০-৫-১৩ তারিখের এক পত্রে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন—

"সুরেন আমাকে চিঠির জবাব দিলে না কেন? তাকে আমার হাতের কলম দিয়েচি, কেন না, এর চেয়ে ভাল জিনিস আর আমার দেবার নাই। সে তার কী সদ্ব্যবহার কচ্চে জিজ্ঞাসা ক'রে লিখো। আমার কলমের যেন অসম্মান না হয়। আর চারটে কলম দেওয়ার বাকি আছে। যোগেশ

মজুমদার কোথায়? পুঁটু, বুড়ি এবং সৌরীন এদের জন্যও আমার কলম ঠিক করে রেখেছি—একদিন পাঠিয়ে দেব।

উপরের চিঠির—পুঁটু এবং বুড়ি হলেন, যথাক্রমে বিভূতিভূষণ ভট্ট ও তাঁর ভগ্নী নিরুপমা দেবী। এঁরা উভয়েই শরৎচন্দ্রের খুব স্নেহভাজন ছিলেন। শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে কলম উপহার পেয়ে সেই কলমের কথা উল্লেখ করে বিভূতিবাবু তাঁর 'আমার শরৎ-দা' প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন—

"তাঁহার জীবনের আর একটা কথা এবং বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বড় কথা—তাঁহার অসাধারণ ভালবাসার ক্ষমতা।...সেই ভালবাসাই বহুদিনের বিস্মৃতির আবরণকে ভেদ করিয়া হঠাৎ একদিন দুইটি ফাউণ্টেন পেন-এর আকারে আমার ও আমার ভগ্নী নিরুপমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। নিরুপমা তখন 'দিদি' ও 'অন্নপূর্ণার মন্দির' প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে কিছু যশ অর্জন করিয়াছেন, আমিও তখন 'স্বেচ্ছাচারী' লিখিয়া ভারতীতে ছাপাইয়াছি। শরৎদা যে কোথায়, তাহাও যেন তখন আমাদের তেমন স্মরণেই ছিল না। এমন সময় আমার নামে একটি একেবারে সোনার কলম, নিরুপমার নামেও একটা 'ওয়াটারম্যান'। আমি ত উহা পাইয়া অবাক! এত দামী কলম লইয়া কি করিব?

'আছে সেটা চোরের ভাগ্যে'—এই মনে করিয়া দাদাকে পত্র দিলাম। তিনি লিখিলেন—বেশ করেছি দিয়েছি, তোকে ওতেই লিখতে হবে। যেমন অদ্ভুত বেয়াড়া মানুষ, তেমনি তাঁহার হুকুম। আমি উহা ফেরৎ পাঠাইয়া লিখিলাম যে—এ তো একটা গহনা, এ দিয়ে কখনো লেখা যায়। আপনি যা দিয়ে লেখেন তাই একটা পাঠাবেন—বাস্ আর কোথায় যাইব—আর একটা রূপায় মোড়া প্রকাণ্ড লেখনীর বংশদণ্ডাঘাত।" (ভারতবর্ষ—চৈত্র, ১৩৪৪)

এইভাবে শরৎচন্দ্র নিজে যেমন দামী কলম ব্যবহার করতেন, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রিয়জনদেরও তেমনি তিনি দামী দামী কলম উপহার দিতেন।

শরৎচন্দ্রকে দামী কাগজ ও দামী কলম ব্যবহার করা সম্বন্ধে কেউ কিছু বললে, তিনি বলতেন—কাগজ কলমই আমার জীবিকার উপায়, তাই আমি সবচেয়ে দামী কাগজে ও দামী কলমে লিখি। আর তা ছাড়া ভাল কাগজ ও ভাল কলম না হ'লে আমার লেখাই বেরোয় না।

শরৎচন্দ্রের এই লিখন-বিলাসের অভ্যাসটিকে বিশ্ব-বিখ্যাত নাট্যকার বার্নার্ড শ'র লিখন-অভ্যাসের সহিত তুলনা করা যেতে পারে। শরৎচন্দ্র যেমন ভাল কাগজ না হলে লিখতে পারতেন না, বার্নার্ড শ'ও তেমনি একটা বিশেষ ধরণের কাগজেই লিখতে পছন্দ করতেন। তিনি লিখতেন ফিকে সবুজ কাগজের প্যাডে। এই ফিকে সবুজ রঙটাই ছিল তাঁর প্রিয় রঙ। শরৎচন্দ্রের ন্যায় বার্নার্ড শ'ও একেবারে পাঁচ ছ'টি ফাউণ্টেন পেন নিয়ে লিখতে বসতেন এবং যখন যেটায় লিখতে ইচ্ছা যেত, তখন সেটায় লিখতেন। একসঙ্গে সবগুলো কলম কাছে না থাকলে নাকি তাঁর লেখা বেরোত না।

বার্নার্ড শ আদৌ তাড়াতাড়ি লিখতেন না। তাড়াতাড়ি লিখলে ভাল সাহিত্য-সৃষ্টি হয় না—এই ছিল তাঁর ধারণা। শরৎচন্দ্রও এই মত পোষণ করতেন এবং তিনিও কখন তাড়াতাড়ি লিখতেন না। শরৎচন্দ্র নিজেই যে শুধু তাড়াতাড়ি লিখতেন না তা নয়, এই তাড়াতাড়ি না লিখবার জন্য তিনি তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদেরও উপদেশ দিতেন। এ সম্বন্ধে আশালতা সিংহের দ্রুত লেখার কথা উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র দিলীপকুমার রায়কে একবার এক পত্রে লিখেছিলেন—

"...ওকে অত তাড়াতাড়ি লিখতে বারণ কোরো। লেখার দ্রুতগতি কেরাণীর কোয়ালিফিকেশন, লেখকের নয়।"

দেশ বিদেশের খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এক একজন এক এক পরিবেশ ও অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁদের সাহিত্য-সৃষ্টি করে গেছেন। যেমন—কারো বিশেষ কোন অভ্যাস ভিন্ন, আবার কারো বিশেষ পরিবেশ ছাড়া লেখা বেরোত না। কেউ নির্জনতা ভিন্ন কিছুতেই লিখতে পারতেল না, আবার কেউ বা কোলাহলের মধ্যে থেকেও দিব্যি সাহিত্য-সৃষ্টি করে যেতেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে—কবি ইয়েট্স লিখবার আগে সাবান দিয়ে হাত মুখ ভাল করে না ধুয়ে লিখতে পারতেন না। বালজাক পায়জামা ও ড্রেসিং গাউন না পরলে লেখার প্রেরণা পেতেন না। তেমনি আবার চার্লস ডিকেন্স রাস্তায় বসে অনায়াসেই সাহিত্য-সৃষ্টি করতে পারতেন। ভিক্টর হিউগো রাস্তার ধারে কাফেতে বসে বসেও উপন্যাস লিখেছেন।

কবি মাইকেল একই সঙ্গে চারখানা পর্যন্ত গ্রন্থ রচনা করতে পারতেন। তাঁর গ্রন্থ রচনার ধরণটা ছিল এইরূপ—একটা বড় ঘরের চার কোণে চার জন শ্রুতিলেখককে বসাতেন। তাঁরা প্রত্যেকে তাঁর পৃথক পৃথক বইয়ের শ্রুতিলিখন লিখতেন। মাইকেল ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে এক একজনকে একটা একটা করে বই বলে যেতেন।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ থিয়েটারে কোন ভূমিকায় অবতরণ করে অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে যে সময় পেতেন, সেই সময়ের মধ্যেও নাটক রচনা করতে পারতেন। একবার তিনি মিনার্ভা থিয়েটারে প্রফুল্ল নাটকে যোগেশের ভূমিকায় নেমে এইভাবে দুখানি নাটিকা লিখে দিয়েছিলেন।

কবি কীট্‌স ও রবীন্দ্রনাথ—এঁরা দিবস ও রাত্রির যে কোন সময়ে যে কোন অবস্থায় সাহিত্য রচনা করতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথ পাল্কীতে, বোটে, ট্রেনে, জাহাজে সর্বত্রই কবিতা লিখতে পারতেন। কীট্‌স সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, তিনি যে শার্ট পরতেন তার হাতার ইস্ত্রিরি কড়া থাকত, সঙ্গে কাগজ না থাকলে তিনি শার্টের হাতার কড়া ইস্তিরিতে কবিতা লিখে রাখতেন।

শরৎচন্দ্র কিন্তু এঁদের মত যখন তখন এবং যে কোন অবস্থায় লিখতে পারতেন না। সাধারণতঃ তাঁর লেখার একটা সময় ছিল এবং একটা বিশেষ পরিবেশ ছাড়াও তিনি লিখতে পারতেন না। রেঙ্গুনে চাকরি করতে করতে যখন তিনি সাহিত্য-চর্চা করতেন, তখন তিনি সাধারণতঃ রাত্রে পড়তেন এবং সকালের দিকে ঘণ্টা দুই করে লিখতেন। তখন তিনি লেখার চেয়ে পড়তেনই বেশী। শরৎচন্দ্র সেই সময় ২৮-৩-১৩ তারিখে এক পত্রে যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালকে লিখেছিলেন—আমি প্রতিদিন ২ ঘণ্টার বেশী কিছুতে লিখি না—১০।১২ ঘণ্টা পড়ি।

রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে শরৎচন্দ্র সাহিত্যকেই যখন একমাত্র জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করলেন, তখন অবশ্য অনেকটা সময় তাঁকে এই সাহিত্য রচনায় দিতে হয়েছিল। তবে তিনি বিকালে ও সন্ধ্যার ঠিক পরে একরূপ লিখতেনই না। ঐ সময়টায় তিনি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দাবা খেলে, গল্পগুজব করে অথবা বেড়িয়ে কাটাতেন। সকালে ও রাত্রেই ছিল তাঁর লেখার প্রশস্ত সময়।

সকল সময়েই শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে ছিল অবারিত দ্বার। তাই লোকজন

সব সময়েই তাঁর কাছে যেতে পারত। এই অতিথি-অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করতে গিয়ে শরৎচন্দ্রের অনেক সময় নষ্ট হত।

শরৎচন্দ্র নির্জনতা ছাড়া লিখতে পারতেন না। লেখার সময় তাঁর ঘরের মধ্যে বা তাঁর সামনে কেউ থাকলে তাঁর লেখার খুব অসুবিধা হত। তাঁর লেখার জন্য আলাদা ঘর ছিল। এবং সেখানে বসেই তিনি লিখতেন। শরৎচন্দ্র নতুন জায়গায় গিয়ে অনুকূল পরিবেশ না হলে সহজে বড় একটা লিখতে পারতেন না।

শরৎচন্দ্র চেয়ার-টেবিলে, ইজিচেয়ারে, ফরাসে বসে সকল অবস্থাতেই লিখতেন। ইজিচেয়ারে বসে লিখবার জন্য তিনি টেবিলের বদলে একটা কাঠের স্ট্যাণ্ড বা 'দাঁড়' করিয়ে তাতে একটা হাত দেড়েক লম্বা ও হাতখানেক চওড়া পিতলের মোটা পাত বসিয়ে নিয়েছিলেন। দাঁড়টায় ঘন ঘন খাঁজ কাটা ছিল এবং তাতে স্ক্রু লাগিয়ে এমন ব্যবস্থা করা ছিল যে ইচ্ছামত ওঠানো নামানো যেত।

ফরাসে বসে লিখবার জন্য ডেস্কের ন্যায় তাঁর একটা ছোট টেবিল ছিল। তাতে প্যাড রেখে তিনি লিখতেন।

শরৎচন্দ্র যখন লিখতে বসতেন, তখন অনেক সময়েই গড়গড়ার নলটা তাঁর বাঁ হাতে ধরা থাকত। নলটি মুখে দিয়ে ধূমপান করতে করতে তিনি চিন্তা করতেন। তারপর সেই চিন্তাকে তিনি ধীরে ধীরে পরিচ্ছন্নভাবে সুন্দর হস্তাক্ষরে কাগজের বুকে লিখে যেতেন।

লিখবার সময় তামাক টানতে টানতে তো বটেই, তাছাড়া অনেক সময় তিনি ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজেও চিন্তা করতেন। আবার কখন কখন চেয়ার থেকে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতেও লেখা সম্বন্ধে ভাবতেন।

শরৎচন্দ্র এইভাবে ভেবেচিন্তে লিখতেন বলেই, তাঁর লেখায় কাটাকুটি থাকত না। দামী কাগজে ও দামী কলমে লেখা যেমন তাঁর সখ ছিল, তেমনি কাটাকুটিহীন, পরিচ্ছন্ন ও মুক্তার মত ঝরঝরে করে লিখতেই তিনি ভালবাসতেন। তাই কাগজ, কলম, পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা সবদিক থেকেই শরৎচন্দ্রের লেখায় একটা মস্তবড় বিলাস ছিল।

বন্ধু-বৎসল

শরৎচন্দ্র অত্যন্ত বন্ধু-বৎসল ছিলেন। বন্ধু-বান্ধবদের খোঁজখবর নেওয়া, তাঁদের দুঃখে সহানুভূতি জানানো প্রভৃতি তাঁর চিঠিপত্র থেকে অনেক পাওয়া যায়। এ ছাড়া তিনি বন্ধুদের অভাবে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করতেন, তাঁদের বিপদে মৌখিক সহানুভূতি ছাড়া অন্য উপায়েও সান্ত্বনা দিতেন। শরৎচন্দ্রের সামান্য পরিচিত এবং অখ্যাত বন্ধুরাও তাঁর এইরূপ সাহায্য ও সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হতেন না। এখানে এখন এই ধরণেরই কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি—

অশ্বিনীকুমার বর্মণ নামে একব্যক্তি স্বদেশী করে কিছুদিন জেল খাটেন। অশ্বিনীবাবু স্বদেশসেবী হিসাবেই শরৎচন্দ্রের পরিচিত ছিলেন।

অশ্বিনীবাবু জেল থেকে ফিরে কিছুদিন পরে 'আর্য পাবলিশিং কোম্পানী' নামে একটি বইয়ের দোকান করেন। কিন্তু পুঁজির অভাবে তিনি লেখকদের কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে বই নিতে অক্ষম হন। ফলে নতুন বইয়ের অভাবে তাঁর দোকানও অচল হবার উপক্রম হয়।

শরৎচন্দ্র অশ্বিনীবাবুর এই দুরবস্থা দেখে তাঁকে স্থায়ীভাবে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই তাঁর 'স্বদেশ ও সাহিত্য' বইখানি অশ্বিনীবাবুকে একেবারে দান করেছিলেন। অশ্বিনীবাবু ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে এই বইটি প্রকাশ করেন।

১৯ ৯ খ্রীষ্টাব্দে ইস্টারের ছুটিতে রংপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীর সভাপতি হিসাবে শরৎচন্দ্র যে প্রবন্ধটি পড়েছিলেন, সেটি তখন সরস্বতী লাইব্রেরী 'তরুণের বিদ্রোহ' নাম দিয়ে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছিল। এর ১ম সংস্করণ শেষ হয়ে গেলে, শরৎচন্দ্র অশ্বিনীকুমার বর্মণকে 'স্বদেশ ও সাহিত্য' বইটি দেবার সময় তাঁকে এই 'তরুণের বিদ্রোহ' বইটিও দান করেছিলেন। শরৎচন্দ্র এই সময় 'তরুণের বিদ্রোহ' গ্রন্থে যুক্ত করবার জন্য তাঁর 'সত্য ও মিথ্যা' প্রবন্ধটিও অশ্বিনীবাবুকে দিয়েছিলেন। ফলে অশ্বিনীবাবু তাঁর দোকান থেকে 'তরুণের বিদ্রোহ' ও 'সত্য ও মিথ্যা' এই প্রবন্ধ দুটি নিয়ে নূতন সংস্করণ 'তরুণের বিদ্রোহ' প্রকাশ করেন।

বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকেও শরৎচন্দ্র একটি গ্রন্থ দান করেছিলেন। প্রমথবাবুকে গ্রন্থদানের কাহিনীটি এই :—

প্রমথবাবু কলেজ ছেড়ে••কিছুদিন পাথুরেঘাটার রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ করেন। তারপর তিনি পোর্ট হেল্‌থ অফিসে চাকরি নেন। চাকরি করার সময় তিনি শারীরিক খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায় চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। চাকরি ছেড়ে প্রমথবাবু স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য প্রথমে মধ্যভারতের ছত্রপুব রাজ্যে যান। ছত্রপুরে গিয়ে প্রথমদিকে-কিছুদিন একটু সুস্থ থাকলেও ক্রমে তাঁর শরীর খুব খারাপ হয়ে পড়ে। তখন তিনি ছত্রপুর ছেড়ে যুক্ত প্রদেশের ভাওয়ালী স্যানিটোরিয়ামে যান। সেখানে গিয়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি তো দূরের কথা বরং তাঁর স্বাস্থ্য দিন দিন খারাপের দিকেই যেতে থাকে এবং সেখানে যাওয়ার চার মাস পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রমথবাবুর মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে তাঁর আর্থিক দুরবস্থার কথা জানতে পেরে শরৎচন্দ্র তাঁর ‘কাশীনাথ’ বইখানির গ্রন্থস্বত্ব বন্ধু প্রমথনাথকে দান করেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের এই গ্রন্থদানের কথা তাঁর গ্রন্থেব প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় প্রমথবাবুকে জানালে, প্রমথবাবু তখন হরিদাসবাবুকে লিখেছিলেন—

“প্রিয়বরেষু,

হরিভাই, কাল সন্ধ্যায় তোমার পত্র পাইয়া অবধি আমি কি পর্যন্ত যে আত্মহারা হইয়া আছি, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা সম্ভব নহে।…জীবনে এরূপ সহানুভূতি ও সাহায্য পাইতে কখনও অভ্যস্থ নহি, আর আমাকে কিসের জন্য, কি যোগ্যতার জন্যই বা লোকে দিবে। এখন দেখিতেছি, অযোগ্যতাও একটা বিশেষ গুণ। শরতের সব কার্যই বিচিত্র—যেদিন হইতে তাহার সহিত আলাপ হইয়াছে, সেইদিন হইতেই ইহা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। তাহার কার্য তাহাকেই সাজে—তাহার তুলনা নেই। এ অপ্রত্যাশিত অননুভূত সহানুভূতি পাইবার আমি তো ভাই কোন হিসেবেই যোগ্য নই।…শরতের কাণ্ড! পৃথিবীটা আমার কাছে নূতন করিয়া তুলিয়াছে। শরৎকে আর কি বলিব, সে দেবতা।…আমি আজন্ম পরিশ্রম করিয়া আমার পরিবারবর্গের ভবিষ্যতের জন্য যাহা করিতে পারি নাই, আজ তোমরা তাহা করিলে।·· তোমাদের কোটী কোটী নমস্কার—তোমরা এখন আমার অনেক উচ্চে, তোমরা দাতা, আমি গ্রহীতা।”

শরৎচন্দ্র কিছুদিন 'রসচক্র' সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। তখন ঐ প্রতিষ্ঠানটির সম্পাদক ছিলেন কবি কালিদাস রায়। সাহিত্যিক অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ও ঐ প্রতিষ্ঠানের একজন সভ্য ছিলেন।

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের 'মাটির স্বর্গ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে তাঁর গ্রন্থের প্রকাশক একখানি ঐ বই রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বইটি পড়ে তখন (১৩৩৮ সালে) প্রবাসীতে ঐ বই-এর এক বিরূপ সমালোচনা লিখেছিলেন।

এর কিছুদিন পরে প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় একবার কোন কারণে অসমঞ্জবাবুর উপর ক্ষুণ্ণ হন। ঐ সূত্রে রবীন্দ্রনাথও আবার তখন অসমঞ্জবাবুর উপর ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র এ সব কথা জানতেন। তাই তখন তিনি রসচক্রের সম্পাদক কালিদাসবাবুকে বলেছিলেন—অসমঞ্জ বড় মনমরা হয়ে আছে। ওকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দেওয়া দরকার। তাই ভাবছি, আমরা রসচক্রের একটা বড় অধিবেশনের মাধ্যমে ওকে অভিনন্দিত করব। আর যা খরচ হবে আমিই দেব।

শরৎচন্দ্র টাকা দিলে রসচক্রের অন্যতম সভ্য কালিদাসবাবুর ছোটভাই রাধেশবাবু, অসমঞ্জবাবুর জন্য মুর্শিদাবাদের গরদের কাপড় ও উত্তরীয়, রূপার চন্দন-বাটি, ট্রে ইত্যাদি কেনেন।

১৩৪৪ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ রবিবার দিন, বেলগাছিয়ায় 'দ্বারকা-কাননে' রসচক্রের এক উদ্যান-সম্মেলনে শরৎচন্দ্র অসমঞ্জবাবুকে অভিনন্দন জানান।

অসমঞ্জবাবু শরৎচন্দ্রের দেওয়া গরদের কাপড় ও উত্তরীয় পরলে শরৎচন্দ্র তাঁকে ধান দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে একটি অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। সেই অভিনন্দন পত্রটি শরৎচন্দ্রের কথামত কালিদাসবাবু লিখেছিলেন। সেই অভিনন্দন পত্রের এক জায়গায় এইরূপ ছিল—

"যে সকল সাহিত্য-সেবীর ধন, মান, পদ-গৌরব, প্রতিষ্ঠা ও কৌলিন্যবল আছে, তাঁহাদের বন্দনা গাহিয়া বহু লোকই কৃতার্থ হয়। কিন্তু সাহিত্য-মাধুরী ছাড়া যাঁহার অন্য কোন সম্বল নাই, রস-সাধনা ছাড়া যাঁহার অন্য কোন ব্রত নাই, তাঁহাকে কেহই কোন দিন মর্যাদা দান করে না। হে সর্বগৌরবহীন, অনন্যব্রত রসশিল্পী! আজ তোমাকে অভিনন্দিত করিয়া আমরা অবিমিশ্র সাহিত্য-সেবাকেই সম্মানিত করিলাম।"

অতিথি-পরায়ণ

শরৎচন্দ্র ছিলেন পরিমিত ও স্বল্পাহারী। নিজে অল্প-আহারী হলেও, অপরকে খাওয়ানোর ব্যাপারে তিনি কিন্তু ছিলেন এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁকে খাওয়ানোর জন্য তাঁর বাড়ীর লোকজনের যেমন ব্যস্ততার সীমা থাকত না, তিনি ঠিক তেমনি ভাবেই ব্যস্ত হয়ে পড়তেন, যখন তাঁর বাড়ীতে কোনও অতিথি যেতেন। তাঁর নিজের খাওয়ার সখ তিনি মেটাতেন অতিথিদের খাইয়ে। পরিচিত বন্ধুবান্ধব বা অপরিচিত কোন লোকজন তাঁর বাড়ীতে গেলে, তিনি তাঁদের আপ্যায়নের কখনো কোন ত্রুটি করতেন না।

রেঙ্গুন থেকে ফিরে আসার পর শরৎচন্দ্র কি বাজে শিবপুরের বাড়ীতে, কি সামতাবেড়ে, আব কি কলকাতায় যখনই যেখানে থেকেছেন, সব সময়েই তাঁব কাছে সাহিত্যসেবী ও দর্শনার্থীদের সমাগম হয়েছে। শরৎচন্দ্র সকল সময়েই তাঁর এই সব অতিথিদের যথাযোগ্য সমাদব করলেও, তিনি যখন গ্রামে সামতাবেড়ের বাড়ীতে থাকতেন, তখন সেখানে অতিথি-সমাগম হলে তাঁদের পরিচর্যার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। কারণ সামতাবেড় হচ্ছে কলকাতা থেকে প্রায় ৩৪ মাইল দূরে। বি-এন-আর-এর দেউলটি স্টেশনে নেমে মাইল দুই পায়ে হেঁটে গেলে তবে এই গ্রামে পৌঁছনো যায়। তাই কলকাতা বা অন্য কোন স্থান থেকে কেউ সেখানে গেলে, শবৎচন্দ্র আগে তাঁর বিশ্রাম ও আহারাদির ব্যবস্থা করতেন। এস্থলে পরিচিত, অপরিচিতর কোন প্রশ্ন ছিল না। সকল অতিথিকেই তিনি সমান ভাবে সমাদর করতেন। আর সেখানে শবৎচন্দ্রের অতিথিও প্রায় লেগেই থাকত। মাসিক পত্রিকার সম্পাদকরা তো লেখা পাওয়ার আশায় তাঁর কাছে যেতেনই, তাঁরা ছাড়া বহু সাহিত্যিক, অধ্যাপক এবং শিক্ষকও যেতেন। আবার অনেক সময় ছাত্ররাও ঝাঁকে ঝাঁকে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হত। তাছাড়া আরও কত রকমের লোক যে কত প্রয়োজনে তাঁর কাছে যেতেন, তার ইয়ত্তা নেই। এই রকম বিভিন্ন ধরণের অতিথি তাঁর প্রায় রোজই লেগে থাকত। শহর থেকে দূরে তাঁর এই গ্রামের বাড়ীতে তিনি সকল অতিথিকেই যথাসাধ্য আদর যত্ন করতেন।

শরৎচন্দ্রের এই অতিথি-পরায়ণতার উদাহরণ হিসাবে তাঁর অতিথিদেরই লেখা দু-একটা কাহিনী এখানে উদ্ধৃত করা গেল—

একবার রসরাজ অমৃতলাল বসুর জন্মোৎসব সভার উদ্যোগীরা ঠিক করেন যে, শরৎচন্দ্রকে তাঁরা সেবারকার সভায় সভাপতি করবেন। তাই এই প্রস্তাব নিয়ে 'অমৃত-চক্রের' তৎকালীন সচিব উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় একদিন শরৎচন্দ্রের কাছে গেলেন।

শরৎচন্দ্র তখন সামতাবেড়েই থাকতেন। উমাচরণবাবু ছিলেন শরৎচন্দ্রের সম্পূর্ণ অপরিচিত। তিনি শরৎচন্দ্রের কাছে তাঁর প্রস্তাব পেশ করলে, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে অমৃতলালের কিরূপ আলাপ ছিল, তিনি অমৃতলালের কোন্ কোন্ বই পড়েছেন এবং তাঁকে কতখানি শ্রদ্ধা করেন, সমস্তই জানালেন। কিন্তু অসুস্থতাবশতঃ সভায় সভাপতিত্ব করার অক্ষমতাও তিনি শেষে প্রকাশ করলেন। শরৎচন্দ্র অমৃতলালের স্মৃতি-সভায় যাওয়ার অক্ষমতা জানালেও তিনি উমাচরণবাবুকে যে ভাবে সমাদর করেছিলেন, সে সম্বন্ধে উমাচরণবাবু নিজেই এক জায়গায় লিখেছেন—

"একদিন বেলা প্রায় একটার সময় শবৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীতে গিয়া পৌছিলাম। শরৎচন্দ্র তখন আহারান্তে একখানি ইজিচেয়ারে বিশ্রাম করিতেছিলেন। তখন চৈত্র মাস—দ্বিপ্রহরে যাওয়ার জন্য তিনি আমাকে তিরস্কার করিয়া এত যত্ন করিলেন যে, আমি মনে করিলাম যেন কোন অতি আত্মীয়ের নিকট আসিয়াছি। কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িলেন না। আমি ভাবিতে লাগিলাম, তিনি কত বড়, আমার মত একজন সামান্য ব্যক্তিকেও যিনি এত সমাদর করিলেন। এমনি অতিথি-পরায়ণ ছিলেন শরৎচন্দ্র—এতই মিষ্ট ছিল তাঁহার ব্যবহার।" (বিচিত্রা, মাঘ ১৩৪৪)

অধ্যাপক কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় একদিন কয়েকজনসহ শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের সেই-ই প্রথম পরিচয়। এর আগে শরৎচন্দ্র তাঁদের কোনদিন দেখেন নি; আর তাঁদের নামও শোনেন নি। কাননবাবুরা গেলে আলাপ-পরিচয় ও কথায় কথায় কয়েক ঘণ্টা কেটে যায়। এমন সময় বেলা প্রায় শেষ হয়ে আসে। শরৎচন্দ্র তখন কাননবাবুদের কিছুতেই ছাড়তে চাইলেন না, রাতটাও সেখানে

কাটাবার জন্ত বিশেষভাবে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। সেদিনকার কথা উল্লেখ করে কাননবাবু লিখেছেন—

"পাড়াগাঁয়ের মানুষদের কাছে অতিথি-সেবা একটা অবশ্য করণীয় কর্তব্যের মধ্যে। শহরের জীবনে অতিথি-সেবা নেই—তা নয়। শহরের লোকেরাও বাড়ীতে অতিথি এলে সাধ্যমত যত্ন করেন। কিন্তু তাঁদের সেই যত্ন অনেকটা সামাজিক। পল্লীর মানুষদের সেবার মধ্যে একটা অবাধ আত্মীয়তা আছে। তাঁরা এটাকেও ঠিক সামাজিক কর্তব্য হিসেবে দেখেন না—এটা যেন গার্হস্থ্য-ধর্মের অঙ্গ। তাই অতিথি পেলে তাঁদের মনে যে খুশী আপনা থেকে স্ফূর্ত হয়ে ওঠে তা শহরের লোকের মধ্যে দুর্লভ। শরৎচন্দ্রের আতিথ্যের মধ্যে এম্নি একটা আত্মীয়তা ছিল। প্রথম যেদিন তাঁর পানিত্রাসের বাড়ীতে (শরৎচন্দ্রের গ্রামের নাম সামতাবেড়—পানিত্রাস নয়। সামতাবেড়ের ডাকঘর হচ্ছে পানিত্রাস। পানিত্রাস সামতাবেড়ের পাশেই অবস্থিত) যাই, সেদিন তাঁর সঙ্গে আলাপ মোটেই ছিল না। তখন খুব কম তিনি কলকাতায় আসতেন। তাই স্বভাবতঃই তাঁর ভক্তদের মধ্যে অনেকে প্রায়ই পানিত্রাসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। সহজেই অনুমান করা যায়, তখন তাঁর অতিথি সমাগমের প্রায়ই কামাই ছিল না। অথচ আমাদের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা আলাপের পর তিনি আমাদের সে-রাত্রিটা থেকে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। কথা বলার ধরণে বেশ বোঝা গেল, এটা তাঁর নিতান্ত মৌখিক পীড়াপীড়ি নয়।" (বিচিত্রা, মাঘ ১৩৪৪)

শরৎচন্দ্রের অতিথি-সংকারের কথা-প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'শরৎচন্দ্র-স্মৃতিকথা' প্রবন্ধে লিখেছেন—

"...একবার প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যকরি কমিটির সভায় তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলাম। জলখাওয়ার আয়োজন বেশ ছিল। খাওয়াইতে আমি তাঁহাকে কুণ্ঠিত দেখি নাই। আমার বন্ধু গল্প-লেখক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, একবার তাঁহার নূতন বাড়ী পানিত্রাসে গিয়াছিলেন, উদ্দেশ্য শরৎবাবুকে দেখিতে ও প্রণাম জানাইতে। চারুবাবু একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, তখন সরকারী কাজে ঐ অঞ্চলে ঘুরিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই বাড়ীর ভিতর হইতে এক থালা গরম লুচি, বেগুনভাজা ও ছয়খানি বাতাসা আসিয়া উপস্থিত হইল। চারুবাবুর কোন কথা বলিবার পূর্বেই

শরৎবাবু তাঁহার স্বাভাবিক মাধুর্যভরা কণ্ঠে বলিলেন—এত বেলায় ব্রাহ্মণের বাড়ী এসে কি অভুক্তাবস্থায় যেতে পারো ভায়া ?

চারুবাবু—বেশ, বেশ, বাতাসা আবার কেন ?

শরৎবাবু—ওটা ভায়া গ্রামের ভদ্রতা।" (সংহতি—ভাদ্র, ১৩৫৮)

শরৎচন্দ্রের গ্রামের বাড়ীতে যাঁরা খেয়েছেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে, প্রায় ৪ ইঞ্চি ব্যাসের কি রকম বড় বড় বাতাসা তিনি তাঁর অতিথিদের খেতে দিতেন। সামতাবেড় একেবারে অজ পাড়াগাঁ। তখন সেখানে কাছাকাছি কোথাও হাট বাজার না থাকায় ছানার মিষ্টান্ন পাওয়া যেত না। তাই শরৎচন্দ্র সব সময়ের জন্য তাঁর বাড়ীতে এই রকমের বড় বড় বাতাসা মজুত রাখতেন এবং অতিথিরা এলে মিষ্টদ্রব্য হিসাবে এই বাতাসা খেতে দিতেন।

শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে শুধু যে ক্ষণিকের বা এক আধ দিনের অতিথিরাই যেতেন, তা নয়, তাঁর এমনও সব বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন, যাঁরা একটানা মাসের পর মাসও তাঁর বাড়ীতে কাটিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের এরূপ দুজন বন্ধু এক সময় তাঁর বাড়ীতে প্রায় তিন মাস ছিলেন। এঁরা হলেন, প্রবোধচন্দ্র বসু ও অধ্যাপক (পরে অধ্যক্ষ) বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য।

সেটা তখন ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ। শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি, আর প্রবোধচন্দ্র বসু ও বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য যথাক্রমে সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ। শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে এঁরা তখন কিরূপ খাওয়া-দাওয়া ও আদর-যত্নের মধ্যে ছিলেন, সে সম্বন্ধে বিজয়বাবু বলেন—

"শরৎদার বাড়ীতে আমরা রাজার হালে ছিলাম। তিনি রোজই খাওয়া-দাওয়ার প্রচুর আয়োজন করতেন। তাঁর দুটো পুকুর ছিল। পুকুর থেকে রোজ মাছ ধরানো হত। আর শরৎদার বাড়ীতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, তাঁর নিজের পোষা গরুর ঘন মিষ্টি দুধ। শরৎদার সেই খাওয়ানোর কথা আজও মনে আছে।"

কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করলে, তৎকালীন ভারত গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসকে তখনই বে-আইনী ঘোষণা করে। এবং আইন অমান্যকারী কংগ্রেস-নেতাদের গ্রেপ্তার করে। হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে শরৎচন্দ্র যদিও তখন আইন অমান্য করে জেলে গেলেন না

বটে, কিন্তু সেই সময় তিনি তাঁর গ্রামের বাড়ীতে বসে অনাথ কংগ্রেসকর্মীদের অন্নের সংস্থান করে যেতে লাগলেন। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁর স্নেহভাজন বন্ধু মণীন্দ্রনাথ রায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

"লোকের আসার বিরাম নাই দলে দলে। বিশেষতঃ কংগ্রেস বে-আইনী হবার দরুণ যাঁরা অনাথ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাঁদের।"

শরৎচন্দ্র তখন গ্রামে থেকে দিনের পর দিন তাঁর এইসব কংগ্রেসী অতিথিদের আহার জুগিয়ে যেতেন।

শরৎচন্দ্র সামতাবেড় থেকে কলকাতায় এলে, তাঁর কাছে যাওয়া অনেকটা সহজ হওয়ার ফলে, এখানে তাঁর অতিথি-অভ্যাগতের সংখ্যা বহু পরিমাণে বেড়ে যেত। তবে সামতাবেড়ের মত তাঁর এখানকার অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য তাঁকে মধ্যাহ্নভোজন বা নৈশভোজনের ব্যবস্থা বড় একটা করতে হত না। তবুও কিন্তু তিনি তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করে না খাইয়ে ছাড়তেন না। 'অমুক দিন আমার বাড়ীতে তোমার নিমন্ত্রণ রইল' বলে প্রায়ই তিনি বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর বাড়ীতে বন্ধু এবং অতিথিদের শুধু যে যত্নসহকারে খাওয়াতেন তা নয়, অনেক সময় তিনি তাঁর সামতাবেড়ের বাগানের ফলমূল, পুকুরের মাছ প্রভৃতিও বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতেন।

শরৎচন্দ্র নিজে যেমন লোকজনকে খাওয়াতে ভালবাসতেন, আবার তেমনি তিনি গল্পের আসরে বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে টাকা পয়সা আদায় করেও সময় সময় অনেককে খাওয়াতেন। অবশ্য যাঁরা তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং যাঁদের উপরে তাঁর জোর চলত, তাঁদের কাছ থেকেই তিনি টাকা আদায় করতেন। এজন্য অনেক সময় তিনি সোজাসুজি ভাবে টাকাপয়সা না চেয়ে, নানা ফন্দিফিকির করেও টাকা আদয় করে নিতেন। বন্ধুরা কখনো কখনো শরৎচন্দ্রের ফন্দির কথা জানতে পারলেও হাসিমুখেই টাকা দিতেন। এই রকমের একটা ঘটনা এখানে বলছি—

শরৎচন্দ্র সেদিন 'ভারতবর্ষ' অফিসে এসেছেন। অফিসের কর্মচারীদের সঙ্গে তিনি বসে বসে গল্পগুজব করছেন। তখন বিকাল বেলা। শরৎচন্দ্রের আফিং খাওয়ার সময়, তাই তিনি পকেট থেকে আফিংএর কৌটোটা বার করে, একটা আফিং-এর পাকানো বাড় খেয়ে নিলেন। অফিসের কর্মচারীরা

তাঁর আফিং খাওয়া দেখছেন দেখে শরৎচন্দ্র তাঁদের বললেন—কি আফিং খেয়ে বুঝি মরবার লোভ হচ্ছে? তারপর তিনি পাশের একজনকে বললেন—দেখ, তুমি একটু আফিং খাও, তাহলে দেখবে তুমি আমার মতই সাহিত্যিক হয়ে গেছ। এই বলে শরৎচন্দ্র শুধু তাঁকেই নয়, নানাভাবে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এবং আফিংএর অশেষ গুণমহিমা বর্ণনা করে অফিসশুদ্ধ সকলকেই একটু একটু করে আফিং খাইয়ে দিলেন।

এই সময়টায় ভারতবর্ষের স্বত্বাধিকারীদের—কি হরিদাস চট্টোপাধ্যায় আর কি তাঁর ভাই সুধাংশু চট্টোপাধ্যায় কেউই অফিসে ছিলেন না। তাঁরা তখন বাড়ী চলে গেছেন। শরৎচন্দ্র আরও মজা করবার জন্য ভারতবর্ষের অন্যতম স্বত্বাধিকারী বন্ধু হরিদাসবাবুকে এক চিঠি লিখে অফিসের দরোয়ানের হাত দিয়ে তখনই পাঠিয়ে দিলেন। চিঠিতে তিনি লিখলেন—ভায়া, আফিংএর রূপের মোহে, আর কেউ কেউ আফিং ধরে আমার মত সাহিত্যিক হবার লোভে, আপনার অফিসশুদ্ধ সমস্ত লোকই আমার কাছ থেকে জোর করে আফিং কেড়ে নিয়ে খেয়ে বসে আছে। এখন তারা আফিংএর নেশায় ঝিমুচ্ছে। এখনি যদি না তাদের মিষ্টি খাওয়ার ব্যবস্থা করেন, ঝিমুনি কাটবে না। তাহলে কি হবে বুঝতেই পারছেন? আপনার হাতে এখনি পুলিশের হাতকড়া পড়বে। অতএব পত্রপাঠ কিছু পাঠিয়ে দিন।

হরিদাসবাবু শরৎচন্দ্রের পত্র পেয়ে তাঁর আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন। তিনি দরোয়ানের হাতে তখনি দশটা টাকা পাঠিয়ে দিলেন। অফিসে অল্পই কর্মচারী ছিল। তাই বিকালের জলযোগটা তাঁদের সেদিন মন্দ হল না।

শরৎচন্দ্র এমনিভাবে নানা উপায়ে অনেককেই খাওয়াতে ভালবাসতেন। তিনি তাঁর নিজের বাড়ীতে লোকজনকে মাঝে মাঝে যেমন খাওয়াতেন, তেমনি আবার বিশিষ্ট বন্ধুদের কাছ থেকে টাকাপয়সা আদায় করেও মাঝে মাঝে অনেকের ভোজের ব্যবস্থা করতেন। সব সময়েই, বিশেষ করে তাঁর নিজের বাড়ীতে তাঁর অতিথিসেবাব ভিতর এমন একটা আন্তরিকতা ও আত্মীয়তার ভাব ছিল যে, যিনি একবার তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছেন, তিনি সেকথা আর ভোলেন নি। তাই অনেকেই শরৎচন্দ্রের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে নানা জায়গায় নানাভাবে তাঁর সেই আতিথ্যের উচ্চ প্রশংসা করে লিখেও গেছেন। শরৎচন্দ্রের অতিথি-পরায়ণতার এগুলি নিদর্শন হয়ে রয়েছে।

মজলিসী

সভায় বক্তৃতা দিতে হবে মনে হলে যে শরৎচন্দ্রের হৃৎকম্প উপস্থিত হ'ত, সেই শরৎচন্দ্রই কিন্তু যখন কোন বৈঠকী-আসরে বা মজলিসে যেতেন, তখন কথায় একেবারে মেতে উঠতেন। গল্পগুজবে ও হাস্য-পরিহাসে এমনিভাবে তিনি আসর জমিয়ে রাখতেন যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এবং বেলার পর বেলা কাটিয়ে দিতেন। আর তাঁর শ্রোতারাও তাঁকে ছেড়ে যেতে চাইতেন না।

এই হাস্য-পরিহাসপ্রিয়তা ও মজলিসী-স্বভাব শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলা থেকেই ছিল। ভাগলপুরে অবস্থানকালে ছেলেবেলায় তিনি নিজেদের সাহিত্য-সভার সভাপতি ছিলেন এবং এই সাহিত্য-সভার বৈঠকে তিনিই প্রাধান্য করতেন। এ ছাড়া পাড়ার সমবয়সীদের দলেও তিনিই ছিলেন নেতা। এই সমবয়সী বন্ধুদের সব সময়েই তিনি গল্পগুজবে মশগুল করে রাখতেন। শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুর থেকে গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে মিশে হুগলী শহরে যখন পড়তে যেতেন, তখনও পথে সঙ্গীদের নানা রকমের গল্প বলতেন।

পরে রেঙ্গুনে অবস্থানকালেও একজন মজলিসী মানুষ বলে শরৎচন্দ্রের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানে তাঁর বন্ধুরা এবং সহকর্মীরা উৎসুক হয়ে থাকতেন তাঁর মুখের কথা ও গল্প শুনবার জন্য।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে চলে এসে যখন হাওড়ায় বাজে শিবপুরে বাস করছিলেন, তখন একবার সরস্বতী পূজার সময় তিনি কাশীতে উত্তরা-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ীতে বেড়াতে যান। শরৎচন্দ্র কাশীতে গিয়ে দেখেন যে, সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও পূর্ণিয়া থেকে কাশী বেড়াতে এসে সুরেশবাবুর বাড়ীতেই উঠেছেন। সুরেশবাবুর বাড়ীতে বাঙ্গলার দুজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের একত্র সমাবেশ হয়েছে, এই শুনে কাশীর শিক্ষিত বাঙ্গালী অধিবাসীরা সুরেশবাবুর বাড়ীতে দলে দলে আসতে লাগলেন। তাঁরা এই দুই সাহিত্যরথীর সঙ্গে দেখা করে, তাঁদের সঙ্গে গল্প করে এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নমস্কার জানিয়ে যেতে লাগলেন। এই সময় কেদারবাবু মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগছিলেন। শরৎচন্দ্রের হাসি-ঠাট্টা ও গল্পের পাল্লায়

পড়ে তাঁর জ্বরও যেন তখন তাঁকে আক্রমণ করতে ভুলে গিয়েছিল। শরৎচন্দ্র এই সময় সকল কাজকর্ম ভুলে তাঁর দর্শনার্থী ও কেদারবাবুকে নিয়েই শুধু দিনের পর দিন গল্প করে কাটিয়ে দিয়েছিলেন। সে কথার প্রসঙ্গে কেদারবাবু তাঁর 'শরৎ-কথা' প্রবন্ধে লিখেছেন—

"পূর্ণিয়া থেকে, এখানকার যা নামী ও দামী জিনিস—ম্যালেরিয়া, সেটি সংগ্রহ করি।······পুরো পাঁচ মাস তার উৎপাত সয়ে পূজার পর কাশী চলে গেলুম। দেখি তিনিও সঙ্গে এসেছেন—কাশীবাস করতে চান—আমাকেই অবলম্বন করে।······উত্তরা-সম্পাদক শ্রীমান্ সুরেশ চক্রবর্তীর বাসায় উঠেছি। জ্বরভোগ করি, ছুটি পেলেই 'কোষ্ঠির ফলাফল' লিখি।···শ্রীপঞ্চমীর পূর্বদিন—বাইরের ঘরে বসে লিখছি। সহসা শুনলুম—এইটি কি সুরেশবাবুর বাসা? বাবু গাড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।······

···(শরৎচন্দ্র) ঘরে এসে ঢুকলেন।·· তারপর কত কথা। অসুখের উল্লেখমাত্র নয়।—অসুখ আবার কি? ও সেরে গেছে।—কথাটি ব্রহ্মবাক্যের মতই কাজ করলে, আমার যে অসুখ ছিল বা আছে, সে কথাটা শরীরে বা মনে অনুভবই করিনি।······

তারপর দিন যায়, রাত আসে। স্নানাহার স্মরণ থাকে না। আনন্দমুখর তরুণেরা আসে যায়—সুরেশের লাইব্রেরীতে সরস্বতী পূজা—সভাপতি শরৎবাবু,······আজ আমাকে নিয়ে বেরুতেই হবে। টাঙ্গাওলাকে বলে দেওয়া হল—'কাল ঠিক আটটায়···আসা চাই, দেখিস্—খবরদার বিলম্ব না হয়,—বুঝতা?'—'হাঁ হুজুর' বলে সে চলে গেল। পরদিন সেলাম করে জানিয়ে দিলে—ঠিক আটটায় হাজির হয়েছে।

বেলা ৯টায় সময় দ্বিতীয় সেলাম। তখন চা খাওয়া চলছে, ভোলা তাওয়া চড়াচ্ছে। গাড়োয়ানকে বললেন—'এই ভ্যাখ্না, চট্ করে নিচ্ছি—সত্বরই যাতা হায়।'

ক্রমে তরুণ দলের আগমন। তাওয়াও ফিকে মেরেছে। 'ভোলা করচিস্ কি, বাবুরা এসেছেন—কোন আক্কেল নেই।······'

বেলা ১১টায় তৃতীয় সেলাম। 'তাই তো কেদারবাবু, এ বেটা যে ছাড়ে না দেখছি। এ বেলা কি যেতে পারবেন?'

বললুম—'এঁরা সব দূর থেকে এসেছেন, এঁদের ফেলে······'

'তাই তো—তা ও-বেটা বোঝে না কেনো। ওহে এগারোটা তো

বাজ গিয়া,—এখন খাও দাও গিয়ে। তোমাদের আবার 'পাকাতে' হয়। কাশীতে তো কষ্ট দিতে আসতে নেই। যাও—ঠিক চারটে বাজলেই আও কিন্তু।'······

সে কি বলতে যাচ্ছিল। 'হাঁ হাঁ বুঝা হায়, তোমার ক্ষতি নেই করে গা—ভাড়া ঠিক পাবে গো।' সে চলে গেল।

বললেন—'আজ কিন্তু বিকেলে দেরি করলে চলবে না কেদারবাবু।'

······টাঙ্গাওলা দু বেলাই ঠিক আসে। রাত ১১টার পর সাত টাকা নিয়ে যায়। দুদিন এইভাবেই কাটল।

বললুম—'কাশীতে কাজটা ভালো হচ্ছে কি? আপনি ধর্মভীরু মানুষ—ঘোড়াটার যে ইহকাল পরকাল গেল—বাতে ধরে মরবে যে।'

'না—কাল আর কারো কথা শোনা হচ্ছে না। আপনি কাল সকাল সকাল উঠবেন, পারবেন ত?'

তৃতীয় দিনও সকালে বেরুনো হয়ে উঠল না।" (ভারতবর্ষ—ফাল্গুন, ১৩৪৪)

শরৎচন্দ্র কি রকম যে মজলিসী মানুষ ছিলেন এবং কিভাবে যে তিনি গল্পে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতেন, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই লেখাটি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে মুন্সীগঞ্জে যে সাহিত্য-সম্মেলন হয়, তাতে সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র, আর ইতিহাস শাখার সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যাপক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার। সম্মেলনের শেষে রমেশবাবু তাঁর ঢাকার বাড়ীতে যাওয়ার জন্য শরৎচন্দ্রকে আমন্ত্রণ করলে শরৎচন্দ্র ঢাকা যান। ঢাকায় রমেশবাবুর বাড়ীতে তিনি দু-একদিন ছিলেন। সেই সময় সেখানকার লোকদের সঙ্গে শরৎচন্দ্র কিভাবে গল্প করে কাটিয়েছিলেন, সে কথার প্রসঙ্গে রমেশবাবু তাঁর "শরৎ-স্মৃতি' প্রবন্ধে লিখেছেন—

"আমার বাটীর মধ্যে একটি পুকুর ছিল। তাহার বাঁধান ঘাটের উপর দুই রোয়াকে বসিয়া আমাদের মজলিস জমিত।······ঘাটের মজলিসে তিনি আসর জমাইয়া বসিতেন, আর পেয়ালার পর পেয়ালা চা আসিত এবং ঘন ঘন হুঁকার কলিকা বদলি হইত।" (শরৎ-স্মরণিকা)

শরৎচন্দ্রের বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের (মুখোপাধ্যায়ের) পুত্র পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় এক সময় শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে প্রায়ই যেতেন। পাঁচুগোপালবাবু শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে গেলে, শরৎচন্দ্র তাঁর সঙ্গে গল্প করতেন। এ কথার উল্লেখ করে পাঁচুগোপালবাবু শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর 'স্মৃতি-পূজা' নামে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাতে তিনি লিখেছিলেন—

"প্রত্যহ বহুক্ষণ তাঁর সঙ্গে গল্পগুজবে কাটিয়েছি। তিনি কেবল গল্প লিখতেন না, গল্প করবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতাও তাঁর ছিল। সভায় তাঁকে মানাতো না, কিন্তু গল্পের বৈঠকে তিনি ছিলেন যাদুকর গল্পী।"

শরৎচন্দ্র এমন মজলিসী মানুষ ছিলেন যে, একবার তাঁর কাছে গেলে, তাঁর হাস্য-পরিহাস ও গল্প ছেড়ে তাঁর কাছ থেকে ওঠা কঠিন হত। একমনে তাঁর কথা শুনতেই হত। তাঁর কথা বলার মধ্যে এমনি একটা যাদু ছিল। শরৎচন্দ্র অধিকাংশ সময়ই কথায় কথায় হাসির ফোয়ারা ছোটাতেন। আবার কখন কখন তিনি গম্ভীর হয়ে মিথ্যা করে কারও কারও বিরুদ্ধে এমন সব কথা বলতেন যে, যে শুনত সে বিশ্বাস না করে থাকতে পারত না। তারপর শরৎচন্দ্রের এই কথাকে সে আবার যখন মিথ্যা বলে জানতে পারত, তখন সে হেসে উঠত।

শরৎচন্দ্র মিছামিছি অনেককে রাগিয়ে দিয়েও মজা উপভোগ করতেন। শরৎচন্দ্রের এই মানুষকে ক্ষ্যাপানোর কথা উল্লেখ করে দিলীপকুমার রায় লিখেছেন—

"শরৎচন্দ্রের একটা অভ্যাস ছিল, মানুষকে ক্ষ্যাপানো। এ সময়ে তিনি ভারি হাস্কামি করতেন। চিঠিপত্রেও। এ ভঙ্গি হল ফরাসি—প্রকৃতিতে : এর নাম 'ব্লেগ' : অর্থাৎ কিনা নিপুণ ভঙ্গিতে রটানো—যা আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু যারা এ-ভঙ্গিকে চেনে না, তারা স্বতঃই ওঠে চ'টে—ভাবে কত কী ভুল কথা। এই জন্যেই তর্কাতর্কির পরে অনেককে তাঁর সম্বন্ধে খুব খারাপ ধারণা নিয়ে ফিরতে আমি দেখেছি স্বচক্ষে। এতে আমি দুঃখ পেতাম বরাবরই, কারণ শরৎচন্দ্রকে কেউ গালিগালাজ করলে আমার বাজত—কিন্তু শরৎচন্দ্র দারুণ খুশী হতেন। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমি সময়ে সময়ে দারুণ তর্ক করতাম, কিন্তু তিনি শুধু হাসতেন।"

শরৎচন্দ্র লোককে ক্ষেপিয়ে বা কারও বিরুদ্ধে কিছু মিথ্যা রটিয়ে যে মজা করতেন, একেও তাঁর এক প্রকারের হাস্য-পরিহাসেরই নামান্তর বলা যেতে পারে। এই প্রকারের রসিকতায় এর আসল মিথ্যা রূপটা যখন ধরা পড়ে, তখন সকলেই হাসিতে ফেটে পড়ে। শরৎচন্দ্রের এই মিথ্যা রটানোগুলো এমনি নির্দোষ থাকত যে, যার বিরুদ্ধে রটানো হ'ত, সেও প্রকৃত কথাটা জানতে পারলে বিমর্ষ না হয়ে হেসেই উঠ্ত।

শরৎচন্দ্র কথায় কথায় লোককে প্রায়ই হাসাতেন। তাঁর এই হাসির কথাগুলি যেমন সূক্ষ্ম, তেমনি মার্জিত রুচিসম্পন্নও ছিল। তাঁর এই হাসির গল্পের মধ্যে কোথাও স্থূলতা বা ভাঁড়ামির স্থান ছিল না। . তিনি কথায় কথায় লোককে কিভাবে হাসাতেন, এখানে তাঁর সেরূপ দু-একটা হাসির গল্প বলছি—

শরৎচন্দ্রের মাতুল ও বন্ধু উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাননবিহারী মুখোপাপাধ্যায় একদিন শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়েব বাড়ীতে বেড়াতে যান। সেদিন কাননবাবু কথাপ্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এ অঞ্চলের স্বাস্থ্য কি রকম? এখানে ম্যালেরিয়া আছে নাকি?

এর উত্তরে মৃদু হেসে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—উপীন, তুমি সে গল্পটা কাননকে বুঝি বল নি? তবে শোন, এখানে পাশের গাঁয়ে আমার এক ভগ্নীপতি আছেন, তাঁর বয়স প্রায় পঁচাত্তর। তাঁকে পানিত্রাসের স্বাস্থ্যের কথা কেউ জিজ্ঞাসা করলে, তিনি জবাব দেন—আর কেন বলেন মশাই, এই বুড়ো বয়সেও খোলা জায়গায় বসে একটু নিশ্চিন্তে যে তামাক খাব, তারও উপায় নেই।

শরৎচন্দ্রের এই কথাটির কোথায় যে সূক্ষ্মভাবে হাসির ইঙ্গিত রয়েছে, কাননবাবু ধরতে পারছেন না দেখে উপেনবাবু কথাটির ব্যাখ্যা করে দিলেন। উপেনবাবু বললেন—পাড়াগাঁয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছে তামাক খেতে নেই, শরতের ভগ্নীপতির বয়স যদিও পঁচাত্তব, তাহলেও এ অঞ্চলে তাঁর চেয়েও অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি রয়েছেন। তাঁরা সর্বদাই আশপাশে ঘোরাঘুরি করেন বলে শরতের ভগ্নীপতির ফাঁকায় বসে তামাক খাওয়ার ব্যাঘাত হয়। এ থেকেই বুঝতে পারছ, এখানকার স্বাস্থ্য কেমন?

কথাটা শুনে কাননবাবু এবার খুব হেসে উঠলেন।

শরৎচন্দ্রের আর একটি গল্প :—

'ভারতবর্ষ' কার্যালয়ে শরৎচন্দ্র এসেছেন। ভারতবর্ষের সম্পাদকীয় বিভাগের লোকজন ছাড়া আরও কয়েকজন সাহিত্যিক সেদিন উপস্থিত আছেন। সেই সময় ১৩৪০ সালের শ্রাবণ মাসের 'পরিচয়' পত্রিকায় দিলীপ কুমার রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র 'সাহিত্যের মাত্রা' প্রকাশিত হয়েছে। সেদিন সকলে রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি নিয়েই আলোচনা স্বরু করলেন। একজন শরৎচন্দ্রকে উদ্দেশ করে বললেন—কবি যাঁদের সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে মনে হচ্ছে আপনিও আছেন। এ প্রবন্ধে কবি যে সব অভিযোগ করেছেন, দেখেছেন তো?

শরৎচন্দ্র এই কথাগুলো শুনে গম্ভীর হয়ে বললেন—কবি এই বলে আমার কি ক্ষতি করবেন শুনি? আমি তাঁর যে ক্ষতি করে দিয়েছি তার তুলনায় এ কিছুই না।

অনেকেই অমনি উদ্‌গ্রীব হয়ে শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি? আপনি আবার রবীন্দ্রনাথের কি ক্ষতি করলেন?

—সে যা করে দিয়েছি, সে রবীন্দ্রনাথই টের পাবেন।

—তবু শুনি না, কি ক্ষতি করেছেন?

—গিরিজা বোসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপ করিয়ে দিয়েছি।

—তাতে আর ক্ষতি কি হবে?

—সে তোমরা তার কি বুঝবে? যাঁর ক্ষতি হবে, তিনিই জানতে পারবেন। জান তো গিরিজা কি রকম গল্পে লোক। তার উপর কবিতা লেখার রোগ আগে। এখন দুবেলা রবীন্দ্রনাথের কাছে যাবে, আর গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করবে। রবীন্দ্রনাথের স্বভাব তো জানই, নিজের অসুবিধা হলেও লোককে মুখের উপর কথা বলে তাড়িয়ে দিতে পারেন না। গিরিজার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ায় এই ফল হল যে, গিরিজা অনবরত রবীন্দ্রনাথের কাছে যাবে, তার ফলে রবীন্দ্রনাথকে আর একটি লাইনও লিখতে হবে না। কেমন! কবি আমার যা ক্ষতি করেছেন, সে তুলনায় আমি তাঁর বেশী ক্ষতি করতে পারি নি?

শরৎচন্দ্র এমনভাবে কথাগুলো বলে গেলেন যে, সকলেই শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন।

শরৎচন্দ্র এইভাবেই অতি সূক্ষ্ম ও রুচিপূর্ণ গল্প বলেই লোককে হাসাতেন।

এই কারণেই তাঁর রচনার মধ্যে যে হাস্যরসের চিত্রগুলি রয়েছে, সেগুলিও এমনি সুন্দর ও মার্জিত হয়েছে।

বড় বড় সভাসমিতিতে দাঁড়িয়ে তিনি কিছু বলতে পারতেন না বটে, কিন্তু বৈঠকী আসরে বা মজলিসে তিনি ছিলেন একজন মস্ত বড় বক্তা ও একজন সত্যিকারের উঁচুদরের মজলিসী মানুষ।

শরৎচন্দ্রের স্নেহভাজন বন্ধু সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ১৩৬০ সালের দৈনিক বসুমতী শারদীয়া সংখ্যায় এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

"হয়ত অনেকেই জানেন না যে, শরৎচন্দ্র খুব ভাল গল্প বলিয়ে ছিলেন। এদিক দিয়েও তিনি ছিলেন একজন উঁচুদরের আর্টিস্ট। তাঁর লেখার থেকে গল্প বলার কায়দা ছিল আরো মনোহর।"

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় ছিল, তাঁরা সকলেই জানেন, এ কথা কত সত্য। গল্প করবার তাঁর একটা ক্ষমতাই ছিল অসাধারণ। গল্পের অভিনব বিষয়বস্তুর কথা ছেড়ে দিলেও তাঁর বলার ভঙ্গিতেই এমন একটা যাদু ছিল যে, শ্রোতারা অভিভূত হয়ে যেতেন। কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারও তাই এক জায়গায় লিখেছেন—

"গল্প শুনিয়া আমি অভিভূত হইয়াছিলাম—শুধু গল্প নয়—গল্প বলিবার আশ্চর্য ভঙ্গিতেও।...শরৎচন্দ্রের গল্প সকলে পড়িয়াছেন ও মুগ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাব অনুপ্রেরণা আর এক ধরণের—তাহাতে ভাবের সংক্রামণতা আরো অব্যর্থ।"

বাঙ্গলা, বিহার ও বর্মা এই তিনটি দেশে শরৎচন্দ্র ব্যাপকভাবে ঘুরেছিলেন এবং সর্বত্রই তিনি বহুলোকের সঙ্গে মিশেছিলেন। এই বিপুল ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার সব কাহিনী তিনি বন্ধুবান্ধবদের শোনাতেন। এর মধ্যে একদিকে যেমন থাকত নিছক হাসির গল্প, তেমনি কত রকমের করুণ কাহিনীও থাকত। এমন কি দেবদেবীর কাহিনী থেকে মায় ভূতের গল্প পর্যন্ত কিছুই বাদ যেত না।

শরৎচন্দ্রের এই বৈঠকী গল্পের এক শ্রোতা ১৩৪৪ সালের মাঘ সংখ্যা বিচিত্রায় এ সম্বন্ধে লিখেছিলেন—'কতদিন তাঁহার বালিগঞ্জের বাড়ীতে বৈকালে গিয়া রাত্রি পর্যন্ত তাঁহার মুখে গল্প শুনিয়াছি। রেঙ্গুন প্রবাসের গল্প, সাপ ধরার গল্প, কুমীর ধরার গল্প, বামুনঠাকুরের গল্প, ঔপন্যাসিক নায়ককে আর

চালাইতে না পারিয়া সর্পদংশনে কেমন করিয়া মৃত্যু ঘটাইলেন তাহার গল্প, রায় বাহাদুরের নূতন উপাধি লাভে ব্যাণ্ড বাজাইয়া গ্রামে যাওয়ার গল্প, মূর্খ জমিদারের লাইব্রেরীর গল্প—এইরূপ কত বিচিত্র কথা তিনি বলিয়া যাইতেন, আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিতাম।'

মৃত্যুর তিন চার বছর আগে শরৎচন্দ্র একবার ভাগলপুরে গিয়েছিলেন। সেখানে গেলে ভাগলপুর-প্রবাসী সাহিত্যিক 'বনফুল' (ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) একদিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে যান। আলাপ-পরিচয়ের পর 'বনফুল' শরৎচন্দ্রকে একটি গল্প বলতে অনুরোধ করলে শরৎচন্দ্র তাঁকে এক সাধুর জাহাজ গিলে খাওয়ার এক গল্প শুনিয়েছিলেন। 'বনফুল' শরৎচন্দ্রের এই গল্পটি একদিন আমায় শোনান। শরৎচন্দ্রের মাতুল ও বাল্যবন্ধু সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখেও শরৎচন্দ্রের এই গল্পটি শুনেছি। শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্পের নমুনা হিসাবে এখানে সেই গল্পটি পরিবেশন করা গেল—

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—

আমরা তখন ছেলেমানুষ। স্কুলে পড়ি। সেই সময় একবার ভাগলপুরময় একটা খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, এই ভাগলপুরেরই আদমপুর ঘাটে এক অত্যাশ্চর্য সাধু এসেছে। গেরুয়া বা জটার দিক থেকে আর পাঁচজন সাধুর মতো হলেও, এর গুণ আর শক্তি নাকি অসাধারণ। ক'দিনের মধ্যেই নাকি সে ভাগলপুরের কত লোকের কত দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে দিয়েছে। আর শুধু কি তাই! কত কি অদ্ভুত তাজ্জব কাণ্ডও নাকি দেখাচ্ছে। সেটা তখন আমের সময় নয়, অথচ কেউ হয়তো বললে—সাধুজী একটা পাকা আম খাওয়ার বাসনা। সাধুজী অমনি তার ঝোলার মধ্যে হাতটি পুরে দিব্যি পাকা আম তুলে আনলে।

লোকে সাধুর এই সব অলৌকিক কাণ্ড দেখে তো একেবারে তাজ্জব বনে যাচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যেই সাধুর কথা শহরময় রাষ্ট্র হয়ে গেল। ফলে হ'ল কি জানো—সাধুকে শুধু দেখবার জন্যই আদমপুর ঘাটে রোজই লোকে লোকারণ্য। অনেকে একান্ত ভক্তও হয়ে পড়ল সাধুবাবার। কী সব দীক্ষাটিক্ষা দিয়ে সাধু তাদের শিষ্যও করে ফেললে।

একদিন সাধু তার শিষ্যদের বলল—হাম গঙ্গামায়ীকে পূজা দেগা।

ভক্তরা শুনে গদগদ। বলল—সে আর কথা কী গুরুদেব! পূজার যা কিছু

নৈবেদ্য উপকরণ কালই আমরা সব এনে হাজির করব এখানে। আপনি পূজার ব্যবস্থা করুন।

পরদিন শিষ্যবৃন্দ গঙ্গামায়ের পূজার জন্য প্রচুর উপকরণ এনে হাজির করল আদমপুর ঘাটে। গঙ্গাতীরে বালুর উপর একেবারে জলের কাছ ঘেঁসে থরে থরে সব কিছু সাজানো হল। পূজার সময় হয়ে এলে সাধু পূজায় বসবে কি এমন সময় এক নিদারুণ ব্যাপার ঘটে গেল।

'কার' কোম্পানীর বড় স্টীমারখানা তখন রোজই ঐ সময় আদমপুরঘাট পাস করে যেত। জাহাজের যেমন ছিল গর্জন, তেমনি ঢেউও তুলত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড। সেই ঢেউ এসে করল কি জানো, গঙ্গামায়ীকীর পূজার নৈবেদ্য ফলমূল সব তো নিয়ে গেল ভাসিয়ে।

এই দেখে শিষ্যরা হায় হায় করে উঠল! সাধু কিন্তু গেল একেবারে ক্ষেপে। চীৎকার করে শাপশাপান্ত করতে লাগল—এতবড় স্পর্ধা জাহাজের! আমার গঙ্গামায়ীকীর পূজা ভাসিয়ে দিয়ে যায়! আচ্ছা কাল আয় তুই বেটা জাহাজ! এসে গ্যাখ! কাল তোকে আস্ত আমি গিলে খাব। কাল আর তোকে পালাতে দিচ্ছি নে! আয় একবার!

এদিকে শিষ্যরা তো সাধুর কথা শুনে হাঁ করে রইল। গুরুদেব বলেন কি! এতবড় একটা জাহাজ—তাকে আস্ত গিলে খাবেন!

একজন শিষ্য বলতে যাচ্ছিল—গুরুদেব ··

গুরুদেব তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ ও আমার এক কথা। কাল ঐ জাহাজকে আমি গিলে খাবই। ওর আর নিস্তার নেই। ওর এতবড় স্পর্ধা যে আমার আয়োজিত পূজার নৈবেদ্য ভাসিয়ে দিয়ে যায়!

শিষ্যরা তবুও যেন ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না। মানুষে জাহাজ গিলে খাবে—একি কখনো সম্ভব! অবশেষে তাদের মধ্যেই একজন বললে—গুরুদেবের কাছে অসম্ভব কিছু নেই। সাধনার বলে কি না করতে পারেন তিনি। জাহাজ ভক্ষণ তো তুচ্ছ ব্যাপার। মহাপুরুষদের লীলাখেলাই আলাদা রে ভাই!

এখন এই বার্তা তো রটে গেল শহরময় যে, কাল বেলা বারটার সময় কার-কোম্পানীর বড় জাহাজখানা যখন আদমপুর ঘাটের কাছ দিয়ে যাবে, তখন সাধুজী সেই জাহাজখানাকে আস্ত গিলে খেয়ে নেবে।

শহর ছাড়িয়ে শহরের আশেপাশেও অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল কথাটা।

পরের দিন সকাল থেকেই আদমপুর ঘাটে লোক জমতে শুরু হয়ে গেল। দল বেঁধে আমরাও তো গেলাম। গিয়ে দেখি বেলা যত বাড়ে, লোকও ততই ঝাঁকে ঝাঁকে আসতে থাকে। ঘাট, ঘাটের আশপাশের সব জায়গা সমস্তই লোকে থৈ থৈ। দেখতে দেখতে ঘাটের আশপাশের বড় বড় গাছগুলো পর্যন্ত লোকে ভর্তি হয়ে গেল। কোথাও জায়গা না পেয়ে শেষে অনেকে গঙ্গায় নেমে জলে গিয়েও দাঁড়িয়ে রইল।

সাধুজীর জাহাজ গেলা দেখতে এটুকু কষ্ট কে না করবে বল!

এদিকে এগারটা বেজে গেল। বারটাও প্রায় বাজে বাজে। তখনো কিন্তু সাধুজীর কোন সাড়াশব্দ নেই। সে তখন তীরে ধুনি জ্বালিয়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন।

এদিকে লোকের ভক্তি, ভয়, উৎকণ্ঠা যেন ফেটে পড়ছে গঙ্গাতীরে।

এমনি সময়ে দূরে আসামীর টিকি দেখতে পাওয়া গেল। হৈ হৈ করে উঠল সব লোক—ঐ জাহাজ আসছে, জাহাজ আসছে!

লোকের চীৎকার শুনে সাধু তার ধ্যান ভঙ্গ করে চক্ষু মেলল। তারপর গম্ভীর মুখে ধীর পদক্ষেপে গঙ্গায় গিয়ে নামল। কোমর খানেক জল পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়াল স্থির হয়ে। রবি বর্মার গঙ্গাবতরণের ছবি দেখেছ? সেই ছবির শিবের মত সাধুও ঠিক তেমনি ভাবেই দাঁড়াল। কোমরে হাত দুটি রেখে কম্বুকণ্ঠে সহসা চীৎকার করে উঠল—আয় বেটা জাহাজ! আজ আর তোর নিস্তার নেই! তোকে আজ আস্ত গিলে খাবই!

সাধু বলে আর গলা চড়ে।

এদিকে ঢিপ্ ঢিপ্ করতে থাকে লোকের বুক। না জানি আজ কি অঘটনই বা ঘটে!

তীরের হৈ হল্লা কিন্তু এই সময়টায় একেবারে থেমে গিয়েছিল। বিস্ময়-বিমূঢ় গঙ্গাতীর নিঃশ্বাস রোধ করে ভাবছিল—তাই তো এতবড় জাহাজটাকে গিলে খাবে কি করে?

ভীমগর্জনে এসে পড়ল জাহাজ। ঢেউ আছড়াতে লাগল আদমপুরের ঘাটে। সাধু এবার হুঙ্কার দিয়ে উঠল—এসেছিস্! আয়!—বলেই বিরাট এক হাঁ করে জাহাজটার দিকে এগিয়ে যাবে কি, ঠিক এমনি সময় হ'ল কি জানো, তীর থেকে দশ পনের জন লোক হঠাৎ হাউ মাউ করে কেঁদে হুড়মুড় করে জলের মধ্যে গিয়ে সাধুর পা দুটো জড়িয়ে ধরল। তারা কেঁদে সাধুকে

বলল—রক্ষা করুন গুরুদেব! রক্ষা করুন গুরুদেব! নির্জীব অচেতন একটা তুচ্ছ পদার্থ এই জাহাজ, একটা অপরাধ করে ফেলেছে, তার কি মার্জনা নেই গুরুদেব! তার উপর রাগ করা কি আপনার সাজে গুরুদেব! তাছাড়া জাহাজের মধ্যে নরনারী ঐ যে শত শত যাত্রী রয়েছে, ওরা তো কোন অপরাধ করে নি গুরুদেব! তবে কোন্ অপরাধে ওদের খাবেন?

শুনে সাধুর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। মুখ গম্ভীর করে খানিকক্ষণ কি ভাবল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—তা বটে, আচ্ছা ছোড় দেও। তুম্‌হারা বাত রহা বেটা!

সাধু এবার জাহাজের দিকে চেয়ে হাত নেড়ে বলল—যা বেটা, খুব বেঁচে গেলি আজ! তোর পুনর্জন্ম হয়ে গেল!

জাহাজখানা ততক্ষণে সাধুর কাছ ছাড়িয়ে অনেকদূর চলে গেছে।

শরৎচন্দ্রের এই মৌখিক গল্পটিকে একটি প্রথম শ্রেণীর রসোত্তীর্ণ গল্প বলা যেতে পারে। গল্প বলার মধ্যে এমন একটা নিপুণতা রয়েছে যে, তীরের যে দশ পনের জন লোক জলের মধ্যে গিয়ে সাধুর পায়ে ধরে কাঁদল, তারা যে সাধুর শেখানো লোক, এ কথার উল্লেখ না থাকলেও তা পরিষ্কার ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাছাড়া সমস্ত গল্পটার মধ্যেও আগাগোড়া বেশ একটা সামঞ্জস্য রয়েছে।

এখানে আরও একটি গল্পের উদাহরণ দেওয়া গেল—

মেদিনীপুর শহরে 'বেলী হল পাবলিক লাইব্রেরী'টির বর্তমানে নতুন নাম হয়েছে 'রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার'। আগে এই পাঠাগারের উদ্যোগে প্রতি বছর মেদিনীপুর জেলা পাঠাগার সম্মেলন হ'ত। তাতে জেলার প্রায় সকল পাঠাগারেরই প্রতিনিধি যোগ দিতেন।

এই পাঠাগার সম্মেলনের দ্বিতীয় বৎসরের অধিবেশনে সভাপতি হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র সেবার মেদিনীপুরে গিয়ে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নাড়াজোলের ছোটকুমার বিজয়কৃষ্ণ খানের বাড়ীতে উঠেছিলেন। যথাসময়ে সভা হয়ে গেল। পরের দিন সকালে বিজয়কৃষ্ণবাবুর বাড়ীতে একটা ঘরোয়া সাহিত্য বৈঠক হয়। তাতে শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যে অনেকে সাধারণভাবে সাহিত্য এবং

শরৎচন্দ্রের রচনা বিষয়ে নানা প্রশ্ন করছিলেন। শরৎচন্দ্র একে একে তাঁদের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ একজন প্রশ্ন করে বসলেন—আচ্ছা শরৎবাবু, সতীত্বই তো নারীত্ব। আপনি আবার ও-দুটোকে আলাদা করলেন কেন?

এই প্রশ্ন শুনে শরৎচন্দ্র বললেন—এর উত্তরে তাহলে আপনাদের একটি গল্প বলি শুনুন। বলে শরৎচন্দ্র সুরু করলেন—

আমাদের পাড়ায় এক বাল-বিধবা থাকতেন। গ্রাম সম্পর্কে তিনি আমার দিদি হতেন। খুব অল্প বয়সেই দিদির বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের কিছুদিন পরে দিদি বিধবা হয়ে বাপের বাড়ীতে ফিরে আসেন। দিদির শুধু বাপ-মা। ভাইবোন বা কাকা-জ্যাঠা কেউই ছিল না। তাও আবার দিদির বিধবা হবার কয়েক বছর পরে তাঁর বাবাও মারা যান। দিদি আর দিদির মা থাকেন। দিদির যখন তিরিশ-বত্রিশ বছর বয়স, তখন দিদিকে একলা রেখে দিদির মা-ও মারা গেলেন। সেই থেকে বাড়ীতে দিদি একাই থাকতেন।

গ্রামের সকল পরিবারেই দিদির খুব খাতির ছিল। কেননা লোকের অসুখ-বিসুখে প্রাণ দিয়ে দিদি সেবা করতেন, লোকের কাজকর্মের বাড়ীতে দিনরাত করে প্রচুর খাটতেন। গ্রামে এমন বাড়ী ছিল না যে, কোনো না কোনো বিষয়ে দিদির কাছ থেকে উপকার পায় নি।

আমি তখন ছেলেমানুষ। হঠাৎ আমার মাথায় খেয়াল চাপল, দিদি তো ওঁর বাড়ীতে একাই থাকেন, তা আজ রাত্রে ওঁকে ভয় দেখাতে হবে।

ঠিক করলাম, দিদির বাড়ীর প্রাচীরের লাগাও বাইরের দিকে যে বড় জাম গাছটা আছে, সন্ধ্যার পর সেই গাছে উঠে বিকৃত স্বরে শব্দ করে দিদিকে ভয় দেখাব।

সন্ধ্যার পর একটু রাত হলে লুকিয়ে জামগাছটায় গিয়ে উঠলাম।

দিদির একখানা মাত্র মাটির ঘর। বাড়ীর চারদিকেই প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। যাতায়াতের জন্য উঠোনের একদিকে একটি মাত্র দরজা ছিল। সন্ধ্যা হলেই দিদির এই বাইরের দরজায় খিল পড়ে যেত।

জামগাছ থেকে দিদির ঘরের সমস্তই দেখা যায়। অন্ধকারে গাছে উঠে সেখান থেকে খোনা গলায় যেমনি বলেছি—দিঁ-দিঁ, অমনি দেখি একটা লোক দিদির খাট থেকে তড়াক্ করে লাফিয়ে পড়ে খাটের তলায় গিয়ে লুকিয়ে পড়ল।

এই যে ব্যাপারটা দেখা গেল, এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, দিদির হয়তো সতীত্ব নেই, কিন্তু তাই বলে তাঁর নারীত্বও থাকবে না কেন? মানুষের রোগে শোকে সেবা করে, দীন-দুঃখীকে দান করে, যে মহত্ত্বের পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তার কি স্বতন্ত্র কোন মূল্য নেই? নারীর দেহটাই কি সব, অন্তরটা কি কিছুই নয়? এই বাল-বিধবা দুঃসহ যৌবনের তাগিদে তার দেহটাকে যদি পবিত্র রাখতে না-ই পেরে থাকে, তাই বলে তার আর সব গুণ মিথ্যে হয়ে যাবে? আমাদের কাছে কোন শ্রদ্ধাই সে পাবে না?

এই জন্যই আমি সতীত্ব ও নারীত্ব—দুটোকে আলাদা করে দেখেছি।

এই গল্পটি যে শরৎচন্দ্রের ছাড়া আর কারও নয়, তা গল্প দেখেই বলা যেতে পারে। নারীর প্রতি শরৎচন্দ্রের যে অসীম দরদ, তা এই গল্পের সঙ্গে যেন মিশে রয়েছে।

শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন ধরণের এই সব বৈঠকী গল্পগুলির রসোত্তীর্ণ গল্প হিসাবে একটা মূল্য তো আছেই, তাছাড়া এগুলি থেকে মানুষ শরৎচন্দ্রের একটা দিকের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রেরও তেমনি অনেক খবরাখবর মেলে।

ধর্মনিষ্ঠ

শরৎচন্দ্র অনেক সময় বন্ধুমহলে নিজেকে একজন 'ঘোরতর নাস্তিক' বলে পরিচয় দিতেন। এ কথা যেমন তিনি মুখে বলতেন, তেমনি আবার কখনো কখনো চিঠিপত্রেও লিখে জানাতেন। কিন্তু এইভাবে তিনি নিজেকে নাস্তিক বলে পরিচয় দিলেও, আসলে তিনি আদৌ নাস্তিক ছিলেন না। এ ছিল তাঁর আস্তিকতারই একটা অতি-বিনয়। তাই তাঁর নাস্তিক্যের প্রচারটা ছিল একান্তভাবে মৌখিক ও বাহ্যিক। এই মৌখিক কথার আড়ালে তাঁর অন্তরে ফল্গুধারার মতই ঈশ্বরভক্তির একটা গোপন স্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হ'ত। তিনি ছিলেন সত্যকারের একজন ঈশ্বর-বিশ্বাসী ধার্মিক মানুষ।

শরৎচন্দ্র বন্ধুবান্ধবদের কাছে কথা-প্রসঙ্গে যেমন প্রায়ই নিজেকে নাস্তিক বলতেন, তেমনি একবার তিনি সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে নিজেকে নাস্তিক বলে পরিচয় দিতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন। কেদারবাবুর যুক্তির কাছে সেদিন তাঁর নাস্তিক্যের আবরণ খসে গিয়ে আস্তিকতাই প্রকাশ পেয়েছিল। এই নিয়ে সেদিন কেদারবাবুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের যে কথোপকথন হয়েছিল, কেদারবাবু নিজেই সে কথা তাঁর 'শরৎ-কথা' প্রবন্ধে লিখে গেছেন। তিনি লিখেছেন—

"তাঁর ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে তাঁর অনুরক্ত ভক্তদের মধ্যে জিজ্ঞাসার উদয় হওয়া স্বাভাবিক···

তাঁর সঙ্গে কাশীতেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। কথা-প্রসঙ্গে বললেন—মুক্তির আশায় বুঝি কাশীবাস করছেন?

বললুম—সেটা বলা কঠিন, হয়ে গেলে অ-লাভ নেই তো! তবে ঝঞ্ঝাট থেকে কতকটা মুক্তি পাবার জন্যে অনেকেরই আসা। ওই সঙ্গে দেশের লোকেও যে কিঞ্চিৎ মুক্তি না পায়—তাও নয়···

এইটে ঠিক বলেছেন—বলে হাসলেন। বললেন—আমাকে নাস্তিক বলে অনেকেই জানেন, আপনিও জানেন বোধ হয়?

বললুম—অপরাধী করবেন না। আপনার বইয়ের মধ্য দিয়েই আপনার সঙ্গে পরিচয়। তাতে যে ছাপা হয়ে গিয়েছে—আপনি পরম আস্তিক।

—কে বললে, কোথায়? ভুল কথা—

—যা নিয়ে কথা শুনতে পাই, সেই 'চরিত্রহীনে'ই রয়েছে—দিবাকর গৃহদেবতা নারায়ণের ভোগ না দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল। তার মন'কিন্তু সেই অপরাধের বেদনা এড়াতে পারে নি। ফেরবার পথে গঙ্গাতীরে গিয়ে অপরাধের জন্য সাশ্রুক্ষমা প্রার্থনা না করে বাড়ী ফিরতে পারে নি। এই সামান্য ঘটনাটা নাস্তিক বাদ দিতেন, বিশেষ ক্ষতিও হত না। আপনি পারেন নি…

—ও কিছু নয় কেদারবাবু, লেখকদের অমন অনেক অবান্তরের সাহায্য নিতে হয়, ঐ একটাই তো?…

—বহুৎ আছে। জগতে অবান্তরও বহুৎ আছে। মন প্রিয়টা ধরেই চলে। ওই বই থেকেই বলি;—আপনার সাধের সৃষ্টি কিরণময়ীকে একটি ইন্টেলেকচুয়াল জায়েণ্ট বানিয়েছেন, আবার সুরমাকে (পশুটিকে) হিঁদুর ঘরের একটি সরল বিশ্বাসী প্রতিমা গড়েছেন। যার সামনে কিরণময়ী স্তব্ধ নিষ্প্রভ হয়েই ফিরেছিল, এটা করলেন কেনো?…

—আমার লেখা এমন করে কেউ দেখে বলে জানতুম না, তাহলে সাবধান হতুম।…

—অনেকেই দেখেন, যাঁর ভাল লাগে তিনিই দেখেন। দেখুন, নাস্তিকেরা অতি সাবধানী, তাঁরা মাথার সাহায্যে লেখেন বলেই মনে হয়। সুরমাতে মাধুর্য্য রয়েছে—ওটা যে প্রাণের জিনিস। দরদে গড়া।

—যান্ যান্ বেলা হয়েছে, নমস্কার! দেখতে যেন পাই।

দ্রুত চলে গেলেন।" (ভারতবর্ষ—ফাল্গুন, ১৩৪৪)

উদ্ধৃত অংশটি থেকে দেখা যায় যে, শরৎচন্দ্র নিজেকে নাস্তিক বলে পরিচয় দিতে গেলেও, কেদারবাবু উদাহরণ এবং যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন—তাঁর মুখের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সেটা আদৌ তাঁর অন্তরের কথা নয়। শরৎচন্দ্র কেদারবাবুর কাছে এইভাবে ধরা পড়ে গেলে, সেদিন তখন তাঁর 'যান্ যান্' বলে সরে পড়া ছাড়া আর উপায় ছিল না।

শরৎচন্দ্র মুখে যেমন অনেকের কাছে নিজেকে নাস্তিক বলে প্রচার করতেন, মাঝে মাঝে চিঠিপত্রেও তিনি এই ধরণের কথা লিখতেন। শরৎচন্দ্র দিলীপ-কুমার রায়কে একবার লিখেছিলেন—

"মণ্টু, একটা কথা বোধ করি পূর্বেও আমার কাছে শুনে থাকবে, আমাদের

বংশের একটা ইতিহাস আছে। এই বংশে আমার মেজ ভাই (প্রভাস) ৺স্বামী বেদানন্দকে নিয়ে অখণ্ড ধারায় ৮ম পুরুষ সন্ন্যাসী হওয়া চললো—কেবল আমিই হোলাম একেবারে ঘোরতর নাস্তিক। 'হেরেডিটি' আমার রক্তে একেবারে উজান টানে সুর ধরলে।"

শরৎচন্দ্র এখানেও 'হেরেডিটি আমার রক্তে একেবারে উজান টানে সুর ধরলে' বলে যে কথা বলেছেন, এও তাঁর নিছক রসিকতা। কেননা শরৎচন্দ্রের জীবনী যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে, তিনিও একবার সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, এবং বেশ কিছুদিন সাধুদের সঙ্গে মিশে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। এইভাবে শরৎচন্দ্র নিজেও তাঁর কথামতই তাঁদের বংশে সন্ন্যাসী হওয়ার ধারাটিকে বজায় রেখেছিলেন। তাই শরৎচন্দ্র এখানে নিজেকে 'ঘোরতর নাস্তিক' বলে যে পরিচয় দিয়েছেন, এও তাঁর একান্তভাবেই বাহ্যিক কথা বা রসিকতা মাত্র।

শরৎচন্দ্র কারো কারো কাছে নিজেকে নাস্তিক বলে লিখলেও, তিনি তাঁর বহু চিঠিপত্রে আবার ঈশ্বর-বিশ্বাসের কথাও লিখেছেন। রসিকতার কথা ছেড়ে দিয়ে, যখন তিনি তাঁর চিঠিপত্রে গুরুত্ব নিয়ে কোন কথা বলতে গেছেন, তখন অনেক সময় তিনি ঈশ্বরের নামও স্মরণ করেছেন। যেমন শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে একবার লিখেছিলেন—

"আমার অসুখের কথা শুনিয়া আপনি যাহা লিখিয়াছেন, আমি বোধ করি তাহা কল্পনা করিতেও ভরসা করিতাম না। অন্তরের সহিত আশীর্বাদ করি দীর্ঘজীবী এবং চিরসুখী হোন। ভগবান আপনাকে কখনো যেন কোন বিশেষ দুঃখ না দেন।

আমি পীড়িত—এখানে সারিবে বলিয়া আর ভরসা করি না। দেহের আর সমস্ত বজায় রাখিয়াও জগদীশ্বর আমাকে যদি পঙ্গু করিয়াই শাস্তি দেন—তাই ভাল।"

এর পরে শরৎচন্দ্র হরিদাসবাবুকে আর এক পত্রে লিখেছিলেন—

"যদি অদৃষ্ট আমার চিরকালের মত ভাঙিয়াও থাকে, তাহাও যদি জানিতে পারি—তাহা হইলেও ধীরে ধীরে এই মহাদুঃখ বোধ করি সহিয়া যাইবে। হয়ত বা তখন এই পঙ্গু হওয়াটাকেই ভগবানের আশীর্বাদ বলিয়া মনেও করিব এবং স্থির চিত্তে গ্রহণ করিতেও পারিব।"

চিঠি দুখানি শরৎচন্দ্রের ঈশ্বর-বিশ্বাসের একটা বড় উদাহরণ। এখানে ঈশ্বর-প্রদত্ত শাস্তিকেও তিনি মঙ্গলময়ের মঙ্গল-ইচ্ছা হিসাবেই শান্ত মনে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। অতি বড় ধার্মিক মানুষ ছাড়া এমন কথা কেউ কখনই বলতে পারেন না।

শরৎচন্দ্র তাঁর বন্ধুবান্ধবদের কাছে এই ধরণের আরও অনেক চিঠি লিখেছেন, যাতে তিনি তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাসের কথা অকপটেই স্বীকার করেছেন। তাই শরৎচন্দ্র কারো কারো কাছে মুখে বা চিঠিপত্রে নিজেকে ঘোরতর নাস্তিক বলে থাকলেও, তিনি আসলে একজন ঘোরতর আস্তিক মানুষই যে ছিলেন, এ কথা বলা চলে।

আগেকার দিনে আমাদের এই বাঙ্গলা দেশে এক হিন্দুধর্মের মধ্যেই শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি নামে কয়েকটি সম্প্রদায় ছিল এবং এদের নিজেদের প্রচার নিয়ে তখন এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অপর সম্প্রদায়ের জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতাও চলত। এই নিয়ে একদল নিজেদের গুণগান ক'রে অপরের নিন্দাবাদ করতেও ছাড়ত না। ফলে পরস্পরের মধ্যে নানা রকমের তিক্ততা, এমন কি ঝগড়াঝাটি পর্যন্তও দেখা দিত। আজকের দিনে বাঙ্গলা দেশের কোথাও কোথাও এই সম্প্রদায়-ভেদ কিছু কিছু থাকলেও, এদের পরস্পরের মধ্যে সে তিক্ততা আর নেই। এখন একজন সাধারণ হিন্দু শিব, শক্তি, বিষ্ণু প্রভৃতি সকল দেবতারই উপাসনা করে থাকে। তার কাছে হিন্দুর সব দেবতাই সমান, সকলেই উপাস্য। শরৎচন্দ্রও ঠিক এই প্রকারেরই একজন হিন্দু ছিলেন। তিনিও শিব, শক্তি, বিষ্ণু প্রভৃতি সকল দেবতাকেই মেনে চলতেন। তবে সকল দেবতার পূজা করলেও শরৎচন্দ্র বিশেষভাবে বিষ্ণু-উপাসক ছিলেন। এই দিক থেকে শরৎচন্দ্র বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলেন, এ কথা হয়ত বলা যেতে পারে।

একবার দিল্লীতে কংগ্রেস অধিবেশনে শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর সঙ্গে গিয়ে সেই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। দিল্লী থেকে ফেরার পথে শরৎচন্দ্র বৃন্দাবন হয়ে বাড়ী ফিরেছিলেন। বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দিরে গিয়ে শরৎচন্দ্রের মনে এক প্রবল ভক্তিভাব দেখা দেয়। শরৎচন্দ্রের সেদিনকার সেই ভক্তিভাবের কথা উল্লেখ করে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎ-কথা' প্রবন্ধের এক স্থানে লিখেছেন—

তিনি দেশবন্ধুর সহিত দিল্লী যান। দিল্লী হতে ফেরবার পথে বৃন্দাবন না হয়ে ফেরেন নি। তাঁর সঙ্গীদের অন্যতম ছিলেন, আমার জনৈক বন্ধু। তাঁর কাছে শুনেছি—আমাদের শরৎচন্দ্রকে গোবিন্দজীর মন্দিরে সাশ্রুনেত্রে গড়াগড়ি দিতে দেখে সকলেরই নয়ন সিক্ত হয়েছিল। অতিবড় নাস্তিকও সে দৃশ্য দেখলে আস্তিকত্ব পান!"

শরৎচন্দ্রের ভক্ত মনের এ একটা বড় পরিচয়। আর শরৎচন্দ্র বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দিরেই শুধু সাশ্রুনেত্রে গড়াগড়ি দেন নি, তিনি তাঁর নিজের বাড়ীতেও একখানি ঘরকে বিষ্ণুমন্দির করে তুলেছিলেন। তিনি বাড়ীতে রাধাকৃষ্ণের একটি মূর্তি স্থাপন করে, অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত নিজে নিয়মিত পূজা করতেন। দেশবন্ধু শরৎচন্দ্রকে রাধাকৃষ্ণের এই মূর্তিটি দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের এক স্নেহভাজন হাওড়ায় শিবপুরের প্রতুল মুখোপাধ্যায়, দুর্গা দেবী নাম্নী এক বিধবাকে বিবাহ করে আত্মীয়-স্বজনদের নিকট নিন্দনীয় হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র সেই সময় প্রতুলবাবুর স্ত্রীকে, কন্যার মত করে নিজের সামতাবেড়ের বাড়ীতে কিছুদিন রেখেছিলেন। মেয়েটি একটু-আধটু লেখাপড়া জানে দেখে, শরৎচন্দ্র তখন নিজেই তাঁকে আরও একটু লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। শরৎচন্দ্র সেই সময় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বাঙ্গলার ইতিহাস' নামক যে বইটি দুর্গা দেবীকে উপহার দিয়েছিলেন, সেই বইটি দুর্গা দেবী এবং প্রতুলবাবু একদিন আমাকে দেখিয়েছিলেন। দেখলাম, সেই বই-এর মলাটের ভিতর পৃষ্ঠায় এক জায়গায় লেখা আছে—

> ৬ই ভাদ্র শুক্রবার ১৩৩১—১৯২৪
> রাত্রি ১২টার সময় শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন
> দাশের নিকট হইতে একটি রাধাকৃষ্ণের
> মূর্তি পাইলাম।
>
> শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র যে বছর চিত্তরঞ্জন দাশের কাছ থেকে রাধাকৃষ্ণের মূর্তিটি পেয়েছিলেন, সেই বছরই চৈত্র মাসে তিনি মুন্সীগঞ্জে সাহিত্য-সভায় সভাপতি হয়েছিলেন। সভার পর মুন্সীগঞ্জ থেকে তিনি ঢাকা শহরে গেলে সেখানকার 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী' একটি সুদৃশ্য কারুকার্যখচিত শাঁখে করে তাঁকে মানপত্র দিয়েছিল। শরৎচন্দ্র সেই সুন্দর শাঁখটি তাঁর রাধাকৃষ্ণকে দিয়েছিলেন। সেই শাঁখ বাজিয়ে প্রতিদিন তিনি তাঁর ঠাকুরের পূজা করতেন।

বৈষ্ণব-পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন বলেন যে, তিনি বার তিনেক শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। সকালের দিকে হাওড়া থেকে রওনা হয়ে দুপুরের কিছু আগেই তিনি শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছতেন। শরৎচন্দ্র ঐ সময়টায় নিজে তাঁর গৃহ-দেবতার পূজা করতেন। তাই সাহিত্য-রত্ন মশায় তিন দিনই শরৎচন্দ্রকে পূজা শেষ করে এসে তসরের কাপড় পরা অবস্থায় তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে দেখেন।

শরৎচন্দ্র সাহিত্য-রত্ন মশায়কে মধ্যাহ্নভোজন না করিয়ে একদিনও ছাড়েন নি। শরৎচন্দ্র প্রথম দিন তাঁকে বলেছিলেন—হরেকৃষ্ণবাবু আমিও বৈষ্ণব, এই দেখুন আমারও গলায় তুলসীর মালা রয়েছে।—বলে তিনি তাঁর গলার মালা দেখিয়েছিলেন।

মধ্যাহ্নভোজনে বসে হরেকৃষ্ণবাবু তিন দিনই লক্ষ্য করেন যে, থালায় তরকারি সমেত সাজানো ভাতের উপরে একটি করে তুলসী পাতা রয়েছে।

ভাতের উপরে তুলসী পাতা থাকার কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় শরৎচন্দ্র হরেকৃষ্ণবাবুকে বলেছিলেন—গৃহদেবতাকে যে অন্নভোগ দেওয়া হয়েছিল, সেই থালাই আপনাকে দেওয়া হয়েছে।

মধ্যাহ্নভোজনের পর শরৎচন্দ্র বৈষ্ণব-ধর্ম ও বৈষ্ণব-সাহিত্য নিয়ে সাহিত্য-রত্ন মশায়ের সঙ্গে আলোচনা করতেন এবং তাঁর মুখে পদাবলী আবৃত্তিও শুনতেন।

বৈষ্ণব ধর্মের উপর শরৎচন্দ্রের যেমন একটা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ এবং সাহিত্যপাঠের জন্যও তাঁর একটা অদম্য ইচ্ছা ছিল। শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে থাকতেন, সেই সময় একবার তিনি কলকাতায় এসে পড়বার জন্য হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বহু বৈষ্ণব-গ্রন্থ নিয়ে গিয়েছিলেন। এই গ্রন্থগুলি তখন তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত বহুবার পড়েছিলেন। এই গ্রন্থপাঠের কথা উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে তখন হরিদাসবাবুকে এক পত্রে লিখেছিলেন—

"আপনি আমাকে 'চৈতন্য-চরিতামৃত' পড়িতে দিয়াছিলেন, সেগুলি আমি ফিরাইয়া দিই নাই। আসিবার সময় মনেই হয় নাই—তারপরে সেগুলি এখানে চলিয়া আসিয়াছে।···এছাড়া আরও অনেকগুলি বৈষ্ণব-গ্রন্থ পড়িতে দিয়াছিলেন। সমস্ত বইগুলি যে কতবার পড়িয়াছি (এমন কি রোজই প্রায় পড়ি) তা বলিতে পারি না। এগুলিও ফিরাইয়া দিবার কথা ছিল।

আপনাকে অনেক রকমেরই ত ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছি, তাই হঠাৎ এগুলির দাম বলিয়া দিতেও ইচ্ছা হয় না। বইগুলি বরং আমাকে দান করুন। আমি অনেক আশীর্বাদ করিব এবং ভবিষ্যতেও প্রত্যহ এই কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া লজ্জা পাইব না।"

বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণবশতঃই শরৎচন্দ্র হরিদাসবাবুর কাছ থেকে এই বৈষ্ণব-ধর্মগ্রন্থগুলি নিয়ে গিয়েছিলেন এবং গভীর আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সহিত গ্রন্থগুলি একরূপ প্রতিদিনই পড়তেন।

বৈষ্ণব ধর্ম-গ্রন্থ অধ্যয়ন ছাড়াও শরৎচন্দ্রের যে মূল পেশা ছিল, গল্প-উপন্যাস রচনা, তাঁর সেই গল্প-উপন্যাসের মধ্যেও তিনি অনেকগুলি বৈষ্ণব চরিত্র এঁকেছেন। সর্বত্রই তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিতই এই চরিত্রগুলি চিত্রিত করেছেন। বৈষ্ণবধর্মের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগবশতঃই তিনি চরিত্রগুলি এমনিভাবে আঁকতে সক্ষম হয়েছেন।

তবে শরৎচন্দ্র নিজে অনেকটা বৈষ্ণবভাবাপন্ন মানুষ হলেও, হিন্দুর সকল প্রকার ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডই—তা সে বৈষ্ণবীয়, অবৈষ্ণবীয়, বৈদিক, পৌরাণিক বা লৌকিক যাই হোক্ না কেন, সমস্তই তিনি বিশ্বাস করতেন এবং হিন্দুর সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানই মেনে চলতেন। শরৎচন্দ্র নিজে যেমন ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন, তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীও তেমনি অত্যন্ত ধর্মশীলা মহিলা ছিলেন। তিনি জীবনভোর পূজাপার্বণ ও বারব্রত নিয়েই থাকতেন। হিন্দুর সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রতিই শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধা থাকায় শরৎচন্দ্র সকল সময়ই নিজে তাঁর স্ত্রীর—কি বৈষ্ণবীয় আর কি অবৈষ্ণবীয়—সকল বারব্রতেই তাঁকে সমর্থন ও সহযোগিতা করতেন। অর্থের কথা বাদ দিলেও শরৎচন্দ্র তাঁর স্ত্রীর এই সব বারব্রতের জন্য তাঁর বহু মূল্যবান সময় পর্যন্তও দিয়েছেন এবং নানা অসুবিধাও মেনে নিয়েছেন।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বহু ব্রাহ্মণ আজকাল অনাবশ্যক বিবেচনায় পৈতা ত্যাগ করে থাকেন। শরৎচন্দ্র ব্রাহ্মণদের এই পৈতা ত্যাগ করার ব্যাপারে অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। শরৎচন্দ্রের কলকাতার প্রতিবেশী অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য পৈতা ত্যাগ করেছেন শুনে একবার তিনি তাঁর উপর বড় অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সেদিনের ঘটনা সম্বন্ধে নির্মলবাবু তাঁর 'শরৎ-স্মৃতি' প্রবন্ধে নিজেই বলেছেন—

বৈষ্ণবভাবাপন্ন শরৎচন্দ্র (গলায় তুলসীর মালা)

"...একটা ঘটনা প্রায়ই মনে পড়ে। শরৎচন্দ্রের যে বৎসর তিরোভাব হয়, সেই বৎসর গ্রীষ্মকালে একদিন খালি গায়ে আমি বাগানের কাজে লিপ্ত আছি; হঠাৎ শরৎচন্দ্র আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, এমন মাঝে মাঝে আসিতেন। আমার গলদেশে যজ্ঞোপবীত ছিল না লক্ষ্য করিয়া শরৎচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, 'তোমার পৈতে কোথায়? কোমরে নাকি?' তখন আমার সঙ্গে যজ্ঞোপবীত ছিল না। আমি শরৎচন্দ্রকে তাহাই জানাইলাম। আমার উত্তরে শরৎচন্দ্র সত্যই ব্যথিত হইলেন এবং রংপুরের ভাষণে (১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে রংপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ যুব সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে) যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহারই পুনরুক্তি করিয়া বলিলেন যে, যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিলে পিতৃপুরুষকে অপমান করা হয়।" (শরৎ-স্মরণিকা)

শরৎচন্দ্রের জীবন থেকে এইরূপ বহু উদাহরণ দিয়ে দেখান যেতে পারে যে, তিনি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন পূজা, বারব্রত প্রভৃতি ছোট বড় সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানই শ্রদ্ধার সহিত মেনে চলতেন। এমন কি মৃত্যুর পূর্বে তাঁর বাড়ীর সকলের আপত্তি সত্বেও তিনি নিজে তাঁর চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্তেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। এ সম্পর্কে ১-৫-৩৭ তারিখে এক পত্রে অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়কে তিনি লিখেছিলেন—

"বাড়ীর সকলের অত্যন্ত অমত থাকলেও প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণের আয়োজন করেচি। সজ্ঞানে ঐটিই শেষ কাজ।"

শরৎচন্দ্র যে কিরূপ ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন, তা তাঁর এই প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা থেকেও বেশ বোঝা যায়। তাই শরৎচন্দ্র কখনো কখনো কারো কারো কাছে নাস্তিক বলে নিজের পরিচয় দিয়ে থাকলেও, তিনি সকল সময়েই যে অত্যন্ত ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন, তা বলা চলে। তিনি তাঁর সাহিত্য বা লেখার মধ্যে কোথাও কখনো যেমন নাস্তিকতার কথা প্রচার করেন নি, তেমনি তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও একজন পরম ধার্মিকের ন্যায়ই জীবন অতিবাহিত করে গেছেন।

পত্নী-প্রেমিক

শরৎচন্দ্রের দুই বিবাহ। প্রথম স্ত্রীর নাম শান্তি দেবী, দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম হিরণ্ময়ী দেবী।

শান্তি দেবীর সহিত শরৎচন্দ্র মাত্র দু বৎসর বিবাহিত জীবন যাপন করেছিলেন। বিবাহের দু বৎসর পরে শান্তি দেবী প্লেগ রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান।

শান্তি দেবীর সহিত শরৎচন্দ্রের বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁব 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন—

"স্ত্রীকে ছাড়িয়া এক মুহূর্তও থাকিতে কষ্টবোধ করিতেন বলিয়া, আমি তাঁহাকে মহাস্ত্রৈণ বলিয়া উপহাস করিতাম।

স্বপ্নবিলাসী শরৎচন্দ্রের প্রাণে ছিল, অপূর্ব প্রেমের ভাণ্ডার, তিনি তাঁহার সমস্ত খুলিয়া দান কবিয়াছিলেন, তাঁহাব স্ত্রী শান্তি দেবীকে।"

শান্তি দেবীর মৃত্যুতে শরৎচন্দ্রের মানসিক দুরবস্থার কথা-প্রসঙ্গে গিরীনবাবু লিখেছেন—

"শান্তি দেবী সংসারের দুঃখ কষ্টকে তুচ্ছ করিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন। শরৎচন্দ্র পলকহীন দৃষ্টিতে স্ত্রীর মৃত্যু-বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। শবদেহেব উপর আছড়াইয়া পড়িলেন এবং 'ওগো কোথা গেলে গো! তুমি আমার সকল অবস্থাব সাথী ছিলে' বলিয়া বালকের স্থায় কাঁদিতে লাগিলেন। নিদারুণ শোকে তাঁহার অন্তব বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল।...

শরৎচন্দ্র স্ত্রীর জন্য অনেকদিন পর্যন্ত শোকাচ্ছন্ন ছিলেন। তিনি দুর্গা বাড়ীতে যথারীতি স্ত্রীব শ্রাদ্ধ কবিয়াছিলেন।"

শান্তি দেবী প্লেগ রোগাক্রান্ত হলে শবৎচন্দ্র তখন 'রেঙ্গুন সেবক ও সংকার সমিতি'র সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন। রেঙ্গুন সেবক ও সংকার সমিতি গঠিত হয়েছিল ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। অতএব শরৎচন্দ্র ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের আগে তো নয়ই, পরে কোন এক সময়ে শান্তি দেবীকে বিবাহ করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে এক চিঠিতে বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে রেঙ্গুনে তাঁর ঘর পোড়ার কথা লিখেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীতে হিরণ্ময়ী দেবীর কাছে একদিন রেঙ্গুনে তাঁদের ঘর পোড়ার গল্প শুনেছিলাম। হিরণ্ময়ী দেবী বলেছিলেন, তাঁদের ঐ ঘর পোড়ার সময় তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে রেঙ্গুনেই ছিলেন।

রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের একবারই ঘর পুড়েছিল। অতএব শরৎচন্দ্র ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চের আগেই হিরণ্ময়ী দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। শরৎচন্দ্র জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই হিরণ্ময়ী দেবীর সহিতই সুখে ও শান্তিতে কাটিয়ে ছিলেন।

হিরণ্ময়ী দেবী খুব স্বামী-সোহাগিনী ছিলেন। রেঙ্গুনে থাকার সময় তিনি নিজের হাতে অত্যন্ত যত্ন সহকারে পরিপাটি করে রেঁধে তাঁর স্বামীকে খাওয়াতেন। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে দেশে ফিরে যখন হাওড়ায় বাজে শিবপুরে থাকতেন, তখনও অনেকদিন পর্যন্ত রান্নাবান্নার যাবতীয় কাজকর্ম হিরণ্ময়ী দেবী নিজের হাতেই করতেন। তারপর শরৎচন্দ্রের আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে, শরৎচন্দ্র স্ত্রীর পরিশ্রম লাঘবের জন্য রাঁধবার লোকের ব্যবস্থা করলেও হিরণ্ময়ী দেবী অনেক সময় নিজেই রাঁধতেন। তা ছাড়া সব সময়ই তিনি তাঁর স্বামীর খাওয়ার দিকে নজর রাখতেন। আর তিনি প্রায় এটা ওটা ভাল খাদ্য ঘরে তৈরি করে তাঁর স্বামীকে খাওয়াতেন।

এদিকে শরৎচন্দ্র কিন্তু আদৌ ভোজন-বিলাসী ছিলেন না। অধিকন্তু তিনি ছিলেন অল্পাহারী। হিরণ্ময়ী দেবী তবুও ছাড়তেন না। তিনি কাছে বসে অনুরোধ উপরোধ করে তাঁর স্বামীকে খাওয়ানোর চেষ্টা করতেন। স্ত্রীর এই খাওয়ানোর জুলুমের কথা নিয়ে শরৎচন্দ্র লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে একবার এক পত্রে লিখেছিলেন—

"পরম কল্যাণীয়াসু,

…কোনকালে আমি অম্বলের রুগী নই। এত কম খাই যে, অম্বল পর্যন্ত আমার কাছে ঘেঁসে না, পাছে তাকেও বা অনাহারে শুকিয়ে মরতে হয়। কি যে সেদিন জোর করে ছাই পাঁশ কতকগুলো ঘরের তৈরি করা সন্দেশ খাইয়ে দিলে যে, আজও যেন তার ঢেঁকুর উঠছে। আমি এদেশের বিখ্যাত কুঁড়ে। চিবোবার ভয়ে কোন জিনিস সহজে মুখে দিতে চাইনে—আমার ধাতে ও

অত্যাচারই সবে কেন? কি বল দিদি, ঠিক না? কিন্তু বাড়ীর লোকে বোঝে না, তারা ভাবে আমি কেবল না খেয়ে খেয়েই রোগা। সুতরাং খেলেই বেশ ওদেরই মত হাতী হয়ে উঠব।...আজ বিশ বছর আমরা কেবল খাওয়া নিয়েই লাঠালাঠি করে আসছি। ঐ খেলে না, খেলে না—রোগা হয়ে গেল—ঘরসংসার রান্নাবান্না কিসের জন্যে—যেখানে দুচোখ যায় বিবাগী হয়ে যাব, ইত্যাদি কত কি। আমি বলি, ওরে বাপু বিবাগী হবে ত শীগ্‌গীর হও —এ যে শুধু আমাকে ভয় দেখিয়ে দেখিয়েই কাঁটা করে তুললে। বাস্তবিক আমার দুঃখটা আর কেউ দেখলে না দিদি। আমি প্রায় ভাবি, সত্যিকার স্বর্গ যদি কোথাও থাকে ত সেখানে বোধ হয়, এমন একজন আর একজনকে খাবার জন্য জবরদস্তি করে না। আর তা যদি হয় ত—আমি যেন বরঞ্চ নরকেই যাই।”

হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর স্বামীর খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কিরূপ যত্ন করতেন, এ চিঠিখানি তার একটি প্রধান সাক্ষ্য।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'শরৎচন্দ্রের বিবাহ প্রসঙ্গ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখবার সময় একদিন আমি হিরণ্ময়ী দেবীকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য সামতাবেড়ে গিয়েছিলাম। আমি যখন যাই, তার কিছু আগেই শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরে অবস্থানকালের জনৈক বন্ধু হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। যাবাব সময় তিনি তাঁর বৌদি হিরণ্ময়ী দেবীর জন্য কিছু কমলা লেবু নিয়ে গিয়েছিলেন। দেখলাম, হিরণ্ময়ী দেবী সেখানে উপস্থিত কয়েক জনকে সেই কমলা লেবুগুলো নিয়ে যেতে বললেন এবং আরও বললেন যে, তিনি কমলা লেবু খান না।

হিরণ্ময়ী দেবী কমলা লেবু কেন খান না, কৌতূহলবশে তাঁকে জিজ্ঞাসা করাতে জানলাম যে, শরৎচন্দ্র পার্ক নার্সিং হোমে মৃত্যুর পূর্বে কমলা লেবুর রস খেতে চেয়ে খেতে পান নি বলে, শুধু হিরণ্ময়ী দেবীই নন, শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশবাবুও কমলা লেবু খেতেন না। এই কারণেই প্রকাশবাবুর স্ত্রীও কমলা লেবু খাওয়া ছেড়ে দেন।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যু তারিখ ২রা মাঘ। বছরের এই দিনটিকে হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর স্বামীর মৃত্যু দিন বলে অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পালন করতেন। এই দিনটি

তিনি তাঁর স্বামীর ধ্যান-ধারণা করে এবং নিরম্বু উপবাস করে কাটাতেন। আর প্রতি বছর ২রা মাঘ তারিখে অথবা এর পরের একটা রবিবারে হিরণ্ময়ী দেবী বহু টাকা খরচ করে সামতাবেড়ের বাড়ীতে বালক-ভোজন করাতেন।

এই হিরণ্ময়ী দেবী সম্বন্ধে আর একটি কথা বলার এই যে, শরৎচন্দ্র তাঁর প্রথম যৌবনে অল্পদিন-স্থায়ী সাহিত্য-সাধনার পর দীর্ঘদিন যখন সাহিত্যক্ষেত্র থেকে দূরে ছিলেন এবং আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূর প্রবাসে যখন ছন্দহীন জীবন যাপন করছিলেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁর জীবনে হিরণ্ময়ী দেবী এসে যদি না দেখা দিতেন, তাহলে সেদিনের সেই শরৎচন্দ্র আজকের শরৎচন্দ্র হতে পারতেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

হিরণ্ময়ী দেবী অশিক্ষিতা, গ্রাম্য, সরলা ও অনেক বিষয়ে অবুঝ ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর মত স্বামী-সেবাপরায়ণা, ধর্মশীলা, কর্তব্যনিষ্ঠাবতী, কোমল-হৃদয়া, অহংকার ও অভিমানশূন্যা মাহিলা এ যুগে খুব কমই আছেন। তিনি তাঁর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেমের বাঁধনে ভবঘুরে শরৎচন্দ্রকে সংসারে আবদ্ধ করতে পেরেছিলেন বলেই, পরে শরৎচন্দ্রের জীবনে সাহিত্য সাধনার পথ সহজ ও সুগম হয়েছিল। তাই শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনে হিরণ্ময়ী দেবীর দানই বোধ করি সবার উচ্চে।

শরৎচন্দ্র তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকে কিরূপ ভালবাসতেন, এখন তারই কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি :—

হিরণ্ময়ী দেবীর পেটে যখন প্রথম টিউমার দেখা দেয়, তখন ডাক্তার দেখে অপারেশন করবার উপদেশ দেন এবং এ কথাও বলেন যে, অপারেশন না করলে, এই টিউমার দিনে দিনে বেড়ে যেতে থাকবে।

অপারেশন করাতে গিয়ে পাছে হিরণ্ময়ী দেবীকে হারাতে হয়, এই ভয়ে শরৎচন্দ্র কিছুতেই অপারেশন করতে দিলেন না। হিরণ্ময়ী দেবীর পেটের সেই টিউমার পরে বৃহদাকার ধারণ করে এবং শেষে এমন হয় যে, আর অপারেশনের কথাই উঠত না।

হিরণ্ময়ী দেবীর অসুখ-বিসুখ করলে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়তেন। সামতাবেড়ে থাকার সময় হিরণ্ময়ী দেবী একবার নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলে শরৎচন্দ্র কিরূপ কাতর হয়ে পড়েছিলেন, সে সম্বন্ধে মণীন্দ্রনাথ রায় লিখেছিলেন—

"...কতদিনের কথা, তবুও যেন কত না আমার মনে রয়েছে। হঠাৎ একদিন দাদার একখানা চিঠি পেলাম—লিখেছিলেন, 'মণি, বড়বৌয়ের খুব অসুখ, এ যাত্রায় বাঁচবেন কিনা জানি না—পারতো একবার এসো।' চিঠি পড়ে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো, তখনই ছুটে গেলাম। দেউলটিতে নেমে সামতাবেড়ে যখন পৌছলাম, তখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হতে চলেছে...দেখলাম, দাদার বাড়ীর একদিকের একতলার নীচের একটি লম্বা খোলা দালানে একখানি ইজিচেয়ারে দাদা শুয়ে আছেন—বাঁ দিকের লম্বা হাতলে বাঁ পায়ের উপর ডান পাটি দিয়ে। পাশেই গড়গড়াতে সাজা তামাক, হাতে নল, কিন্তু টানছেন না। বোধ হলো চোখ বুজেই আছেন...একটি হ্যারিকেন আলো খানিকটা টিম্‌টিম্ করে জলছে। আস্তে আস্তে গিয়ে দাদার পায়ের ধূলো নিতেই তাঁর সম্বিত ফিরে এলো। বুঝলাম এবার যে সত্যিই তিনি চোখ বুজিয়ে ভাবনার রাজ্যে গিয়েছিলেন। পাশেই একটি ছোট বেতের মোড়া ছিল, বসলাম। বললেন, 'মণি, তুমি আজই যে আসবে তা আমি আশা করিনি—তবে আমার চিঠি পেয়ে যে তুমি নিশ্চয়ই আসবে, এটা আমি সুনিশ্চিত করেই জানতাম। চলো উপরে। খুব করুণভাবেই বললেন, 'বড় বৌয়ের খুব বাড়াবাড়ি মণি, ডবল নিউমোনিয়া—বোধ করি এবার আর তাঁকে ধরে রাখতে পারলাম না। বুকে পিঠে সর্দি বসে গেছে, জ্বরও খুব বেশী—অচেতন অবস্থাতেই রয়েছেন। এখানকার ডাক্তার দেখছেন।' দেখলাম, দাদার দু'চোখ জলে ভরে গিয়েছে, কথাগুলিও যেন ভারি ভারি।"

শরৎচন্দ্র হাওড়ায় বাজে শিবপুরে থাকার সময় একবার সস্ত্রীক কাশী গিয়ে সেখানে কিছুদিন ছিলেন। সেই সময় তিনি কাশী থেকে তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থের প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে এক পত্রে লিখেছিলেন—

"...এখানে ভারি গরম পড়িয়াছে, আর এক মুহূর্ত মন টেকে না, এমন হইয়াছে। কাল-ভৈরব পোষ মানিল না। চৈত্র মাস, যাওয়া যায় না। একটা ব্রত উদ্‌যাপন আছে এঁর। শ দুই টাকা পাঠিয়ে দেবেন। একছত্র লেখা যায় হয় না, একি বিশ্রী দেশ। গত ৪।৫ দিন কলম নিয়ে বসি, আর ঘণ্টা দুই চুপ করে থেকে উঠে পড়ি।"

এই চিঠিখানিতে দেখা যায় যে, কাশীতে শরৎচন্দ্রের তখন আর এক মুহূর্ত মন না টিকলেও স্ত্রীর ব্রত উদ্‌যাপনের জন্মই শুধু তিনি অত অসুবিধা ভোগ

করেও চৈত্র মাসটা কাশীতেই কাটিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র সকল সময়েই তাঁর স্ত্রীর এই সব কাজের জন্য অত্যন্ত আনন্দের সহিতই নিজের সময় ও অর্থ দুই-ই ব্যয় করতেন। এজন্য তিনি আদৌ কুণ্ঠাবোধ করতেন না। হিরণ্ময়ী দেবীর এই সব বার-ব্রতের ব্যয় ছাড়া, ব্রতের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে ব্রাহ্মণভোজন করানোর ব্যাপারেও শরৎচন্দ্রের উৎসাহ কম ছিল না। এ কাজের জন্য তিনি তাঁর অন্য কাজকেও পণ্ড করতে আদৌ ইতস্ততঃ বোধ করতেন না। বেহালার মণীন্দ্রনাথ রায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের ৮-২-৩২ তারিখের একটি পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করলেই এই কথার সত্যতা পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন—

"সরস্বতী পূজোর সময় আমার বাড়ীর বার হওয়া চলে না। আমি অন্যান্য বারে তার পরের দিন বাইরে যাই। কিন্তু এবারে শনিবারে বড় বৌয়ের একটা ব্রত প্রতিষ্ঠার বাকি বামুন খাওয়ানোর দিন, আমার এ কথাটা সেদিন মনে ছিল না। তাই মঙ্গলবারেই যেতে পারবো ভেবেছিলাম। আমি এই মঙ্গলবারের পরের মঙ্গলবারে বেরিয়ে পড়বো অর্থাৎ ১৬ই ফেব্রুয়ারী।"

হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর ধর্মকর্মের পথে এইভাবে তাঁর স্বামীর সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়ে আপন মনে তাঁর যত খুশী বার-ব্রত করে যেতেন। হিরণ্ময়ী দেবীর এই ধর্মভাব তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঠিক এমনিভাবেই ছিল। ছোট ছোট বার-ব্রত ছাড়া বড় বড় কাজও তিনি করতেন। বহু টাকা ব্যয় করে সামতাবেড়ে়য় তিনি বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সামতাবেড়ের পাশে গোবিন্দপুর গ্রামের শিব-মন্দির নির্মাণের জন্য হিরণ্ময়ী দেবী হাজার টাকারও বেশী দান করেছিলেন।

হিরণ্ময়ী দেবীর কোন সন্তান হয় নি। শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশ-বাবুর কন্যা মুকুলমালা এবং পুত্র অমলকুমারকে শরৎচন্দ্র ও হিরণ্ময়ী দেবী নিজের পুত্র-কন্যার ন্যায়ই আদর-যত্ন ও স্নেহ করতেন। শরৎচন্দ্র তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশবাবুর বিয়ে দিয়ে ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে নিজের কাছেই রেখেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের পরিবারে তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী, ছোটভাই প্রকাশবাবু, প্রকাশবাবুর স্ত্রী এবং তাঁদের পুত্র কন্যা—এই ছোট্ট পরিবারের মধ্যে শরৎচন্দ্র

খুব শান্তিতেই দিন কাটাতেন। বাড়ীর প্রত্যেকের সুখ সুবিধার দিকে তিনি সব সময়েই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি অসুখে পড়লে, পাছে কোথাও কারো কিছু অসুবিধা হচ্ছে, এই ভেবে তিনি বিব্রত হয়ে পড়তেন। মৃত্যুর আগের বছর শরৎচন্দ্র যখন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য দেওঘর যান, তখন তিনি ঘন ঘন চিঠিতে বাড়ীর খবর পাবার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছিলেন। সেই সময় তিনি তাঁর দিদির মেজ দেওরের ছেলে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে একখানি বড় করুণ চিঠি লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—

"হোঁদল, আজ দশ দিনের মধ্যে বাড়ীর খবর কেবল একখানি চিঠিতে পেয়েছি। অসুস্থ দেহে সকলের জন্যে বড় চিন্তা হয়। তোমার মামীমা ত চিঠি লিখতে জানেন না, সুতরাং তোমরা অনুগ্রহ করে যদি প্রত্যহ না হোক ২।১ দিন পরে পরেও এক আধটা পোস্টকার্ড দাও ত কতকটা নিশ্চিন্ত হই।"

অতবড় সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের স্ত্রী চিঠি পর্যন্ত লিখতে জানতেন না। অসুস্থ দেহে দূর দেশ থেকে বাড়ীর সংবাদসহ স্ত্রীর একখানি পত্র পেলে শরৎচন্দ্র তখন কতই না শান্তি পেতেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী চিঠি লিখতে জানতেন না বলে, তাঁর ও বাড়ীর অন্যান্য সকলের সংবাদ নিয়ে চিঠি লিখবার জন্য তিনি অন্যকে অনুরোধ করেছিলেন।

হিরণ্ময়ী দেবী তো শরৎচন্দ্রকে চিঠি লিখতে পারতেন না। আর শরৎচন্দ্রও হিরণ্ময়ী দেবী ভাল পড়তে পারবেন না বলে এবং চিঠির উত্তর দিতে পারবেন না বলে তাঁকে সাধারণতঃ চিঠি লিখতেন না।

মণীন্দ্রনাথ রায় একবার পরিহাস করে হিরণ্ময়ী দেবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শরৎচন্দ্র তাঁকে কখনো চিঠিপত্র লিখেছিলেন কিনা! এ সম্পর্কে মণিবাবু নিজে যা লিখেছেন এখানে তাই উদ্ধৃত করছি—

"হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, বৌদি, দাদা আপনাকে চিঠিপত্র লিখতেন? মুখখানি একটু ঘুরিয়ে বললেন—তোমার দাদা তো ভাই আমাকে ছেড়ে বড় একটা বেশীদিন থাকতেন না। তাছাড়া আমি মুখ্যু মানুষ, লেখাপড়া তো জানি না। শুধু নামটাই লিখতে পারি—না, চিঠি কখনও লেখেন নি।"

হিরণ্ময়ী দেবী মণিবাবুর কাছে কি বল্লেছিলেন, জানি না। তবে শরৎচন্দ্র কখনো যে হিরণ্ময়ী দেবীকে চিঠি লেখেন নি তা নয়। শরৎচন্দ্র তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকে যে চিঠি লিখেছিলেন, এরূপ অন্ততঃ দুখানি চিঠির খবর আমি

জানি। হিরণ্ময়ী দেবীকে লেখা শরৎচন্দ্রের সেই চিঠি দুখানি উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে আছে। উমাপ্রসাদবাবু চিঠি দুখানি হিরণ্ময়ী দেবীর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। চিঠি দুটির একটির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করছি।

এই চিঠিটি শরৎচন্দ্র তাঁর মৃত্যুর বছর খানেক আগে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য দেওঘরে গিয়ে ১৩৪৩ সালের ১৮ই ফাল্গুন তারিখে সেখান থেকে হিরণ্ময়ী দেবীকে লিখেছিলেন। শরৎচন্দ্র দেওঘরে পৌঁছেই, তার পরের দিন তিনি তাঁর স্ত্রীকে চিঠি লিখে পৌঁছনোব খবর দিয়েছিলেন এবং ঐ চিঠিতেই লিখেছিলেন—

কল্যাণীয়াসু,

বড়বৌ·· ···সকলেই বলচেন ১ মাস ২ মাস থাকতে পারলে শরীর সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যাবে। দেখি, কতদিন থাকতে পারি। ভাবনা আমার তোমার জন্যেই, পাছে অসাবধানে অসুখ-বিসুখ করে। কারণ, তোমার অসুখ করেছে যেদিন কানে শুনতে পাবো, সেই দিনই দেওঘর ছেড়ে কলকাতায় চলে যাবো।· ·

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মৃত্যুর কদিন আগে শরৎচন্দ্র তাঁব এই স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকে জীবনস্বত্বে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করে উইল করে দিয়ে যান। হিরণ্ময়ী দেবীর মৃত্যুর পরের অবস্থা ভেবে উইলে তিনি এ কথাও অবশ্য লিখে যান যে, হিরণ্ময়ী দেবীব মৃত্যু হলে ভ্রাতুষ্পুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন।

হিরণ্ময়ী দেবী অশিক্ষিতা, সরল-স্বভাবা গ্রাম্য-মহিলা ছিলেন। হিরণ্ময়ী দেবী অত্যন্ত স্বামী সেবাপবায়ণা হলেও অতবড একজন প্রতিভাধর সাহিত্যিকের যোগ্য সহধর্মিণী হতে পারেন নি, একথা বলা যেতে পারে। তবুও এই হিরণ্ময়ী দেবীর উপরই শরৎচন্দ্রের ভালবাসা ছিল অত্যন্ত গভীর।

একটি হৃদয়-দৌর্বল্যের কাহিনী

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিক। অন্নপূর্ণার মন্দির, দিদি, বিধিলিপি প্রভৃতি গ্রন্থের লেখিকা নিরুপমা দেবী তখন মাত্র ১০ বৎসরের বালিকা এবং সদ্য বিবাহিতা। সেই সময় তিনি তাঁর পিতা হুগলীর সাব-জজ নফরচন্দ্র ভট্ট মহাশয়ের নিকট চুঁচুড়ায় থাকতেন।

চুঁচুড়ার মণীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী লেখিকা অনুরূপা দেবী নিরুপমা দেবীর প্রায় সমবয়স্কা ছিলেন। অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবী, এঁদের উভয়ের মধ্যে তখন পরিচয় হলে, উভয়ে একদিন চুঁচুড়ায় গঙ্গাস্নান করে 'গঙ্গাজল' বা বন্ধুত্ব পাতান। এঁদের এই বন্ধুত্ব বরাবর অটুট ছিল এবং একজনের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এই বন্ধুত্বের সূত্র ছিন্ন হয় নি।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে নিরুপমা দেবীর মৃত্যু হয়। ঐ সময় ১৩৫৭ সালের পৌষ সংখ্যা 'কথা-সাহিত্য' পত্রিকায় অনুরূপা দেবী বন্ধু নিরুপমা দেবী সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে সেই প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধেও কিছু লিখেছিলেন। অনুরূপা দেবী লিখেছিলেন—

"তিনি (অর্থাৎ শরৎচন্দ্র) সুবিধা মত অনেকের কাছে নিজের মর্যাদা বাড়াবার জন্যই হোক্, কিম্বা শুধু কল্পনা বিলাসের আকাশ-কুসুম চয়নের জন্যই হোক্, বা আনন্দলাভের জন্যই হোক্, অনেক রকম অবান্তর ও অনধিকার রটনা করে বেড়িয়েছেন। যা নিয়ে অন্য কোন সমাজ হ'লে ডিফারমেসন চার্জ দিয়ে মামলা আনাও চলতে পারতো। আমাদের উচ্চ হিন্দু সমাজে দুষ্টব্যক্তিকে যথাসাধ্য পরিহার করেই চলতে উপদেশ দেওয়া হয়। কাদামাটি ঘেঁটে পাঁক তৈরি করতে ব'লে নয়। যে ভদ্রসমাজের নামজাদা ঘরের সম্মানিতা মহিলাদের সম্বন্ধে কতখানি সংযতভাবে কথা বলা উচিত আজকের দিনের বহুসম্মানিত, সেদিনকার ছন্নছাড়া, ভবঘুরে লোকটির সে উচ্চ শিক্ষা ছিল না; সে আমি, আমার স্বামী এবং এখনও বর্তমান দু'একজন নরনারী প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি। তিনি তাঁর বন্ধুর ছোট বোনকে বুড়ী বলে উল্লেখ করতে পারেন, সেটা কিছু বিচিত্র নয়, কিন্তু তাই থেকে এ প্রমাণ হয় না যে, অর্ধশতাব্দী পূর্বে নিতান্ত নিয়মতান্ত্রিক ঘরের বালবিধবার

শরৎচন্দ্রের মত চরিত্রের একজন অনাত্মীয় তরুণের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মেলামেশা চলতো।"

১৩১৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'যমুনা' পত্রিকায় অনিলা দেবী, এই ছদ্মনামে শরৎচন্দ্রের 'নারীর লেখা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র অনুরূপা দেবীর 'পোষ্যপুত্র' উপন্যাসের তীব্র বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন—

"...প্রায় উপমাগুলিই যে না জানিয়া লেখা তাহা পড়িলেই চোখে ঠেকে। আর একটা জিনিস তার চেয়েও বেশী ঠেকে—সেটা অসহ্য জ্যাঠামো।... তাঁহার না জানিয়া যা-তা উপমা দিবার স্বপক্ষে সে রকম কৈফিয়ৎ কিছু নাই। তাই দৃষ্টান্তের মত দুই একটা উল্লেখ করিব মাত্র।

এক স্থানে বলিতেছেন, বিজন পথে চলিতে চলিতে অকস্মাৎ পায়ের নীচে দংশনোদ্যত সর্প দেখিলে পথিক যেমন আড়ষ্ঠ কাঠ হইয়া দাঁড়ায় ইত্যাদি। তাই বটে! একটা ন্যাকড়া কিম্বা দড়ির টুকরো দেখিলে লাফাইয়া কে কার ঘাড়ে পড়িবে ঠিক থাকে না, আড়ষ্ঠ হইয়াই দাঁড়ায়! তাও আবার যে সে সর্প নয়—একেবারে দংশনোদ্যত সর্প! ইনি যে লেখেন নাই, রান্নাঘরে হঠাৎ জলন্ত আগুনের টুকরো পায়ের নীচে মাড়াইয়া ধরিয়া রাঁধুনি যেমন অবাক হইয়া হাঁ করিয়া দাঁড়ায়,—ইহাই পরম ভাগ্য!"

শরৎচন্দ্রের এইরূপ লেখার জন্য অনুরূপা দেবী সেই রাগেই পরে এখানে সুযোগ পেয়ে শরৎচন্দ্রকে 'সেদিনকার ছন্নছাড়া, ভবঘুরে', 'ধৃষ্টব্যক্তি' ইত্যাদি বলেন নাই তো!

যাই হোক্, অনুরূপা দেবী যে বলেছেন, শরৎচন্দ্র 'বুড়ী' অর্থাৎ নিরুপমা দেবীকে নিয়ে অনেক রকম অবান্তর ও অনধিকার রটনা করে বেড়িয়েছেন, এখন শরৎচন্দ্রের সেই 'রটনা' সম্বন্ধে আমি যা জানি,, এখানে তাই বলছি—

শরৎচন্দ্র একবার এক পত্রে রাধারাণী দেবীকে লিখেছিলেন :—

"আমার মত কুঁড়ে মানুষ সংসারে আর দ্বিতীয় নেই। একান্ত বাধ্য না হ'লে কখনো কোন কাজই আমি করতে পারিনে। তবুও এতগুলো বই লিখেছিলাম কি করে? সেই ইতিহাসটাই বলি।

আমার একজন 'গারজেন' ছিলেন। এঁর পরিচয় জানতে চেও না। শুধু

এইটুকু জেনে রাখ, তাঁর মত কড়া তাগাদাদার পৃথিবীতে বিরল। এবং তিনিই ছিলেন, আমার লেখার সব চেয়ে কঠোর সমালোচক। তাঁর তীক্ষ্ণ তিরস্কারে না ছিল আমার আলস্যের অবকাশ, না ছিল লেখার মধ্যে গোঁজামিলের সাহায্যে ফাঁকি দেবার সুযোগ। এলোমেলো একটা ছত্রও তাঁর কখনো দৃষ্টি এড়াতো না। কিন্তু এখন তিনি সব ছেড়ে ধর্ম-কর্ম নিয়েই ব্যস্ত। গীতা-উপনিষদ ছাড়া কিছুই তাঁর চোখে পড়ে না। কখনো খোঁজও করেন না, এবং আমিও বকুনি ও তাড়া খাওয়া থেকে এ জন্মের মতো নিস্তার পেয়ে বেঁচে গেছি। মাঝে মাঝে বাইরের ধাক্কায় প্রকৃতিগত জড়তা যদি ক্ষণকালের জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখনি আবার মনে হয়—ঢের ত লিখেছি, আর কেন, এ জীবনের ছুটিটা যদি এই দিক থেকে এমনি করেই দেখা দিলে, তখন মিয়াদের বাকি দু চারটে বছর ভোগ করেই নিই না কেন? কি বল রাধু? এই কি ঠিক নয়? অথচ লেখবার কতবড় বৃহৎ অংশই না অলিখিত রয়ে গেল। পরলোকে বাণীর দেবতা যদি এই ত্রুটির জন্য কৈফিয়ৎ তলব করেন ত, তখন আর একজনকে দেখিয়ে দিতে পারবো, এই আমার সান্ত্বনা।"

শরৎচন্দ্র রাধারাণী দেবীকে আর একটি পত্রে লিখেছিলেন—

"রাধু, তোমার আগেকার চিঠি যথাসময়েই পেয়েছিলাম এবং নূতন বছরের আরম্ভে যে আশীর্বাদ চেয়েছিলে, তা মনে মনে দিতে কোন কৃপণতা করিনি, শুধু প্রকাশ্যে জানানোটা ঘটে ওঠেনি ভাই। 'এই কালই জবাব দেবো' এই একটি প্রতিজ্ঞা প্রত্যহ সকালে উঠেই কবেছি এবং করতে করতে মাস দেড়েক কেটে গেলো। এমনি স্বভাব! অথচ তোমাদেব আজও এ জ্ঞান জন্মালো না যে, ভাবো—'দাদাটি তোমাদের স্বর্গে গেছেন—আর তাকে স্মরণ করাই বা কেন, আর তার আশীর্বাদ চাওয়াই বা কিসের জন্য।' আর কদিনই বা বাকি আছে বোন! একটু আগে থেকেই না হয় ভাবলে। কি এমন ক্ষতি? আরও ত কেউ কেউ এইটাই স্বীকার করে নিয়ে একেবারে নিরুদ্দেশের আড়ালে মিলিয়ে গেছেন। তোমরা পারো না?"

শরৎচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে যে সব চিঠিপত্র লিখেছিলেন, তার যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করতে পেরেছি, সেই সব নিয়ে 'শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র' নাম দিয়ে আমি একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছি। এই গ্রন্থে রাধারাণী দেবীকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠিগুলিও আছে।

এখানে উদ্ধৃত রাধারাণী দেবীকে লেখা শরৎচন্দ্রের পত্রাংশ দুটির মধ্যে প্রথমটিতে 'আমার একজন গারজেন ছিলেন, এঁর পরিচয় জানতে চেও না' যে লেখা আছে, রাধারাণী দেবী কিন্তু শেষ পর্যন্ত এঁর পরিচয় জানতে পেরেছিলেন।

'শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র' গ্রন্থটি সম্পাদনাকালে শরৎচন্দ্রের উক্ত 'গারজেন'এর কথা রাধারাণী দেবীকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি আমার কাছে মুখে নিরুপমা দেবীর নাম করলেও, গ্রন্থে গারজেনের পাদটীকায় নাম বাদ দিয়ে শুধু 'জনৈক মহিলা সাহিত্যিক' এই কথাটি লিখতে বলেছিলেন।

রাধারাণী দেবীকে লেখা দ্বিতীয় পত্রাংশটিতে যে 'আরও ত কেউ কেউ এইটাই স্বীকার করে নিয়ে একেবারে নিরুদ্দেশের আড়ালে মিলিয়ে গেছেন' আছে, এ সম্বন্ধে রাধারাণী দেবীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি মুখে নিরুপমা দেবীর নাম বলে ঐ কথাগুলির পাদটীকায় যা লিখতে বলেছিলেন, তা হচ্ছে এই—

"শরৎচন্দ্রের জীবনে একটা গোপন বেদনা ছিল, তাঁর এই বেদনার কথা রাধারাণী দেবী জানতেন। তাই রাধারাণী দেবীকে লেখা বহু পত্রেই তাঁর এই বেদনার আভাষ পাওয়া যায়। এখানেও সেই আভাষই ব্যক্ত হয়েছে।"

আমার সম্পাদিত 'শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র' গ্রন্থটিতে রাধারাণী দেবীকে লেখা শরৎচন্দ্রের উপরোক্ত পত্র দুটির পাদটীকায় তিনি যা লিখতে বলেছিলেন, তাই মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

রাধারাণী দেবী আমার কাছে বলেছিলেন, তাঁকে লেখা বহু পত্রেই শরৎচন্দ্রের গোপন বেদনার আভাষ রয়েছে।

রাধারাণী দেবী, তাঁকে লেখা শরৎচন্দ্রের যে ক'টি পত্র আমাকে আমার 'শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র' বইটিতে প্রকাশ করতে দিয়েছিলেন, তার মধ্যে ২।৩টি পত্রে শরৎচন্দ্রের ঐ বেদনাব আভাষ দেখছি। কিন্তু তিনি যখন তাঁকে লেখা 'বহু পত্রেই' বলেছিলেন, তখন নিশ্চয়ই ঐ প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা আরও চিঠি তাঁর কাছে থাকা স্বাভাবিক। অন্ততঃ ঐ প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা একটি দীর্ঘ পত্র যে আজও (এই প্রবন্ধ লেখার সময়) তাঁর কাছে অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে, তা আমি জানি।

রাধারাণী দেবী, তাঁকে লেখা শরৎচন্দ্রের যে পত্রগুলি আমাকে প্রকাশ করতে দিয়েছিলেন, সেই পত্রগুলি দেবার সময়, ঐ দীর্ঘ পত্রটিও তিনি আমাকে

দেখিয়েছিলেন। তাঁর স্বামী নরেন্দ্র দেবও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নরেনবাবু সেই সময় ঐ পত্রটি নিয়ে 'প্রেম ও শরৎচন্দ্র' নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখবার জন্য আমাকে বলেছিলেন। (কারণ, ঐ সময় আমি 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের জীবনের ও চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে নানা প্রবন্ধ লিখছিলাম।) কিন্তু রাধারাণী দেবী তখন ঐ চিঠিটি আমাকে দেন নি। তবে পরে আমাকে দেবেন বলেছিলেন। সেই হিসাবে পরে তাঁর কাছে ঐ চিঠিটি কয়েকবার চেয়েছি। কিন্তু কেন জানি না তিনি কি ভেবে সেই চিঠিটি আর দিলেন না। তাঁর স্বামী নরেনবাবুও ঐ চিঠিটির নকল আমাকে দেবার জন্য তাঁকে বলেছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি দেন নি।

রাধারাণী দেবীকে লেখা বহু পত্রেই যেমন শরৎচন্দ্রের গোপন বেদনার আভাষ আছে, লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের একটি পত্রেও তেমনি তাঁর সেই গোপন বেদনার কথাই পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে। শরৎচন্দ্রের সেই পত্রটি এই :—

"পরম কল্যাণীয়াসু,

…আমার মানসিক পরিবর্তন সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন তুমি বহুদিন হইতে করিয়া আসিতেছ, এবং বহুদিন হইতেই আমি নীরবে আছি। কিন্তু আমার মত যখন তোমার বয়স হইবে, তখন হয়ত ইহা বুঝিতেও পারিবে যে, জগতে মানুষের এমন কথাও থাকিতে পারে, যাহা কাহারও কাছে ব্যক্ত করা যায় না। গেলেও তাহাতে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের মাত্রাই বাড়ে। অথচ, এই নীরবতার শাস্তি অতিশয় কঠিন।

ভীষ্ম যে একদিন স্তব্ধ হইয়া শরবর্ষণ সহ্য করিয়াছিলেন, সে কথাটা চিরদিনের জন্য মহাভারতে লেখা হইয়া গেল, কিন্তু কত অলিখিত মহাভারতে যে এমন কত শরশয্যা নিত্যকাল ধরিয়া নিঃশব্দে রচিত হইয়া আসিতেছে, তাহার একটা ছত্রও কোথাও বিদ্যমান নেই। এমনি করিয়াই সংসার চলিতেছে।…

তোমার এই দাদাটির অনেক বয়স হইয়াছে, অনেকের অনেক প্রকারের ঋণ এ নাগাদ শোধ করিতে হইয়াছে। তাহার এ উপদেশটি কখনো বিস্মৃত হইও না যে, পৃথিবীতে কৌতূহল বস্তুটির মূল্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়া যত বড়ই হোক্, তাহাকে দমন করার পুণ্যও সংসারে অল্প নয়।

যে বেদনার প্রতিকার নাই, নালিশ করিতে গেলে যাহার নীচেকার পঙ্ক জেরায় জেরায় একেবারে উপর পর্যন্ত ঘুলাইয়া উঠিতে পারে, সে যদি থিতাইয়া থাকে ত থাক না। কি সেখানে আছে, নাই বা জানা গেল, কি এমন ক্ষতি?"

শরৎচন্দ্র নাকি জীবন ভোরই তাঁর এই বেদনা বয়ে বেড়িয়েছেন। তিনি তাঁর প্রথম যৌবন থেকে শেষ বয়স পর্যন্ত নাকি নিরুপমা দেবীর কথা ভুলতে পারেন নি।

রেঙ্গুনের গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন—

"শরৎচন্দ্রের প্রণয়-ভাগ্য মোটেই ভাল ছিল না। তাঁহার প্রথম জীবনের প্রণয়ঘটিত নৈরাশ্যের কথা সকলেই অবগত আছেন।"

শরৎচন্দ্র বিদেশে বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সবকারের কাছে নিরুপমা দেবীর উপর তাঁর হৃদয়-দৌর্বল্যের গল্প করেছিলেন। তাই তিনি ঐ কথা লিখে গেছেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর স্নেহভাজন বন্ধু কাশীর কবিরাজ হরিদাস শাস্ত্রীর কাছেও একবার বলেছিলেন—

"প্রথম যৌবনে আমি একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলাম। ভালবাসা নিষ্ফল হল, কিন্তু সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলার মধ্যে সে এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে। সশরীরে যে নয়, সে তোমায় বোঝাতে হবে না বোধ হয়।

…তার পরিচয় চাও ত? না, তা দেব না।" (সাহানা—১৩৪৬)

শরৎচন্দ্র সেদিন হরিদাস শাস্ত্রীর কাছে 'মেয়ে'টির পরিচয় দেন নি। পরে দিয়েছিলেন কিনা জানি না। তবে সেদিন তিনি ইঙ্গিতে নিরুপমা দেবীর নামই করেছিলেন বলে মনে হয়।

এ সব ছাড়াও নিরুপমা দেবীকে নিয়ে শরৎচন্দ্রের আরও এক ধরণের একটি ঘটনার কথা জানা যায়। সেটি হচ্ছে এই:—

শরৎচন্দ্র ১৩-২-১৩ তারিখে রেঙ্গুন থেকে যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

"আমার তিনটে নাম।

সমালোচনা, প্রবন্ধ প্রভৃতি—অনিলা দেবী।

ছোটগল্প—শরৎচন্দ্র চট্টো।

বড়গল্প—অনুপমা।"

শরৎচন্দ্রের এই অনুপমা নাম নেওয়ার মধ্যেও নিরুপমা দেবীর প্রতি তাঁর হৃদয়-দৌর্বল্যের লক্ষণ ছিল বলে মনে হয়। কেননা কেউ কেউ বলেন, নিরুপমা দেবীর আসল নাম ছিল, অনুপমা দেবী। যেমন, ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস' ৪র্থ খণ্ডে লিখেছেন—

"ইঁহার আসল নাম অনুপমা। ১৩১৫ সালের মাঘ মাস হইতে (ভারতী 'শেফালিকা') নিরুপমা নাম গৃহীত হইয়াছিল। কুন্তলীন পুরস্কারে (১৩১১), ...এবং ভারতীতে (১৩১৫ ভাদ্র ও অগ্রহায়ণ) প্রকাশিত গল্পে অনুপমা নামই পাই।"

শরৎচন্দ্রের মাতুল ও বাল্যবন্ধু সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৩৩২।৩৩ সালে 'কল্লোল' পত্রিকায় যখন শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লিখছিলেন, সেই সময় তিনি একবার প্রসঙ্গক্রমে নিরুপমা দেবী সম্বন্ধে লিখেছিলেন—

"তাঁহার 'অনুপমা' নামটিই তিনি আত্মগোপনের জন্য সময়ে সময়ে ব্যবহার করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইয়াছে এবং তাঁহার প্রকৃত নামটিই অবশেষে বহাল থাকিয়া গিয়াছে।" (শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক)

সুরেনবাবু বলেন—তিনি ঐ কথা লিখলে তখন বিভূতিভূষণ ভট্ট প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁকে লিখেছিলেন—'বুড়ীর নাম চিরকালই নিরুপমা, কোনদিন অনুপমা ছিল না।'

যাই হোক, নিরুপমা দেবীর নাম অনুপমা নাও যদি হয়, তাহলেও শরৎচন্দ্র নিরুপমা শব্দের একই অর্থে (তুলনাহীন) অনুপমা নামটি যে নিয়েছিলেন, এ অনুমান করা যেতে পারে।

শরৎচন্দ্র যে আমার তিনটি নাম বলে, তাঁর দিদি অনিলা দেবীরও নামটি নিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে আমার মনে হয়—শরৎচন্দ্র দুটো নাম বলে নিজের নামের সঙ্গে শুধু 'অনুপমা' নাম নিয়ে লিখলে, পাছে তাঁর হৃদয়-দৌর্বল্য অত্যন্ত প্রকট হয়ে পড়ে এবং সকলে ধরে ফেলে, এই কারণেই তিনি তাঁর দিদির নামটিও নিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র 'আমার তিনটে নাম' বলে, অনিলা দেবীর নাম নিয়ে লিখলেও, শেষ পর্যন্ত কিন্তু অনুপমা নাম নিয়ে কিছু লেখেন নি বা লিখতে সাহস করেন নি। তবে যমুনা-সম্পাদক ফণিবাবুকে ঐ চিঠি লেখার প্রায় বছর খানেক পরে ১৩২০ সালের চৈত্র সংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রিকায় তাঁর 'অনুপমার প্রেম'

নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। এই অনুপমার প্রেম গল্পটির বিষয়বস্তু হচ্ছে :—

অনুপমা ধনী জগবন্ধুবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা। অনুপমা অল্প বয়সেই গল্প উপন্যাস পড়ত।

অনুপমাদের প্রতিবেশী ললিত নামে একটি যুবক অনুপমাকে ভালবাসত। ললিত বদ্ সঙ্গে মিশে মদ ধরেছিল। তবে শেষে মদ ছেড়ে দিয়ে ভাল হয়ে গিয়েছিল। অনুপমা ললিতের ভালবাসার কোনও মূল্য দেয় নি, বরং তার উপর দুর্ব্যবহারই করেছিল।

অনুপমার প্রথমে বিয়ের কথা হয় বি-এ ক্লাসে পড়া একটি যুবকের সঙ্গে। কিন্তু সেখানে বিয়ে না হয়ে একটি বৃদ্ধের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বিয়ের অল্পদিন পরে অনুপমার স্বামী যক্ষ্মা রোগে মারা যায়। অনুপমা বিধবা হয়ে, বৈমাত্রেয় বড়ভাই-এর সংসারে থাকে। কিন্তু দাদা ও বৌদির গঞ্জনা ও অত্যাচারে অনুপমা একদিন জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে যায়!

ললিত অনুপমাকে জল থেকে তুলে নিজের ঘরে এনে শুশ্রূষা করে বাঁচায়। অনুপমা জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ চেয়ে দেখে, সে ললিতের পালঙ্কে শুয়ে, আর ললিত তার পাশে বসে।

এই 'অনুপমার প্রেম' গল্পের বিষয়বস্তুর সঙ্গে নিরুপমা দেবীর জীবনের অনেকটা মিল পাওয়া যায়। এমন কি শরৎচন্দ্রের নিজের জীবনেরও কিছু মিল এবং তাঁর নিজের মনের কথার কিছুটা ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। যেমন—

নিরুপমা দেবীও ধনী নফরচন্দ্র ভট্টর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা ছিলেন। নিরুপমা দেবীও অল্প বয়সে গল্প-উপন্যাস পড়তেন। তাঁর স্বামী নবগোপাল ভট্ট বি.এ পড়ার সময় যক্ষ্মারোগে মারা যান। তিনি বিধবা হয়ে ভাই-এর সংসারে ছিলেন। তাঁর সহোদর ভাই থাকলেও, তাঁর বৈমাত্রেয় বড়ভাই এবং বড় বৌদি ছিলেন।

অনুপমার প্রেম গল্পের ললিতের ন্যায় শরৎচন্দ্রও যে কোন কারণেই হোক অল্প বয়সেই মদ ধরেছিলেন এবং তিনিও ছিলেন ভাগলপুরে খঞ্জরপুর পল্লীতে নিরুপমা দেবীদের প্রতিবেশী।

'অনুপমার প্রেম' গল্প লেখার মধ্যে শরৎচন্দ্রের মনের কথা বা উদ্দেশ্য কি ছিল? তিনি কি এই গল্পে নিরুপমা দেবীকে জানাতে চেয়েছিলেন যে,

বিধবা হয়ে দাদা-বৌদির সংসারে থাকার চেয়ে, যে তাঁকে সত্যকার ভালবাসে, তাঁকে বিয়ে করা অনেক ভাল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বলেন—শরৎচন্দ্র, নিরুপমা দেবীর উপর তাঁর হৃদয়-দৌর্বল্যের কথা জানিয়ে রেঙ্গুন থেকে নিরুপমা দেবীকে ঐ সময় নাকি একটি চিঠিও লিখেছিলেন। শরৎচন্দ্র নিরুপমা দেবীকে ঐ চিঠিটি লিখলে, তখন বিভূতিভূষণ ভট্ট আমাকে ঐ চিঠিটির কথা শুনিয়ে বলেছিলেন— দেখ না ভাই সৌরীন, শরৎদা এখনও বুড়ীকে ভুলতে পারে নে।

বিবাহের প্রস্তাব করে নিরুপমা দেবীকে লেখা শরৎচন্দ্রের এই ধরণের একটি চিঠির কথা শরৎচন্দ্রের স্নেহভাজন বন্ধু শিল্পী শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহও বলে থাকেন। সতীশবাবু বলেন—শরৎচন্দ্রের সেই চিঠিটি শেষে নিরুপমা দেবীর দাদাদের হাতে যায়।

সতীশবাবু আরও বলেন যে, ঐ কথাগুলি তিনি শরৎচন্দ্রের নিজের মুখেই শুনেছেন।

নিরুপমা দেবীকে নিয়ে শরৎচন্দ্রেব, অনুরূপা দেবীব ভাষায় 'অনেক রকম অবান্তর ও অনধিকার রটনা'র কথা আলোচনা করা গেল। এখন দেখা যাক্, নিরুপমা দেবীকে নিয়ে এইরূপ রটনা করার পক্ষে শরৎচন্দ্রের কোন কারণ ঘটেছিল কিনা—

নিরুপমা দেবীর জীবনী থেকে জানা যায়, তিনি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৪।১৫ বছর বয়সে বিধবা হয়ে ভাগলপুরে তাঁর পিতার কাছে চলে আসেন।

শরৎচন্দ্র ঠিক ঐ সময়টায় কলেজের পড়া ছেড়ে দিয়ে 'আদমপুর ক্লাবে' থিয়েটার করে এবং সাহিত্য-চর্চা কবে কাটাচ্ছিলেন। নিরুপমা দেবীর মেজদা ইন্দুভূষণ ভট্ট ভাগলপুর কলেজে শরৎচন্দ্রের সহপাঠী থাকায়, শরৎচন্দ্র ভট্ট-পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, তাঁদের বাড়ীতে যাতায়াত করতেন এবং ক্রমে সেখানে নিজের একটা লেখাপড়ার আস্তানাও করে নিয়েছিলেন।

নিরুপমা দেবীর নিজের লেখা থেকেই জানা যায় যে, তাঁর স্বামীর সপিণ্ডকরণের সময় (অর্থাৎ ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে) শরৎচন্দ্র ভট্টবাড়ীতে 'আত্মজনে'র মতই হয়ে গিয়েছিলেন।

নিরুপমা দেবীর ঐ লেখাতেই দেখছি, তাঁর স্বামীর সপিণ্ডকরণের দিন,

বাড়ী থেকে কিছুটা দূরে যমুনিয়ার তীরে ঠাকুর বাড়ীতে সপিণ্ডকরণের সময় তিনি, পুরোহিত, এবং তাঁর এক জ্যাঠতুতো বিধবা বৌদি ছাড়া, সেখানে শুধু তাঁর ছোট্‌দা বিভূতিভূষণ ভট্ট এবং শরৎচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। শ্রাদ্ধের কাজে জোগাড় দেওয়া ও দেখাশুনা করবার জন্যই বিভূতিবাবু ও শরৎচন্দ্র সেখানে ছিলেন। শ্রাদ্ধের দানাদির মধ্যে বিভূতিবাবু ও শরৎচন্দ্রের একটা ভুল হয়ে যাওয়ায়, অনেকক্ষণ পরে নিরুপমা দেবী সসঙ্কোচে পুরোহিতের নিকট এঁদের সেই ভুলটির কথা উল্লেখ করেন। ভুলের কথা শুনেই শরৎচন্দ্র তখন ভুল সংশোধনার্থে বেশ বিব্রত হয়ে পড়েন এবং নিরুপমা দেবীকে উদ্দেশ করে বলেন—'ভ্যাখ দেখি কতটা হাঙ্গামে পড়তে হল—ভুলটা এতক্ষণ পরে ধরিয়ে না দিয়ে, তখনি দিলে না কেন?'

ঐ শ্রাদ্ধের সময়েই ঘৃত মধু ইত্যাদির গন্ধে একটা ভীমরুল এসে নিরুপমা দেবীকে মোক্ষমভাবে কামড়ে দিলে, শরৎচন্দ্র বিষম ব্যস্ত হয়ে হুলবিদ্ধ স্থানে একবার দধি, একবার মধু দেবার জন্য ব্যাকুলভাবে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন।

নিরুপমা দেবীর লেখায় আরও দেখা যায় যে, শ্রাদ্ধের সময় তিনি থান কাপড় পরে শ্রাদ্ধ করায়, শ্রাদ্ধান্তে পরবার জন্য, শরৎচন্দ্র তাঁদের বাড়ী থেকে পাড়ওয়ালা কাপড় এবং তাঁর খুলে রাখা হাতের গহনাগুলিও নিয়ে এসেছিলেন।

বাড়ীতে আত্মজনের মত না হলে, শরৎচন্দ্রের হাতে কেউই সোনার গহনা দিতেন না। শরৎচন্দ্র এমনিভাবেই তখন ভট্টবাড়ীতে আত্মজনের মত হয়ে ছিলেন।

সেদিনের ঐ শ্রাদ্ধের ঘটনার পর আরও প্রায় চার বছর শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে ছিলেন।

ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের নেতৃত্বে যে সাহিত্য-সভা ছিল, নিরুপমা দেবীও সেই সাহিত্য-সভার একজন সদস্যা ছিলেন। তিনি সাহিত্য-সভার বৈঠকে যেতেন না বটে, তবে তাঁর লেখা সেই সভায় পড়বার জন্য সাহিত্য-সভার অন্যতম সদস্য তাঁর দাদা বিভূতিভূষণ ভট্টর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন।

নিরুপমা দেবী নিজেই লিখেছেন, তাঁর লেখার জন্য শরৎচন্দ্রই বিভূতিবাবুর মারফৎ বিষয় নির্বাচন করে দিতেন।

নিরুপমা দেবী আরও বলেছেন—তাঁর ক্রম-বর্ধিতাকার কবিতার খাতায় তাঁর প্রতিটি কবিতার মাথায় অথবা আশেপাশে শরৎচন্দ্রের মন্তব্য থাকত।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"পুঁটুদের বাড়ীতে আমাদের যাতায়াত ছিল হামেশা।...সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় যে সময়েই পুঁটুদের বাড়ী গিয়েছি, দেখেছি শরৎচন্দ্র বসে আছেন।...বই পড়তেন...গল্প লিখতেন অনর্গল। এ যাবৎ পুঁটু আর তাঁর ভগ্নী নিরুপমা, এঁরাই ছিলেন পাঠক-পাঠিকা। সে দলে আমিও 'ইনিসিয়েটেড' হলুন।"

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন—"ইংরাজী ১৮৯৬ সালে ভুবনমোহিনীর (শরৎচন্দ্রের মাতা) মৃত্যুর পরে শরৎচন্দ্র খঞ্জরপুরে গিয়ে খোলাখুলি ভাবে সাহিত্য আলোচনা সুরু করলেন। সে আলোচনা চলতো বিভূতিভূষণ ভট্ট এবং নিরুপমার সঙ্গে।"

সৌরীনবাবু লিখেছেন—শরৎচন্দ্রের মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ঐ সময় একদিন শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর কাছে বলেছিলেন—শরৎ 'বয়ে' গেছে, তার সঙ্গে আমাদের আর তেমন সম্পর্ক নেই। সে সতীশদের (আদমপুর ক্লাবের) বাড়ীতে ও পুঁটুদের বাড়ীতে থাকে।

অনুরূপা দেবীও ঐ সময়কারই শরৎচন্দ্রকে ছন্নছাড়া ইত্যাদি বলেছেন। আর তিনি 'শরৎচন্দ্রের মত চরিত্রের লোক' বলে শরৎচন্দ্রকে ভাল চরিত্রের লোক বলেন নি।

অতএব উপেনবাবু ও অনুরূপা দেবীর যথাক্রমে কথা ও লেখায় কিছুটা সত্য থাকলে দেখা যায় যে, শরৎচন্দ্র ঐ সময়টায় একজন আদর্শবাদী ও নীতিবাগীশ যুবক ছিলেন না। যদি তাই হয়, তাহলে ঐরূপ চরিত্রের শরৎচন্দ্রের পক্ষে একটি যুবতী নারী, যিনি অনাত্মীয়া ও বন্ধুর ভগ্নী, যাঁদের বাড়ীতে দিনের অধিকাংশ সময়ই কাটান, যাঁর লেখা দেখে দেন ও যাঁর লেখার বিষয় নির্বাচন করে দেন—এক কথায় যিনি সাহিত্য-সাধনার পথে তাঁর সহযাত্রিনী, এবং যাঁর সঙ্গে দেখাশুনা ও কথাবার্তাও হয়, তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। 'বয়ে যাওয়া' 'শরৎচন্দ্রের মত চরিত্রের' যুবকের পক্ষে কেন, ঐ অবস্থায় পড়লে অনেক চরিত্রবান, নীতিবাগীশ যুবকের পক্ষেও আকৃষ্ট হওয়া আদৌ অস্বাভাবিক নয়।

অনুরূপা দেবী বলেছেন—"এ প্রমাণ হয় না যে, অর্ধশতাব্দী পূর্বে নিতান্ত নিয়মতান্ত্রিক ঘরের বাল-বিধবার শরৎচন্দ্রের মত চরিত্রের একজন অনাত্মীয় তরুণের সঙ্গে মেলামেশা চলতো।"

অনুরূপা দেবী 'নিতান্ত নিয়মতান্ত্রিক ঘর' বলে ভট্ট-পরিবারকে কি অত্যন্ত রক্ষণশীল ও গোঁড়া পরিবার বলতে চেয়েছিলেন?

পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত ঐ ভট্ট-পরিবার যে আদৌ রক্ষণশীল ছিলেন না, বরং প্রগতিশীল ও উদারপন্থী ছিলেন, তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা—বিভূতিভূষণ ভট্ট ও তাঁর দাদাদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কখন ও কিভাবে প্রথম পরিচয় হয়, সে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র নিজেই লিখেছেন—

"ভাগলপুরে আমাদের সাহিত্য-সভা যখন স্থাপিত হয়, তখন আমাদের সঙ্গে শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ ভট্ট বা তাঁর দাদাদের কিছুমাত্র পরিচয় ছিল না। বোধ হয় একটা কারণ এই যে, তাঁরা ছিলেন বিদেশী এবং বড়লোক।...স্বর্গীয় নফরচন্দ্র ভট্ট ছিলেন সেখানকার সব-জজ। তারপরে কি করিয়া এই পরিবারের সঙ্গে আমাদের ক্রমশঃ জানাশুনা এবং ঘনিষ্ঠতা হয়, সে-সব কথা আমার ভাল মনে নাই। বোধহয় এইজন্য যে, ধনী হইলেও ইঁহাদের ধনের উগ্রতা বা দাম্ভিকতা কিছুমাত্র ছিল না। এবং আমি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম বোধ হয় এই জন্য বেশী যে, ইঁহাদের গৃহে দাবা খেলার অতি পরিপাটি আয়োজন ছিল। দাবা খেলার পরিপাটি আয়োজন অর্থে বুঝিতে হইবে—খেলোয়াড়, চা, পান ও মুহুর্মুহু তামাক।"

বিভূতিবাবুদের বাড়ীতে যে দাবা খেলার আয়োজন ছিল, একথা বিভূতিবাবুর লেখা থেকেও জানা যায়। বিভূতিবাবু লিখেছেন—

"শরৎচন্দ্রকে প্রথম যখন দেখি তখন তিনি ভাগলপুর তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে পড়েন।...আমি তখন স্কুলের ছাত্র।.. আমরা ছোটরা তখন ঐ অদ্ভুত মানুষটিকে সসম্ভ্রমে দাদাদের পড়িবার ঘরে আসা যাওয়া করিতে ও দাবা পাশা খেলিতে দেখিতাম মাত্র।" (ভারতবর্ষ—চৈত্র ১৩৪৪)

বিভূতিবাবুর মেজদা ইন্দুভূষণ কলেজে শরৎচন্দ্রের সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। যে বাড়ীতে ছেলেরা (যারা ছাত্র) দাবা পাশা খেলে (শরৎচন্দ্রের মুহুর্মুহু তামাকের কথা না হয় বাদই দিলাম) সে বাড়ী রক্ষণশীল তো নয়ই, এমন কি সে বাড়ীর শাসনও যে মোটেই কঠিন ছিল না, সে কথা বলা যেতে পারে।

নিরুপমা দেবী লিখেছেন—মেজদা ৺ইন্দুভূষণ ভট্ট বোধ হয় তাঁহাকে (শরৎচন্দ্রকে) আদমপুর ক্লাবেই প্রথম জানেন।

ইন্দুবাবু আদমপুর ক্লাবে যাতায়াত করলে, এ থেকেও বোঝা যায় যে, তাঁরা রক্ষণশীল সমাজের লোক ছিলেন না।

শরৎচন্দ্র বলেছেন—"সে সময়ে সে দেশে সাহিত্য-চর্চা একটা গুরুতর অপরাধের মধ্যেই গণ্য ছিল।"

অথচ নিরুপমা দেবী ও তাঁর অগ্রজ বিভূতিবাবুর লেখা থেকে জানা যায় যে, তাঁদের বাড়ীতে ক্ষুদ্র পরিসরের হলেও রীতিমত একটা সাহিত্য-চক্র ছিল!

নিরুপমা দেবী লিখেছেন—"দাদাদের বৈঠকখানায় তাঁহার (শরৎচন্দ্রের) কণ্ঠের আরও গান, আমরা ভিতর হইতে শুনিয়াছি।"

যে বাড়ীতে সে যুগে গান ও সাহিত্য-চর্চা চলত, সে বাড়ী কখনই রক্ষণশীল ছিল না। প্রগতিশীল ও উদারপন্থীই ছিল। সেই কারণেই অনাত্মীয় যুবক শরৎচন্দ্র ভট্টবাড়ীতে রিজার্ভ করা চেয়ারে বসে দিনের বেশীর ভাগ সময়ই লেখাপড়া করলেও ভট্টবাড়ীর লোকেরা আপত্তি করেন নি।

অনুরূপা দেবী লিখেছেন—বুড়ীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গ মেলামেশা হ'ত না।

শরৎচন্দ্র ২৯-৭-১৯ তারিখে লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে এক পত্রে কিন্তু এই বুড়ীর সম্বন্ধেই লিখেছিলেন—

"...এই মেয়েটিই একদিন যখন তাহার ষোল বৎসর বয়সে অকস্মাৎ বিধবা হইয়া একেবারে কাঠ হইয়া গেল, তখন আমি তাহাকে বার বার করিয়া এই কথাটাই বুঝাইয়াছিলাম, 'বুড়ি, বিধবা হওয়াটাই যে নারীজন্মের চরম দুর্গতি এবং সধবা থাকাটাই সর্বোত্তম সার্থকতা ইহার কোনটাই সত্য নয়।' তখন হইতে সমস্ত চিত্ত তাহার সাহিত্যে নিযুক্ত করিয়া দিই, তাহার সমস্ত রচনা সংশোধন করি এবং হাতে ধরিয়া লিখিতে শিখাই—তাই আজ সে মানুষ হইয়াছে, শুধু মেয়ে-মানুষ হইয়াই নাই।"

শরৎচন্দ্র রাধারাণী দেবীকে লিখেছিলেন—"...তাঁর তীক্ষ্ণ তিরস্কারে না ছিল আমার আলস্যের অবকাশ...।"

শরৎচন্দ্রের এই সব কথাকে বাদ দিলেও, তবুও ভাগলপুরে এঁদের মধ্যে যে দেখাশুনা ও কথাবার্তা হয়েছিল, সে তো স্বয়ং নিরুপমা দেবীর লেখা থেকেই দেখা যায়। ভাগলপুর ছাড়ার পরেও এঁদের সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং শরৎচন্দ্র নিরুপমা দেবীকে যে চিঠি লিখতেন, এ কথাও নিরুপমা দেবীর লেখা থেকেই জানা যায়।

নিরুপমা দেবী লিখেছেন—"ব্রহ্মদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পরে তিনি একবার আমাদের বাড়ীতে (বহরমপুরে) আসিয়া কয়েকদিন অবস্থানও করিয়াছিলেন।...এখান হইতে ফিরিয়া গিয়া তিনি 'চরিত্রহীন' লিখিতে আরম্ভ করেন এবং 'যমুনা'য় তাহা প্রকাশিত হইলে, আমাদের কেমন লাগিতেছে, জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান।

ইহাব বহুদিন পরে সাহিত্য-সম্রাটরূপে বহরমপুরে তিনি আর একবার আসিয়াছিলেন এবং অল্পক্ষণের জন্য আমাদের সঙ্গেও দেখা করিয়া যান।"

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে একবার বহরমপুরে নিরুপমা দেবীকে একটি এবং বিভূতিবাবুকে একটি দামী ফাউণ্টেন পেনও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

'শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র' নামে আমার যে বইটি আছে, ঐ বইটি সম্পাদনার সময় বিভূতিভূষণ ভট্টকে কি তাঁর ভগ্নী নিরুপমা দেবীকে লেখা শরৎচন্দ্রের কোন চিঠি বিভূতিবাবুর কাছে আছে কিনা জানবার জন্য আমি একদিন বহরমপুরে বিভূতিবাবুর কাছে যাই। সেদিন বিভূতিবাবুর অমায়িক ও ভদ্র-ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। তিনি সমাদর করে আমাকে মধ্যাহ্ন-ভোজন না করিয়ে ছাড়েন নি।

চিঠির কথা বলায় তিনি বলেছিলেন—শরৎদার কোন চিঠিই আজ আর আমার কাছে নেই। দু-একখানা যা ছিল, কবে কিভাবে তা হারিয়ে গেছে।

বহরমপুর থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পবে, বহরমপুরের 'পরিক্রমা' নামে একটি ছোট সাপ্তাহিক কাগজে হঠাৎ একদিন দেখি—বহরমপুরের এক শরৎ-স্মৃতি সভায় রেঙ্গুন থেকে বিভূতিবাবুকে লেখা শরৎচন্দ্রের একটি চিঠি এবং নিরুপমা দেবীকে লেখা আর একটি চিঠি পড়া হয়েছে। দেখলাম—১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বিভূতিবাবুকে লেখা শরৎচন্দ্রের দীর্ঘ চিঠিটি ঐ পরিক্রমায় ছাপাও হয়েছে। বিভূতিবাবুর এক ভ্রাতুষ্পুত্র অশোককুমার ভট্ট চিঠি দুটি সভায় নিয়ে গিয়েছিলেন।

বিভূতিবাবুকে লেখা ঐ চিঠিতেও নিরুপমা দেবী সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের অনেক কথা রয়েছে। সেই চিঠির কিছুটা এই :—

পরম কল্যাণীয় পুঁটুভায়া,

অনেকদিন পরে তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়াছি—প্রার্থনা করিতেছি যেন এখানি তোমার হাতে পড়ে। আমার সমস্ত দুষ্কৃতি ভুলিয়া সবটুকু স্নেহের চক্ষে পড়িয়ো ভাই, যেন এ লেখা আমার সার্থক হয়।···

বলিতেছি কি যে এমনি অদৃষ্ট আমার যে এতদিনে বোধ হয় মাস চারেক কলিকাতায় থাকিয়াও তোমাদের দেখিতে পাইলাম না।···এখন মনে হইতেছে যে, কোনদিন কোনকালেও দেখা হইবে কিনা। একবার আশুর সহিত ও একবার একাই তোমাদের বাড়ীতে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলাম, কিন্তু কি রকম লজ্জা লজ্জা করিতে লাগিল—আর গেলাম না।

পুঁটু বড় হতভাগ্য জীবন আমার। এমন অর্থহীন নিষ্ফল নিরস দিন, মাস ও বৎসরের সমষ্টি যে কেন বহিয়া বেড়াইতেছি, কিছুতেই ভাবিয়া পাই না। ভগবান বুদ্ধি যদি দিয়াছিলেন, একটু সুবুদ্ধি দিলেই ত পারতেন! যদি না দিলেন ত এত ভালবাসিতে শিখাইয়াছিলেন কেন? ভালবাসিবার একটি মাত্র পাত্র আমাকে দিলেই কি এই বিশ্বরাজ্যে তাঁহার লোকের অভাব ঘটিত! জানি না কেমন বিচার!

বুঝিতে পারি যে আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব সকলেরই আমি ঘৃণার পাত্র। এ বোঝা যে কত মর্মান্তিক তাহা বলিলে লোকে বিশ্বাস করিবে না।···কিন্তু পুঁটু সমস্তটাই কি আমার নিজের হাতে গড়া? আমার ঘুড়ির নীচে ভার নাই, আমার তীরের মাথায় ফলা নাই, আমার নৌকায় হাল নাই—এখন সোজা চলিতেছি না বলিয়া যে ধিক্কার দিয়া দুহাত দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছ, তাহার সবটাই কি আমার দোষে?···

আমাকে একছত্র লিখিয়া পাঠাইলেই কি তোমরা পতিত হইতে? এত দূরে থাকিয়া তোমাদের কাহারো কোন ক্ষতি করিতে পারিব না।···

একদিন তো তোমরা আমাকে ভালবাসিয়াছিলে—আজ আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি এ চিঠির জবাব দিয়ো ভাই! চিরদিনই বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি, জানি না তুমি ও বুড়ি কোনদিন আমার প্রতি বিমুখ হইবে না—আমার এ বিশ্বাস ভাঙ্গিয়ো না। মিথ্যা যদিই বা হয়, ক্ষতি কি? যে মিথ্যা কাহারো কোন ক্ষতি করিবে না, অথচ একজনকে আশ্রয় দিবে, নৈতিক

অবনতি যে তাহাতে কতখানি মাপিয়া দেখিবার শিক্ষা আমার নাই, কিন্তু দয়ামায়া ও স্নেহের স্বর্ণাঙ্গে একতিল আঁচড়ও লাগিবে না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি।

মনে করিও না, আমি কাহারো কোন সংবাদ রাখি না। ছাপার অক্ষরে পাই। হাতের লেখা না-ই বা হইল, আমাকে বিশেষ করিয়া নাই বলিল, সকলেই যাহা পায়, কৃতজ্ঞতার সহিত আমিও তাহা গ্রহণ করি। তুমি লেখ না—তবুও নিজের মনের ভিতর দিয়া অনুভব করি তুমি সুস্থ নির্বিঘ্ন আছ। বুড়ির সংবাদও পাই, মনে মনে কত যে আশীর্বাদ করি, কত গৌরব অনুভব করি, তাহা আমিই জানি। সে যাহা লেখে একটুখানি অংশ আমি মনে মনে আদায় করিয়া নদীর ধারে জেটির উপর বসিয়া পরিপাক করি এবং কামনা করি যেন বাঁচিয়া থাকিয়া বিশেষ একটু ভাল জিনিসের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারি।

না জানি বুড়ির খাতাখানি আজকাল কত মোটা হইয়াছে। একবার পড়িতে এমনি ইচ্ছা করে। আচ্ছা কাটাকুটি করা এমনি 'রাফ্ কপি' একটা কিছু নাই কি? চুপিচুপি চুরি করিয়া একটি বার যদি পাঠাইতে পার, আমি তিন চার দিনের মধ্যেই রেজিস্ট্রি করিয়া ফিরাইয়া দিব। যদি নিতান্তই খোঁজ খবর করে, বলিয়ো একজন পড়িতে লইয়াছে। সে বেচারা ভাল মানুষ, অত পীড়াপীড়ি হয়ত করিবে না।"

শরৎচন্দ্র এই চিঠিতে লিখেছিলেন—কলকাতায় গিয়ে তোমাদের বাড়ী যেতে উদ্যত হয়েছিলাম, কিন্তু কি রকম লজ্জা লজ্জা করতে লাগল—আর গেলাম না।

শরৎচন্দ্র ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় এসে বহরমপুরে বিভূতিবাবুদের বাড়ীতে যেতে লজ্জা লজ্জা বোধ করলেও, পরের বাবে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রেঙ্গুন থেকে এসে বহরমপুরে বিভূতিবাবুদের বা নিরুপমা দেবীদের বাড়ীতে গিয়ে কয়েক দিন ছিলেন।

এই চিঠিতেই শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে এক রজক কন্যার সহিত তাঁর আঠার মাস ব্যাপী দাম্পত্য-প্রেমচর্চার এক কাহিনী বলেছেন।

শরৎচন্দ্র বিভূতিবাবুকে এই চিঠিটি লিখবার সময় নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন—এ চিঠির কাহিনী নিরুপমা দেবীও তাঁর দাদার কাছ থেকে অবশ্যই শুনবেন।

এই ভেবেই কি শরৎচন্দ্র বিশেষ করে নিরুপমা দেবীকে জানাবার জন্যই— সত্যই হোক্ আর মিথ্যাই হোক্, নিজের ঐ রজক কন্যার সহিত দাম্পত্য-প্রেমচর্চায় কাহিনীটি লিখেছিলেন ? নিরুপমা দেবীকে জানাবার জন্য তখন কি শরৎচন্দ্রের মনের ভাব এই হয়েছিল যে, তোমার কাছে ব্যর্থ হওয়ার জন্যই আজ আমার এই দশা !

শরৎচন্দ্র তাঁর এই চিঠিতেই অবশ্য নিজেই পরিষ্কারভাবে বলেছেন—"এখন সোজা চলিতেছি না বলিয়া যে ধিক্কার দিয়া দু হাত দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছ, তাহার সবটাই কি আমার দোষে ?"

এবার নিরুপমা দেবীর জন্য শরৎচন্দ্রের একটি বড় ত্যাগের কাহিনী আমি যা জানি, এখানে তা বলছি। সে কাহিনীটি এই :—

নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্রের 'শুভদা' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি একবার পড়েছিলেন। ফলে শুভদার প্রভাব তাঁর প্রথম বয়সের লেখা অন্নপূর্ণার মন্দির উপন্যাসে বিশেষভাবে পড়ে। এ সম্বন্ধে ১৩৪০ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'জয়শ্রী' পত্রিকায় নিরুপমা দেবী নিজেই লিখেছেন—

"তবে একটা কথা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে গল্পটি (অন্নপূর্ণার মন্দির) লিখিতে গিয়া অলক্ষ্যে শরৎদার শুভদার আভাষ যে গল্পের মধ্যে আসিয়া গিয়াছে, ইহা খুবই সত্য।"

অন্নপূর্ণার মন্দির প্রকাশিত হলে, শরৎচন্দ্র বইটি পড়ে দেখেন যে, তাতে তাঁর শুভদা উপন্যাসের কাহিনীর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

শুভদা প্রকাশিত হলে, পাছে নিরুপমা দেবী হেয় হয়ে পড়েন, এই ভেবে শরৎচন্দ্র তাঁর শুভদা উপন্যাস ছাপলেনই না। তবে পাণ্ডুলিপিটি নষ্ট না করে রেখে দিলেন, এই আশায় যে, অবসর পেলে পরে গল্পটিকে বদলে আবার নতুন করে লিখবেন। শুভদার পাণ্ডুলিপি দীর্ঘকাল পড়ে রইল। শরৎচন্দ্রের অবসর আর হয়ে উঠল না। তখন শরৎচন্দ্র শেষ বয়সে একদিন ওটিকে আর না রেখে পুড়িয়ে ফেলাই ঠিক বলে মনস্থ করলেন।

শরৎচন্দ্র ঐ সময় তাঁর হাওড়া জেলার সামতাবেড়ের বাড়ীতে থাকতেন। একদিন তিনি তাঁর ভাগ্নে (তাঁর দিদি অনিলা দেবীর মেজ দেওরের ছেলে। ইনি শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে থেকে লেখাপড়া শিখতেন) রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে বহু পুরাতন কাগজপত্রের সহিত শুভদার পাণ্ডুলিপিটি পোড়াতে দিলেন।

শুভদা বইটি একটি সুন্দর বাঁধানো মোটা খাতায় লেখা ছিল। ঐরূপ একটি সুন্দর খাতায় লেখা পাণ্ডুলিপি দেখে রামকৃষ্ণবাবু শরৎচন্দ্রকে বললেন—এটা কেন পোড়াতে দিচ্ছেন?

উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন—ওটাকে পুড়িয়ে ফেলতেই হবে। আমার ও বই বেরোলে, একজন অত্যন্ত হেয় পড়বেন।

রামকৃষ্ণবাবু কিন্তু কাগজ পোড়াবার সময় শুভদার পাণ্ডুলিপিটি না পুড়িয়ে এক ফাঁকে সেটিকে সরিয়ে রাখলেন এবং পরে সেটি এনে শরৎচন্দ্রেরই একটি আলমারির বইয়ের পিছনে লুকিয়ে রাখলেন।

শরৎচন্দ্র এর কিছুই জানতে পারলেন না। তিনি বরং রামকৃষ্ণবাবু কাগজ পুড়িয়ে ফিরলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কিরে সেই মোটা খাতাটা পুড়িয়েছিস্ তো?

উত্তবে রামকৃষ্ণবাবু বলেছিলেন—হ্যাঁ।

শরৎচন্দ্রের কাছে যে তাঁব বাল্য-রচনা 'শুভদা' নামে একটি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি আছে, এ কথা তাঁর বন্ধুদের কেউ কেউ জানতেন। শরৎচন্দ্রের বন্ধুরা শুভদার পাণ্ডুলিপিটি পডবার জন্য শবৎচন্দ্রকে খুবই পীড়াপীড়ি করতেন। শরৎচন্দ্র কিন্তু কাউকেই পাণ্ডুলিপিটি দেখান নি। শরৎচন্দ্রের স্নেহভাজন বন্ধু বাতায়ন-সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল এই সময় শুভদার পাণ্ডুলিপিটি পড়বার জন্য খুব জেদ করেন। শরৎচন্দ্র তখন তাঁকে খানিকটা পোড়া ছাই দেখিয়ে ছিলেন। এ সম্বন্ধে অবিনাশবাবু লিখেছেন—

"শুভদা সম্পর্কে আমাব সঙ্গে তাঁর যে নাটকীয় ঘটনা ঘটেছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ না দিয়ে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, শুভদার পাণ্ডুলিপি শোনাবার জন্য আমার পীড়াপীড়িতে তিনি শেষ পর্যন্ত আমাকে পড়তে দিতে রাজী হয়ে আমাকে সামতাবেড়ে যাবার জন্যে একটি দিন নির্দেশ করে দেন। নির্দিষ্ট দিনে আমি যখন উপস্থিত হলুম, তখন তিনি অতি বিমর্ষভাবে বললেন —অবিনাশ, সব শেষ হয়ে গেছে! তিনি এমনিভাবে কথাগুলি বললেন, যেন আমি তাঁর কোন রুগ্ন পুত্রকে দেখতে গেছি, যার মৃত্যু সংবাদটি তিনি আমাকে শোনালেন। এই বলেই তিনি পাশের ঘর থেকে একটি বিস্কুটের টিনে খানিকটা কাগজ পোড়া এনে আমাকে বললেন—পাছে তুমি অবিশ্বাস কর, তাই শুভদার পাণ্ডুলিপির পোড়া ছাই তোমার জন্যে রেখে দিয়েছি। এরপর আমার আর কি বলবার থাকতে পারে! কিন্তু এই ব্যাপারটি যে

মিথ্যা, তা এখন বেশ বোঝা গেছে। কিন্তু প্রশ্ন এই, কেন শুভদা তিনি তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশ করেন নি, আর কেনই বা এ পাণ্ডুলিপি তিনি কাউকে পড়তে দিতে চান নি। তাঁর নিজের মুখেই শুনেছি, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের (গুরুদাস কোং) শত অনুরোধেও তিনি এ পাণ্ডুলিপি তাঁকে দেখান নি। কেন? কিসের জন্য শুভদা সম্পর্কে তাঁর এ মনোভাব ছিল? শরৎচন্দ্রের ভবিষ্যৎ জীবনীকারদের নিকট থেকে এ প্রশ্নের উত্তরের আশায় রইলুম।"

শরৎচন্দ্র শুভদা ছাপানো তো দূরের কথা পাণ্ডুলিপিটি পর্যন্ত কেন যে কাউকেও পড়তে দিতেন না, আশা করি অবিনাশবাবু এখানে তার উত্তর পেলেন।

শরৎচন্দ্র ঐ সময়েই 'ছোটদের মাধুকরী' নামক একটি পত্রিকায় 'বাল্যস্মৃতি' নাম দিয়ে এক প্রবন্ধে লেখেন—

"ছেলেবেলার লেখা কয়েকটা বই আমার নানা কারণে হারাইয়া গেছে। সবগুলার নাম আমার মনে নাই। একখানা 'অভিমান', মস্ত মোটা খাতায় স্পষ্ট করিয়া লেখা, অনেক বন্ধু বান্ধবের হাতে হাতে ফিরিয়া অবশেষে গিয়া পড়িল বাল্যকালের সহপাঠী কেদার সিংহের হাতে। কেদার অনেক দিন ধরিয়া অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু ফিরিয়া পাওয়া আর গেল না। এখন তিনি ঘোরতর তান্ত্রিক সাধুবাবা! বইখানা কি করিলেন, তিনিই জানেন— কিন্তু চাইতে ভরসা হয় না। তাঁর সিঁদুর মাখানো মস্ত ত্রিশূলটার ভয় করি! এখন তিনি নাগালের বাইরে, মহাপুরুষ, ঘোরতর তান্ত্রিক সাধুবাবা!

দ্বিতীয় 'শুভদা'; প্রথম যুগের লেখা ওটা ছিল আমার শেষ বই অর্থাৎ বড়দিদি, চন্দ্রনাথ, দেবদাস প্রভৃতির পরে।" (ছোটদের মাধুকরী, আশ্বিন ১৩৪৫)

এই লেখার কিছুদিন পরেই কিন্তু শরৎচন্দ্র একদিন সামতাবেড়ের বাড়ীতে আলমারির বই ঘাঁটতে গিয়ে হঠাৎ শুভদার পাণ্ডুলিপিটি দেখতে পেলেন। দেখে বুঝলেন, রামকৃষ্ণবাবু সেদিন তাঁর কাছে মিথ্যা কথা বলেছিলেন এবং পাণ্ডুলিপিটি না পুড়িয়ে এইখানে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

শুভদার পাণ্ডুলিপি পোড়ানোর ব্যাপারে রামকৃষ্ণবাবুর মিথ্যা কথাটা যে শরৎচন্দ্র জানতে পেরেছেন, এটা রামকৃষ্ণবাবুকে জানাবার জন্যই শরৎচন্দ্র

একদিন আলমারির যে জায়গায় পাণ্ডুলিপিটি লুকানো ছিল, সেখান থেকে খানকতক বই রামকৃষ্ণবাবুকে নামিয়ে আনতে বললেন।

রামকৃষ্ণবাবু বলেন—মামা হঠাৎ ঐখান থেকে খানকতক বই আনতে বলায় আমি বুঝতে পারলাম, তিনি নিশ্চয়ই শুভদার পাণ্ডুলিপিখানা ঐখানে দেখেছেন, এবং আমি যে মিথ্যা কথা বলেছি, সে বিষয়ে আমাকে শিক্ষা দেবার জন্যই ঐরূপ বলছেন। মামার কথা শুনে ভয়ে আমার বুক কাঁপতে লাগল। যাই হোক্, বই নামিয়ে দিয়েই আমি সেখান থেকে সরে পড়লাম। এই ঘটনার পর কয়েকদিন আমি মামার সামনে যেতে সাহস করতাম না।

শরৎচন্দ্র কি ভেবে পাণ্ডুলিপিটি আর পোড়ালেন না, বা নষ্ট করলেন না—রেখেই দিলেন। হয়ত ভেবেছিলেন, যখন পাণ্ডুলিপিটা রক্ষা পেয়েই গেল, তখন থাক্, পরে পারি তো নতুন করে লিখব। কিন্তু সে আর হয়ে ওঠে নি। তাঁর মৃত্যুর পরে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স এ বইটি প্রকাশ করেন।

নিরুপমা দেবীর উপর শরৎচন্দ্রের দুর্বলতা এবং তাঁর জন্য শরৎচন্দ্রের একটা বড় ত্যাগের কথা (শুভদা পোড়াতে দেওয়া) জানা গেল। এখন দেখা যাক্, নিরুপমা দেবীর উপর শরৎচন্দ্রের এই দুর্বলতার কথা নিরুপমা দেবী জানতেন কিনা, এবং শরৎচন্দ্রের উপর নিরুপমা দেবীর কোন দুর্বলতা ছিল কিনা!

এ কথা অনুমান করা যেতে পারে যে, নিরুপমা দেবীর প্রতি শরৎচন্দ্রের ব্যবহারে এবং তাঁকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র থেকে, তাঁর উপর শরৎচন্দ্রের দুর্বলতার কথা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। এ ব্যাপারে মেয়েরা অতি সহজেই পুরুষের হাবভাব দেখে, তার মনের ভাব বুঝে নিতে পারে। আর নিরুপমা দেবী তো গল্প উপন্যাস লেখিকা হিসাবে মানুষের চরিত্র ও মন নিয়েই মাথা ঘামাতেন, অতএব তাঁর পক্ষে শরৎচন্দ্রের হাবভাব দেখে তাঁর উপর শরৎচন্দ্রের মনের ভাব বুঝে নেওয়া অতি সহজ ছিল।

সর্বোপরি সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এবং সতীশচন্দ্র সিংহের বর্ণিত নিরুপমা দেবীকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠির কথা সত্য হলে, নিরুপমা দেবী তো তাঁর উপর শরৎচন্দ্রের মনের ভাব পরিষ্কারই জানতেন।

এ সম্বন্ধে আরও একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। নরেন্দ্র দেব বলেন—নিরুপমা দেবীর মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী একবার বৃন্দাবনে গেলে, সেখানে নিরুপমা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। (নিরুপমা দেবী শেষ

জীবনে বৃন্দাবনে বাস করতেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।) সেদিন তখন তাঁদের মধ্যে কথা-প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের কথা উঠলে, নিরুপমা দেবী নরেনবাবুদের বলেছিলেন—'শরৎদার যে বাউণ্ডুলে দশা হয়েছিল, সে শুধু আমারই জন্য।'

এবার দেখা যাক্, নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্রের মনের কথা জানায়, শরৎচন্দ্রের প্রতি তাঁর মনে কোন দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল কিনা?

নিরুপমা দেবী ছিলেন সেকালের বিধবা। তাই তিনিও সেকালের হিন্দু বিধবাদের ন্যায়, হিন্দু বিধবার আদর্শে ও সংস্কারে অতি নিষ্ঠাবতী ছিলেন। সে যুগে বিধবা-বিবাহ কিছু কিছু চালু হলেও অধিকাংশ হিন্দু বিধবার ন্যায়ই তাঁরও বিশ্বাস ছিল যে, বিধবার আর বিয়ে হতে পারে না। সেকালের বিধবাদের বিশ্বাস ছিল, তাঁদের ভাগ্য যখন পুড়েছে, সেই পোড়া ভাগ্য নিয়েই বাকিটা জীবন কাটিয়ে দিতে হবে।

নিরুপমা দেবী একদিকে প্রাচীন হিন্দু বিধবার আদর্শে ঘোরতর বিশ্বাসী, অপর দিকে তিনি তাঁর উপর শরৎচন্দ্রের মনের কথাও জেনেছেন, তাই পাছে তাঁর মনে কোনও দুর্বলতার প্রশ্রয় পায়, এই জন্যই হয়ত তিনি ঘোরতর জপতপ পরায়ণা ও কঠোর ব্রতচারিণী হয়ে উঠেছিলেন। এবং ব্রত ও জপতপের দুর্ভেদ্য প্রাচীরে তিনি দুর্বলতার প্রবেশ একেবারেই রোধ করে দিয়েছিলেন।

নারী-চরিত্রের রহস্যজ্ঞাতা শরৎচন্দ্র যে নিরুপমা দেবীর মনের অবস্থা বুঝতেন, তা অতি সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। সেই জন্যই বোধ হয় নিরুপমা দেবীর এই কঠোর জপতপের কথা উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র একবার লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন—

"বুড়ির ওপর আমার ভারি আশা ছিল, কিন্তু সে ঐ একটা 'দিদি' ছাড়া আর কিছুই লিখতে পারলো না। কেন জানো? বার-ব্রত, জপতপ ইত্যাদি জ্যাঠামির আগুনে ভিতরে তার যা-কিছু মধু ছিল, সব বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে গেল। অবশ্য আতিশয্যের জন্যেই, না হলে আমাদের ঘরের কোন্ মেয়ে আর এ-সব ব্যাপার কিছু কিছু না করে?"

নিরুপমা দেবী যে অত্যন্ত জপতপ পরায়ণা ও আচার-নিষ্ঠাবতী ছিলেন, এ কথা অনেকেই বলে থাকেন। নিরুপমা দেবীর আচার-নিষ্ঠা সম্বন্ধে

শরৎচন্দ্রের বন্ধু এবং অনুরূপা দেবীর মাসতুতো ভাই সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বলেন—অনুরূপা দিদির বান্ধবী বলে আমি নিরুপমা দেবীকে দিদি বলতাম। ঐ নিরুপমা দিদি একবার আমাদের কলকাতার বাড়ীতে এসেছিলেন। আমরা যদিও ব্রাহ্মণের আচার-নিষ্ঠা এবং বাছ-বিচার যথাসম্ভব মেনে চলি, তবুও তিনি আমাদের বাড়ীতে এসে, ধোয়া রান্নাঘর আবার নিজের হাতে গোবর দিয়ে নিকিয়ে নিলেন। বাসন-কোসনও আবার নিজের হাতে ধুয়ে, তাতে রান্না করে তবে খেলেন।

নিরুপমা দেবীর মনের অবস্থা যে শরৎচন্দ্র জানতেন, তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। এই জন্যই হয়ত শরৎচন্দ্র রাধারাণী দেবীকে একবার এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

"তোমরা—এই মেয়েরা—তোমাদের আজও ঠিক চিনে উঠতে পারলুম না। নিজের জীবনের অতি কঠিন ও গভীর বেদনায় এই অভিজ্ঞতাই মাত্র সঞ্চয় করতে পেবেচি রাধু।...নিজের জীবনকে ফোঁটায় ফোঁটায় গলিয়ে নিঃশেষে নীরবে দগ্ধ করে যে-অভিজ্ঞতা বাস্তব থেকে আহরণ করেছি; এখন মনে হয়, আমার সাহিত্যেও হয়ত সেইটাই ফুটে উঠেছে বারংবার, আমার জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারেও। আর এটা অত্যন্ত অকৃত্রিম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই বোধ হয়, এত সহজে ছোট বড় সবাইকার কাছে আবেদন পেয়েছে।

আমার কি মনে হয় জানো? আমরাই যে শুধু তোমাদের চি ন উঠতে পারলুম না তা নয়, তোমরা নিজেরাও বোধ হয় নিজেদের ঠিক চিনে উঠতে পারো না, অথবা নিজেকে চিনতে ভয় পাও। হয়তো এমনও হতে পারে, চিনেও সহজে তাকে স্বীকার করে নিতে চাও না। এও কিন্তু আমার কাল্পনিক ধারণা নয়, সত্যিকারের অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত ধারণা, সুতরাং এর মূল্য উড়িয়ে দেবার নয়।

আজ এই পর্যন্ত। সাক্ষাতে এ বিষয়ে আলোচনার ইচ্ছা রইল।"

শরৎচন্দ্র রাধারাণী দেবীকে এই যে লিখেছিলেন, যে অভিজ্ঞতা বাস্তব থেকে আহরণ করেছি, আমার সাহিত্যেও হয়ত সেইটাই ফুটে উঠেছে বারংবার আমার জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারেও।

শরৎচন্দ্র তাঁর নিজের জীবনের অতি কঠিন ও গভীর বেদনায় ঐ অভিজ্ঞতা

সঞ্চয় করেছিলেন। তাঁর অত্যন্ত বেদনায় বাস্তব থেকে আহরণ করা এই অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যে কোথায় কিভাবে ফুটে উঠেছে, এখন দেখা যাক্—

শরৎচন্দ্রের যে উপন্যাসে তাঁর নিজের জীবনের বহু ঘটনা রয়েছে, সেই শ্রীকান্ত উপন্যাসের কথাই প্রথমে ধরা যাক্। শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মী চরিত্রে আমরা দেখি, বিধবা রাজলক্ষ্মী প্রাচীন হিন্দু বিধবার সংস্কারে অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী। তাই সে বাইজী হয়েও শ্রীকান্তের সঙ্গে মিলিত হতে পারে নি। আর তার এই মনের ক্ষুধাকে সে ধর্মকর্ম ও জপতপের দ্বারাই দমন করেছে এবং তার মনকে ঐ দিকেই সে নিবিষ্ট থেকে নিবিষ্টতর করেছে।

আমার মনে হয়, শরৎচন্দ্র তাঁর রাজলক্ষ্মী চরিত্রের কল্পনায় নিরুপমা দেবীর গৃহীত একদিকে হিন্দু বিধবার আদর্শে নিষ্ঠা, অপরদিকে জপতপের প্রাধান্য, এইটাই দেখিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে একবার লিখেছিলেন—

"আমার সকল বই আপনি পড়িয়াছেন কিনা জানি না। পড়িয়া থাকিলে নিশ্চয়ই অন্ততঃ এই ব্যাপারটা চোখে পড়িয়াছে যে, অনেকগুলি বড় এবং সুন্দর জীবন শুধু বিধবা বিবাহ সমাজে না থাকার জন্যই চিরদিনের জন্য ব্যর্থ নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। ইহার অধিক নিজের সম্বন্ধে বলিবার আমার নাই।"

শরৎচন্দ্রের সময়ে হিন্দু সমাজে যে বিধবা বিবাহ ছিল না তা নয়। তবে এ কথা ঠিক যে, তার বহুল প্রচলন ছিল না। কিন্তু তাই বলে, শরৎচন্দ্র তাঁর গ্রন্থগুলির একটিতেও বিধবা বিবাহ দেখালেন না কেন? এখানেও আমার মনে হয়, তাঁর নিজের জীবনের ঐ বেদনার অভিজ্ঞতাকেই তিনি তাঁর সাহিত্যে জ্ঞাতসারেই ফুটিয়ে রেখে গেছেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর পল্লী-সমাজের রমা ও রমেশের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন—

"রমার মত নারী এবং রমেশের মত পুরুষ কোন কালে কোন সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দু সমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হ'ল এই যে, এতবড় দুটি মহাপ্রাণ নরনারী এ জীবনে বিফল, ব্যর্থ, পঙ্গু হয়ে গেল।"

শরৎচন্দ্রের 'পল্লী-সমাজ' (১৩২৩) লেখার ৪৩ বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র

'বিষবৃক্ষ' (১২৮০) লিখে বিধবা বিবাহ দেখিয়ে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক রমেশচন্দ্র দত্তও তাঁর উপন্যাসে এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষও তাঁর নাটকে বিধবা বিবাহ দিয়েছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সময়ে বিধবা বিবাহ অনেকাংশে চালু হওয়া সত্ত্বেও তিনি রমা-রমেশের বিবাহ না দিয়ে বলেছেন—হিন্দু সমাজে এ সমাধানের স্থান না থাকায় এতবড় দুটি নর-নারীর জীবন ব্যর্থ, পঙ্গু হয়ে গেল।

শরৎচন্দ্রের এইরূপ কথা বলার মধ্যেও মনে হয়, তাঁর নিজের ঐ গভীর বেদনার কথাই তাঁর জ্ঞাতসারেই উচ্চারিত হয়েছে।

নিরুপমা দেবীর প্রতি শরৎচন্দ্র আকৃষ্ট হলেও, বিধবা নিরুপমার সহিত তাঁর বিবাহে তখন একাধিক বাধা ছিল। যথা—

প্রথমতঃ—তখন অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিধবা বিবাহ চালু হলেও, অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবার আবার এই বিধবা বিবাহকে নিন্দার চোখে দেখতেন। নিরুপমা দেবীর পিতা এই শেষোক্ত দলের ছিলেন বলেই মনে হয়। তা না হলে তিনি মাত্র ১৪ বৎসর বয়স্কা বিধবা কন্যার পুনরায় বিবাহের চেষ্টা করলেন না কেন? দ্বিতীয়তঃ—নিরুপমা দেবীর পিতা ছিলেন ধনী, আর শরৎচন্দ্রের পিতা ছিলেন একেবারেই নিঃস্ব। তৃতীয়তঃ—শরৎচন্দ্র এবং নিরুপমা দেবী উভয়েই ব্রাহ্মণ পরিবারের হলেও, শরৎচন্দ্র ছিলেন রাঢ়ী শ্রেণীভুক্ত আর নিরুপমা দেবী ছিলেন বৈদিক শ্রেণীভুক্ত। সেকালে রাঢ়ী-বৈদিকে বিবাহ হ'ত না। এমন কি আজও রাঢ়ী-বৈদিকের ছেলেমেয়েরা পরস্পর ভালবেসে বা প্রেমে পড়ে বিবাহ না করলে, অভিভাবকরা দেখেশুনে বিবাহ দিতে গেলে রাঢ়ী-বৈদিকে বিবাহ দেন না।

শরৎচন্দ্র তাঁর দেবদাস প্রভৃতি কয়েকটি উপন্যাসে পরস্পর প্রণয়মুগ্ধ নায়ক-নায়িকার মধ্যে ব্রাহ্মণ সমাজের এই উঁচুঘর ও নীচুঘর এবং আর্থিক অবস্থার তারতম্য দেখিয়ে, মিলনে ব্যর্থতা চিত্রিত করেছেন। এ ক্ষেত্রেও হয়ত তিনি তাঁর নিজের জীবনের বেদনার অভিজ্ঞতাই ফুটিয়েছেন।

নিরুপমা দেবী যে বলেছিলেন—'শরৎদার যে বাউণ্ডুলে দশা হয়েছিল, সে শুধু আমারই জন্যে।'

শরৎচন্দ্র যে তাঁর দেবদাসের মতই অল্পবয়সে মদ ধরেছিলেন এবং অনেকদিন উচ্ছৃঙ্খল জীবন কাটিয়েছিলেন, সে শুধু তাঁর এই প্রথম-প্রণয়ের ব্যর্থতার জন্যই বলে মনে হয়।

নিরুপমা দেবীর কথা ইঙ্গিত করে শরৎচন্দ্র রাধারাণী দেবীকে যে লিখেছিলেন—

"...লেখবার কত বড় বৃহৎ অংশই না অলিখিত রয়ে গেল। পরলোকে বাণীর দেবতা যদি এই ত্রুটির জন্যে কৈফিয়ৎ তলব করেন ত তখন আর একজনকে দেখিয়ে দিতে পারবো, এই আমার সান্ত্বনা।"

ঐ 'একজন' অর্থাৎ নিরুপমা দেবীর সহিত শরৎচন্দ্রের মিলিত জীবন-যাপনের যদি কোন সুযোগ হ'ত, তাহলে তাঁর লিখবার বৃহৎ অংশটা আর অলিখিত থাকত না। সে সুযোগ হলে একদিকে তিনিও যেমন আরও বড় সাহিত্যিক হতে পারতেন, দেশবাসীও তেমনি তাঁর অলিখিত বৃহৎ অংশটা পেয়ে উপকৃত হ'ত।

শেষ বয়সে বন্ধুমহলে কোন সাহিত্যের আড্ডায় কখনও কথা-প্রসঙ্গে নিরুপমা দেবীর কথা উঠলে, শরৎচন্দ্র চুপ করে থাকতেন। আর যদিও বা তিনি নিরুপমা দেবীর সম্বন্ধে কিছু বলতেন, তো অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিতই তাঁর নাম উচ্চারণ করতেন।

অপরপক্ষে নিরুপমা দেবীও, দাদাদের বন্ধু এবং নিজের প্রথম সাহিত্য-সাধনার দিনের গুরুস্থানীয় বলে কি মুখে আর কি লিখে সর্বত্রই বরাবর শরৎচন্দ্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছেন। ১৩৩৫ সালের ৩১শে ভাদ্র তারিখে শরৎচন্দ্রের ৫৩তম জন্মদিবসে কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে দেশবাসী শরৎচন্দ্রকে যে সম্বর্ধনা জানায়, সেই সম্বর্ধনা সভায় গাইবার জন্য নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ একটি গান রচনা করে দিয়েছিলেন। সেই গানের আরম্ভটা উদ্ধৃত করেই এ প্রসঙ্গ শেষ করছি। গানের আরম্ভটা ছিল এই—

তুমি যে মধুকর
কমল বনে।
আহরি আন মধু
আপন মনে॥

পরিশিষ্ট

কয়েকটি টুকরো লেখা

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর কিছুদিন পরে তাঁর ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের একটি ছোট খাতা পান। খাতায় ঠিক লেখা বলতে যা বোঝায়, তেমন কোন লেখা ছিল না। তবে কয়েক লাইন করে কয়েকটা টুকরো টুকরো লেখা খাতার মধ্যে ছড়িয়ে ছিল। তাও আবার অধিকাংশ লেখাই ছিল, আরম্ভ আছে তো শেষ নেই, শেষ আছে তো আরম্ভ নেই, গোছের। লেখাগুলি পেন্সিলে ও কালিতে দু রকমই ছিল। ঐ খাতার স্থানে স্থানে শরৎচন্দ্র পেন্সিলে ছবি আঁকবারও চেষ্টা করেছিলেন। মোটের উপর সময় কাটাবার ছলেই ঐ খাতার পাতাগুলি ভরে উঠেছিল।

শরৎচন্দ্র গল্প-উপন্যাস লিখবার সময় প্রায়ই হাতের কাছে এই রকম একটা খাতা বা আলাদা কাগজ রাখতেন। লেখার ফাঁকে ফাঁকে তিনি ঐ খাতায় বা কাগজে ছবি আঁকবার চেষ্টা করতেন ও আবোল-তাবোল লিখতেন। কখনো হয়ত অকারণে নিজের নামটাই বারে বারে লিখতেন। আসলে মনটাকে হাল্কা করে নেবার জন্যই তখন ঐরূপ করতেন।

ঐ সময়েই তাঁর হাত থেকে দু-চারটা টুকরো লেখাও বেরিয়ে যেত। প্রকাশবাবুর পাওয়া খাতাটির মধ্যে ঐরূপ কয়েকটি লেখা দেখা গিয়েছিল। সেই লেখাগুলি সংখ্যা দিয়ে পর পর এখানে দিলাম—

১। বিদ্যা বা লেখাপড়া শেখার ফলে 'স্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লিভিং'-এর 'স্ট্যাণ্ডার্ড' বাড়বেই এবং 'ইকনমিক্ কণ্ডিশন' ভালো না হ'লে পারিবারিক অসন্তোষ বাড়বেই।

২। 'ইকনমিক্' অবস্থা বাড়াবার উপায় একমাত্র শিক্ষিত পুরুষদের 'ইণ্ডাস্ট্রি' গ'ড়ে তোলা। ছোট দোকান করবার শিক্ষা ছেলেবেলা থেকে শিখতে হয়। বি-এ পাস করার পরে ও জিনিস চলে না, ওখানে অশিক্ষাই বরং কাজের।

৩। জাতের ছোট-বড় ভাঙ্গার চেষ্টা করতে হবে।

৪। মুষ্টিমেয় সমাজের মধ্য থেকে মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী ভদ্র সন্তানের অপরিসীম 'স্যাক্রিফাইস্' কাজে লাগে না। এই মুষ্টিমেয় লোকগুলি যদি

সমাজের সর্বস্তরের মধ্যে কথে আসতো, সমস্ত সমাজের সঙ্গে তার নাড়ীর যেগা থাকতো।

৫। 'পারমানেণ্ট সেটেল্‌মেণ্ট'-এর জন্যই জমিদার। তালুকদার ও অসংখ্য মধ্যবিত্ত 'মিড্‌লম্যান' সমস্ত সমাজের 'ইকনমিক্' অবস্থাকে বাড়তে দেয় নি—কেবলমাত্র জমি আঁকড়ে থেকে শুধু কৃষকরাই যা কিছু দেশের 'ওয়েলথ্' সৃষ্টি করছে। বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে 'পারমানেণ্ট সেটেল্‌মেণ্ট' না থাকার জন্যই ওদেশে 'ইণ্ডাস্ট্রি'র উন্নতি হচ্ছে। জমি কেনা ও বেশী সুদে লগ্নি কারবার করা হচ্ছে বাঙ্গলার ধনী হবার একমাত্র পন্থা।

৬। কলেজের মেয়ে,—বই মুখস্থ করে, আর পরীক্ষা পাস করার চেষ্টায় ক্রমাগত রাত্রি জাগরণে শরীর-স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে যায়—আর সব লাকসানই পূরণ হ'তে পারে, কিন্তু যে সন্তান এদের জন্মাবে সে চিররুগ্ন হয়েই থাকবে।

৭। সহজ বুদ্ধিই দুনিয়ায় সবচেয়ে অ-সহজ।

৮। বিশেষ কাজের বিশেষ ধারা পৌনঃপুনিক ব্যবহারে দাঁড়ায় মানুষের অভ্যাসে। সেই ব্যষ্টির অভ্যস্ত কাজ ব্যাপ্ত হয়ে সমষ্টিতে ছড়িয়ে পড়ে তখনই সে হয় আচার।

৯। আমাদের পূর্বপুরুষেরও পূর্বে যাঁরা, তাঁরা চিন্তা এবং বুদ্ধি দিয়ে দেখিয়েছিলেন, বহু ক্লেশসাধ্য কাজের পরিণাম মঙ্গলময়।

১০। আচার-বিচার কথাটা এক নিঃশ্বাসেই বলি বটে, কিন্তু আচার জিনিসটা বুদ্ধি দিয়ে প্রবর্তিত হয় নি, তাই যুক্তি দিয়েও এর পরিবর্তন হয় না।

১১। অদৃষ্ট জিনিসটাই চিরদিন জীবনসংগ্রাম ও ধর্মের মাঝে অচ্ছেদ্য ও অফুরন্ত সেতুর শিকলের মতো জুড়ে আছে।

১২। দৃশ্যমান সকল বস্তুরই আরম্ভটা অজ্ঞেয়তত্ত্বে অদৃশ্য হয়েছে।

১৩। ধর্মনিষ্ঠা অক্ষুন্ন রাখতে হ'লে ধর্মের বই কত পড়তে হয়। সমাজের উন্নতি করতে হ'লে সমাজ সম্বন্ধে কত অভিজ্ঞতা দরকার। তার সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করতে নেই। ('বাতায়ন', ১৩৪৫)

শরৎচন্দ্র গল্প লিখতে আরম্ভ করে এক-আধ পাতার বেশী লেখেন নি, এমন দু একটা টুকরো লেখা উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে আজও (এই লেখার সময়) রয়েছে।

প্রশংসাপত্র

শরৎচন্দ্র কারো কারো বই পড়ে ভাল লাগলে প্রশংসাপত্রও লিখে দিতেন। যেমন, নিজের বন্দী জীবনের কাহিনী নিয়ে লেখা দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের 'স্রোতের তৃণ' বই ও আশীষ গুপ্তের গল্প পড়ে প্রশংসাপত্র লিখে দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র দু একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে তাঁদের প্রতিষ্ঠান দেখে খুশী হয়ে প্রশংসা পত্রও লিখে দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের নিজের বই-এর সিনেমা থিয়েটার হ'লে, সিনেমা থিয়েটারের মালিকরা তাঁকে বই দেখাবার জন্য আমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতেন, এবং তাঁকে দিয়ে প্রশংসা বাণীও লিখিয়ে নিতেন।

তবে এমনও হয়েছে যে, অপরের নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়ে ভাল লাগায় স্বেচ্ছায় প্রশংসা বাণীও লিখে দিয়েছেন। যেমন—'সীতা' নাটকে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর দল পরিচালনা ও শিক্ষকতার শক্তি এবং তাঁর নিজের অভিনয় দেখে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। তখন তিনি সীতা নাটকের অভিনয় দেখে এই প্রশংসাপত্রটি লিখে দিয়েছিলেন—

সীতা

বিগত দুই রাত্রি উপর্য্যুপরি ও আদ্যোপান্ত মুগ্ধ হইয়া আমি এই নাটকের অভিনয় দেখিয়াছি। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে ইহার তুলনা নাই। আশ্চর্য এই স্বল্পকালের মধ্যে শিশির কি করিয়া না তাঁহার দলের নতুন লোকগুলিকে এমন মানুষ করিয়া তুলিলেন। বিশেষ করিয়া তাঁহার নিজের অভিনয় দেখিবার সময় বহুবারই মনে হইয়াছে, এই বাঙ্গলা দেশের সমস্ত অভিনেতাই যে সবিনয়ে ইহার কাছে আপনাদের শিশু বলিয়া মনে করেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। এবং সত্য স্বীকার করায় তাঁহাদের গৌরব আছে।

অটোগ্রাফের খাতায় বাণী

যশস্বী লেখক হিসাবে শরৎচন্দ্রের নাম ছড়িয়ে পড়লে, তখন অনেকেই তাঁর কাছে অটোগ্রাফের বা স্বাক্ষর সংগ্রহের খাতা নিয়ে তাঁর স্বাক্ষর ও বাণী আনতেন। এইরূপ বিভিন্ন ব্যক্তির অটোগ্রাফের খাতায় তিনি যে সব বাণী দিয়েছিলেন, এখানে তারই কয়েকটি উদ্ধৃত করছি—

শরৎচন্দ্র তাঁর বাজে শিবপুরের প্রতিবেশী বলাইচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অটোগ্রাফের খাতায় লিখে দিয়েছিলেন—

> অবাঞ্ছিত বস্তুকে সহিবার জন্য যে সহিষ্ণুতা, তাহার অর্জনেই মানুষের কল্যাণ।

নির্মল দেব নামক আর এক ব্যক্তির খাতায় লিখেছিলেন—

> যাকে চাই না, সে যদি আমার না চাওয়াকে পরাস্ত ক'রে আসে, তাকে যেন নিতে পারি।

কলকাতার বীণা দেবী সরস্বতীর, দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের স্বাক্ষর ও বাণী সংগ্রহ করার একটা ভীষণ ঝোঁক ছিল। সেই হিসাবে তিনি তাঁর একটি মোটা বাঁধানো খাতায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির বাণী নিয়েছিলেন। বীণা দেবী শরৎচন্দ্রের কাছে একবার বাণী চেয়ে তাঁর ঐ খাতাটি শরৎচন্দ্রের কাছে রেখে এসেছিলেন। খাতায় বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ধরণের ভাল ভাল কথা লেখা দেখে, শরৎচন্দ্র কতকটা ব্যঙ্গ করেই তখন সেই খাতায় নিজে লিখেছিলেন—

> হাতে কাজ ছিল না। বসে বসে সমস্ত লেখাগুলিই পড়লাম। জগতে এত বেশী ঈশ্বর-পরায়ণ ও সাধু ব্যক্তি আছেন জেনে মন খুসিতে ভরে উঠ্‌লো।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১১ই অক্টোবর '২৮

নলিনী-সম্বর্ধনায় আশীর্বাণী

১৩৩৯ সালের ৭ই ফাল্গুন নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের ৫০ বৎসর বয়সে পদার্পণ উপলক্ষে 'নলিনী-সাহিত্য' নামে যে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে শরৎচন্দ্র নীচের লেখাটি দিয়েছিলেন। রামমোহন লাইব্রেরীতে তখন একটি নলিনী-সম্বর্ধনা সভাও হয়েছিল। সেই সভায় এই লেখাটি পঠিতও হয়েছিল—

শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জন

শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জন আমার বহুদিনের বন্ধু। বাঙ্গলা সাহিত্যের কল্যাণ কামনায় এঁকে কতদিন কতদিকে কাজ করতে দেখেচি, কতদিন কত জায়গায় আমাদের দেখাশুনা ঘটেচে।

বহু দরিদ্র সাহিত্যিকের নলিনী আজীবন বন্ধু, তাঁদের মঙ্গলের জন্য কত পরিশ্রমই না নলিনী করেছেন।

বাঙ্গলা সাহিত্যের যে এতটা শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, সেটা যদি মনে করি কেবল মাত্র সাহিত্যিকদেরই চেষ্টায় হয়েছে, তাহলে অত্যন্ত ভুল করা হবে। শ্রীবৃদ্ধির ইতিহাসে অংশ দাবী করার দলিল যাঁদের হাতে নেই, তাঁদের অনেককে আমি জানি। নলিনী তাঁদেরই পুরোভাগে।

নলিনীর পঞ্চাশ বৎসর বয়স পূর্ণ হবার দিনে তাঁকে সম্বর্ধনা করতে অনেকে চান, আবার অনেকে তার বিরুদ্ধে। তাদের অভিযোগটা এই যে, নলিনীরঞ্জন সাহিত্য-সৃষ্টি করেন নি, সুতরাং এ সম্মান তাঁর প্রাপ্য নয়।

নলিনীরঞ্জন সাহিত্য-সৃষ্টি করেছেন কিনা, আমিও ঠিক জানি নে, কিন্তু সৃষ্টির জন্য অনেক কিছুই করেছেন, তা জানি। এই জন্যই বিশেষ একটা দিনে যদি বন্ধুবান্ধবের আয়োজনে তাঁর সম্বর্ধনা হতে পারে ত আমি অসঙ্গত ভাবি নে, এমন কি ন্যায়সঙ্গতই মনে করি।

নলিনীর আমি শুভাকাঙ্ক্ষী, তাঁর বহু সদ্গুণের কথা আমার অপরিজ্ঞাত নয়।

আমি সত্যই কামনা করি তাঁর সম্বর্ধনা যেন সফল হয়।

আমি অত্যন্ত পীড়িত, নইলে নিজেই গিয়ে উপস্থিত হোতাম।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দুটি ছবি আঁকা

সাহিত্যিক ও শিল্পীদের প্রতিষ্ঠান 'রসচক্রে'র অন্যতম সদস্য শিল্পী সতীশচন্দ্র সিংহ শরৎচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। সতীশবাবুর বাড়ীতে এক সময় কিছুদিন রসচক্রের অধিবেশন হয়েছিল। সতীশবাবুর বাড়ী শরৎচন্দ্রের কলকাতার বাড়ীর নিকটেই। তাই শরৎচন্দ্র কলকাতায় থাকাকালে রসচক্রের সভাপতি ছিলেন বলে সতীশবাবুর বাড়ীতে রসচক্রের সকল অধিবেশনেই যেতেন।

এছাড়া তিনি কলকাতায় থাকলে প্রায় প্রতিদিনই সতীশবাবুর বাড়ীতে বেড়াতেও যেতেন। গিয়ে তিনি সতীশবাবুর ছবি আঁকা দেখতেন এবং ছবি সম্বন্ধে আলোচনাও করতেন।

সতীশবাবু বলেন—"একসময় আমি আমার বাড়ীতে একটি বড় তৈলচিত্র এঁকেছিলাম। ছবিটির বিষয় ছিল, ছেলে কোলে সহ দাঁড়ানো এক মা। ঐ ছবিটি আঁকবার সময় একটি যুবতী মেয়ে তার ছোট্ট ছেলেটিকে কোলে নিয়ে ছবির 'মডেল' হিসাবে উপস্থিত থাকত। মেয়েটি তার ছেলেসহ প্রায় ২০ দিন এসে 'মডেল' হয়েছিল।

আমি 'ইজেলে'র সামনে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকতাম। শরৎদা আমার পাশে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে আমার ছবি আঁকা দেখতেন। শরৎদার তামাকের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। তিনি গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে তন্ময় হয়ে আমার ছবি আঁকা দেখতেন এবং আমি যতক্ষণ ছবি আঁকতাম, ততক্ষণ তিনি থাকতেন।

আমি সাধারণতঃ আধঘণ্টা অন্তর অন্তর ছবির 'মডেল' মেয়েটিকে বিশ্রাম করবার জন্য ছেড়ে দিতাম। ঐ সময় সে তার ছেলেকে নিয়ে একটু বিশ্রাম করে নিত।

আমি তুলি ধরে ছবি আঁকবার সময় শরৎদা কোন কথা বলতেন না। তুলি রাখলে তিনি প্রায়ই বলতেন—ঐ জায়গাটা ঐ রকম করলে কেন? আবার কখনও বলতেন—এইখানটায় এই রকমের একটা টান দিলে বোধ হয় ভাল হোত।